চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির প্রতিষ্ঠিত

ত্রৈমাসিক

পত্রিকা

বৈশাখ আষাঢ়

The Jay Shree Chemicals & Fertilisers

Prop. Jay Shree Tea & Industries Ltd.

Manufacturers of :

Superphosphate, Fertiliser Mixtures, Sulphuric Acid, Cryolite, Sodium Selico Fluoride, Precipitated Silica etc.

Factory & Office :

Nanda Bose Road,
Khardah, 743 155
24 Parganas,
West Bengal

Telephones : 58-1064, 58-1399, 58-2945

Regd. & Sales Office :

Industry House
10, Camac Street, (15th Floor)
Calcutta, 700 017

Telephones : 44-9821/25, 44-9827

Telegram : JAYSUPER, Calcutta/Khardah

কৃষি সংবাদ

ঠিকমত সার দিন অধিক ফলনশীল ধানে অনেক বেশী ফলন পাবেন

জমি তৈরীর সময় একরপিছু ৮-১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট সার দিন। জমি কাদা করার সময় সবটা ফসফেট ও পটাশ সার এবং মোট দেয় নাইট্রোজেন সারের ১/৪ অংশ দিন।

জমি উর্বর হলে কাদা করার সময় নাইট্রোজেন সার দেওয়ার দরকার নেই, ঐ সময়ে শুধু সবটা ফসফেট ও পটাশ সার দিন এবং নাইট্রোজেন সার পাশকাঠি ছাড়ার সময় ও থোড় আসার আগে দুবারে দিন।

কোন ধানে কি কি সার কখন দেবেন

জাত	কাদা করার সময় প্রতি একরে	নাইট্রোজেন চাপান সার প্রতি একরে (রোয়ার কতদিন পরে)
১। জলদি জাত	নাইট্রোজেন ৫-৬ কেজি	১০-১৫ দিন পরে ১০-১২ কেজি
১০০-১২০ দিনে পাকে	ফসফেট ১০ "	৩০-৩৫ দিন পরে ৫-৬ "
	পটাশ ১০ "	
২। মাঝারি জাত	নাইট্রোজেন ৬-৭	১০-১৫ দিন পরে ১২-১৪ "
(ক) ১২০-১৩০ দিনে পাকে	ফসফেট ১২ "	৪০-৪৫ দিন পরে ৬-৭ "
	পটাশ ১২ "	
(খ) ১৩০-১৪৫ দিনে পাকে	নাইট্রোজেন ৬-৭ "	১০-১৫ দিন পরে ১২-১৪ "
	ফসফেট ১২ "	৪৫-৫০ দিন পরে ৬-৭ "
	পটাশ ১২	
৩। মাঝারি-নাবি ও নাবি জাত		১০-১৫ দিন পরে ১২-১৪ "
(ক) ১৫০ দিনের বেশী	ঐ	৫৫-৬০ দিন পরে ৬-৭ "
(খ) মাসুরী ও-সি ১৩৯৩	নাইট্রোজেন ৪	১০-১৫ দিন পরে ৮ "
এন-সি ১২৮১,	ফসফেট ১২ "	৫৫-৬০ দিন পরে ৪ "
সি-আর ১০১৪	পটাশ ১২ "	

তবে মাটি পরীক্ষা করিয়ে সার দিলে সারের অপচয় কম হবে ও ফলন ভাল পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

NEW FROM NBT (I)

The Press
by M. Chalapata Rau Rs. 8.50

The Indian Theatre
by A. Rangacharya Rs. 8.25

Geography of the Himalaya
by S. C. Bose Rs. 10.25

The Communications Revolution
by Narayana Menon Rs. 5.75

Broadcasting and the People
by Mehra Masani Rs. 10.25

The Past and Prejudice
by Romila Thapar Rs. 5.00

Freedom Struggle
by Bipan Chandra
Amales Tripathi &
Barun De Rs. 5.00

Population (2nd rev. ed.)
by S. N. Agarwala Rs. 9.50

Sri Lanka
by Urmila Phadnis Rs. 6.75

Malaysia
by M. Sivaram Rs. 6.00

Vegetables (5th rev. ed.)
by B. Chowdhury Rs. 11.00

AVAILABLE AT LEADING BOOK STALLS IN CALCUTTA

Temples of North India (Rp.)
by Krishna Deva Rs. 8.00

Indian Folk Arts & Crafts (Rp.)
by Jaslean Dhamija Rs. 12.25

Jewellery of India
by Francis Brunel Rs. 32.50

Album of Indian Paintings
by Mulk Raj Anand Rs. 28.50

Album of Indian Sculpture
by C. Sivaramamurti Rs. 28.00

Folklore of Punjab
by S. S. Bedi Rs. 7.75

Folklore of Assam
by Jogesh Das Rs. 5.75

Folklore of Tamil Nadu
by S. M. L. Lakshmanan
Chethar Rs. 10.75

You and Your Health
by V. N. Bhave and others
Rs. 20.00

You and Your Food
by K. T. Achaya Rs. 5.50

Wonders of Space
by Mohan Sundara Rajan
Rs. 10.50

The Weather Weapon
by N. Seshagiri Rs. 10.00

NATIONAL BOOK TRUST, INDIA
A-5, GREEN PARK, NEW DELHI 110 016.

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ	১·৫০	জোড়াসাঁকোর ধারে	৬·৫০
ভারতশিল্পে মূর্তি	১·৫০	ঘরোয়া	৫·০০
বাংলার ব্রত	৩·৫০	পথে বিপথে	৫·৫০
সহজ চিত্রশিক্ষা	১·৬০	আলোর ফুলকি	৫·৫০

আধুনিক শিল্পশিক্ষা : শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতে শিল্পশিক্ষার ইতিহাস, তিনটি পর্যায়ে আলোচিত : ১। ইংরেজ প্রবর্তিত আর্ট স্কুলের শিক্ষা; ২। ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা এবং ৩। আধুনিকতম শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য। এই রচনা শিল্পী ও শিল্প-অনুসন্ধিৎসু হিসাবে লেখকের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সংবলিত। মূল্য ৬·০০ টাকা।

শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত : মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

শিল্প-শিক্ষার্থী এবং শিল্প-জিজ্ঞাসুদের জন্য প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা। গ্রন্থটি চার ভাগে বিভক্ত : ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, ভারতীয় চিত্রকলা, বহির্ভারতের শিল্পের ইতিহাস এবং সমসাময়িক চিত্রকলা ও অবনীন্দ্র-যুগ। মূল্য লিম্প বাঁধাই ২০·০০ টাকা, শোভন সংস্করণ ২৪·০০ টাকা।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ : শ্রীমতী রানী চন্দ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির চিত্তাকর্ষক কাহিনী এবং ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়। শিল্পীগুরুর আত্ম-প্রতিকৃতি, বিখ্যাত রঙিন চিত্র 'কালো মেয়ে', কুটুম-কাটামের তিনখানি প্রতিলিপি, সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অলংকৃত। মূল্য ১০·০০ টাকা, শোভন সংস্করণ ১২·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা-৭১

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

ASIAN DRAMA

BY GUNNAR MYRDAL

AN INQUIRY INTO THE POVERTY OF NATIONS

The three volume edition of **Asian Drama**, 'an encyclopaedia of the history, politics and economic prospects of the newly independent nations of South Asia', originally published by Allen Lane. The Penguin Press has been compressed into this Pelican edition by Seth S. King of **New York Times. £ 1.75 Rs. 28.00**

Exclusive Distributors—

Rupa & Co.

15 Bankim Chatterjee Street,
Calcutta 700 073
Also at—Allahabad : Bombay : Delhi

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী : বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু করিয়া প্রতি তিন মাসে অর্থাৎ আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে "চতুরঙ্গ" বাহির হয়। সডাক বার্ষিক মূল্য ৮·৫০ পয়সা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা। বৈদেশিক দুই পাউন্ড পঞ্চাশ স্টারলিং এবং চার ডলার, উভয় ক্ষেত্রেই রেজেস্ট্রী খরচসহ।

"চতুরঙ্গে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য বাধ্যতা থাকিবে না। ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটওয়ালা লেফাফা না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

প্রতি সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের মূল্য :

সাধারণ পৃষ্ঠা ৩২৫·০০ টাকা। অর্ধপৃষ্ঠা ২০০·০০ টাকা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কভার পৃষ্ঠা ৪২৫·০০ টাকা ও চতুর্থ কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা ৫০০·০০ টাকা।

পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ২৫ দিন পূর্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধাদি বিনিময় পত্রিকাদি চিঠিপত্র টাকাকড়ি চেক ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি
পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা :

৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা, ৭০০০১৩

ফোন : ২৪-৬১২৭

স্বাগতবিদায়	৫·০০
(১৯৭৪ সালে রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত)	
যে আঁধার আলোর অধিক	৬·০০
হোল্ডারলিনের কবিতা	৩·৫০
মেঘদূত (অনুবাদ)	১৫·০০
দময়ন্তী দ্রৌপদীর শাড়ী	৪·০০

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-৭৩

সকল কাব্যপ্রেমিকের অবশ্য পাঠ্য
গার্সী-অস্তেরো কর্তৃক প্রকাশিত অভিনব
ব্রতকথা
লোকনাথ ভট্টাচার্যের সুদর্শন

ঘর

॥ মূল্য সাড়ে আট টাকা ॥

[বইটির একটি বৃহৎ অংশ ফরাসী অনুবাদে পুস্তকাকারে ফ্রান্স হতে প্রখ্যাত FATA MORGANA কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। নাম *PAGES SUR LA CHAMBRE*]

প্রাপ্তিস্থান
ভারবি, লেখক সমবায় সমিতি বিপণি,
কর্মা কে এল মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা।

The Little Oxford Dictionary

now includes a 32-page Supplement of Indian Words

Though this is the smallest of the Oxford dictionaries, there is room in it for 30,000 defined words and combinations, besides idiomatic phrases and derivatives.

The Supplement contains a selection of words that have entered English from the Indian languages.

Compiled by George Ostler
Fourth edition edited by Jessie Coulson
Supplement of Indian Words by
R. E. Hawkins
Fourth edition Crown 16mo, 736 pages
Cloth boards Rs. 12.00

Other Oxford Dictionaries

The Oxford English Dictionary
in 13 volumes
Royal 4to, 16,570 pages £ 150

A Supplement to the Oxford English Dictionary
Vol. 1 : A-G Royal 4to, 1356 p. £20
Vol. 2 : H-N Royal 4to, 1300 p. £22

The Compact Oxford English Dictionary
in 2 volumes
Royal 4to, 4134 pages £50
(with reading glass)

The Shorter Oxford English Dictionary
in 2 volumes
3rd edition Demy 4to, 2700 p. £35

The Concise Oxford Dictionary
5th edition Crown 8vo, 1574 p. Rs. 30

The Pocket Oxford Dictionary
5th ed. F cap 8vo, 1072 p. Rs. 22.50

Oxford School Dictionary
Dorothy Mackenzie, revised by
Joan Pusey
3rd ed. Demy 8vo, 384 p. Rs. 16.00

Oxford
University Press

নিরহঙ্কার
গর্ব ...
দীন বাউলের গর্ব
তার একতারা।
একতারার তারে যে
সুরের ঝঙ্কার সে তোলে
তা লক্ষ প্রাণে সঞ্চারিত
হ'য়ে অপূর্ব আবেগের সৃষ্টি
করে। বাউল ও তার একতারা
আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের
সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত।
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রসারিত
অনাড়ম্বর রেলপথও আমাদের গর্ব।
বিভিন্ন অঞ্চলকে একত্র গ্রথিত করে,
বিভিন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, সমগ্র
দেশকে সে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।
পূর্ব রেলওয়ে

অতীত বাংলার রাজধানী

গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় আসুন

মালদা শহর থেকে অল্প দূরে গৌড় এবং পাণ্ডুয়া মধ্যযুগীয় বাংলার দুটি প্রধান শহর... আজও অতীতের অনেক গৌরব বহন করে আছে। সেখানে আজ আর সেই রাজকীয় আয়োজন ও আড়ম্বর নেই। তবুও অসংখ্য মিনার ও মসজিদ এবং অতীতের বহু স্মৃতি-চিহ্ন এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। চুপিচুপি আজও তারা সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা কয়।

কলকাতা থেকে ট্রেনে মালদা ৭ ঘণ্টার পথ। ফরাক্কা সেতু হয়ে যাওয়াতে সোজাসুজি মোটরে কিংবা বাসে যেতে পারেন সহজেই। সড়কপথে মালদার দূরত্ব ৩৩৮ কিলোমিটার। মালদার আরামপ্রদ ট্যুরিস্টলজে কয়েকটা দিন আনন্দে কাটিয়ে আসুন।

বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
রিজার্ভেশন কাউন্টার
ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন
৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট)
কলিকাতা-৭০০ ০০১

ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট), কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২৩-৮২৭১, গ্রাম ঃ TRAVELTIPS

পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
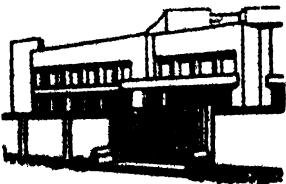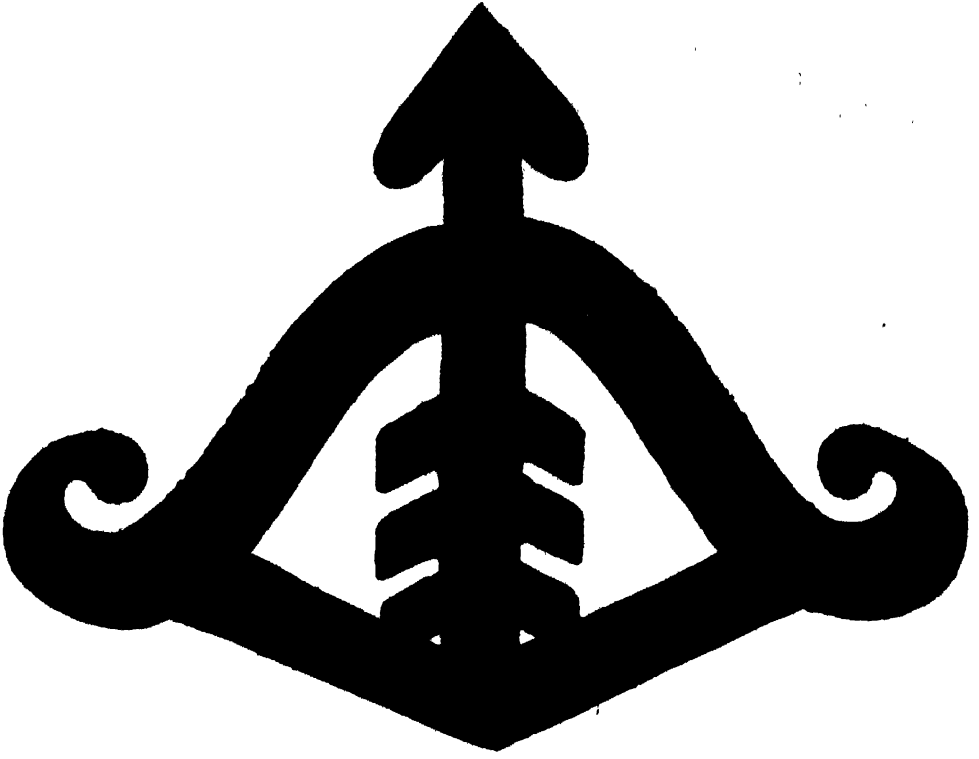
এই শরতে আকাশকে দেখে ঈর্ষা হয় আমাদের। সাদা মেঘের কোনোটা নৌকো, কোনোটা জাহাজ। তরতরিয়ে ছুটে চলেছে নীল সমুদ্রে। কোথাও বাধা নেই। বিশৃঙ্খলা নেই। উন্মুক্ত, অবাধ। অথচ আমরা যারা এই কলকাতা শহরের মানুষ, তাদের চলার গতি প্রতি মুহূর্তে বিপর্যস্ত। এই দুরূহ সমস্যাটাকে মনে রেখেই ভূগর্ভ রেল তার

লক্ষ্যভেদে স্থির।

কলকাতার মন্থর এবং বিশৃঙ্খল যানবাহনের জগতে ভূগর্ভ রেল গেঁথে চলেছে এমন এক সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ, যখন আমাদের চলার পথ হবে শরতের মেঘের মতই উন্মুক্ত, অবাধ আর বিঘ্নহীন।

ভূগর্ভ রেল মানেই গতির প্রগতি

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায়—ভূগর্ভ-রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

Only Chloride could beat Chloride's 'long-life' record!

Chloride India's advanced technology presents

Exide supreme

Tomorrow's battery here today!

Exide 'Supreme' is the end result of years of intensive research and development. Its unique high-grade polypropylene container and special power-packed construction makes Exide 'Supreme' the sturdiest, most advanced battery for your car. Proof of its superiority is the instant acceptance in sophisticated international markets. And Exide 'Supreme' is manufactured by Chloride India—so it's got to be the best!

Longer life! More power!
—and here's why:

1. **LONGER LIFE** because of improved plate and battery design.
2. **MORE POWER** because it has special through-partition inter-cell connectors and shorter plate pitch resulting in instant starting even in extreme weather conditions.
3. **PEAK EFFICIENCY** because special lid construction min[illegible] surface leakage and [illegible] corrosion
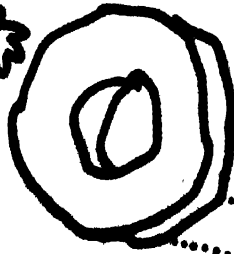
Exide Supreme has already been accepted as original equipment fitment in Ambassador, Premier and Standard cars. Also being used by the State Transport undertakings.

This battery is available for replacement in Ambassador, Premier and Standard cars.

A CHLORIDE PRODUCT

CIC-4LINI

'...তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি'

সেই কবে ইতিহাসের ঊষালোকে আদিম
যুগের মানুষ আবিষ্কার করলো চক্রের রহস্য—
সুরু হলো সভ্যতার জয়যাত্রা। হাজার-হাজার বছর
অতিক্রান্ত হলো। তারপর একদিন জন বয়েড
ডানলপ আবিষ্কার করলেন হাওয়া-ভরা নিউম্যাটিক
টায়ার—চক্রের জয়যাত্রা এবার দ্রুততর হলো।
বিজ্ঞানের এই বিচিত্র আশীর্বাদকে ভারতবর্ষে প্রথম
নিয়ে এল ডানলপ। তারপর থেকেই
প্রগতি মিছিলের পুরোধায় রয়েছে ডানলপ ইণ্ডিয়া।

প্রগতির পথিকৃৎ

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন ঃ

খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করা হচ্ছে যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কী ভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাই ভালো।

কী ভাবে মোকাবিলা করবেন ঃ

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের খরচ কমান। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জলের পাম্প, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আইন মেনে চলুন ঃ

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দয়া করে মনে রাখবেন। সকাল ৯-৩০ থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকন্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ন, মার্কারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বাতি জ্বালানোও নিষেধ।

'বিদ্যুৎ' ঘাটতি কমিয়ে আনতে আমাদের সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

SEB 459A2/77
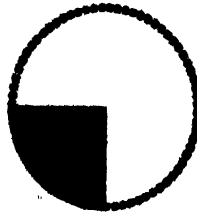
for comprehensive consultancy services in every field of engineering activity

For more than 25 years we have been providing technical consultancy services from start to finish. For every aspect of engineering, involving power generation and distribution, paper, fertiliser, cement, steel, other ferrous and non-ferrous metals, mining, material handling, textile, docks and harbours etc. involving architectural, structural, mechanical, electrical and project-development-construction-management-operation activities.

From feasibility studies and project reports through design engineering and supervision to successful commissioning, our veteran engineers bring all their experience and know-how to the task, assisted by computerised technology to turn your proposals into working projects.

In the international field also, we are providing technical consultancy service in a big way–Thailand, Philippines, Nepal, Syria, Egypt, Iraq, Kenya and Venezuela being some of the countries where we have already exported our service.

DEVELOPMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

Consulting Engineers

24-B Park Street, Calcutta-700 016
Phone: 24-8153 (8 lines)
Cable: ASKDEVCONS
Telex: KULCIA 021 7401
Branches: NEW DELHI BOMBAY MADRAS DAMASCUS CAIRO PUERTO ORDAZ HONG KONG NEW YORK
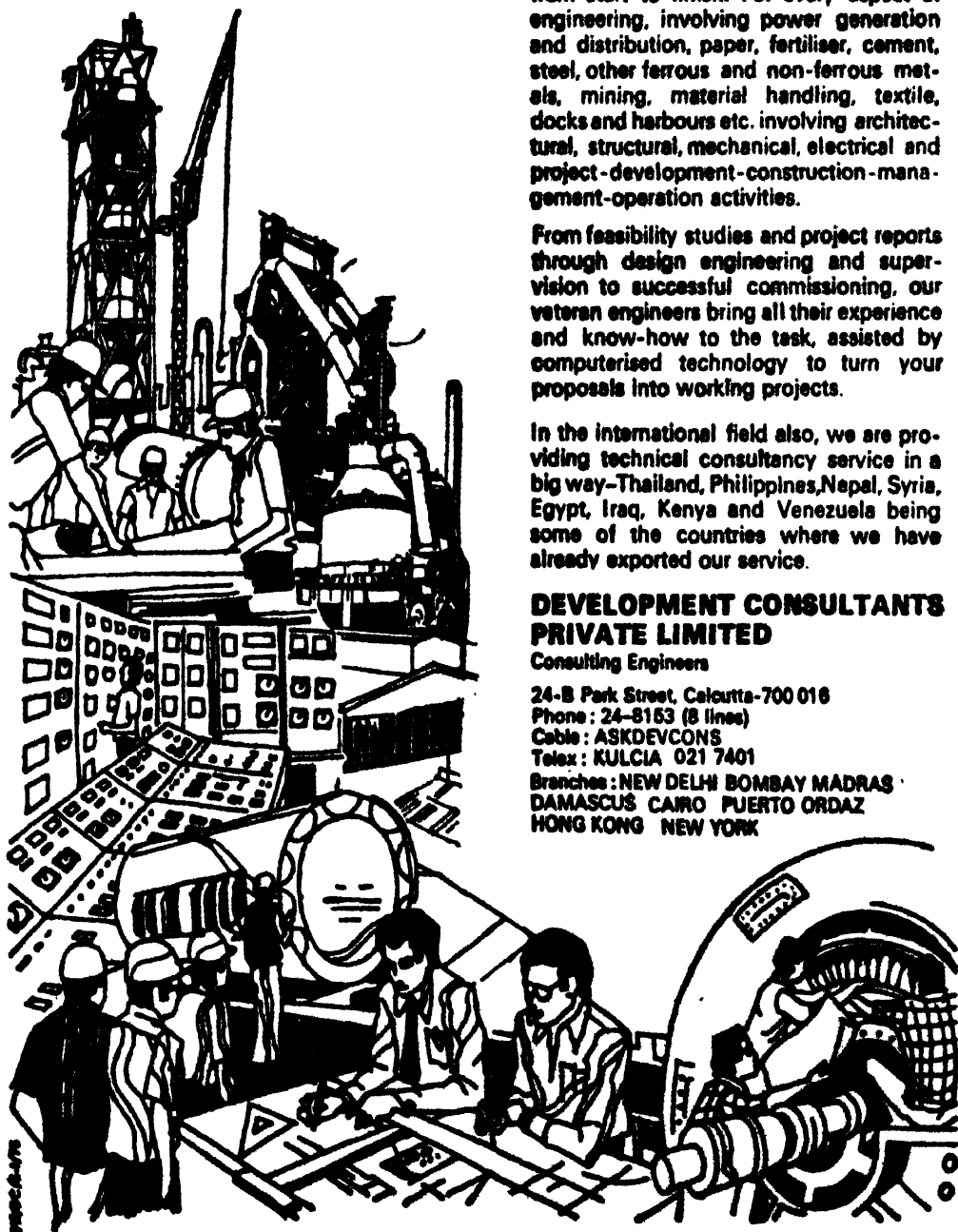
বর্ষ ৩১ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৪

সূচিপত্র

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদপট : কানু বসু

আতাউর রহমান কর্তৃক রে অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২১/১ ভট্টার লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও
৫৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বোরোলীন

অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

দাড়ি আপনাকে কামাতেই হবে

তা আপনি যতই ক্লান্ত বিরক্ত আর আলস্য বোধ করুননা কেন ! কাজটা সহজ সুন্দর এবং মোলায়েম হয়ে যায় যদি রাত্তিরে শোবার সময় বোরোলীন মেখে শুতে যান। দাড়ি কামাবার পর আবার মুখে মেখে নিন বোরোলীন— সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম।

বোরোলীন ত্বককে করে তোলে নরম ও শান্ত। তাছাড়া হঠাৎ কেটে গেলে বা ছড়ে গেলেও ভয় নেই। বোরোলীন নিরাময়ী। বোরোলীন জীবাণু নাশক। এমন কি ফুসকুড়ি, ব্রণ—ইত্যাদির উৎপাতও জব্দ তার কাছে। সুতরাং দাড়ি কামাবার অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলুন আগে পরে নিয়মিত ভাবে বোরোলীন ব্যবহারের অভ্যাস।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

বোরোলীন হাউস, ১ [illegible] এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৩
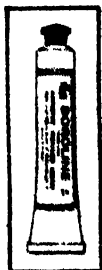
বর্ষ ৩১ বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৪

মার্কস ও ব্যক্তিমানুষ

সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

একথা সত্য যে নানা ব্যক্তির কাছে মানবতাবাদের নানা অর্থ হতে পারে। ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধতা থেকে আমূল সামাজিক পরিবর্তনের সমর্থকদের দৃষ্টিভঙ্গীকে, এক অর্থে, 'মানবতাবাদী' বলাটা হয়তো অযৌক্তিক নয়। গোঁড়া মার্কসবাদীরা অবশ্য বলতে চান যে, মানবতাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থানের দ্বারা। মানবতাবাদের নানা ভাষ্য যে আমরা পাই তার কারণ মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ, মানবকল্যাণ, মানুষ ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যেকার সম্পর্ক, নৈতিক মূল্যবোধের যথার্থতা প্রভৃতি সমস্যা প্রসঙ্গে নানা মুনির নানা মত। মানবতাবাদী ভাবধারায় মার্কসবাদও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেকের মতে মার্কসবাদই মানবতাবাদী আদর্শসমূহের বাস্তবায়নের পথ দেখিয়েছে; মার্কসবাদই দেখিয়েছে কিভাবে সমাজের বৈষয়িক ও শ্রেণীগত গঠনবিন্যাসের প্রভাবে চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটে এবং কিভাবে আবার চিন্তাধারাকেই মানুষ বৈষয়িক ও সামাজিক পরিবর্তনের কাজে ব্যবহার করে।

ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের 'নাইট' হিসাবে মার্কস বিশেষ পরিচিত। ইতিহাসের তিনি বস্তুবাদী ভাষ্যকার, বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নিয়েই তার নিরন্তর ভাবনা। মার্কসের এই চরিত্রচিত্রণ যথার্থ নয়, এমন কথাও বলা যায় না। তবুও রুবেলের সঙ্গে (Maximibel Rubel) সুর মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়, 'আজ মার্কসের পুনর্বাসনের প্রয়োজন।' একথা আজ নানা মহলে স্বীকৃত যে, মার্কসবাদে এমন কতকগুলি 'সত্য' আছে এযাবৎ যা বিস্মৃতির অতলে ডুবে ছিল, অন্তত অনুচ্চারিত ছিল। আজ সেইসব 'সত্য'গুলিকে তাদের স্বকীয় মর্যাদার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। গোঁড়া মার্কসবাদীদের মুখর ভাষণ উপেক্ষা করে নানা দেশে মার্কস-বাদীরা সেই কাজে হাত দিয়েছেন। এদেশের মার্কসবাদীরাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন?

কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মার্কস শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তা, বিপ্লবের কলাকুশলী, শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের তাত্ত্বিক, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাতা—এইসব বিশেষণে ভূষিত করলেই কার্ল মার্কসের সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। কেননা মার্কস দার্শনিক, জার্মান এনলাইটেনমেন্টের উত্তরসাধক,—ব্যক্তিমানুষের সমস্যা নিয়ে তিনি ভাবিত। তিনি কবি এবং দার্শনিক, প্রবুদ্ধ মানবিকতার প্রবক্তা; মার্কসের বোধ হয় এটাই প্রকৃত পরিচয়।

একদা এসব বক্তব্য শোনাও পাপ ছিল। এখনও গোঁড়া মার্কসবাদীরা বলবেন, এসব বক্তব্য তাদেরই যারা বুর্জোয়া সমাজের আদর্শ ও ভিত্তিকে রক্ষা করবার জন্য কাজ করছে, আক্রমণ করছে 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মানবতাবাদের সক্রিয় বৈপ্লবিক কর্মধারাকে'। আর কিছুকাল আগে, স্তালিনযুগে তো বার বার শোনা যেত মার্কস সামূহিকতার দার্শনিক, ব্যক্তির শিশিরবিন্দু সমাজরূপী কিংবা শ্রমিককর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্ররূপী মহাসমুদ্রে বিলীন না হলেই নাকি 'মহতী বিনষ্টি'। স্তালিনোত্তর যুগে, সমাজতান্ত্রিক দেশসহ অনেক দেশের মার্কসবাদী ভাবুকেরাই অধুনা বলছেন 'মার্কস মুখ্যতঃ ব্যক্তিমানুষের দার্শনিক'। সাম্যবাদকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার ও পূর্ণতার স্বার্থে। সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানুষের অবাধ বিকাশ সম্ভব হবে, মানুষ স্ব স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত হবে, এই ছিল মার্কসের আত্যন্তিক প্রত্যয়। নিরাপত্তা কিংবা দেহী জীবের সুখসম্ভোগের জন্য কিংবা শুধু প্রাচুর্যের জন্য সাম্যবাদ কাম্য—এ বক্তব্য মার্কসের নয়। *Economic and Philosophical Manuscripts of 1844*-এর শেষভাগে এবং *German Ideology*-তে মার্কস ভাবীকালের সাম্যবাদী সমাজের ছবি এঁকেছেন। সে ছবি কল্পনায় স্নিগ্ধ, কাব্যিক, হয়তো অংশত ইউটোপিয়ান। তবু মনে হয়, সেই ছবিতে কবিদার্শনিক মার্কসের পরিচয়ই প্রধান। মার্কস কল্পনার ধ্যাননেত্রে যে সাম্যবাদী সমাজের ছবি দেখেছেন সেই সমাজে নিপীড়ন নেই, পুরুতপাণ্ডা, ধর্মের ভেকধারীদের কর্তৃত্ব নেই, নেই রাষ্ট্রনায়কতা কিংবা পার্টিনায়কতার উদ্ধত কর্তৃত্ব। সেই সমাজে শ্রমবিভাগের উৎকেন্দ্রিকতা ও গ্লানি নেই, নেই টাকার দাসত্ব। এই সমাজ শ্রেণীহীন, শোষণহীন, নিপীড়নহীন। প্রবুদ্ধ মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতায় গড়ে-ওঠা এই সমাজ। সমষ্টিতান্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিমানুষ এই সমাজে বলিপ্রদত্ত নয়। পূর্ণতার সাধনায়, মানবধর্মের সাধনায় সকলেই এখানে আনন্দযোগে নিযুক্ত।

মার্কস যে 'ব্যক্তিমানুষের দার্শনিক', এ আবিষ্কার সাম্প্রতিককালের। অধুনা তাঁর যে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পুস্তকটি নিয়ে অনুশীলন হচ্ছে সেটি হল *Economic and Philosophical Manuscripts of 1844*। ১৯২৭ সালে সোভিয়েত দেশে পুস্তকটির একটি অসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। জার্মানির লাইপজিগে প্রথম জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। ১৯৫৯ সালের আগে ইংরাজি ভাষায় পুস্তকটির কোন সংস্করণ ছাপা হয়নি। তরুণ মার্কসের অন্যান্য লেখার উপরও পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সাম্প্রতিককালে। মার্কস-সাহিত্যের মধ্যমণি হিসাবে স্বীকৃত-*Grundrisse*-ও ১৯৫৩ সালের আগে সহজলভ্য ছিল না। যদিও মার্কস স্বয়ং বলেছেন : 'পুস্তকটি আমার পনের বছরের, অর্থাৎ আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট কালের অনুশীলনের ফসল।' অধুনা-সুলভ মার্কসীয় সাহিত্য অনুশীলন করলে দেখা যাবে যে, মার্কসমানসে বরাবরই বিচ্ছিন্নতা তথা অ্যালিয়েনেশনের সমস্যা উপস্থিত ছিল। অ্যালিয়েনেশনের সমস্যাকে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিহার করেছিলেন, এ কথা তাই স্বীকার করা চলে না। মেস্‌জারস্ (Meszaros) তো দাবি করেছেন যে, 'সমগ্র খসড়ায় এই সমস্যার বিপুল উপস্থিতি সম্পূর্ণ বহাল আছে এবং তিনশটি প্রসঙ্গে সমস্যাটির আবির্ভাব ঘটেছে। [it maintains its massive presence throughout the whole manuscript and appears in some 300 contexts]

Economic and Philosophical Manuscripts of 1844 ও সমকালীন মার্কসীয় লেখাগুলিকে 'অর্বাচীন' আখ্যা দিয়ে অনেকে বাতিল করতে চান। অথচ মার্কস যখন তাঁর পরবর্তী লেখায় সঙ্গে হেগেলদর্শনের সম্পর্কের প্রশ্ন আলোচনা করতে চেয়েছেন (ক্যাপিটালের দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধে) তখন তাঁর মতামত বুঝবার জন্য *Manuscripts*-এর অন্তর্ভুক্ত *Critique of*

Hegelian Dialectic-এরই উল্লেখ করেছেন। যদিও আজও ঐ *Manuscript* টি মার্কসবাদ-জিজ্ঞাসুরা তেমনভাবে পড়েন না।

আধুনিক মার্কসচর্চার দৌলতে আজ বোঝা যাচ্ছে যে *Manuscripts*, *The German Ideology* ও *Grundrisse*, এবং ঐ পর্বের অন্যান্য লেখায় মার্কস বিস্তারিতভাবে তাঁর তাত্ত্বিক অবস্থান এবং তাঁর স্বকীয় পদ্ধতির আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে ক্যাপিটাল গ্রন্থে দেখা যায় এই পদ্ধতির প্রয়োগ। ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্কস পর্বান্তরে পৌঁছেছেন, তরুণ বয়সের লেখার সঙ্গে এই পর্বের চিন্তাভাবনার কোন পরম্পর্য নেই, এ বক্তব্য কোন কোন মহল থেকে ওঠে ঠিকই, কিন্তু এ বক্তব্য ইদানীংকালের খ্যাতিমান পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেননি। অপরপক্ষে, এসব পণ্ডিতেরা বলেন যে তরুণ বয়সের মার্কসের অ্যালিয়েনেশন তত্ত্বটাই ক্যাপিটালের 'অর্থনৈতিক শোষণের বিশ্লেষণে পূর্ণতা লাভ করেছে। কেননা মার্কস দেখিয়েছেন, মানুষই ইতিহাস রচনা করে; আবার একই সঙ্গে নিজের নবরূপায়ণ সম্পন্ন করে। ইতিহাসেরই ধারাপথে শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপিত হয় এবং এই সমাজেই মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশের পথ অবারিত করে তোলে। মার্কস-ভাবনার পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাত্রা হয়তো আছে, কিন্তু একথা বিস্মৃত হওয়া যায় না যে ১৮৪৪ সালের *Manuscripts* হতে মার্কসের প্রবীণ বয়সের লেখা পর্যন্ত, সর্বত্র, এইসব ধ্যানধারণা ও দার্শনিক প্রতীতিরই বিস্তার।

আধুনিক পণ্ডিতেরা দেখাচ্ছেন, মার্কসের দার্শনিক ও সমাজবিষয়ক রচনাসম্ভার থেকে যে মৌল প্রত্যয়গুলির পরিচয় মেলে তা তিন ধরনের। প্রথমত, মানুষের প্রকৃতি ও তার অ্যালিয়েনেশন সম্পর্কে। দ্বিতীয়ত, ইতিহাস সৃষ্টি এবং মানুষের নবরূপায়ণ সম্পর্কে। তৃতীয়ত, সমাজরূপান্তরে মানুষের সজ্ঞান ও সচেতন অংশগ্রহণ সম্পর্কে।

বলা বাহুল্য, মার্কস প্লেটোর ধরনে বিশেষ ও সাধারণ, ব্যক্তি ও সামান্য (universal)—এই প্রকারের ধ্যানধারণার প্রশ্রয় দিয়ে ব্যক্তি-অতিক্রমী 'মানবতা'-রূপী সামান্যে উপনীত হননি। তাঁর ভাবনার বিষয় সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক মানুষ। মার্কস মনে করেছেন, মানুষ স্বতঃই স্রষ্টা, তবে তার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এগিয়ে চলে নিঃসঙ্গ একাকিত্বের অন্ধকারে নয়, সহকর্মীদের সহযোগিতার আশ্রয়ে। এই সৃষ্টিশীল কর্মধারায় মানুষ নিজেকে খুঁজে পায়, বহির্জগতের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে পূর্ণতর হয়ে ওঠে। আধুনিক কালের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও মানুষেরই সৃষ্টি। অথচ এই ব্যবস্থায় যান্ত্রিকতার শৃঙ্খলে মানুষ বন্দী। এই ব্যবস্থায় মানুষের শুধু উপকরণ-মূল্যই আছে এবং দেখা গেছে এই ব্যবস্থার বিধিবিধান মানুষের স্বার্থ, মানুষের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। 'অ্যালিয়েনেশন' বলতে মার্কস এই কথাই বুঝেছিলেন। মার্কস তাই চেয়েছিলেন অ্যালিয়েনেশন-মুক্ত সমাজ, এমন সমাজ যেখানে মানুষের ব্যক্তিসত্তার অবাধ বিকাশ সম্ভব। এবং বলা বাহুল্য, পুঁজিবাদ এমন সমাজ নয়।

ইতিহাসসৃষ্টি প্রসঙ্গে মার্কস বলতে চান যে, সমাজ-কাঠামো বিধিদত্ত ব্যবস্থা নয়, মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু সমাজ-কাঠামো একবার দানা বাঁধলে, স্থিতি লাভ করলে, মানুষের উপর সে প্রভাব ফেলে। অবশ্য মানুষ নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে (তার প্রয়োজনের কথা মনে রেখে) এই সমাজ-কাঠামোকে নতুন রূপ দিতে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষও পরিবর্তিত হচ্ছে, নবরূপে ঘটছে তার আবির্ভাব। আমাদের যুগে পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ করেও এই সত্যে উপনীত হওয়া যায়। পুঁজিবাদ যত বিকাশ লাভ করে ততই সৃষ্টি হয় পুঁজিবাদ-বিনাশের শর্তাবলী। দেখা দেয় অ্যালিয়েনেশন-মুক্ত সমাজের পূর্বশর্ত। পুঁজিবাদ অপ্রাচুর্যের স্থলে প্রাচুর্য আনে, মানুষের প্রয়োজন মেটাবার পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে। অথচ যে জনগণের অসম্মতিতে পুঁজিবাদ ভারাক্রান্ত সেই অসম্মতি দুরী-

করণের বাস্তব পরিবেশও সৃষ্টি করে পুঁজিবাদ। মার্কস-ভাবনায় তৃতীয় যে সূত্রটি মূল্যবান সেটি হল মানুষের চৈতন্যের ক্রিয়াশীলতার স্বীকৃতি। মার্কস মৌমাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের সঙ্গে মানুষের যে আত্যন্তিক পার্থক্য তা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে মৌমাছিতন্ত্র ও মানবধর্ম আলাদা। মানুষই পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে, তার সম্ভাবনা কতটুকু তার বিচার করে। মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত করতে হলে মানুষের উদ্দেশ্যকে, চিন্তাভাবনাকে, প্রেরোবোধকে বুঝতে হবে। মার্কস তাই চেয়েছেন মানুষ নিজেকে ও জগৎকে চিনুক, বিকশিত পুঁজিবাদের সম্ভাবনা ও সংকট সম্পর্কে অবহিত হোক। এই জ্ঞান, এই সচেতনতা এক অর্থে মনোজাগতিক বিপ্লব। এই মানসিক বিপ্লব সংঘটিত না হলে সমাজরূপান্তরের প্রচেষ্টা চোরাবালিতে পথ হারাবে, স্রষ্টা মানুষ হার মানবে পরিবেশের কাছে। মার্কস দেখেছেন পুঁজিবাদ এক বিশেষ ঐতিহাসিক পর্বের সমাজব্যবস্থা, এর নিজস্ব নিয়মকানুন আছে। কিন্তু তিনি বুঝেছেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সচেতনতার বুলির আড়ালে মানুষের জীবনের সম্ভাবনাকে খণ্ডিত করা চলে না। অধিকাংশ মানুষ যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতা সম্পর্কে সচেতন হবে, স্বেচ্ছায় অংশ নেবে নতুন সমাজগঠনে, তখনই আবির্ভাব হবে সমাজতন্ত্রের। এই আবির্ভাব হবে সংগ্রামের পথে, কেননা নবজন্ম দুঃখ ও অশ্রুপাত বিনা সম্ভব নয়।

মার্কস অ্যালিয়েনেশনের পটভূমিকায় প্রকৃতি মানুষ ও সমাজের প্রশ্ন তুলেছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহিমময় হয়ে উঠতে পারেনি মানুষ। জ্ঞানে-কর্মে, স্নেহপ্রেম-প্রীতিতে, সুন্দরের সাধনায় সার্থকতা লাভ করতে পারেনি অগণিত মানুষ এই সমাজে। আশু প্রয়োজনের বৃত্তে ঘুরে ঘুরেই তারা জীবনপাত করে, কেননা এই সমাজ অসুন্দর, শ্রমবিভক্ত, অর্থ-লোলুপ, সম্পত্তিকেন্দ্রিক এবং প্রতিযোগিতামূলক। এই সমাজে মানুষ যে সীমা ও তুচ্ছতার বাঁধনে পীড়িত ও অবমানিত হবে তাতে বিস্মিত হবার কারণ কী?

একথা সত্য, মার্কস কি দাস-সমাজে, কি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, কি পুঁজিবাদী সমাজে—সর্বত্রই—অ্যালিয়েনেশনের প্রকাশ দেখেছেন। *Manuscripts*-এ মার্কস সম্পত্তি-নির্ভর, পণ্য-উৎপাদনকারী সমাজের বিশ্লেষণ করেছেন, এই সমাজের স্ববিরোধিতা তো খুবই স্পষ্ট। শ্রমিক যত বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্টি করে ততই তার জীবনযাত্রার গ্লানি বৃদ্ধি পায়। পুঁজিপতিরা যতই প্রতি-যোগিতার নামে ততই বেশিসংখ্যক পুঁজিপতির বরাতে সর্বনাশ নেমে আসে। মার্কস বলেছেন, এটাই হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির সারাৎসার। অ্যালিয়েনেশন আছে বলেই শ্রমজীবী মানুষ যত বেশি উৎপাদন করে ততই তার উপভোগের পরিমাণ কমে তুলনামূলকভাবে, যত বেশি মূল্য সে সৃষ্টি করে, ততই তার মূল্যহীনতা প্রকট হয়। তার সৃষ্টবস্তু যতই সুন্দরতর হয়ে ওঠে, ততই সে নিজে আকারপ্রকারহীন বস্তুতে পরিণত হয়।

বলা প্রয়োজন যে মার্কস 'অ্যালিয়েনেশন'-কে ইতিহাসগত সমাজের সমস্যা হিসাবে দেখেছেন, যদিও তাঁর মতে এই সমস্যা পূর্ণতা লাভ করে পুঁজিবাদী সমাজে। অ্যালিয়েনেশনমুক্ত সমাজের স্বাধিকারলব্ধ মানুষের দর্শনই মার্কসের দর্শনভাবনার চাবিকাঠি।

নীলকণ্ঠ পাখির ঝরা পালকের মতো

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

শুঁড়তোলা শামুকচলা দেখতে গিয়ে একটা পুরো
শৈশব কেটে গেছে
পদ্মপুকুরের ধার, ওধারে নদীর মতো চলন্ত পথের স্রোত।
গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের তনুশ্রী পেয়েছে,
বুনো চারাগাছ শাল পিয়াশাল
মহুয়া নয়নতারার বন।
অথচ এসব কথারা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে
পুরোনো দালানটার কাঁধে হাত রেখে রেখে।
এখন নতুন নতুন সব ইমারত
নতুন ভাবে ভেঙে যাবার সম্ভাবনায়
উদ্ভাসিত।
মানুষের শ্রম যে আকৃতি নিয়ে
শহর হয়েছে
সেখানে অনেক বাগান আর ঐতিহাসিক সত্তায়
প্রতিষ্ঠিত অবকাশ-চৈত্যের যক্ষ-যক্ষী
প্রস্তর-স্নেহের নীড়।
তাও ভেঙে যাবে দেখো
একদিন একটা নীলকণ্ঠ পাখি
ভেঙে ভেঙে যেমন পালক হয়ে
বনে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

অমরতা

মণীন্দ্র রায়

নিজের চোখ দুটোকে যখন
নিজেরই বুকের মধ্যে ডুবিয়ে
সারাদিন খুঁজে চলেছ
গজমোতির বুদ্বুদ,
রোদ্দুরের মাটির ওপর তখন
প্রতিটি ঘাসের কোটা থেকে জন্ম নিচ্ছে
পুরুষালি হাসির সবুজ উল্লাস।

দিস্তে দিস্তে কাগজের কুলুঙ্গীতে
লালন করে যাও তুমি
হলুদ অমরতার ছায়াপিণ্ড পুত্রকন্যা,
নিজের স্মৃতিফলকের গিল্টিকরা সোনায়
শায়িত থাকো অনন্তকাল,
অস্থিমজ্জার সংসারে তখনো
ঝলসানো হাতের আগুন থেকে ঠিকরে পড়বে
কোটি কোটি দুরন্ত চাকীর উপহার—
স্বপ্ন অশ্রু স্বপ্ন হিংসা শস্য॥

যাত্রা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এত ফুল কেন, আমারও কি সময় হয়েছে!
সময় মানে কি সুসময়? অথবা গভীর অসময়ে
হঠাৎ আবার আজ চক্রবালে সপ্তর্ষি এসেছে!
সমস্ত প্রবীণ গ্রন্থ টুকরো টুকরো ছিঁড়ছে দ্যাখো
তাঁর নতুন কিছু পংক্তির উত্থান—যার খুব কাছে
নীরব দাঁড়িয়ে এক সংস্করণহীন কবি,
এই বোকা বিজ্ঞাপনচঞ্চল কলকাতায় সেই এঁকেছিল ছবি
অপমান চিনেছিল চন্দনের মতো;
এখন সে মালাবান চলে যাবে, এখন সে
যেতে যেতেও কেঁপে উঠবে ভাষাহীন দুঃখের আক্রোশে,
সমস্ত দেয়াল থেকে ঝরে যাবে পোস্টারের আহত মন্ত্রণা
রাস্তায় স্বাধীন কোন গর্ত থাকবে না!
শুধু সাতটি নক্ষত্র যেন নতুন সঙ্গীর খোঁজে
জানলা ভেঙে ঢুকে যায় নিজস্ব গরজে
গিয়ে দ্যাখো ছন্দপুরুষ আর নেই, তাঁর নিশ্বাস চলে গেছে
অবিকল বাতাসের মতো.........

এত ফুল কেন, আমার কি সময় হয়েছে!

পুরনো অ্যালবাম

তুলসী মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধা শুয়ে আছে খোলা ফুটপাথে
          অতিশয় বৃদ্ধা রমণী
উস্কোখুস্কো কাকলাস শরীর—প্রায় বিবসনা
    আশেপাশে খুচ্র কিছু মুদ্রা পড়ে আছে
অবশ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য নয়—নেহাতই পথের করুণা!
    ত্রস্ত চোরের মতো
রুমাল আড়াল করে ফুটপাথ বদল করি দ্রুত।

আচমকা পাঁজর ঝাঁঝরা করে ডেকে ওঠে দশটা তক্ষক
নিদারুণ হাহাকারে উড়ে আসে পুরনো অ্যালবাম
    অ্যালবামের পৃষ্ঠা থেকে
খাঁড়া হাতে উঠে আসে রক্তচক্ষু দুরন্ত তান্ত্রিক।
বাসের জানালা ধরে ফেটে পড়ি পাগলের মতো—
    ধাইমা, ধাইমা.........
    মাতৃঋণ স্বীকার করিনি
ফলত কী ঘোরতর পরাজয়ে কী দারুণ মিথ্যে হয়ে আছি!

ভূতগ্রস্ত বালকের মতো হা-হা করে ছুটে এসে দেখি
    ফুটপাথ শূন্য পড়ে আছে
খাঁ খাঁ দুপুরে উড়ছে গুটি কয় মাংসলোভী মাছি।

পায়রার খোপ

অমিয়ভূষণ মজুমদার

রানী স্বর্ণকুমারী জুবিলি হাইস্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টীচার গগন আচার্য স্বপ্ন দেখছিল নিজের বাড়িতে বিছানায় শুয়ে। ভোরের স্বপ্ন, যে স্বপ্ন নাকি সত্য হয়।

অ্যাসিস্ট্যান্ট টীচার বলতে সাধারণত যে তরুণ বয়সের একজনকে মনে আসে, তেমন নয়। গগন আচার্যর বয়স এবার ষাট হল। পাড়ার বয়স্ক লোকেরা বলে গগনবাবু, ছেলেরা বলে দাদু। চাকরি প্রায় শেষ হয়ে এল। আর দু মাস আছে। ষাটেই চাকরি যাওয়ার কথা, যদি না যায় তবে তার একমাত্র কারণ হবে যে সে উদ্বাস্তু। না, না, না। আর কোন কারণ নেই। সে মনে রাখতে চায় না। সে একেবারে ভুলে যেতে চায়। সে সেই ব্যাপারটার দরুন কোন সুবিধা নিতে চায় না। সেই চল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা। তখন তার বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। এখন রোগা-রোগা হাড়েমাসে জড়ানো তামাটে রঙের এক বুড়ো মানুষ, মুখে অধিকাংশ সময়ে দু-একদিনের দাড়ি, ঘোলাটে চোখ, মাথার সাদা চুল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

আজ সে স্বপ্ন দেখছিল পায়রার খোপটার দরজা কী করে কার ভুলে আবার খোলা ছিল, আর আজ আবার সেখানে কিছু ছেঁড়া পালক পড়ে আছে যা প্রমাণ করবে আবার সেই অন্ধকার থেকে তৈরি ভাম এসেছিল আর আর-একটা পায়রা কমেছে। স্বপ্নে যেমন হয়, কিছুতেই হাত উঠছিল না, কিছুতেই পা দুটো তাকে বইতে পারছিল না, এমনকি চেষ্টা সত্ত্বেও সেই ভামের চেহারা নেয়া অন্ধকারকে যে দূর দূর বলবে এমন শব্দ কিছুতেই তার মুখে তৈরি হচ্ছিল না।

চাপা বোবা কান্নার মতো শব্দ করে সে উঠে বসল। না, স্বপ্ন সে মানে না। স্কুলে সে বিজ্ঞান পড়ায় না? সে তো সেই সেকালে চল্লিশ বছর আগে বি-এসসি পাশ করেছিল বটে। স্বপ্ন ফলে, এরকম বিশ্বাস সে করে না। স্বপ্নের অন্য রকমে ক্ষমতা আছে অবশ্য, তা মিথ্যা হলেও শরীরটাকে যেন থেঁতলে দিয়ে যায়। ঘুম ভেঙে গেলেও উঠে বসলেও হাত পা চলতে চায় না। ক্লান্তিতে গোটা শরীরটাই ধুঁকতে থাকে।

পাড়ার হোমো-ডাক্তার বলেছে এমন সব স্বপ্ন দেখার কারণ নাকি ডিসপেপসিয়া। তা, ঘুমের থেকে উঠে এখন মুখের মধ্যে বিস্বাদ লাগছে বৈকি।

সে বিজ্ঞানের মাস্টার বটে। সে মনোবিজ্ঞানের বিষয়ও কিছু কিছু শুনেছে। তার ক্লাশে পড়ানোর ফিজিক্স কেমিস্ট্রির তুলনায় কিন্তু সে বিজ্ঞানকে বরং নভেল-টবেলের মতো ধোঁয়াটে আর কাল্পনিক মনে হয়। তারা, তা সত্ত্বেও, স্বপ্নের একরকম ব্যাখ্যা করে।

পায়রার খোপ একটা সত্যই আছে তাদের বাড়িতে। কাল রাত্রিতে শোবার আগে কি কেউ কমে-আসা পায়রাগুলো সম্বন্ধে কিছু বলছিল, সেজন্যই কি স্বপ্ন? তাও যদি হয়, কী ব্যাখ্যা কাল সকালের স্বপ্নের?

গরম, গরম। গরমের স্বপ্নই সে দেখছিল। গরম, জ্বালা। আগুন নয়, জ্বালা। কাল ভোরের স্বপ্ন, সে স্বপ্ন যেন সেই জ্বালা থেকে পরিত্রাণের জন্য। আরও জল, আরও গভীর জল, পুরু জলের প্রলেপ। নদীর তলার জলে, স্ফটিকের থামের মতো একটা বৃষ্টিধারার মধ্যে ডুবে গিয়ে, ঢুকে গিয়ে সে জ্বালা ভুলে স্থির হয়ে যেতে চাইছিল। যে জ্বালায় প্রতি রোমকূপ পুড়ে উঠছে, কপালের খুলির নিচে যেন গ্রীষ্মের একশ চল্লিশ ডিগ্রি তাপ। আর সে তাপে অবিরত চেষ্টা করছে যে জলের

ধামের মধ্যে ঢুকতে পেরেছে তাকে আরও শীতল করতে, যেন তা সমেত নদীর গভীর তলায় তলিয়ে যেতে।

ভয়ে আঁ আঁ ক'রে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কাল। দু-এক মিনিট যেন বুঝতেই পারেনি কোথায় আছে সে। সারা শরীর ভিজে। সারা মুখে জল। খুব কাঁদলে যেমন নাকেও সর্দি হয়, সে উঠে বসে কোঁচার খুঁটে নাক মুছেছিল।

অবশেষে সে আশ্চর্য হয়ে দেখেছিল সে তার নিজের ঘরেই বটে। চোখের মণি দুটিকে যেন খানিকটা ঠেলে এগিয়ে দিয়ে তবে সে দেখতে পায়। তেমন করে দেখেছিল ব্রজবালা (কী আশ্চর্য, ব্রজবালাই তো তার স্ত্রীর নাম) মেঝেতে ব'সে সে সেই ভোরে নেকড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে সলতে পাকাচ্ছে। সলতে! আশ্চর্য, কত সলতে লাগে সন্ধ্যাবেলার তুলসীতলার প্রদীপ দিতে? সেই সন্ধ্যার প্রদীপ দেয়া হবে তার জন্য দুপুরে, রাতে, এই সকালে...

আজ কিন্তু ব্রজবালা সলতে পাকাচ্ছে না বন্ধ ঘরের মেঝেতে বসে।

গগনবাবু দেখলে দরজা খোলা। তাহলে ব্রজবালা আগেই উঠে গিয়েছে। সে বিছানা থেকে নেমে ঘরের মেঝেতে দাঁড়াল।

অবশ্য, অন্য কাজ কী-ই বা আছে? আজ দুদিন ধরে মেজ বউমা রান্না করছে। রান্নাই বা কী? তিনকৌটো চালের ভাত, একমুঠো ডাল, তিন-চারটে আলু-পটলের তরকারি। মাছ...

তার আগে অবশ্যই এক কাপ চা। হ্যাঁ, চা বৈকি। চায়ের পরে একটা বিঁড়ি। তাহলেই গগন আবার পৃথিবীর মুখ দেখতে সাহস পায়। না, মাছ...

পৃথিবীর মুখ? কী যেন বলে...না, মাছ কখনই নয়। কী আশ্চর্য, মাছ কেন হতে গেল? তার বেশ মনে পড়ছে, মেজবউমার একটা নাম আছে। সে যেন খুঁজে বার করল। মেজবউমার নাম সুলতা।

তাহলেও এটা বোধ হয় ঠিকই যে তার আর স্কুলে পড়ানো উচিত নয়। সে ভুলে যাচ্ছে অনেক কিছু। মনে থাকে না, মনে এলেও তার আধখানা যেন হারিয়ে যায়। পাড়ার হোমো-ডাক্তার বলছে, এটাও নাকি পাকস্থলীর দোষে হয়।

সুলতা প্রথম একমাস পাথর হয়ে গিয়েছিল। তারপর সুবি তাকে দিয়ে চা করাত সকালে আর সন্ধ্যায়। আজ তিন-চারদিন থেকে সুলতা রান্না করতে পারছে আবার। তাহলে সুলতা ফিরেছে। আর সেই সুযোগে ব্রজবালা আবার সলতে পাকাচ্ছে।

তা সলতে পাকানো বরং ভালো স্তব্ধ হয়ে বসে। না, না। না। না, না। না। কাল থেকে বসে যেমন হল। বুদ্ধিটা কার যেন? মনে পড়ছে না। যাক, ব্রজবালাকে সময়মতো স্নান করানো যাচ্ছে। তারপর একদিকে গগন, মাঝখানে ব্রজবালা, অন্যদিকে ও। ও, মানে, ছোট ছেলে। দাঁড়াও। এখুনি মনে হবে, সুবিই তো তার নাম। সুভাষ থেকে সুবি। কার এমন নাম আর বাংলাদেশে সুভাষের মতো। এই বুদ্ধি করেছিল সে-ই। ব্রজবালাকে মাঝখানে বসিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা দুদিন ভালোই হয়েছিল। কাল প্রথম গ্রাস খাওয়ার পর, দ্বিতীয় গ্রাসের জন্য পাতে হাত দিয়ে কী যেন মনে পড়ে গেল ব্রজবালার। যেন ভাবছেই, ভাবছেই। হঠাৎ বললে—ও মা! কেউ খায়নি যে! সকলের আগে নিজে খেতে বসার লজ্জা যেন। তারপর ভাতমাখা হাতে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে শুরু করলে—কেউ খায়নি, কেউ খায়নি...

গগন বলেছিল (এই তো বেশ মনে পড়ছে তার), আহা, অমন করে না, অমন করে না। দেখো, দেখো, দেখো, মেজবউমা কাঁদছে। আমাদের মেজবউ, দেখো।

দড়ি থেকে গামছা নিয়ে মুখ মুছলে গগন। চোখ মুছলে। নাক ঝাড়তে হল।

মেজবউমার পরনে পাড়ওয়ালা শাড়িই বটে। কিন্তু সিঁথি সাদা, কপাল সাদা। সে হাঁটুর উপরে মুখ গুঁজে হু-হু করে কেঁদে উঠেছিল।

—না, না। সুবি, কখনও মাছ নয়। এ বাড়িতে আর কখনও মাছ আসবে না।

—না, বাপু, তার চাইতে সলতে পাকানো ভালো। তবু তো স্তব্ধ হয়ে থাকে। আর যেন সারাদিনের চেষ্টায় সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় গলায় আঁচল দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে কী যেন বলে, কী যেন বলে।

গগন ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। তার বুকের ভিতরে কিছু একটা যেন ফোঁপাচ্ছে।

সকাল হয়েছে বৈকি। রোদও উঠেছে। না, বারান্দাতেও নেই ব্রজবালা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনে, উঠোন পার হয়ে কলতলার দিকে গেল গগন। তখন তার চোখে পড়ল রান্নাঘরের পাশে চারটে বাঁশের খুঁটির উপরে বসানো বাক্সে কাঠের তৈরি পায়রার খোপটা। রোদে জলে জীর্ণ। তাই টিনের টুকরো, বাঁশের বাখারি দিয়ে মেরামত করা।

গগন দাঁড়িয়ে পড়ল। আর তখন তার অনুভব হল আজ যেন বিশেষ কিছু। কী যেন আজ, কিসের জন্য যেন আজ খুব বিখ্যাত। কে বলে দেবে তাকে? কাকে জিজ্ঞাসা করা যায়?

মিনিট পনেরো পরে কলতলা থেকে ফিরল গগন। উঠোনটা পার হতে গিয়ে আবার সে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

এবার সে দেখতে পেল। রান্নাঘরের উনুনে আঁচ দেয়া হয়েছে। ঘরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার। তার মধ্যে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে মাটিতে বসে আছে ব্রজবালা।

আঃ হাঃ! হলদে অক্ষিগোলক, ধোঁয়াটে মণি। গগন এদিক ওদিক তাকাল। বারান্দার উপরে ঘরের দরজা খুলে সুবি বেরোল। হাই তুলল সে।

রান্নাঘরের মুখোমুখি সুবির দরজা। সে রান্নাঘরের ধোঁয়া আর তার মধ্যে ব্রজবালাকে দেখতে পেল। একটু ভাবল সুবি। ধোঁয়াটা দম বন্ধ করার মতো নয়।

যেন দারুণ পরিশ্রম করে এসেছে সে এমনভাবে সে দু-একবার হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল।

বারান্দা থেকে উঠোনে, উঠোন থেকে কলতলায়। সুবি। সে কল খুলে দিল। ট্যাপের মুখে হাত পেতে জল নিতে গেল। কিন্তু আঙুলগুলো জোড়া লাগল না। আঙুলের ফাঁকগুলো দিয়ে জল পড়ে যেতে লাগল।...বড়দা, মেজদা, মুকুল...। আবার হাত পাতল সুবি ট্যাপের মুখে। আঙুলগুলো একত্র না হয়ে ফাঁক-ফাঁক হয়ে বেঁকে বেঁকে গেল।...শমু, সুধীর, মুকুল...হাতের উপরে জলপড়া দেখতে লাগল সুবি স্তম্ভিত হয়ে। তৃতীয়বারের চেষ্টায় সে আঙুলগুলোর সাহায্যে জল ধরার মতো অঞ্জলি তৈরি করতে পারল।

হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এলো সুবি। তার এই ঘরটা নানা দিক দিয়ে অর্ধসমাপ্ত। তিন দিকে ইটের দেয়াল। চার নম্বর দেয়ালটা বাঁশ-চাটাইয়ের। দুদিকের দেয়ালে প্ল্যাস্টার পরানো হয়েছে। তৃতীয়টিতে এসে হঠাৎ যেন কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্ল্যাস্টার করানো হয়ে ওঠেনি। একটা দরজা আর তিনটে জানলায় পাল্লা বসানো হয়েছে, কিন্তু রং করা হয়নি। অথচ কাঠ পুরনো হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে।

ঘরের মধ্যে একটা টেবিল, একটা চেয়ার। সরু বিছানাটায় আধময়লা বালিশ, চাদর। টেবিলে বেশ কিছু বই, খাতা। অগোছালো, প্রায় স্তূপাকারেই রাখা যেন।

টেবিলটার সামনে দাঁড়াল সুবি। বইগুলোর উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেল সে। কী যেন ভাবতে হবে? কিন্তু সে ভাবতে পারলে না বরং তার মন যেন এক-এক খানা বই তুলে দেখবে।... ও, হ্যাঁ, মুকুল...টেবিলটার কাছ থেকে সরে এলো সে।

তার ঘরের বাঁদিকে মেজবউদির ঘর। দুটো ঘরের মধ্যে দরজাটা খোলা। অথচ মেজবউদির ঘরের বারান্দার উপরে দরজাটা বন্ধ দেখে এসেছে এমন মনে পড়ল যেন। দুটো ঘরের মধ্যে দরজাটা খোলা থাকে এইজন্য যে মেজবউদি কোন কোন রাত্রিতে ভয় পায়। আর্তনাদও করে ওঠে।

সুবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরজাটাকে দেখল। ফ্রেমে আঁটা একটা শূন্যতা যেন, যার দুদিকেও এমন শূন্যতা যা কোন চেহারা নেয় না।

কাল সকাল আটটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত সুবি পথের ধারে ডাউয়াগাছটার নিচে মুচির পাশে বসে কাটিয়েছে। মুচি তার চটে বসে, আর সে একটা ইটের উপরে। মুচি কখনও ঠুকঠাক করে কাজ করছিল, কখনও গাহাকের আশায় বসে থাকছিল, সুবি ছ-সাত ঘণ্টা চুপ করে বসেছিল। যেন জায়গাটাতে একটা ঠাণ্ডা-ভাব আছে। দু-একবার মাত্র দু-একজন পরিচিত লোক তাকে লক্ষ্য করেছিল। তারা সকলেই ভেবে নিয়েছিল সে জুতো সারাচ্ছে। ঠাণ্ডা-ভাব সত্য, অন্যদিকে কিন্তু ভাদ্রো দুপুরের রোদ তার মাথা মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছিল, মুখ গলা হাত পিঠ ঘেমে জামাকেও ভিজিয়ে তুলছিল।

সে কি আজকেও যাবে, তেমন করে সেখানে বসে থাকতে? সুবি মেজবউদির ঘরে ঢুকল।

ঘুম ভেঙেছে সুলতার। চুল সারা গায়ে ছড়ানো, কাপড় আলুথালু। তখনই উঠে বসেছে সে। হাঁটু বেড় দিয়ে এগিয়ে রাখা দু' হাতের আঙুলগুলো পরস্পরকে ধরে রেখেছে। সুলতা পায়ের শব্দ শুনতে পেল না, চোখেও যেন দেখতে পেল না। সুবি দেখলে সুলতার দুচোখ থেকেই মোটা দুই ধারা চোখের জল নিঃশব্দে গাল বেয়ে নামছে। গাল থেকে গড়িয়ে গলায়—সব নিঃশব্দে।

এই সকালেই, ঘুম থেকে উঠে বসেই! হয়তো দৃশ্যটাই মনে পড়ে গিয়েছে। সুবি বললে, বউদি, মা রান্নাঘরে গিয়েছে। চা করো গে।

সুলতা দরজা খুলে বেরোল। দরজাটার একটা অভ্যাস আছে শব্দ করার। আর সেই শব্দে চমকে উঠল সুবি।

আবার সে নিজের ঘরে এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। সে ভাবলে, এখন কি কিছু ভাববে সে? কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে না ঘরের এই আলোকে? আর সেই আলো পড়ার ফলে ঘরে যা কিছু সবই অবাস্তব হয়ে যায় যেন। ওই দরজা খোলার শব্দটায় যেন অবাস্তবকে ভাঙার চেষ্টা ছিল।

দু-তিন মিনিট সে দাঁড়িয়ে থাকল টেবিলের সামনে। তারপর হঠাৎ মনে এল কথাটা 'এই বইগুলো সবই বড়দার কেনা।' একটা নিয়ম এই আছে, একটা কথা মনে হলে পরপর অনেকগুলো কথা মনে আসতে থাকে। সাধারণ কথা, খুব সাধারণ কথাই, তবু মনে আসতে থাকে। বড়দা রেলের মিস্ত্রিদের মতো প্যান্ট আর জামা পরত, সে জামা-প্যান্টে তেলকালি মাখা। হাতে একটা ক্যানভাস ব্যাগ। তার গায়েও তেলকালি। সেই ব্যাগে বড়দার কাজের যন্ত্রপাতি থাকত। মনে হত যেন একটা নাটক: সেই নাটকে সে তেমন জামাকাপড় পরে রেলের ইলেকট্রিক মিস্ত্রির অভিনয় করছে।

ঠিক যেন তাই। যে দাদা সকালে উঠে মুড়ি আর চায়ের বাটি নিয়ে বসে থাকত সুবি এলে খাবে বলে, মা চা জুড়িয়ে গেল বললেও বলত, এই তো, ও আসুক, একসঙ্গে খাই; খাওয়াটা তো সুখের নয়, সুখটা একসঙ্গে খাওয়ার। আর যে দাদা রেলমিস্ত্রির পোশাক পরে কাজে যেত—এই দুই যেন এক নয়।

বড়দার, কিছুদিন পর থেকে, অনেক রাত করে বাড়ি ফিরতে হত। কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে, মিস্ত্রির পোশাক ছেড়ে বেড়াতে বেরোলেই ফিরতে অনেক রাত হত। প্রথম প্রথম মা বসে থাকত খাবার নিয়ে। পরে ব্যবস্থা হয়েছিল। সুবির ঘরে বড়দার খাবার ঢাকা থাকত। কারণ সুবি

তো অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে, জেগেই থাকে। পরে সুবি মাকে বলেছিল, আমাদের দুজনের খাবারই একই সঙ্গে রেখে দিও ঢেকে। বড়দা এলে একসঙ্গে খাব। সুবি বলেছিল বড়দাকে নকল করে—খাওয়া ব্যাপারটা এমন সুখের কিছু নয়, একসঙ্গে খাওয়াটাই সুখ।

মনে এল সুবির বড়দা প্রথম রাতে অবাক হয়েছিল। রাত তখন এগারোটা বাজে। শুনে বলেছিল, তাহলে তুই বোস। আমি স্নান করে আসি। এত রাতে স্নান? বড়দা বলেছিল, কেমন যেন ঘেন্না লাগে, বাইরের তেল, কালি, ধুলো।

তেমন একদিন রাতে বড়দা প্রথম বলেছিল হেসে, ভালোই হয়েছে। তোর আর একটু বেশি পড়া হয়ে যায়। তারপর খাওয়া হলে বড়দা তার ব্যাগটাকে টেনে নিয়ে একটা প্যাকেট বার করছিল। বলেছিল, এটা কিন্তু ভালো মোলায়েম খদ্দর, বাবার পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে গিয়েছে, মা কাল তালি দিচ্ছিল। আর এটা দেখ। 'কারেন্ট' নাম। একেবারে সব হালের সংবাদ। আর এই এখানে দেখ আই এ এস পরীক্ষার প্রশ্ন আর তার উত্তর। আমার মনে হল আই এ এস পরীক্ষা দিতে হলে এখন থেকেই এসব পড়া দরকার। এই পত্রিকাটা এখন থেকে নিয়মিত কিনব।

তখন সুবি হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। হ্যাঁ, তখন থেকেই বড়দা রোজ অন্তত একবার করে মনে করিয়ে দিত আই এ এস পরীক্ষার কথা। আর তখন থেকেই বই কেনা শুরু তার। এই টেবিলের সব বই, পড়ার বই-এর চাইতে যাকে বড়দা আউট-বুক বলত। সাহিত্যের, ইতিহাসের, রাজনীতির বই। কবিতার বই। আই এ এস হতে গেলে শুধু পড়ার বই পড়াই শেষ কথা নয়। কী পাগল, কী পাগল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সুবি। কী বলবে, পাগল? বলবে, পেতিবুর্জোয়া। না, না। কী সব গোলমাল হয়ে যায় সুবির মধ্যে।

মেজদার নাম গৌতম। তা থেকে বুদ্ধ, ক্রমশ সেটা বড়দার মুখে বুদ্ধু। আদরের ডাকই, কিন্তু কখনও কখনও তা গালাগালিও হয়ে যেত। যেমন একদিন মেজদা বলেছিল, কেন সুবির কষ্টের কারণ হচ্ছ? উঁচু জীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছ, যখন তা ব্যর্থ হবে শাস্তি থাকবে? রিফিউজি ইস্কুল-মাস্টারের ছেলে কখনও আই এ এস হয় না।

তুমি সত্যিই বুদ্ধু, স্কুল টীচারের ছেলেরা আই এ এস হয়েছে তার কুড়ি কুড়ি প্রমাণ আছে।

মেজদা চটে উঠেছিল। বললে, যেমন তুমি এঞ্জিনীয়ার হয়েছ!

বড়দা তর্ক করেনি। কিন্তু তখন তো তার পরনে রেলের ইলেকট্রিক মিস্ত্রির তেলকালিমাখা, ঘামেভেজা ময়লা জামা-প্যান্ট। সে বরং তার কাজে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তার মুখখানা থমথম করছিল তখন।

মা বলেছিলেন, এমন করে বলিস কেন?

মেজদা বলেছিল, আমি তো ওকে, ওর চাকরিকে অপমান করতে চাইনি। আমি বোঝাতে চাইছিলাম, আমাদের পক্ষে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। কী হয়েছে ওর? সুবি ভালো, খুবই ভালো ছাত্র, কিন্তু তুমি ভেবে দেখো, দাদা বরাবর তার স্কুলে ফার্স্টবয় ছিল। বই ছিল না, পড়া দেখে দেবার কেউ ছিল না, আধপেটা খেয়ে পরিশ্রম করে, তবু সে ফার্স্ট ডিভিজন পেয়েছিল। হল এঞ্জিনীয়ারিং পড়া? যেদিন এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে পারলে না, পলিটেকনিকে যেতে হল, তখনই বোঝা যায়নি চিরকালের জন্য ওঠার পথ বন্ধ হয়ে গেল?

সুবির ভালো লাগেনি। সে নিজের ঘরে গিয়ে পড়ার টেবিলের সামনে বসেছিল। কিন্তু চিরকালকার স্বল্পভাষী মেজদা সেদিন কিছু প্রমাণ করতে চাইছিল। সুবির পড়ার কাছে গিয়ে চুপ করে বলেছিল।

মেজদা বললে, আমি চিরকালই সব বিষয়ে মেজো। স্কুলেও 'এ' ক্লাস ছিলাম না। 'বি' ক্লাস বলতে পারিস। কিন্তু তুই স্কুলের কথা কি জানিস না? বল, সবচাইতে উগ্র বামপন্থী শিক্ষকরা আমাদের স্কুলে কখনও কোন ছাত্রের খাতা দেখে দেয়? বুঝতে না পারলে দ্বিতীয়বার বলে দেয়? তারা তো জনগণের জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করে রেখেছে, কিন্তু জনগণের ছেলে অর্থাৎ যারা প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারে না, বাড়িতে বইখাতা নেই, পড়ার জায়গা নেই, তাদের কোনদিন পড়ায়? প্রাইভেট টিউশানি করে না তারা? সুবি বলেছিল, কী হচ্ছে, মেজদা, এসব বলে? বাবা যে ক্লাশে পাগলের মতো পড়ান, তাতেই বা কী লাভ?

—না লাভ কিছু নয়। আমি কী বলতে চাইছিলাম তাই শোন্। কলেজে যখন অনার্স পড়তে যাবি তখনও দেখবি অধ্যাপকরা পড়াচ্ছে না। সেখানে তো টেক্সট্ বুকের বাইরে অনেক কিছু জানতে হয়। কে জানাবে তাকে? 'বি' ক্লাসের কোন সুবিধা হয় না। তারা নিজের হাস্যকর চেষ্টায় পরীক্ষায় হাস্যকর রকমের ফল পেতে পারে। প্র্যাকটিক্যালি দেখবি যারা অধ্যাপক রাখতে পারে প্রাইভেট টিউশানির জন্য তারা, আর নতুবা বংশপরম্পরায় যারা অনার্স নিচ্ছে তারাই বি এ, এখন তো ভালো ফল করছে। আর আই সি এস? আমার খুবই কষ্টবোধ হয়, বিশ্বাস কর খুবই কষ্টবোধ হয় তোকে হতাশ করতে, কিন্তু আই সি এস স্বাধীন ভারতবর্ষে তারাই হয় যারা উঁচুদরের টাকা খরচ করে সাহেবি-সাহেবি উচ্চারণে সাহেবি মিশনারিদের কলেজে পড়ে। তুই কি দেখিসনি যারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপক হচ্ছে, ভালো কলেজে অধ্যাপক হচ্ছে, তারা হয় অধ্যাপকদের ছেলে, জামাই, ভাগনে ইত্যাদি।

মেজদা খুবই প্র্যাকটিক্যাল। দর্শনে বি ক্লাস অনার্স পেয়ে একেবারে দার্শনিক হয়ে গেল। বলত, আমি তোমার আদর্শবাদে বিশ্বাস করি না, দাদা।

মেজদা আর বড়দায় কী রেষারেষি ছিল! মেজদাই বলেছিল একদিন, তা তো হয়ই। মেজোর মনে খানিকটা হিংসা থাকেই। বড় আর ছোটর যতো আদর, মেজোর তত আদর থাকে না। সেজন্য মেজো হিংসুটে আর একবগ্গা হয়।

এর মধ্যে কতটা সত্য ছিল তা দর্শনের ছাত্র মেজদার জানার কথা। কিন্তু কিছু একটা হয়েছিল, বড়দা আর মেজদা যেন দুজন দুজনকে এড়িয়ে চলত। মেজদাই বেশী। যেমন বড়দার খাবার নিয়ে সুবিই চিরদিন বসে থেকেছে, মেজদার খোঁজও করত না।

কিন্তু সেদিনকার কথা ভাবো। মেজদা বারান্দায় বসে তার ক্যানভাস জুতো জোড়া নিয়ে কী করছিল। বড়দা ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ না ধুয়ে তার কাছাকাছি একটা কাঠের বাক্সের উপরে গিয়ে বসেছিল।

—কী করছিস? জুতো সেলাই?

—দেখতেই তো পাচ্ছ।

—কেন? আবার ইন্টারভিউ নাকি?

—ইন্টারভিউটা কি ঠাট্টার জিনিস?

—তা নয়।

—অনেক হয়েছে। হাতমুখ ধোও গে। মা চা করতে গেল। মেজদা বলেছিল।

দুজনে জোরে জোরে কথা বলছিল। সুবি এগিয়ে গিয়েছিল। সুবি বললে, দাও না আমাকে, মুচিকে দিয়ে সারিয়ে আনি।

মেজদা 'সাগরেদ এলেন', বলে বিরক্ত মুখে জুতো হাতে ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিল।

ক্যানভাসের বেরঙা জুতো। দু পাটির কড়ে আঙুলের জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছিল। বড়দা

সেই কাঠের বাক্সর উপরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সুবি নিজে হাতমুখ ধুয়ে এসেও দেখেছিল বড়দা তেমন ভাবেই বসে আছে। আর তার কালো-হয়ে-যাওয়া চোয়ালের উপরে গর্তে-বসে-যাওয়া চোখ দুটো থেকে স্পষ্ট জলের ধারা নেমে আসছে।

সুবির মনে হল তেমন ভালো করে সে দাদাদের দেখেনি তখনই যেমন সেদিন সে দেখেছিল। বড়দা যে কেমন কালো হয়ে গিয়েছে, তার মুখ চোখ যে তেমন শুকনো তা যেন আর কোনদিনই সুবির চোখে পড়েনি। রাত এগারোটায় বাড়িতে আসে, অনেকদিন সুবি উঠবার আগেই বেরিয়ে যায়, সেজন্যই কি? তার মনে হয়েছিল সে যেন অত্যন্ত পটু অভিনয়দক্ষতা যে রেলের ইলেকট্রিক মিস্ত্রির চাকরির সঙ্গে মানিয়ে যেমন পোশাক, তেমন তার সঙ্গে মানিয়ে গায়ের রং আর স্বাস্থ্য করে নিচ্ছে যেন বড়দা।

আর মেজদা কি সত্যি স্বার্থপর ছিল তখনই। ব্যায়াম করত, স্বাস্থ্য ভালো করে তুলছিল; গায়ের রং ফর্সা হয়ে উঠছিল, মাথার চুলগুলো চকচকে। আর ভাবো সেই নিজের হাতে জুতো সেলাই-এর কথা। ক্যানভাসের ছেঁড়া জুতোর মতো তুচ্ছ জিনিস মুচির কাছে নিয়ে যেতে লজ্জা? কিংবা তার চাইতেও বেশি পেতিবুর্জোয়াসুলভ রুচি যে ক্যানভাসে চামড়ার তাপ্পি লাগিয়ে নেয়ার চাইতে নিজে হাতে রিফু করে দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখা! পচা নিম্নমধ্যবিত্তের ভাবালুতা!

না, না। হঠাৎ যেন সুবির বুকের ভিতরে কেউ গালাগালিগুলোকে প্রতিবাদ করে উঠল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে নিজেই যেন হাঁপাতে লাগল। কিন্তু সে যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছে। সতর্ক হয়ে গেল সে। নিচের ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

পায়ের শব্দ সুলতার। সে চা নিয়ে এসেছে। হাত বাড়িয়ে চা নিল সুবি। তাকে এখন শক্ত হতে হবে। এই এককাপ চায়ের অনেক দাম। এটা খাদ্য বটে। ভাত ছাড়া একমাত্র কিছু যা সকলের পেটে যায়। তাছাড়া সে সাহস করে চা না খেলে অনেকেরই চা খাওয়া হবে না। সুবি বললে, তুমি চা খাও গে, বউদি, তুমি চা খাও গে।

ঘরের মধ্যে ঠিক তেমন টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে সুবি চা খেতে শুরু করল। চোখের জলের এই কৌতুক আছে, চোখ ছাপিয়ে না এলে গলার ভিতরে নামতে পারে। নোনতা লাগল সুবির চা।...

বারান্দায় কাঠের বাক্সের উপরে বসে চা খেতে খেতে গগনবাবুর মনে হল এই বাক্সটাও এনেছিল তার বড় ছেলে পায়রার খোপ মেরামত করতে। উঠোনে যে পায়রার খোপটা সেটাও তারই তৈরি। তখন হায়ার সেকেন্ডারি পড়ে সে। স্কুলে এক্স্ট্রা-কারিকুলার কোর্স ছিল দুটো—দর্জি আর ছুতোরের। এই কোর্স দুটোকে নেয়ার আগে স্কুলে আলোচনা, তর্কাতর্কি হয়েছিল। এরকম কোর্স না নিলে স্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি বলে স্বীকার করবে না। অথচ ভালো এক্স্ট্রা-কারিকুলার কোর্সের শিক্ষক রাখতে অনেক টাকা লাগে। একজন ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়া দর্জি, আর একজন ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়া ছুতোরকে মাস্টারমশাই করে এই কোর্স দুটো চালু করা হয়েছিল।

গগন ভাবলে, এইসব ব্যবস্থা যারা করে তাদের হয়তো অনেক লেখাপড়া, কিন্তু বোকা নয় তারা, সেইসব শিক্ষা-সেক্রেটারি, শিক্ষামন্ত্রীরা? যে গরীব বাপ-মা কষ্ট করে ছেলেকে হায়ার সেকেন্ডারি পড়াচ্ছে সে কি দুঃস্বপ্নেও ভাবে তার ছেলে বড় হয়ে দর্জি কিংবা ছুতোর হবে? নাকি সেইসব শিক্ষা-সেক্রেটারিরা ভাবে এরা প্রকৃতপক্ষে দর্জি, ছুতোর, মিস্ত্রি হওয়ারই উপযুক্ত শুধু।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল গগনের। তার বড় ছেলে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে পলিটেকনিকে ভর্তি হয়েছিল। এঞ্জিনীয়ার হবার উচ্চাশা ছেড়ে বড়জোর ওভারশিয়ার হওয়াই তখন তার উচ্চাভিলাষ। তারপর সেখান থেকে গড়িয়ে রেলের মিস্ত্রি। তখন কি, তখন কি শিক্ষা-সেক্রেটারি খল খল করে হেসে উঠে বলেছিল—আমি আগেই জানতাম, গগন।

হাঁপিয়ে উঠল গগন। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। যেন সে বলবে আমি স্কুলের মাস্টার, তাই এসব কথা মনে হয়। আমি, আমি এসব এড়িয়ে যেতে চাই। আসলে আমার বড় ছেলে, সত্যি তো তার নাম ভুলিনি, সদানন্দ ছিল নাম, আনন্দময় ছিল সে। সে কাঠ দিয়ে একটা পুতুলবাড়ি তৈরি করেছিল। ছোট ছোট দরজাসমেত একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি। দরজাগুলো খোলা-বন্ধ করা যেত যেন সত্যিকারের বাড়ির সত্যিকারের দরজা। মাস্টারমশাইরা বলেছিলেন—এ ছেলে এঞ্জিনীয়ার না হয়ে যায় না। কিছুদিন পরে চারটে বাঁশের উপরে রান্নাঘরের দক্ষিণে ওই ওখানেই বসিয়েছিল সে। তারপর দুটো পায়রা কিনে এনেছিল সে। আর তা থেকে সে যখন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিচ্ছে তখন একঝাঁক পায়রা হয়েছিল। তাদের রকমসকম দেখে...।

তারপর ভাম ধরল পায়রার খোপকে। রাত্রির অন্ধকার হঠাৎ কখন ঘন হয়ে একটা জন্তুর চেহারা নেয়। তারাগুলো কখন হঠাৎ তার ধারালো দাঁত হয়, তা কি ধরা যায়? শব্দ শুনে, কাতর চীৎকার শুনে বাইরে গিয়ে দেখবে শান্ত রাত্রির অন্ধকারে ঝকঝকে তারা হাসছে। মানুষ কী করতে পারে সেই অন্ধকারের বিরুদ্ধে? গগন এদিক ওদিক দেখলে। এই সকালেই, দেখো, কী অন্ধকার।

বিড়িদেশলাই নিয়ে এল ব্রজবালা। বললে,—চা খাওনি?

—খেলাম তো।

ব্রজবালা হাত বাড়িয়ে ঠান্ডা-হয়ে-যাওয়া আধখাওয়া চায়ের কাপটা গগনের হাত থেকে নিয়ে সরিয়ে রাখল।

ব্রজবালা জানে আজকাল তার এই ছোট্ট বাড়িটাতে ছোট্ট একটা ঘটনার পিছনে অনেক কথা, অনেক অনেক শব্দ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, চাপ দিয়ে দিয়ে তারা এগোতে চেষ্টা করে। তাদের বাধা দিতে হলে কথা দিয়ে বাঁধ দিতে হয়। এদিকের কথার শব্দ হলে ওদিকের শব্দ এগোয় না। সে তাড়াতাড়ি করে বললে, স্কুলে যাবে না আজ? যদি যাও বাজারে যেতে হয় এখন।

বিজ্ঞানশিক্ষক গগনবাবু ভাবলে, প্রকৃতপক্ষে এখন তো দিনের বেলা। অন্ধকার কোথায়? অন্ধকারের যে অনুভূতি হয় সেটা এজন্য যে তার চোখে এখন চশমা নেই। আর এই বাতাসের অভাব বোধ হচ্ছে, চারদিক থেকে দেয়াল চেপে আসছে যে তার কারণ বোধ হয়...

সে বললে,—আজ গুমোট নয়?

—না। তেমন নয় বোধ হয়। ব্রজবালা বললে,—থলিটা আনব? থলি আনতে গেল ব্রজবালা।

আর তখনই গগনবাবুকে কেউ যেন বলে দিল,—দেখো তো, এই অন্ধকার যা কখন লম্বা নিচু শরীরের লম্বা লেজের একটা ভাম হয়ে যায় তুমি জানতে পার না, তারই মধ্যে এই বাজার? যে বললে এই কথাটা সে যেন কথাটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে দিয়ে অবাক হয়ে গেল। ব্রজবালার ব্যবহারে। সমস্ত নারীজাতির ব্যবহারে। আমরা পুরুষ, আমাদের কিছুতেই আর ইচ্ছা যায় না। আর যারা যা হয় তারা ভাবে বাজারের কথা, আলুপটলের কথা। হয়তো লঙ্কা আনতেও বলবে। অথচ এমন গুমোট .. কেমন সহানুভূতিহীনা, প্রায় নির্দয়া, নিষ্ঠুরা মনে হয় না? যেন, যেন এই পৃথিবীর মতো হৃদয়-হীনা? অথচ তারা সব নিজের রক্ত মাংসে তৈরি, তাদের কথা যেন ভুলে যায়।

কাঁধে গামছা ফেলে বাজারের থলি হাতে বার হল গগনবাবু। ব্রজবালা ভাবলে, তা জামাটা এখন না পরা ভালো। বাজার থেকে ফিরতে ঘামে ভিজে যায়। ইস্কুলে যাওয়ার সময়ে সেই ঘামে-ভেজা জামা পরতে ভালো লাগে না। ব্রজবালা দেখলে, ডান উরুর উপরে গগনের ধুতিতে মস্ত একটা সেলাই। অবাক হচ্ছে না সে। সে তো নিজেই সেলাই করেছে। ছ' মাস এ বাড়িতে কেউ জামাকাপড় কেনার কথা ভাবেনি।

পথে বেরিয়ে গগন ভাবলে, কিন্তু প্রদীপ জ্বালায় তো। সারাদিন ধরে সেই প্রদীপের জন্যই

জলাতে পাকাচ্ছে। প্রদীপের আলো কি মায়ের স্নেহের মতো, মায়ের হাসির মতো ওদের দিকে উঠে যায় কোন এক অন্ধকারের ভয়ে আশ্বাস হয়? ওদের ছু'তে পারে?

আঙুলে তুলে চোখের কোণ দুটি মুছে নিল গগন। বেশ রোদ্দুর পথে। তার গায়েও পড়ছে। গরমই তো। কিন্তু কিছু বাতাস যেন আছে। গুমোট নয় অন্তত।

হঠাৎ থমকে গিয়ে যে পথে বাজারে ঢোকে গগন সে পথে না গিয়ে অন্য পথে এগোল। কয়েকদিন থেকে সে পথটায় ভবেশের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল। আর ভবেশের একই কথা। সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে সরকার থেকে মাসোহারা পাচ্ছে, এমন কি যে বছরদুয়েক জেল খেটেছে, এমনকি যারা দু-এক বছর অন্তরীণ ছিল দু-একটা বক্তৃতা দিয়ে; তুমি কেন চাকরি রাখার জন্য বলবে না তুমি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলে? চোদ্দ বছর আন্দামানে থেকেও কেন মাসোহারা নেবে না?

না, না। না। গগন তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল। চাকরি আর দু' মাস আছে। তারপর? না, না। তাই বলে সেই চল্লিশ বছরের পুরনো ঘটনাকে সে আর সামনে আনতে পারবে না। হাঁপাতে লাগল গগন। সেই পুলিশ ইনসপেক্টরের ছেলে সুরেন বলেছিল আর্ত চিৎকার করে- আমার বাবাকে মেরো না, গেনু, দোহাই সমীর, আমার বাবাকে মেরো না। সে কেঁদে উঠেছিল। তখন সমীর বলেছিল, গুলি কর, ওকে গুলি কর, গেনু, চিনতে পেরেছে। কিন্তু গগন পারেনি। সে বলেছিল,— ওর কী দোষ? ওর কী দোষ?

এ পথে একটা পরিচিত গন্ধ। আর পুলিশ ইনসপেক্টরের ছেলে সুরেনের সাক্ষ্যতেই সমীরের ফাঁসি হয়েছিল। আর গগনের যাবজ্জীবন। না, না।..

গরম, খুবই গরম। এই দেখো, গরমে সে হাঁপিয়ে উঠছে। ঘামছে সে। আর কেমন একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ এখানে। তাকে কি পাপ বলবে না? না, আমি জানি না। আমি তো নিতান্ত গরীব এক বি-এসসি মাস্টার, বুঝি না, বুঝি না।

সুবি অবশেষে চা শেষ করতে পারলে।

সেদিন বড়দা কাজে না গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসেছিল। মেজদার জন্য একজোড়া জুতো নিয়ে। মেজদা দেখলে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে গম্ভীর মুখে বলেছিল, বেশ। এটাকে ধার বলে নিলাম। প্রাইভেট টিউশানির টাকা পেলে শোধ করে দেব। বড়দা কি আশা করেছিল মেজদার মুখে হাসি ফুটবে? বড়দার মুখটা একেবারে কালো হয়ে গিয়েছিল। এ কি পিঠোপিঠি ভাইদের সুপ্ত হিংসা? দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল একটা।

সুবি ভাবলে, বড়দার মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল। যেমন চাকরি তেমন পোশাক, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে যেন বড়দার চেহারা বদলে যাচ্ছিল। গায়ের রং পুড়ে যাচ্ছে, গর্তে ঢোকা চোখ, বসে-যাওয়া গাল। শুধু চোখের দৃষ্টিটা ছিল ঠিক। মায়ের মতো ছিল বড়দার চোখ। টানা, বড় বড় আর স্নিগ্ধ।

সুবি বলেছিল একদিন,—বড়দা, রোজ এত রাত অবধি...

—ওভারটাইম থাকে।

—রোজ, রোজ ওভারটাইম?

—তা না হলে বাড়িঘর করব কী করে? একজন আই এ এস অফিসারের পৈতৃক বাড়িতে কিছু ডিসেন্সি তো আনতে হবে। তুই বরং আর একটু পড়।

—রাত বারোটা হল। তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো, খেয়ে নিই। আর একটু সকাল সকাল এসো।

সন্ধ্যায় রাঁধা এই ডালভাত এখন বাসি হয়ে গেছে। রোজই তুমি আজকাল ফেলে দিচ্ছ। একটু গরম থাকলে খেতে পারতে।

অবশেষে একদিন সুবি বুঝতে পেরেছিল বড়দার গায়ে যে সোঁদা-সোঁদা সেন্টের মতো গন্ধ আজকাল থাকে তা মদের। বড়দা শ্রমিকদের মতো মদ ধরেছে। যেমন চাকরি, যেমন পোশাক, তার সঙ্গে মিলিয়ে জ্বলে-যাওয়া রং আর সবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে এই সস্তা মদ।

প্রথম যেদিন বুঝতে পেরেছিল দুহাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু সেদিন রাতেই বড়দা ফিরেছিল আর-একটা বই নিয়ে। বলেছিল,—এখন পড়বি না। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিনই আরম্ভ করবি। শেয়ালদা স্টেশনের বই-এর দোকানে বলে রেখেছিলাম।

বড়দা, সুবির অনুরোধেই যেন, এক রাতে আগে আগে এল। তখন বাবা-মা, মেজদা ঘুমিয়ে পড়েছে। কড়ানাড়ার শব্দে আকস্মিকভাবে বড়দা এসেছে ভেবে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে সুবি দরজা খুলে দিয়েছিল। আর তখনই যেন আঘাতটা পেয়েছিল। সিঁড়ির উপরে কোমরে হাত দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছে বড়দা।

ধরে এনে নিজের বিছানাতেই শুইয়ে দিয়েছিল বড়দাকে সুবি। আর বড়দা যেন ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যাবে। কী করবে সে, কিসে ব্যথা কমে? ডাক্তার ডাকবে নাকি? বাবা-মাকে এখনই জানানো দরকার!

বড়দা নিষেধ করেছিল। কামড়াতে কামড়াতে নিচের ঠোঁট দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে তখন। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কোনরকমে দম নিতে নিতে বলেছিল দেখ, ঝোলার মধ্যে একটা ছোট খামে দুটো বড়ি আছে। লাল বড়িটা দে।

সেটা নিশ্চয়ই দারুণ রকমের কোন নেশার বড়ি। বড়দা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মায়ের মতো টানা-টানা বড়-বড় ডাগর চোখ ছিল বড়দার। সেই নীল-নীল চোখ হলুদ হয়ে গিয়েছিল। রক্তছোপ লাগানো মরা-মরা হলুদ।

তখন হায়ার সেকেন্ডারির ফল বেরিয়েছে, প্রথম দশজনের নাম। না, তাতে সুবির নাম ছিল না। অসহায়ের মতো ছটফট করেছে সুবি। কাকে বলবে সে? সে কি দুঃখ করবে, না সুখী হবে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে বলে? বড়দা সেই সকালে আজ তার সেই একমাত্র ভালো পোশাক নীল জিনের জামা প্যান্ট পরে কোথায় বেরিয়েছে।

সন্ধ্যার সময়ে এক চাঙ্গারি খাবার নিয়ে ফিরেছিল বড়দা। সে কী আনন্দ তার! সুবি, তোর সবচাইতে প্রিয় বন্ধুদের খাবার দিয়ে আয়; মা, আজ রান্না করতে হবে না, এত মিষ্টি এনেছি। আমাদের সুবি মুখ রেখেছে। প্রথম দশজন না হোক, ফোর্থ সাবজেক্ট ছাড়াই সে তেয়াত্তর পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছে, ঠিক এগারো জনের নিচেই। মেজদা বলেছিল, খবরটা ঠিক তো। বড়দা বলেছিল, ত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে নিজের চোখে ট্যাবুলেশন শিট দেখে এসেছে সে।

প্রিয় বন্ধু শমু, সুবীর, মুকুল এসেছিল আনন্দের ভাগ নিতে। আর সেদিন সুবি যখন সকলকে প্রণাম করছে বড়দা হঠাৎ বলে উঠেছিল : একেই তিমির-তপস্যা বলে, যা সূর্য প্রসব করে।

মেজদা আদর্শবাদী নয় বলত নিজেকে, তবু সেও বলেছিল, সুবি, আমরা যা পারলাম না তেমনভাবে তুমি বংশটাকে প্রতিষ্ঠিত করো।...

গগনবাবু দেখলে সে গলাতে গিয়ে আমের বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এই সোঁদা-সোঁদা, টক-মিষ্টি, গন্ধ আমেরই। সামনে আর এগোনোর উপায় নেই। সে সেই আমের চাঙারি, ঝুড়ি, ডালার সারির মধ্যে দিয়ে ফিরতে শুরু করল।

আমের কথাই তো। কী যেন? কেউ কিছু বলছে নাকি? ওদিকে কি কোথাও ঝগড়া লেগেছে। না। ও। না। তার বড় আর মেজ ছেলে। তারা তখন ছেলেমানুষ। একটা আমের আঁটি কে খাবে তা নিয়ে ঝগড়া করছিল। গগন দুজনকেই দুটো চড় মেরেছিল। চড় খেয়ে দুজনেই কেঁদে উঠেছিল। গগন বলেছিল : তোমরা ব্রাহ্মণের ছেলে, স্কুলশিক্ষকের ছেলে, তোমরা সামান্য আমের লোভে ঝগড়া করবে, এমন আদর্শহীন!

ও, ও। গগন তার ডান হাতটাকে চোখের সামনে আনল। শক্ত, কড়াপড়া হাত। খুব ব্যথা লেগেছিল ওদের। আহা! খুব বেশি ব্যথা। গগনের ঠোঁটের ডান কোণ, ডান গাল চোখের কোল অবধি কোঁচকাতে লাগল। তাড়াতাড়ি ফিরতে লাগল সে আমের বাজার থেকে।

না, এটা কান্না নয়। সে তো কবেকার কথা। জোর করে সে নিজের মুখকে স্বাভাবিক করতে গেল। সে তো বিজ্ঞানের শিক্ষক। আর সে তো তখন আদর্শ অনুসারে মানুষ করার সময়। না, না, একে প্রকৃতপক্ষে মুখের মাংসপেশীর সাময়িক পক্ষাঘাত বলে। কী যেন ইংরেজি নামও আছে।

সুবি ভাবলে কথাটা হয়তো বড়দার নিজের তৈরি নয়, কিন্তু মানিয়েছিল তার মুখে। তিমির-তপস্যার সূর্য-প্রসব। তা কি হয়? একটা আদর্শ সামনে রেখে যে কোন উপায়ে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্যের হিসাবকে তুচ্ছ করে, তার দিকে ছুটে চলা কি সত্যি সম্ভব হয়? আদর্শ ঠিক হলেই হল, পথ পচা পাঁকে ডুবে থাকলেও ক্ষতি নেই এমনকি সম্ভব হতে পারে?

আবার একদিন ব্যথা উঠেছিল লিভারের। সুবি সেই রাতে বলেছিল একটু ব্যথা কমতে, আমার আর ভাল লাগে না, বড়দা। কী হবে লেখাপড়া করে? ওরকম আদর্শ আমাদের মতো লোকের চোখের সামনে থাকা উচিত নয়। এর চাইতে লজেঞ্জ ফিরি করে বাড়িতে দু-চারটে টাকা আনি, তুমি এ চাকরি ছেড়ে দাও।

সুবি ভেবেছিল তখন না হোক এঞ্জিনীয়ার, পলিটেকনিকের ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর লাইসেন্সিয়েট তো বটে, তাকে যদি মিস্ত্রির কাজ করতে হয়, ভুলে থাকতে তাকে মদ খেতে হবে।

সেদিন বড়দা সুবিকে নিজের বুকে টেনে নিয়েছিল, বলেছিল, তোকে পড়তেই হবে, সুবি। তুই কি ভেবেছিস আমি তোর পড়া শেষ হওয়ার আগে সরে যাব? বড়দা সুবির কান নিজের হৃৎপিণ্ডের উপরে চেপে ধরেছিল। বলেছিল, শুনতে পাচ্ছিস কেমন ধকধক করছে! কী জোর! আমি কখনও মরতে পারি! কষ্ট হচ্ছিল বড়দার, তবু থেমে থেমে বলেছিল, তারপর আই এ এস হয়ে বাবা-মার, গৌতমের বংশের ভার নিলে আমি না হয় তখন অনেক দূরে চলে যাব, নদীতে নদীতে স্নান করে সব ময়লা ধুয়ে ফেলব, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াব, পাহাড়ের চূড়াগুলোর কথা ভাবব, দেখব কী করে মাটির উপরে দাঁড়িয়েও কী করে আকাশ ফুঁড়ে সূর্যের আলোয় মাথা রেখে ঘুমানো যায়, কী শান্তি আর আলো!

এ কী অদ্ভুত আদর্শবাদ!

তাহলে, এখন কি পড়বে সুবি? টেবিলের উপরে বইগুলো ঝড়ের পরে ধ্বংসস্তূপের মতো সাজানো। গুছিয়ে নিতে আর কতক্ষণ লাগবে। হ্যাঁ, এখন তো পড়ার সময়ই। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। টেবিলের কাছেই তো সে। বড়দার কিনে দেয়া কবিতার বইগুলো। দু বছর পড়া হয়নি, কিন্তু কিছুই সে ভোলেনি।

টেবিলের দিকে এগোল সুবি। যেন বই নেবে এমনভাবে হাত বাড়াল। কিন্তু দুখানা হাত টেবিলে রেখে সে হাহাকার করে উঠল। যেন দু হাতে কারো পা ধরেছে। তার সেই অব্যক্ত, অনুচ্চ হাহাকারের মধ্যে দিয়ে সে অস্ফুটস্বরে বললে, মুকুল, শমু, সুবীর, মেজদা...। না, বড়দা, না বড়দা, তুমি আর আমাকে পড়তে বোলো না।

মুকুল, মুকুল...। মুকুল তার বন্ধু ছিল ক্লাস ফোর থেকে। সুন্দর, সুঠাম চেহারা ছিল মুকুলের। শিব্রাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প পড়তে ভালোবাসত। যেখানে সেখানে যখন তখন চিৎকার করে রবীন্দ্রনাথের গান করে উঠতে পারত মুকুল। না, না, মুকুলের গায়ে সে অন্তত ছোরা বেঁধায়নি, অন্তত তার গলায় ব্লেড বসায়নি সে। মুকুল, মুকুল...

মুকুল পরীক্ষার ফিস জমা দিতে গিয়েছিল। সেই ছাত্রদের লাইন থেকে সুবিই তাকে ডেকে এনেছিল 'কথা আছে বলে'। মাস্টারমশাই বলেছিলেন দেশের এ অবস্থায় পরীক্ষা দেয়া অপরাধ। কিছুক্ষণ পরে, ট্রামে সুবিকে চুপ করে থাকতে দেখে মুকুলের মুখ চিন্তাকুল হয়েছিল। ধর্মতলার কাছে মুকুল আর সুবি নামতেই শমু এসেছিল। ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে তারা লাটের বাড়ির দিকে গিয়েছিল। তখন কি মুকুল ভাবছিল সাচ্চা মার্কসিস্টের মতো ভুল করে ফেলেছি। বন্ধুদের কাছে আত্মসমালোচনা করে আবার পুনর্বাসন হতে পারে। হাঁটতে হাঁটতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তা সত্ত্বেও সবগুলো জেটি পার হয়ে গঙ্গার পাড় ধরে তারা হাঁটতে শুরু করেছিল। মুকুল দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে ঘামছিল। সে কি বুঝতে পারছিল—এটা সাধারণ বেড়ানো নয়। এমন সময়ে সুবীর দেখা দিয়েছিল, তার হাতে একটা চটের থলে আর দড়ি, খবরের কাগজে জড়ানো থাকলে তা নিশ্চয় মুকুলের চোখে পড়েছিল। সে কি অবাক হয়েছিল, অজ্ঞাত কোন ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু গঙ্গার ধারে তারা যখন বসেছিল তখন মুকুলের মুখ আবার উজ্জ্বল হতে শুরু করেছে, তার চোয়ালের মাংসপেশীগুলি মনের জোরে দৃঢ় হচ্ছে। সে হয়তো ভাবছিল আজও আবার চার বন্ধুতে তাত্ত্বিক তর্কাতর্কি হবে। না, মুকুল, না।...হাঁপাতে লাগল সুবি।

শমু হঠাৎ খপ করে মুকুলের হাত বেঁধে ফেলেছিল। তখন বোধ হয় মুকুল বুঝতে পারল, আন্দাজ করল। সে প্রাণপণে সেই নাইলনের দড়ির বাঁধন ছিঁড়তে গেল। আর সেই সুযোগে তার পা দুটোকে বেঁধে দিল সুবীর। আর তখন আতঙ্কে মুকুলের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল, পেচ্ছাপে প্যান্ট নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। আর সুবীর বললে,- নিকেশ করে দাও, সুবি।

না, সুবি বসায়নি ছুরি, সুবি বসায়নি মুকুলের সুন্দর গলায় ব্লেড। মুকুল একবার মাত্র ওমা বলে কান্নার মতো চিৎকার করে উঠেছিল যখন সুবীর ছোরাটা তুললে হাতপা বাঁধা মাটিতে পড়ে-থাকা মুকুলের বুক লক্ষ্য করে। আচ্ছা, সবাই কি, সব মানুষ কি, সব প্রাণী কি সে সময়ে ভয় পেয়ে মাকে ডাকে শেষবারের মতো?

সুবি দু হাত তুলে দু চোখের জল ঢাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই তার আড়ষ্ট আঙুলগুলো একত্র হচ্ছে না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল আসছে।

কিন্তু যখন মুকুলকে চটের থলেটায় ভরে দিচ্ছিল সুবীর আর শমু, তখন থলেটা ধরে রেখেছিল সুবি। একবার শুধু সুবি বলেছিল--আরে ওর শরীরটা এখনও গরম। একবার শুধু তার চোখে পড়েছিল মুকুলের ফাঁক-হওয়া গলার মধ্যে থেকে সাদা কিছু বেরিয়ে আছে, তার হাঁ-করা মুখ থেকে দাঁত বেরিয়ে আছে, তার একটা চোখ তখনও দেখতে পাচ্ছে।...

সুলতা এসে বললে, সুবি, ঠাকুরপো, বাবা বাজার না করে ফিরে এসেছেন। বারান্দায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়েছেন।--এসো তো, এসো তো।

চোখ মুছে বাইরে গেল সুবি। গগন স্থির হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার মুখের একটা পাশ থরথর করে কাঁপছে। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল। বলেছে নার্ভের অসুখ। এখন মাঝে মাঝে হয়, এরপরে সব সময়ে হতে থাকবে, হয়তো একটা হাত, হয়তো ঘাড়ও কাঁপবে। অন্য একজন

বলেছে,—হয়তো এটা মানসিক ব্যাপার। নতুবা যাওয়া-আসা করত না রোগটা।

ব্রজবালা বাতাস দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও গগনের ঘাম কমছে না। সুবি বললে,—একটু চা করে আনো বউদি। সুলতা উঠে গেল। সুবি দেখলে গগনের বোজা চোখের পক্ষ্মগুলোর গোড়ায় গোড়ায় জল দেখা দিচ্ছে। তারপর সে জল পক্ষ্ম ছাপিয়ে চোখের কোণে জমা হল। সুবি নিশ্চিন্ত হল। সহজেই এবার সুস্থ হবে গগন, কাঁদতে পারছে। দু-একবার হাহাকার করতে পারলেই স্নায়ুগুলো স্বাভাবিক হবে।

সুবি নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এল। প্রথম দিনের কথা তার মনে আছে। বাবা বউদিকে ডেকে নিয়ে বাড়ির ঘরগুলোকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরেছিলেন, যেন বউদি নতুন এসেছে, যেন বউদি তার আগে ঘরগুলোকে দেখে নিচ্ছিলেন। ঘরগুলো সবগুলো শেষ করা হয়নি। একটি পুরোপুরি, তার-পরেরটি বারো আনা, এরকম অঙ্কের হিসাবে শেষেরটি সিকি পরিমাণ গড়া হয়েছিল। সুলতা বলেছে প্রথম ঘরটির ইলেকট্রিক লাইন বসানো কত সুন্দর হয়েছে তাই বোঝাচ্ছিল গগন। বলছিল, এ কি আর সাধারণ মিস্ত্রির কাজ? তোমার ভাশুর, আমার বড় ছেলে, তাকে আমি এঞ্জিনীয়ার করতে পারিনি, কিন্তু পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর লাইসেন্স ছিল। বলতে বলতে হঠাৎ শুরু হল। আর্ত চিৎকার শুনে সুবি ছুটে গিয়ে দেখেছিল অদ্ভুতভাবে ঘরের মধ্যে একটা সুইচের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে গগন। বাঁ হাতটা ঝোলানো, ডান হাতটা সুইচটার দিকে তোলা, ডান পা-টা ভাঁজ করা, বাঁ পা-টা সোজা, সব মিলে যেন একটা নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা একটা স্ট্যাচু-ভঙ্গি। চোখবন্ধ, নিশ্বাস পড়ছে না। সুবি বলেছিল,—কতক্ষণ হল? প্রায় দু মিনিট। যেন ইলেকট্রিকের শক লেগেছে। কিন্তু সুইচ পর্যন্ত হাত পৌঁছায়নি। সকলে মিলে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল গগনকে। ডাক্তার এসেছিল। ইনজেকশন-টিনজেকশন দিয়েছিল। বিকেলের দিকে গগন ক্লান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল, সুবি, ইলেকট্রিকে তো আগুন দেখা যায় না, কিন্তু সে কি আরও ভয়ঙ্কর বেশি জ্বালা।

সুবি বুঝতে পেরেছিল তার বাবা বড়দার মৃত্যুর কথাই ভাবছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সুবি বলেছিল, শুনেছি ইলেকট্রোকিউটেড হলে হৃৎপিণ্ড সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়, যন্ত্রণা টের পায় না। বলে সে দৌড়ে নিজের ঘরে পালিয়ে এসেছিল।

বড়দা একদিন রাতে ফেরেনি। সকালের খবরের কাগজে ছবি আর সংবাদ দেখে, (না, নাম ছিল না কিন্তু ফটোটা স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল), চমকে উঠেছিল গগন, তারপর সুবি। রেলগাড়ির ছাদে কী যন্ত্র থেকে কী চুরি করতে গিয়ে একজন তার-চোরের মৃত্যু হয়েছে।

মুকুল, শমু, সুবীর আর সুবি গিয়েছিল মৃতদেহ আনতে। কোথাও কাটা-ছেঁড়া নেই, অথচ মানুষটা শেষ হয়ে গিয়েছে। শমু বলেছিল পুলিশদের, কী বলছেন, তার-চোর? একজন কর্মচারী ছিলেন উনি রেলের। তারা বলেছিল, দু-তিন বছরের মধ্যে এরকম নামের কেউ মিস্ত্রি হল না শেয়ালদা ডিভিজনে। রেলের একজন লোক বলেছিল, আমরা মাঝে মাঝে এসে দেখেছি, কিন্তু ভাবতাম মিস্ত্রি হিসাবেই কাজ করছে। পুলিশের লোকেরা বলেছিল, হয়তো গোড়ায় টেম্পোরারি চাকরি ছিল। সুবীর লজ্জায় মুখ নিচু করেছিল, শমু সামনে থাকতে না পেরে উঠে উঠে বাইরে যাচ্ছিল; কিন্তু মুকুল, বড়লোকের ছেলে মুকুল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, সুবি, তুই আর সুবীর এদের কাগজপত্রে সই দিতে থাক, শালারা অনেক কাগজে অনেক সই নেবে, আমি আর শমু খাটিয়া আর ফুল নিয়ে আসি। কী ফুল ভালোবাসতেন রে? সুবীরকে বলেছিল, মুখ তোল শালা, একজন ছাটাই শ্রমিক আমাদের এই বড়দা। তারপর সেখানে পুলিশের পোশাকেই মেজদা এসেছিল। না, মেজদা সেদিন বড়দাকে অস্বীকার করেনি। একজন পুলিশ অফিসার বলেছিল—আনফরচুনেট্।

মেজদা কিছু বলেনি। তার দু-চোখভরা জল ছিল। শম্ভু আর মুকুলের অন্য খাটে, মেজদার যোগাড় করা পুলিশের ট্রেলারে, ফুলে ফুলে ঢেকে বড়দার দেহকে তারা বাড়িতে আনতে পেরেছিল।

মুকুল যতই বলুক, বড়দা চিরদিনের মতো চোর এই ছাপ নিয়ে নিয়েছে।

তখন মেজদা দিন পনেরোর জন্য নিজের ঢাকুরিয়ার বাসা থেকে এই বাড়িতে এসে ছিল বউদিকে নিয়ে। মেজদাই শ্রাদ্ধ করেছিল।

অথচ একটা আবাল্য রেষারেষি ছিল যেন বড়দা আর মেজদায়। রেষারেষি বলেই কি বড়দার প্রায় সব ব্যাপারে সমালোচনা করত? দুজনের আদর্শের সংঘাত নাকি? নাকি পিঠোপিঠির রেষা-রেষিতেই ওদের আদর্শ পৃথক হয়ে গিয়েছিল!

মেজদা ইন্টারভিউ দিত। একবার বাড়িতে এসে বললে, এবার আমাদের দুঃখ যাবে। চাকরি পেয়েছি। সকলেই আনন্দ করে উঠেছিল। তারপর প্রশ্ন উঠল, কী সে চাকরি।—পুলিশের এ এস আই। গগন বলেছিলেন,—বি এ অনার্স হয়ে পুলিশের এ এস আই? মেজদা হাসতে হাসতে বলে-ছিল,—সুবির আই এ এস-এর অক্ষরগুলোকে উল্টে-পাল্টে নিলে এ এস আই হয় না? গগন বলেছিল,—কিন্তু পুলিশ! যেন একটা অনেক দিনের চাপাপড়া ঘৃণা। বড়দা বলেছিল,—আমাদের বাড়িতে পুলিশ? যেন একটা দুর্ভাবনার কথা।

মেজদার কি পৃথক কোন আদর্শ ছিল? না কি সে এক আদর্শহীনতা? মেজদা কি জানতে পেরেছিল বড়দা কী করে? তাতেই কি তার বিরক্তি? মেজদা কি দারুণ রকমে রিঅ্যাকশনারি ছিল?

চাপা একটা অসন্তোষ, চাপা হলেও যার পরিমাণ যেন বেড়ে উঠছিল। বড়দা একদিন বলে-ছিল,—আমাদের বাড়িতে কি পুলিশ মানায়? তখন মেজদার সদ্য বিয়ে হয়েছে। উদ্যোগ করে বড়দাই বিয়ে দিয়েছিল প্রায় চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এখন মনে হয় তার পিছনে মেজদাকে একটা পৃথক বাড়িতে গুছিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল।

সেদিন মেজদা খুব শান্তভাবেই বলেছিল,—বুঝি, বুঝি সবই, কিন্তু চাকরি কি ইচ্ছামতো পাওয়া যায়? কী বুঝেছিল মেজদা? বাবার সেই বহুদিনের পুরনো পুলিশ-বিদ্বেষ তাঁকে ক্রমশ অতৃপ্ত করে তুলেছিল? বড়দার কি অসুবিধা হচ্ছিল নিজেদের বাড়িতে পুলিশ থাকায়?

একদিন মেজদা বলেছিল,—সুবি, গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের বাসাভাড়া দেয়। ভাবছি ঢাকুরিয়ার দিকে একটা বাসা ঠিক করে উঠে যাব তোর বউদিকে নিয়ে।

সুবি বলেছিল,—মেজদা, লোকে কিন্তু তোর খুব নিন্দে করবে। মেজদা বেশ খানিকটা সময় চুপ করে বসে থেকে বলেছিল,—জানিস, সুবি, মুকুল বলছিল আমাকে, আমার এ পাড়া থেকে দূরে কোথাও চলে যাওয়াই ভালো।

মেজদার মুখটা কালো দেখাচ্ছিল, তা কি দুর্ভাবনার, কি দুঃখের, কি রাগের—তা বোঝা যায় না। সুবি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মুকুল? মুকুল একথা বলতে গেল কেন? মুহূর্তে সুবির গলার ভিতরটাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সে কি আতঙ্ক? মেজদা কি রিঅ্যাকশনারি ছিল? দারুণ রকমে রিঅ্যাকশনারি? শ্রেণীশত্রুদের স্পষ্টতম প্রতীক?

একদিন মেজদা বলেছিল বটে, ভণ্ডামিটা ভালো নয় রে, সুবি। তারা কখনই ভালো ছাত্র হতে পারে না। অথচ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা পর্যন্ত বলছে সেই খুনীরা নাকি ভালো ছাত্র সব। তুই নিজেই বল, তুই যে হায়ার সেকেন্ডারিতে ভালো রেজাল্ট করেছিলি তা কি দিনরাত লেখা-পড়াকে ধ্যানজ্ঞান করে উদয়াস্ত পরিশ্রম করার ফল নয়?

—তুমি কি এসব বাইরেও বল, মেজদা?

—বাহ্, কেন বলব না। এই তো আজ সন্ধ্যেতেই গাড়িতে আসতে আসতে বললাম, তোদের

অধ্যাপক নিখিলানন্দবাবুকে। সাধারণ লোকেরা রোম্যান্টিক কথাবার্তা বলতে ভালোবাসে। ডাকাত হলেই তাদের মনে গরিবের প্রতি দয়ালু একজন বীরপুরুষের ছবি ভেসে ওঠে, যে বড়লোকদের উপরে অত্যাচার করে গরিবদের সাহায্য করে। কিন্তু শিক্ষিত লোক, নিজে যে একজন অধ্যাপক, সে কী করে সায় দেয় যে সেইসব খুনীরা ভালো ছাত্র হতে পারে। বললাম, আপনিও কি বিশ্বাস করেন নাকি?

নিখিলানন্দবাবু বললে,—হতে পারে তারা ভালো ছাত্র।

আমি বললাম, আপনি তো অধ্যাপক। পরীক্ষার ফল ভালোই ছিল নিশ্চয়। আপনিই বলুন দিনরাতে কত ঘণ্টা বই মুখে বসে থাকতে হত।

একজন যাত্রী বলেছিল, মেধাবীদের পক্ষে কম পড়লেও চলতে পারে।

বললাম, কার কম পড়লে চলেছিল? বিদ্যাসাগর, ব্রজেন্দ্র শীল, স্যার আশুতোষ? আসলে জানিস, সুবি, এটা একটা প্রচার। আমি নিখিলানন্দর সামনে বললাম, একজন যে খুন করে এসেছে, কিংবা খুন করার সংকল্প করেছে, কিংবা ক্রমশ খুনের সাথে জড়িয়ে পড়ছে, তার মন এমন শান্ত কখনই হতে পারে না যে বই-এর কোন থিয়োরি, থিয়োরেম তার মাথায় ঢুকবে সহজে। যদি তা সত্ত্বেও বেশি নম্বর পায়, ভালো ছাত্র বলে প্রমাণিত হয়, বুঝতে হবে তারা যে দলের কেডার তার দলপতিদের কেউ কেউ আছে অধ্যাপকদের মধ্যে যারা কামক্লেজের জন্য পরীক্ষার আগে সেইসব ছাত্রকে পাঁচ-সাতটা করে প্রশ্ন মুখস্থ করিয়ে দেয়। কিংবা পরীক্ষার খাতা দেখে ভালো ছাত্র হওয়ার উপযুক্ত নম্বর দিয়ে দেয়।

আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল নাকি তখনই সুবি? কেন বলতে গেলে এসব কথা? কী দরকার ছিল?

বড়দার মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই মেজদা নিজে বাসা করে চলে গিয়েছিল বউদিকে নিয়ে।

একদিন মুকুলকে জিজ্ঞাসা করেছিল সুবি, তুই নাকি মেজদাকে অন্য কোথাও চলে যেতে বলেছিস। নাকি বলেছিস, চলে যাওয়াই ভালো।

মুকুল অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে একটা চাপা অশান্তি কিংবা উত্তেজনায় পুড়ছে।

মুকুল বলেছিল, সেই তো ভালো হল। (কেমন যেন উদাস শোনাল তার গলা) একটা কথা বলব তোকে, কাউকে বলিস নে, সুবীর-শমুকেও না। হয়তো

—কী এমন কথা যে বলতে পারছিস না?

—হয়তো এমন হতে পারে তোকে বা আমাকে বলা হল মেজদার উপরে অ্যাকশন নিতে?

আতঙ্কে দিশেহারা হয়েছিল নাকি তখন সুবি?

মেজদার সঙ্গে মাসে একবার করে দেখা হত সুবির। সুবিই যেত মার চিঠি নিয়ে। আর মেজদা টাকার খামটা দিত। বড়দার মৃত্যুর আগে শেষ চিঠি দিয়েছিল মেজদা। লিখেছিল, আগামী মাসে মাইনা বাড়বে। আগামী মাস থেকে বাড়তি টাকাটা তোমাকে পাঠাবো। মা, আমি ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করলে ঘুষ-ঘাষে আরও অনেক বেশি পেতে পারতাম। তোমাকে দিতেও পারতাম। কিন্তু আমি স্কুলমাস্টারের ছেলে বলে ঘুষ-ঘাষ নিতে পারছি না।

সুবি হাঁপাতে লাগল। হাঁ করে-করে নিশ্বাস নিতে হচ্ছে তাকে। মুকুল কি আন্দাজ করেছিল? নাকি সুবীর-শমুর কাছে অ্যাকশনের হুকুমটা শুনেছিল।

তখন মুকুল চলে গিয়েছে। মুকুল, মুকুল...আমি অন্তত আমার দুই হাত দিয়ে চটের থলেটা ধরে ছিলাম।

সেদিন মেজদার বাসার কাছাকাছি গিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে সুবীরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সুবি। আর একটু এগিয়ে একটা গলির মধ্যে একটা চায়ের দোকানে বসে থাকতে দেখেছিল শমুকে। অথচ তারা কেউ যেন সুবিকে দেখতেই পেল না।

ঘণ্টা দুয়েক ছিল সুবি মেজদার বাসায়। বউদি আর মেজদা তাকে কত আদর করেছিল। টাকা দিয়েছিল মাকে দিতে। বউদি বলেছিল, চলো ঠাকুরপো, আজ সিনেমা দেখে আসি। মেজদা বলেছিল, তোর কি শরীর খারাপ লাগছে। একটু শুয়ে নিবি? চা জলখাবারের পর বউদি গা ধুয়ে এল, পরিপাটি করে চুল বাঁধল। সুবি বাড়ি ফিরতে আর মেজদারা সিনেমার জন্য তৈরি হল।

একটা প্রচণ্ড চাপে সুবির দম বন্ধ হয়ে আসছে। কালো কালো গ্যাসে তার বুক এমন ভরে উঠেছে যেন তা ফেটে যাবে। আকাশে ঝড়ের মেঘ যেমন বিদ্যুতে ফাটে আর জল নামে গলগল করে তেমন হলে হত।

মেজদা বউদি বাসা থেকে পঁচিশ গজ যেতে সুবীর-শমুকে দেখতে পেয়ে থেমেছিল। পাড়ার ছেলে ছিল তো। মেজদা কথা বলতে থেমেছিল। আর ঠিক তখনই শমু ছোরাটা বসিয়ে দিল মেজদার পেটে। আর মেজদা পড়ে যেতেই সুবীর ক্ষুর দিয়ে মেজদার গলাটা কেটে দিল। তখনও সুবি বিশ গজ দূরে যায়নি।

সুবি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল গলা দিয়ে শব্দ বার করতে, চোখ মুচড়ে চোখে জল আনতে। সে বলেনি, মেজদা শমু-সুবীরকে দেখে এলাম। মেজদা তুমি আজ বেরিও না। সে বলেনি মেজদা তুমি শমু-সুবীরকে পাড়ার ছেলে মনে কোরো না। সে মেজদাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেনি, মেজদা তোমাদের রিভলবার ছাড়া বেরোনো উচিত নয়। বউদি মেজদার শরীরের উপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুবি এ-গলি ও-গলি ঘুরে বাড়ি ফিরে এসেছিল। বাড়ির নিরাপত্তায়। না, অন্তত সে মেজদাকে সতর্ক করে দিতে পারত, যা সে করেনি। না না...

একটা জান্তব, চাপা আর্তনাদ বার হল সুবির গলা থেকে।

সুলতা এসে বললে, ডাকছো আমাকে?

সুবি চেয়ে দেখল, সুলতা এসে দাঁড়িয়েছে। মলিন পাড়-ছেঁড়া শাড়ি পরা। সে অনুভব করলে এবার অনেক জল আসবে চোখে। কিন্তু দারুণ গরমের হলকা উঠতে থাকলে যেমন বর্ষার মেঘ উড়ে যায় উদাস হয়ে, দু-একটা ফোঁটা মাত্র জল পড়ে শুকনো ধুলোয়, সুবির চোখেও জল এল কি এল না।

সুলতা বললে,- নারায়ণ কি ধারে একসেরটাক চাল দেবে? ওর দোকানো তো আলুপটলও আছে? দেবে ধারে সামান্য কিছু?

অস্ফুটস্বরে সুবি বললে,—মেজদা, মেজদা...

সুলতা বললে,— কিছু বলছ? সুলতা দেখলে, সুবির চোখের সাদা অংশ সব যেন কুয়াশায় ঢাকা, সেজন্যই যেন সে চোখ পিটপিট করছে। সুলতা যেন এ বাড়িতে যে-কোন লোকের যে-কোন সময়ে তেমন হতে পারে সুবির যা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে গেলে তুমি আর ধারে চাল কিনতে যেতে পারবে না।

সুলতা চলে গেলেও সুবির বুক আর গলা থিরথির করে কাঁপতে থাকল। সে নিশ্চয় মেজদার সুন্দর সুগঠিত গলার নালীতে ক্ষুর বসিয়ে দেয়নি কিন্তু, কিন্তু...

কিছুক্ষণ পরে দু-তিন ফোঁটা জল পড়ল সুবির চোখ থেকে। হ্যাঁ, এ বাড়িতে সবকিছুই ঘটছে কি মেজদা চলে যাওয়ার পর থেকে। সে শুনেছে দমদমের দিকে কী এক অ্যাকশন হয়েছিল এক সন্ধ্যায়। পরের দিন সকালে কাছাকাছি একটা গলিতে সারা রাত্রির ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শমুর

শরীরটাকে পাওয়া গিয়েছিল। সে শুনেছে সুবীর কয়েকটা মামলায় জড়িয়ে পড়েছে।

তিন মাস হল মেজদা নেই, এই তিন মাসে এ বাড়ির ঘটনাগুলো এখন অদ্ভুতভাবে আট-পহুরে এমন সাদা-হলুদে রঙে আঁকা যে ছবিগুলোর মধ্যে দিয়ে তোমার দৃষ্টি চলে যায়—এবং ওপারেও কিছু থাকে না। মনে করা যায় ঘটনাগুলোকে—কী লাভ? কী লাভ?

যেমন পাঁচ-ছ দিন আগে সকালে মুখ হাত ধুতে গিয়ে সে বড়দার শখের পায়রার খোপটার দরজাগুলো খুলে দিতে গিয়েছিল। সেই কুড়িটি পায়রার মধ্যে তিন-চারটি তখনও ছিল তাদের আক্রমণের শেষে। হঠাৎ খোপের নিচে চোখ পড়েছিল সুবির। রক্ত নাড়িভুঁড়ি জড়ানো কয়েকটি শাদা পালক চোখে পড়েছিল তার।

যেমন চার-পাঁচ দিন আগে বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইলেকট্রিসিটি আগুনের চাইতে শক্তি-শালী, তাহলে কি জ্বালাটা আগুনে পুড়ে যাওয়ার চাইতেও বেশি? সে তো বড়দার কথাই। যারা বিদ্যুৎ লেগে মারা যায় তারা হয়তো কিছু অনুভব করে না বলে সুবি পালিয়ে এসেছিল।

যেমন এরই মধ্যে একদিন মা এঁটোহাতে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলেছিলেন—ওরা কেউ খায়নি। সে তো বড়দা আর মেজদার কথাই। কেমন একটা রুক্ষ অনুর্বর গরম বোধ হচ্ছে যেন, যেন সাদা-হলুদ এই শূন্যতার দরজা-বন্ধ-করা একটা গুমোট আছে।

যেমন দু-তিন দিন আগে দুপুরে বউদি তার নিজের ঘরে কাঁদছিল। যেন এক দারুণ অনু-তাপের বুকচাপা কান্না। তখনই সুলতা বলেছিল, কী লজ্জা, কী ভয়ংকর হৃদয়হীন লজ্জার কাজ করেছে সে। চার মাস হল সুবির মেজদার মৃত্যু হয়েছে, আর এখন দেখা যাচ্ছে সুলতা চার মাসের গর্ভবতী। কী করে সে বলবে একথা মাকে, কী করে প্রকাশ করা যায় এই হৃদয়হীনতার কথা?

যেন এই রাজ্যে, এই পৃথিবীতে, এই সাদা-হলুদ শূন্যতায় যা ক্ষণে ক্ষণে ধূসর, সেই সময়ে এই নির্লজ্জ প্রাণের অঙ্কুরের কথা প্রকাশ পাওয়া! যেন স্বামীর কাছে থেকে সন্তান গ্রহণ করার চাইতে নিলাজ পাপ আর কিছুতেই হয় না।

আর সুবি উপায়ান্তর খুঁজে না-পেয়ে বলেছিল—আজকাল আইন আছে বউদি। ওকে সরিয়ে ফেলো। চলো হাসপাতালে যাই। কী লজ্জা, কী লজ্জা!

ফিসফিস করে কথা বলছিল সুবি তখন। আর সুলতাও তখনই হাসপাতালে যাওয়ার জন্য সেই মুহূর্তেই ছেঁড়া আধময়লা শাড়িটা পাল্টে, ছেঁড়া চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে বলেছিল ফিসফিস করে, আমার এই হারটাই আছে—প্রায় তিন ভরির হার। এতে হয়ে যাবে বোধ হয়। যন্ত্রচালিতের মতো জামা গায়ে গলিয়ে এসেছিল সুবি। সে কি তখন হাঁপাচ্ছিল! হয়তো সে নিজে নয়, তার বুকের ভিতরে কেউ।

কিন্তু হঠাৎ না-না বলে তীক্ষ্ম কান্নায় ভেঙে পড়ে বউদি চৌকির উপর বসে পড়েছিল। সামনে আকুল হয়ে হাত ছড়িয়ে দিয়ে যেন কাউকে রক্ষা করবে।

সুবি ভাবলে,—আচ্ছা, সেই ছেলে বড় হয়ে যদি একদিন আধো-আধো ভাষায় জিজ্ঞাসা করে, তোমার গায়ে কত জোর, আমার বাবাকে বাঁচাতে পারলে না কেন?

আবার সুবির গলার কাছে শিরাগুলো তিড়বিড় করে কাঁপতে শুরু করল।

যদি আরও বড় হয়ে বলে,—কাকা, তোমার দাদা, তোমার নিজের দাদা, তোমার মায়ের পেটের ভাই, তুমি প্রতিশোধ নাওনি কেন?

জোরে জোরে ফুঁপিয়ে উঠল সুবির বুক।

যেমন কাল। কাল সারাদিন সুবি জনক মুচির কাছে বসে ছিল। জনক মুচি কাজ করছিল। জুতো মেরামত, স্যান্ডালে লোহা ঠোকা, জুতোর রং। আর সকাল থেকে দুপুর, দুপুরে গড়িয়ে

বিকেল। রোদে, ধুলোয় একটা ইটের উপরে বসে ছিল সুবি। একেবারে চুপ করে নয়। খড়কুটো উড়ছিল। একটা লম্বা খড় পেয়ে সেটাকে নখ দিয়ে কুটিকুটি করে আনমনে সেই হলুদ-সাদা রোদের গুমোট দুপুরটা কাটিয়ে দিতে পেরেছিল সে।

সুলতা বাজার থেকে ফিরেছে। একটা কাগজের মতো কিছু হাতে করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে সে ডাকলে সুবিকে,—সুবি, সুভাষ, দেখে যাও।

সুবি গেল সুলতার ঘরে। সুলতা বললে,—দেখো তো এটা কী?

সুবি দেখলে খবরের কাগজে একটা ঠোঙা, যার গায়ে ছবি। সুবি বললে,—চাল এনেছ, সেই ঠোঙা?

কিন্তু সে দেখতেও পেল। চমকেই উঠল সে। একটি আলুথালু মহিলার ছবি, শোকে মুহ্যমান বোঝা যায়, এমন কি মুখ দেখে মনে হয় শোকে হাহাকার করছে। সেই ছবিটার কোণে কেটে বসানো একটা ছোট পৃথক ফটো একটি তরুণের। সুবীর! কী আশ্চর্য সুবীর!

সুলতা বললে, সংবাদটা দেখো।

সুবি পড়লে, অধ্যাপক নিখিলানন্দ আন্ডারগ্রাউন্ড ছিলেন। অসুস্থ হয়ে হসপিট্যালে ছদ্ম-নামে ভর্তি হয়েছিলেন। সুবীরের বাবা নিখিলানন্দ। মৃত্যুর পাঁচ-ছয় দিন আগে নিজের পরিচয় দিয়ে সুবীরকে আর তার মাকে শেষবারের মতো দেখতে চেয়েছিলেন। অথচ সরকার সুবীরের মাকে সংবাদটা জানিয়েছিল মৃত্যুর পরে। তবু সে অভাগিনী স্বামীর মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সরকার জেল থেকে সুবীরকে পিতার শেষকৃত্য করতে, এমনকি শ্রাদ্ধ করতেও ছেড়ে দেয়নি।

ঝিমঝিম করছে সুবির শরীর। সে যেন ঘরেই নেই। বহুদূর থেকে যেন বউদি সুলতার গলা ভেসে এল। সুলতা বললে,—বাস্তবিক, কী নিষ্ঠুর, না? এরকম সাংবাদিকতার জন্য পুরস্কার পাওয়া উচিত। দশটা প্রবন্ধর চাইতে এই একটা ছবি, এই এক কলম সংবাদ বেশি কাজ করে।

সুবি কথা বলতে গিয়ে ঢোক গিলল।

সুলতা বললে,—তুমি দেখো, ঠাকুরপো, আমাদের এই দাশগুপ্ত পুরস্কার পাবে।

সুলতা যেন হাসল। কিন্তু হঠাৎ যেন সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—কিন্তু, সুবি, কিন্তু সুবি, আমার ছবি, আমার ছবি কোন সাংবাদিক কি ছাপবে না?

সুবি ভাবলে, আজও সে কি জনক মুচির পাশে সেই ইটটার উপরে চুপ করে বসে সারাটা হলুদ আলোর দুপুর কাটিয়ে দিতে পারবে? বলো, পারবে? হয়তো বাতাসে উড়ে-আসা একটা খড়ও পেতে পারে আবার আজ সময় কাটাতে।

খ্রীষ্টানতন্ত্র ও য়োরোপীয় সংস্কৃতি

গুরুদাস ভট্টাচার্য

ভূমিকা। মধ্যযুগ-য়োরোপের খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টীয় সন্ত ও ধর্মকেন্দ্রিক লীলানাট্যরূপ বদলাতে-বদলাতে, আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে এসে, কেমন করে, দৈনন্দিন গৃহধর্মকেন্দ্রিক জননাট্য হয়ে উঠল, 'প্যাশন্ প্লে' হয়ে দাঁড়াল 'প্যাশনেট প্লে'—তার ধারাবিবরণী পাওয়া যায় পাশ্চাত্ত্য নাটকের ইতিহাসগ্রন্থ থেকে। বলা বাহুল্য, এ-বিবর্তন পালাকার, রূপকার বা দর্শক, কারও উচ্ছৃঙ্খল খেয়াল-খুশিতে ঘটেনি। এর পটভূমিকায় ছিল বিপুল আয়োজন, জীবনের বিচিত্র-জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, জীবন-দর্শনের ক্রমিক ও অনিবার্য পালাবদল। ইতিহাসের মুহূর্তে-মুহূর্তে প্রবাসী-নিবাসী গতকাল-সমকালীন কোন্ কোন্ উপাদান-উপকরণ য়োরোপভূমি কিভাবে স্বকার্য-সাধনে ব্যবহার করেছে, ঠিক কোন্ পথে তার বিবর্ধন ঘটেছে, তার গোটা ছবিটা তখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, হয়তো হবেও না কোনদিন। তবু নানা জন নানা দিক থেকে নতুন-নতুন অধ্যায় উদ্ঘাটন করছেন। এবং য়োরোপের ধর্ম-স্থিতি বিষয়ক অনুশীলন তারই এক উপাধ্যায়।

মধ্যযুগ, এই যুগধৃত ধর্মতন্ত্র ও অধ্যাত্মচেতনা স্বভাবতই রক্ষণশীল, মুক্তবুদ্ধির ও ঐহিকতার পরিপন্থী। কালক্রমে, আর্থনীতিক-রাজনীতিক-সামাজিক শক্তির রূপান্তরে, বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার অগ্রগতি, বস্তুমুখী দর্শন ও মানবপ্রীতির প্রসার, বুদ্ধিজীবিতার উন্মেষ-প্রয়োগ, ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে ধর্ম-বিযুক্ত সংস্কৃতি পায় আধুনিকতার চরিত্র ও চেহারা। তারও মধ্যে থাকে পুরাতনের রূপ-বর্ণ-গন্ধ, নতুন রূপে ও রীতিতে খেলা করে। ঠিক তেমনি, মধ্যযুগীনতা ও তন্নিষ্ঠ ধার্মিকতার মধ্যেও উপ্ত হয়েছে তার বিরোধী বীজ, জীবিত থেকেছে যুক্তি-মানবতা-বস্তু-মুখীনতা, কোন-না-কোন আকারে। খ্রীষ্টমূর্তির পদতলে দাঁড়িয়েই উচ্চারিত হয়েছে অ্যান্টি-ক্রাইস্টের স্লোগান। তার যুক্তিবাদ এসেছে গ্রীক তর্কশাস্ত্র থেকে; তার সেবাধর্ম থেকে এসেছে মানবতাবোধ; তৃতীয় ধারার উৎস, কেউ কেউ বলেন, পাশ্চাত্ত্য আধ্যাত্মিকতাই, যেখানে-যেখানে ও যখন বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শন পেয়েছে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আশ্রয়।

অবশ্যই, সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত সরলীকরণ। যেহেতু, এ তথ্য সর্ববাদিসম্মত যে খ্রীষ্টান-তন্ত্র, অন্য ধর্মতন্ত্রের মতোই, এসবের বিরোধী ছিল, এমনকি শক্তিপ্রয়োগেও তার কার্পণ্য ছিল না। বিজ্ঞানের অনুশীলন তাই প্রায়শ গুপ্তবিদ্যা ছিল, বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ছিল গুহ্যবিদ্যা। কিন্তু বারেবারেই তন্ত্র পরাজিত হয়েছে, হয় আপোস করেছে, নয় আত্মসাৎ। সন্ত টমাস অ্যাকুইনিয়াস আরিসততলীয় চিন্তাকে ধর্মীয় পাঠপ্রচয়ে নিয়ে আসেন, পরবর্তী কালে সেই চিন্তাই ব্যবহৃত হয়েছে চার্চের আত্মরক্ষার্থে। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টানতন্ত্রের মূল সূত্র: "দৈবী ও মানবীয় ব্যাপার-সমূহের মধ্যে যোগসূত্র ব্যাখ্যার বৃহৎ চেষ্টা", বিশ্ব-ত্যাগে ঈশ্বরলাভ নয়। তন্ত্রের গর্ভগৃহেই লালিত হয়েছে ঐহিকতার চেতনা, ধর্মীয় দর্শনের পৃষ্ঠায় বস্তুমুখীনতা। আর-একটি ঐতিহাসিক তথ্যও লক্ষণীয়। কেবলমাত্র রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্টই খ্রীষ্টধর্ম নয়; তার তত্ত্বে-নীতিতে-কৃত্যে-উৎসবে প্রাচীনতর ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিবিধ উপকরণ-সাধনপদ্ধতি অনুস্যূত হয়ে আছে, যার বেশির ভাগই 'অর্থোডক্স্' বা 'সরকারী' চার্চ স্বীকার করে না; তবু তারা আছে পারিবারিক-সামাজিক অনুষ্ঠানে। যেমন, প্রাচীন সিরীয় চার্চের বিবাহে মালাবদল ও শুভদৃষ্টি! গোটা মধ্যযুগে ছিল অসংখ্য স্থানিক সম্প্রদায়, যদের নিজস্ব তন্ত্র, সাধনা এমনকি গির্জা-পুরোহিতও ছিল। এদের

অনেকের মধ্যে বিজ্ঞান ও বস্তুবিদ্যার চর্চাও বিদ্যমান ছিল। চার্চের অত্যাচার ও দমননীতির মুখে বেশির ভাগই লুপ্ত হয়ে গেছে, অনেকে আত্মগোপন করেছে, বা নতুন রূপে টিকে গেছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে এদের অবদানও কম নয়। এবং সামাজিক উত্থান-পতনের সঙ্গে খ্রীষ্টান-তন্ত্রের সংকোচন-প্রসারণ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এবং এতাদৃশ পটভূমি না থাকলে ১৭-১৮ শতকের য়োরোপখণ্ড হতে পারত না 'বিজ্ঞান-মহাবিশ্ব'। ইতি হোয়াইটহেড।

চার্চ ও ইতিহাস। খ্রীষ্টীয় ধর্মতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু 'চার্চ'-এর স্থাপনা মধ্যযুগের শুরুতে। তার আগে ছিল 'মঠ', দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত মুক্তোর মতো ছড়িয়ে। সেখানে শ্রুতি-স্মৃতি-সহায়ে ঐহিক-পারত্রিক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত মুখে-মুখে। মঠাধীশ 'ক্যামেন'—যেন আশ্রম-ভারতের 'ব্রাহ্মণ'—তাঁর থেকে রোমান 'পন্টিফ্'। বিবিধ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে-উপসম্প্রদায়ে এই ড্রুইড মঠের অনেক শিক্ষা-উপকথা-সাধন-সংগঠনরীতি গৃহীত হয়েছে, মূল তন্ত্রে হয়েছে আভিজাত্যকরণ। অতঃপর বিবর্তন চার্চের, স্থাপত্য থেকে তত্ত্ব, সর্বক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক আদর্শ পরিগৃহীত হয়েছে; পোপ-শাসিত 'খ্রীষ্টের সাম্রাজ্য' হয়ে দাঁড়িয়েছে এক বিস্ময়কর কীর্তিস্তম্ভ, ত্রয়োদশ শতক যার শীর্ষবিন্দু। তারপর চতুর্দশ থেকে ষোড়শ—'নবজাগরণ' মতান্তরে 'পুনর্জন্ম' মতান্তরে 'উত্তরণ' এক সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন সংস্কৃতিতে, সামন্ত-কৃষি-গ্রামকেন্দ্রিক পরিমণ্ডল থেকে শিল্প-ব্যক্তি-বাস্তববতাকেন্দ্রিক শহর-পরিবেশে, কৃষি-অর্থনীতি থেকে মুদ্রা-নীতি থেকে ধনতন্ত্রে।

এ বিবর্তন সহজে হয়নি। চার্চ কেবলই প্রতিরোধ করেছে। কিন্তু তারই ঘরে-বাইরে ঐহিকতা প্রবেশ করেছে ইতিমধ্যে, ৮ থেকে ১০ এই তিন শতক ধরে। সামন্তসমাজে—রাজপাট যেখানে নৈবেদ্যের সন্দেশ—জমিই সম্পদ, যাজকরাও ভূস্বামী, বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হত। বিশপরা শাসনকার্যেও নিযুক্ত হত, বৈষয়িক ব্যাপার দেখাশোনা করত। আর, সংগঠন চালাতে চার্চকে তো করতে হতই। অর্থাৎ, একই ব্যক্তির দ্বৈত রূপ : যাজক-শাসক, 'ব্যারন-প্রীস্ট্', একই সঙ্গে রাজা বা সামন্তের প্রভু, পোপের অনুগত। নাইটরাও তা-ই ছিল। স্বাভাবিকভাবেই, গির্জার দফ্তরে 'অ-ধার্মিক' ব্যক্তির এবং অঙ্গনে বিষয়-বিষের ছায়া পড়তে ও বাড়তে থাকে। পরবর্তী তিন শতকে এল বাণিজ্যের কোটাল, নগরের পত্তন ও পুনর্গঠন, বড় বড় সড়কে ভিড় বণিক-তীর্থযাত্রী-ধর্মযোদ্ধা-ছাত্র-যজমান-যাজকদের; নগদ মুদ্রার প্রচলন; পরিতৃপ্ত সমৃদ্ধি। (বৌদ্ধ-ভারতের সুবর্ণযুগ যেন)। সামন্ত ও যাজক সংস্কৃতির যুগল রূপাবিভঙ্গ। পোপের মর্যাদা ও ক্ষমতাবৃদ্ধি। রোমান সাম্রাজ্যের আদলে চার্চের পুনঃসংগঠন। এবং 'ইনকুইজিশন'। খ্রীষ্টানতন্ত্রের স্বর্ণযুগ। সেই প্রথম, সেই শেষ।

ইতিহাস বিচলিত হল নানা কার্য-কারণে। তার প্রকাশ ঘটল নানাভাবে। যেমন, একটা প্রশ্ন উঠল : 'পুরোহিত-শাসকের আসল প্রভু কে?' চার্চ জানাল : 'যেহেতু ওরা যাজক, আমরাই প্রভু' এবং 'ঐহিক ব্যাপারেরও উচ্চতম অধিকর্তা।' কিন্তু নগদ মুদ্রার কল্যাণে রাজতন্ত্র তখন অর্থ ও ক্ষমতা সঞ্চয় করতে আরম্ভ করেছে। তুলনায়, জমি-দার চার্চ কমজোর, কেন্দ্রীয় কোন শক্তিও তার নেই। সুতরাং এ-দাবি টিকল না। তবে আছে অগণিত ভক্ত তথা জনশক্তি, সামন্ত-আশ্রয়, বিশ্বজনের সমর্থন, এবং নিজস্ব আইন-কানুন-আদালত, জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়-একাধিপত্য। এবং আছে 'ইনকুইজিশন', অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জেহাদের ধারালো হাতিয়ার। সে-যাত্রা সংকটমোচনে মুশকিল হল না। নতুন শতকের শুরুতেই পোপ সপ্তম বোনিফেসী 'জুবিলী বছর' পালন করলেন, দুনিয়ার তাবৎ মানুষের ওপর পোপের 'স্বাভাবিক অধিকার' দাবি করলেন, এবং 'পবিত্র খ্রীষ্টান 'সাম্রাজ্য'র স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। অবশেষে তৃণের মতো উড়ে গেলেন ঝড়ের মুখে।

ঝড় এসেছে বাইরে থেকে। সেখানে নতুন অর্থনীতি, ফলে নতুন সমাজ-সম্বন্ধ, রাজতন্ত্রের দেহে নব-উপলব্ধ 'জাতীয়তা'র শীলমোহর। ধনতন্ত্রের উত্থান-মুখে সামন্তদের জমি সেই সঙ্গে ক্ষমতা গেল, যাজকদের জমি সেই সঙ্গে গেল জনসংযোগে। বিপর্যাস ঘনিয়েছিল ঘরেও—ধর্মক্ষেত্রে বিষয় বাসনার সহাবস্থানে জমে উঠেছিল দুর্নীতি-নৈরাজ্য-অহং, আইকেনের ভাষায় 'মর্ত্যকে-মানুষকে তুচ্ছ ভাবার মনোভাব', যার প্রমাণ 'সবার ওপরে চার্চ' এই ঘোষিত শিরোনামায়। কিন্তু তাই ব'লে তিল-তিল অর্জিত স্বার্থ-দায়িত্ব-ক্ষমতা সব ছেড়ে দেওয়া যায় না। অতএব সংগঠনকে পুনর্বিন্যস্ত এবং নিজস্ব অর্থনীতি ও ব্যবস্থা চালু করা হল, অফিসার নিয়োগ ও কর আদায়ের ভাগ-বাটোয়ারা হল 'জাতীয় রাজ'-এর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে। ধর্মনীতির সারথি করা হল রাজ-নীতিকে, প্রতিবাদ-বিরোধিতা-আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হল। ফলে, চার্চের ধর্মীয় চরিত্রটাই গ্রস্ত হবার উপক্রম ঘটল, তার পরিচালনায় 'বাইরের লোক'-এর হস্তক্ষেপ বাড়ল, এক-একটা পদের জন্যে শুধু হল টাকার খেলা। ধর্মক্ষেত্র দুর্নৈতিক কুরুক্ষেত্র! তারপর ১৫১৬র বোলোনার সন্ধি : 'একটি মূল কেন্দ্রীয় চার্চ' আর নয়। দেশে-দেশে স্ব-অধীন 'জাতীয় চার্চ', যার উদ্ভব 'জাতীয় রাজতন্ত্র'র প্রেরণায়। অবশ্য পোপের কর্তৃত্ব রইল। কিন্তু তিনি এখন অন্যতম 'ইতালীয় প্রিন্স' মাত্র; তাঁর সহচর-গোষ্ঠীতে রাজপুরুষদের ভিড়; যুদ্ধ, রাজনীতি, এইসবই মুখ্য বিষয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি কমজোর। ওদিকে জার্মানিতে তীব্রতর ধর্ম-আন্দোলন, তারও মোকাবিলায় অক্ষম। রিফর্মেশন। 'হোলি রোমান এম্পায়ার' পর্যবসিত 'চার্চ অফ রোম'-এ।

মধ্যযুগের সামন্তবৃত্তে সমাজে চল্ ছিল রোমান্স্-গীতিকা-গাথার। বিদ্যা ও জ্ঞানের চর্চা করত যাজককুল। আর্টের স্রষ্টা এবং শিক্ষার গুরু ছিল এরাই, ইন্টেলেকচুয়াল পুরোহিতগণ। নতুন যুগের জরুরী প্রয়োজনে শিক্ষার বিস্তার ঘটল, শিল্প-সংস্কৃতির সমাদর বাড়ল, আবির্ভূত হল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। বিদ্যা সরে এল চার্চের কাবু থেকে। বুর্জোয়া নীতির আনুকূল্যে জাগল ব্যক্তিত্ব-মানবতা-স্বাধীনচিন্তা। তার প্রভাব পড়ল খ্রীষ্টানতন্ত্রেও। তার একদিকে এরাসমাসের স্বকীয় বক্তব্য, অন্যদিকে একহার্ট প্রভৃতির মরমীয়া অনুভব। এই আবহাওয়াই ছিল জার্মানিতে; তার সঙ্গে এসে মিলেছিল ইতালীয় মানবতাবোধ; জাগ্রত যুক্তিবাদী-বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, 'এন্-লাইট্‌ন্‌মেন্ট্', চার্চের প্রত্যক্ষ সমালোচনা। এই পটভূমিতে রূপ নিল লুথারের 'প্রোটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশন' : সনাতনী চার্চের প্রশ্নহীন আনুগত্য আর নয়, প্রতিটি খ্রীষ্টান স্বাধীন, স্বজমানই যাজক।

পোপতন্ত্র খর্বতর, 'চার্চ' আধা। তবু টিকে রইল। নতুন পরিস্থিতি ও সমাজশক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে, কোথাও আপোস কোথাও ত্যাগ করে 'কাউন্টার-রিফর্মেশন' মাধ্যমে সনাতনী চার্চ ফিরে গেল স্বস্থানে, অধ্যাত্মবৃত্তে। সে-বৃত্তে মধ্যযুগীয় আর নয়, যেমন নয় নতুন যুগের, কার্গুসনের ভাষায়, 'দুই যুগের এক অস্বস্তিকর আপোসের মধ্যে আটকে পড়া রেনেশাঁস-চার্চ ও রেনেশাঁস-পোপতন্ত্র'। এতাদৃশ আপোসের অনিবার্য ফল : সংঘর্ষ ও সংকট, অবিশ্রামী। তার নিদর্শন : রেনেশাঁসের তিন শতক ও চার্চের ইতিহাস।

উপ-সম্প্রদায়, গুপ্ত-সম্প্রদায়। চার্চতন্ত্রের পরিকল্পনায় 'সর্বজনীনতা'র একটা ভাবনা ছিল। সে ভাবনা বহুধা হয়ে গেল। ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট্-জাতীয় চার্চ অর্থাৎ যতো নেশন ততো চার্চ ইত্যাদি ভাগাভাগিতে। এই চার্চতন্ত্রের বাইরেও খ্রীষ্টানতন্ত্র ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে। তাদের কেউবা প্রাচীন, কেবা নবজাতক; কারও উদ্ভব সন্ত ফ্রান্সিস বা জন কেলভিনের মতো

ব্যক্তিত্বের অনুপ্রেরণায়, কারও-বা উত্থান স্থানীয় ধ্যানধারণাতত্ত্বসাধন আশ্রয় করে। কোথাও-কোথাও ইসলাম-সুফী-বৌদ্ধসাধনার প্রবল প্রভাবও লক্ষণীয়।

গ্নস্টিক, ফ্রান্সিসকান, ডোমিনিকান, ক্যালভিনিস্ট, ম্যান্ডিয়ান, স্কপ্টিক, ক্যাথারিস্ট, ম্যানিকেইয়ান—সংখ্যাগণনার অতীত ছোট-মেজো উপসম্প্রদায়। কেউ প্রকাশ্য, কেউ গুপ্ত। এবং প্রায় সকলেরই তত্ত্বে উপাসনায় আদিম কৃত্য থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগীয় মরমীয়া সাধ্য-সাধন, সন্ধ্যা ভাবা, রহস্যময়তা, চিহ্ন-প্রতীক ইত্যাদি লক্ষ্যগোচর হয়। আবার বস্তুজগতের প্রচ্ছায়াও; যেহেতু এগুলির উদ্ভবের ভিত্তিমূলে বাস্তব কার্য-কারণ নিহিত ছিল। সমাজ-বদলের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল খ্রীষ্টীয় নীতি, তন্ত্র। এক-এক স্থানে-কালে তার এক-এক রূপ ও প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। যেমন একদা খ্রীষ্টানমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য ছিল ১৬৫৮-র লেখা *The Whole Duty of Man*; ১৭৪৪-এ তার নয়া সংস্করণ, *The New whole Duty of Man containing the Faith as well as the Practice of a Christian: Made Easy for the Practice of the Present Age!* ফলত, উঠতি মধ্যবিত্ত সমাজ, নতুন ধনী, তাদের কর্মধারার দাবি : নয়া অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও সাধনমালা। তারই প্রেক্ষিতে নতুন চিন্তা ও দল অথবা পুরাতনের নবরূপায়ণ। যেমন, 'ক্যালভিনিস্ট'রা। আদিতে এরা ছিল অদৃষ্টবাদী, ঈশ্বরকে জানত সর্বনিয়ন্তা, মানুষকে তাঁর খেলার পুতুল হিসেবে। ১৬-১৭ শতকে উত্তর ও পশ্চিম য়োরোপের নগরে-নগরে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের জোয়ার, সেখানে ক্যালভিনিস্টদের ভিড়; এবং এখানে, এখন, তাদের সিদ্ধান্ত : স্বগত প্রয়াসে, সহজ ও সাধনায় ব্যক্তিমাত্রেই ঐশ্বরিক কৃপা ও সান্নিধ লাভ করতে পারে। স্বগত চেষ্টায়, পরিশ্রম ও ব্যবসাদারি মাধ্যমে ব্যক্তিমাত্রই ঐহিক সমৃদ্ধি ও সুখ লাভ করতে পারে—সমাগত ধনতন্ত্রের এই আর্থনীতিক সিদ্ধান্তে সঙ্গে ক্যালভিন-অনুরাগীদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের এতাদৃশ ঘনিষ্ঠতাই ম্যাক্স্ ওয়েবার লক্ষ্য করেছিলেন : স্বর্গসুখ ও মর্ত্যসুখ একই পদ্ধতিতে পাওয়া যায়! এইভাবে, 'ক্যাথারিস্ট'দের মধ্যেও ফ্যানফ্যানি দেখেছেন ধনতন্ত্রের চরণচিহ্ন, তার সঙ্গে মিলে আছে মধ্যযুগীন ভাবধারাও।

যে-'অ্যাজেপী'-কে খ্রীষ্টীয় চার্চতন্ত্র সমাহিত ঈশ্বর-উপাসনার রূপ দিয়েছে, একদা তা ছিল গ্রেকো-রোমান প্রেম ও প্যাশন উৎসব, যার প্রকাশ-মাধ্যম : সার্মন্টিক নৃত্য। আসলে, এটি প্রাচীনতর কৃত্য-প্রথা। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল (গ্)নস্টিকদের অনেক শাখায় ঈশ্বর-উপলব্ধির উপায় হিসেবে, এবং আরও অনেক উপসম্প্রদায়ে : 'ইউক্যারিস্ট, গ্রেমোলান্তি, গিরলিনজাইটিস, কামিসার্ড, প্রাচীন ব্যাপটিস্ট্, কোয়েকার' প্রভৃতি। কোয়েকারদের এক শাখা 'লেকিং কোয়েকার' বা 'লেকার'। সুপ্রাচীন কোন-এক 'হিউগোনট' উপদল থেকে এদের কৃত্য ও তত্ত্ব আহৃত বলে মনে হয়। এদের বিশ্বাস : সাম্প্রদায়িক গুরু (নেতা বা নেত্রী, ফাদার বা মাদার) যিনি, তাঁর মধ্যে খ্রীষ্ট পুনরাবির্ভূত গোটা বিশ্বকে মুক্তিদানের জন্যে। বিবাহকে অস্বীকৃতি জানিয়ে, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে, এক বিশিষ্ট সাধনরীতির মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি ও ঈশ্বর-প্রেম-প্রাপ্তি এদের একমেব লক্ষ্য। এবং মুখ্য সাধন : নৃত্য—সমবেত, কিন্তু কোরাসে নয়, যে যার নিজের মতো ভঙ্গিতে ও ইঙ্গিতে। অনিবার্য প্রতিক্রিয়া : কম্প-স্বেদ-রোমাঞ্চ-অশ্রু-হাস্য-পুলকোদ্গম-বেপথু-পতন-মূর্ছা, ইত্যাদি। পরবর্তীকালে, অবশ্য সাধ্যসাধন নিয়মবদ্ধ হয়, এবং নাচও হয় সংগতি-পন্ন। ততদিনে লেকাররা আমেরিকার প্রবাসী থেকে নিবাসী।

খ্রীষ্টানদের চেয়েও প্রবীণ 'গ্নস্টিক'দের খ্যাতি ছিল 'জ্ঞানী' বলে। এরা বিশ্বাস করত : এই বিশ্বের মূলে যে 'পরম শক্তি', তাকে করতলগত করা যায় গ্নসিস্ বা জ্ঞানের মাধ্যমে, নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আবার, এই জ্ঞান বা শক্তি অর্জনের জন্যে ব্যবস্থা ছিল কৃত্যের : জাদু-

ভর্‌নোয়া-আবিষ্ট হওয়া, যৌন ক্রিয়া ইত্যাদি। গ্‌নেসটিকদের অনেক শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ছিল নানা দিকে, কে-যে কোন্‌টো করত, সঠিক জানা যায় না। কবচের ওপর বিধৃত এদের মূল প্রতীকটি অভিনব : মাঝখানে বর্গ-অধিপতি 'অ্যাব্‌র্যাক্‌সাস' নামে মূর্তি (মানব), দেহে রোমান সৈন্যের বর্মনির্মম (সংগ্রাম), ডান হাতে কুঠার ও দণ্ড (শক্তি), বাঁ হাতে ঢাল (নিরাপত্তা, প্রজ্ঞা), মোরগমুখো (বুদ্ধি, আলো), পা তো নয়, জোড়াসাপ (অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি), এ ছাড়া কোন কোনটিতে রথ-বল্গ-চার ঘোড়াও আছে। মিস্‌টিক-সুফী-দরবেশ-মরমীয়ারা প্রেমযোগী; পরিস্রুত-পরিশুদ্ধ হৃদয়ে পূর্বরাগ, অভিসার-বিবাহাদি স্তর পেরিয়ে ঈশ্বরের বা ঈশ্বরীর সঙ্গে মহান ভাবসম্মিলন এদের সাধ্যসাধনতত্ত্ব। সেই সঙ্গে অনেকে কৃত্যেরও অনুষ্ঠান করত। বিভিন্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে-থাকা মরমীয়া ভাবগুলি পরস্পরকে স্পর্শও করেছিল। য়োরোপের একাধিক সম্প্রদায়ে দেখা গেছে : দীক্ষা ভারতীয় রীতিতে, শিক্ষানবীশি মিশরীয় পদ্ধতিতে, সাধনা পারসিক প্রথায়, আস্বাদনে গ্রীক-'অর্‌ফিক' বা 'ব্যাক্‌কাল'। চার্চনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যেও, সম্ভবত ৭ম শতক থেকে, মরমীয়াবাদ প্রবেশ করে। সন্ত অগাস্তিনের মতে, "এতে রহস্যময়তা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে"। সন্ত বার্‌নার্ড বিরোধিতা করেছেন আবার প্রশংসাও করেছেন এদের সাধুতার, আন্তরিকতার। আজও 'গ্রীক অর্থোডক্‌স্‌ চার্চ'-এর অনুষ্ঠানে এই 'গোঁড়া মিস্‌টিক'দের ভাব-ভাবনা-কৃত্য জড়িয়ে মিশিয়ে আছে।

আদিম কৃষিসমাজে (শিকারের বা চাষের বা লড়াইয়ের অনুকরণে) বিবিধ কৃত্যানুষ্ঠান আয়োজিত হত, খোলা আকাশের নিচে, জীবনসংগ্রামের প্রয়োজনে। কালপ্রবাহে, ওই কৃত্যানুষ্ঠানই রূপবদল করতে-করতে ধ্রুপদী ও মধ্যযুগে এসে পরিণত হল ধর্মসাধনায়। (তাবৎ ট্রাডিশনাল আর্টেরও জন্মভূমি : কৃত্য)। তার একটা ধারা পরিশোধিত-পরিমার্জিত হতে-হতে পৌঁছল প্রকাশ্য শাস্ত্রীয় মার্গে, অন্য ধারাটি অপরিশোধিত-অমার্জিত অথবা অর্ধ-শোধিত অবস্থায় উপনীত হল এমন এক সাধন-চক্রে, যা অদীক্ষিতদের কাছ থেকে গোপন রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তার অনেক কারণ ছিল; একটির কথা বলা যাক—আদিম কৃত্যে সমবেত যৌন ক্রিয়া বিধেয় ছিল, শস্য-জন্মের জাদুকৃত্য হিসেবে; চক্রসাধনায়ও সামষ্টিক যৌন ক্রিয়া বিহিত, ভিন্নতর অর্থে; এবং যেহেতু জীবনের সঙ্গে এর আর যোগ নেই, সমাজের নেই সমর্থন, তাই এ-সাধনা গুপ্তভাবেই করণীয়। তাই প্রতীক-রূপক-সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার এইসব মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়ের সাধনায় ও সাহিত্যে সর্ব-জনীন। যেমন স্পেনের 'ইলিউমিনাত্তি', আফগানিস্তানের 'রোশনীয়া' সম্প্রদায়ের পশ্চিমী মডেল। এই নবাগতদের লক্ষ্য : জাদুর মাধ্যমে ক্রমে ক্ষমতা অর্জন, 'মুরাদ' (শিষ্য) থেকে 'মালিক' হওয়া। মানব-কঙ্কালের বেদীর সামনে দীক্ষা ও উপাসনার রীতিপদ্ধতি ছিল বিচিত্র। মার্টিন লুথার ছিলেন গোলাপ-ক্রস পতাকালাঞ্ছন; সুফী জিলানীও গোলাপকে ভাবতেন আলোর প্রতীক; উভয়ের যোগফল 'রোয়-ক্রস ব্রাদারহুড'। এরা ম্যাজিকের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছিল মেডিসিনকে—দাতব্য চিকিৎসা করত, বীক্ষণাগারে রীতিমতো পরীক্ষাও করত; আবার, ভূত-নামানো, সোনা-বানানো এসবও চলত; আসল উদ্দেশ্য ছিল রসায়নশাস্ত্রের সাহায্যে অলৌকিক শক্তি লাভ।

বাইরে ধর্মীয় সংলাপ, আসলে সামরিক শক্তিসঞ্চয় ছিল 'অ্যাসাসীন'দের লক্ষ্য। একাদশ-দ্বাদশ শতকে মধ্যপ্রাচ্যে এরা ভীতির সঞ্চার করেছিল। এদের দেখাদেখি য়োরোপেও গড়া হল 'হস্‌পিট্যালার' ও 'নাইট টেম্পলার' জেরুসালেমের তীর্থযাত্রীদের দেখাশোনা এবং ক্রুসেডে অংশ-গ্রহণ ছিল আদি প্রতিজ্ঞা। গির্জাসেনা 'নাইট টেম্পলার' সংগৃহীত হত নাইট-পরিবারের তরুণ অবিবাহিত নবযুবাদের মধ্যে থেকে; দীক্ষা দলীয় গির্জায়; দুঃখবরণ ও আনুগত্যের কঠিন পরীক্ষান্তে দেওয়া হত ঢাল-তলোয়ার-বর্শা-ঘোড়া এবং অন্যচের। আরাধ্য দেবী মেরী; মন্ত্র 'ইয়াল্লাহ্‌' (অ্যাসাসীনদের 'ইয়া আল্লাহ্‌'র অনুকরণে); সততা-দারিদ্র্য-সংগ্রাম জীবনের সাথী।

দান্তেও এদের এক শাখার সদস্য ছিলেন। ক্রমে এল যশ, অর্থ, তৎসহ লোভ, দম্ভ। নিরঙ্কুশ জমিদারি-আইন-গির্জা-পুরোহিত। ক্রমশ, বিলাস-ব্যসন-অপরাধ। এবং হস্‌পিট্যালারদের সঙ্গে সংঘাত। রাজা ভীত, পোপ ত্রস্ত। হাত মেলালেন। দুশো বছর পূর্ণ হবার পাঁচ বছর আগেই সাধু যোদ্ধার দল দেউলিয়া হয়ে গেল।

শুধু সামরিক দল নয়, সনাতন চর্চার বিরুদ্ধে যে বা যারাই গেছে, তাদের কঠোরভাবে দমন করা হয়েছে 'অবিশ্বাসী, নারকী' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে। পদ্ধতি ছিল বিবিধ, বিচিত্র, ভয়ংকর : খুন জখম লুঠ বলাৎকার গুম জলে চোবানো আগুনে পোড়ানো শূলে চড়ানো দড়িতে ঝোলানো পিষে মারা যৌনাঙ্গ বিকৃত করা চোখ কান দাঁত হাত পা ছিঁড়ে নেওয়া ছ্যাঁকা দেওয়া বরফ ঘষা চামড়া ছাড়ানো র‍্যাগিং র‍্যাকিং ব্যারাকিং 'উইচহান্ট' তথা ডাকিনী বা প্রেতসিদ্ধ ছাপ দিয়ে মেরে ফেলা আর 'ইনকুইজিশন' তথা ধর্ম-ট্রাইব্যুনাল তথা বিচারের প্রহসনে বিরোধী পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা, তারপর যন্ত্রণা দিয়ে মারা 'ভল্‌ট্‌' বা 'টর্‌চার চেম্‌বার'-এ ; সেখানে মেয়েদেরও পাঠানো হত যথা-বিহিত উপভোগ-অন্তে, সাদ্‌-এর উপন্যাসে যার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গুন্ডার দলও পোষা হত। যেমন স্পেনের 'গার্ডুনা', জার্মানির 'ভেহম্‌'। এরা গ্রামে-গ্রামে ট্রাইব্যুনাল বসাত; চুরি-ডাকাতি-জালিয়াতি এসবেও আপত্তি ছিল না। চেম্‌বারে থাকত 'ভার্জিন মেরী'—ব্রোঞ্জের ফাঁপা মূর্তি, ভেতরে তীক্ষ্ণাগ্র ছুরি, শিক থরে-থরে, তথাকথিত অপরাধীকে তার মধ্যে পুরে দেওয়া হত, খুলে যেত নিচের দরজা, ক্ষতবিক্ষত হতভাগ্য পড়ত তলার ভল্‌টএ, ঘূর্ণ্যমান এবং ধারালো ব্লেডওয়ালা কাঠের সিলিন্ডারে, তার নিচে আর-একটা, তার নিচে আর-একটা, একেবারে নিচে জলস্রোত, টুকরো-টুকরো দেহটা ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত! কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেসব দলও। সে কাল আর নেই। 'কাল্‌ট্‌' এখনও বেঁচে আছে শহরের আনাচে-কানাচে, অভিজাত ক্লাবে, গোপন সমিতিতে, হিংস্র যুদ্ধবাজদের মধ্যে। তাই গার্ডুনাদের দেখা গিয়েছিল ফ্রাংকোর সেনাবাহিনীতে, ভেহমদের নাৎসী নেকড়ের পালে। তাদের বংশে বাতি দেবার লোক এখনও কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই আছে।

শ্রেণীচেতনার মুখোমুখি। রেনেশাঁস। নতুন মানুষ। কিন্তু নতুন চার্চের দেখা নেই! চার্চতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের সংলগ্ন; গ্রামীণ কৃষি-পরিবেশে, যেখানে জীবন অলস, মন্থর, ছকে বাঁধা, স্থাবর জনগণ, ঘনিষ্ঠ সমাজসম্বন্ধ, অবকাশের আকাশ, সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ, রবিবাসরীয় প্রার্থনা ইত্যাদি সুন্দর মানিয়ে যায়। কিন্তু এখানে, শহরে, এই মুহূর্তে কাঁচা জীবন তীব্র গতিশীল এলোমেলো বিপর্যস্ত অনিশ্চিত সংগ্রামমুখর পরিবার-বিচ্ছিন্ন ভিটেচ্যুত, এখানে আকাশ দেখার অবকাশ নেই, কুটুম্বিতে পাতানোর মেজাজ নেই, নির্দিষ্ট সময়ে আড্ডার জমায়েত নেই, এখানে সবাই ছুটন্ত পাগলা ঘোড়া, জোট বাঁধে অন্য রীতিতে, অন্য মানসিকতায়, তার নাম 'কমরেডশিপ', তার নাম 'য়ুনিয়ন', তার নাম 'শ্রেণীচেতনা'। (অবশ্য, পর-কালে শহরের বুকে ক্রমিক স্থিতি এসেছে, ঈষৎ অবসর মিলেছে, চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে, মাথা তুলেছে গির্জা, কোনটার দেহে পুরনো ছাঁচ কোনটার নতুন ছাঁদ; তথাপি সেই আগেকার মতো 'জনসংযোগ' আর অসম্ভব প্রস্তাব। তে হি নো দিবসা গতাঃ!)

শান্ত নিবিষ্ট চিত্ত, নিরুদ্বিগ্ন আশা, নিশ্চিন্ত আত্মনিবেদন—চার্চের চাহিদা; শহরে এদেরই একান্ত অভাব। তাই কারখানা আর রেলপথের উপযোগী নব-রূপক হতে পারল না খ্রীষ্টানতন্ত্র, নিপীড়িত সংগ্রামী জনগণের সামনে কোন বলিষ্ঠ নীতি, বাস্তব কর্মসূচী রাখতে পারল না, গ্রহণ করতে পারল না নবযুগকে। ব্যক্তিগতভাবে কোন-কোন ধর্মশাস্ত্রী এগিয়ে এসেছিলেন, হাতে সেই পুরনো ট্রাডিশন। অর্থাৎ তৎকালীন শহরে শ্রমিকশ্রেণী যখন আবির্ভূত হচ্ছে, সনাতনী চার্চ রক্তে

অনুপস্থিত। সেখানে নায়-ভূমিকায় সোশ্যালিস্টরা মানুষের অনন্ত সম্ভাবনা, শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী ভূমিকা, নতুন জীবনের স্বপ্নকথা শুনিয়ে চলেছে। ধর্মকে না ছুঁয়ে রাজনীতির যাত্রা শুরু।

অবশ্য, ইংল্যান্ডের সোশ্যালিস্টরা প্রথম-প্রথম খ্রীষ্টীয় ভাষাতেই কথা বলত। কিন্তু ফ্রান্সে—বিপ্লব যেখানে ঐতিহ্য—ক্যাথলিক নেতৃত্ব, সম্ভবত সামন্ত মেজাজেই, 'ল' অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড প্রপার্টি'র তথা দক্ষিণ পন্থার পক্ষে। প্রতিক্রিয়ায়, গণ-মেজাজ শাস্ত্রী-বিরোধী। শাস্ত্রীরাও তখন অধিকাংশ অশিক্ষিত, নব্য বুদ্ধিজীবীদের মোকাবিলা করার সামর্থ্য তাদের নেই। তাদের বাণীই এখন শিরোধার্য, যারা বলে, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো সে এইখানে এইখানে, এবং তা ইহজীবনেই প্রাপ্য। ফরাসী শ্রমিকশ্রেণী ধর্মক্ষেত্রের বাইরে এসে দাঁড়াল, 'ডি-ক্রিশ্চিয়ানিজেশন'-এর চেতনাকে ছড়িয়ে দিল দেশে-দেশে। চেষ্টা করেও চার্চ মুছে দিতে পারল না। অবশেষে, ১৮৭৮ সালে সেও—পোপ ত্রয়োদশ লিওর ঘোষণা মারফত—ডাক দিল সমাজ ও জনকল্যাণের, তাকে সক্রিয় করতে এগিয়ে এল সোশ্যাল ক্যাথলিকরা; তৈরি হল তত্ত্ব ও ব্যবহারবিধি। দুটো চরমের মধ্যপথ। কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সমবয়সী চার্টিস্ট আন্দোলনের গর্ভ থেকে উঠে এল 'খ্রীষ্টীয় সমাজবাদ'। সবান্ধব ডেনসন মরিস চার্চের বুকে দাঁড়িয়েই তার বুর্জোয়াঘেঁষা নীতির প্রতিবাদ করলেন, প্রোগ্রাম রচনা করলেন। দেয়ালে পোস্টার পড়ল "addressed to workmen of England..(signed) a working person"। লাড্লোর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকা 'ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যালিস্ট'। লেখা হল: "যীশু স্বয়ং দরিদ্র ছিলেন, গরিবদের জন্যেই প্রাণ দিয়েছেন, ঈশ্বরই তোমাদের স্বাধীনতা দেবেন। খ্রীষ্টানতন্ত্র সমষ্টির উন্নতির কথাই বলে, একের শ্রীবৃদ্ধি নয়। খ্রীষ্টতত্ত্ব-বিচ্ছিন্ন সমাজবাদ পাখি বাদ দিয়ে তার খাঁচাপালক মাত্র।" ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল য়ুনিয়নের সভাপতি ওয়েস্টকট বই লিখলেন খ্রীষ্টানতন্ত্রের সামাজিক আদর্শ ও তার ব্যবহারপদ্ধতি। খ্রীষ্টীয় বিধিবিধানকে সামনে রেখে তার নীতি ও সত্যকে প্রয়োগ করতে হবে বাস্তব সমস্যার সমাধানে, 'অন্যায়ের শাস্তা, ন্যায় ও প্রেমের প্রতীক' যীশুকে জীবন্ত করে তুলতে হবে—এই উদ্দেশ্য নিয়ে খ্রীষ্টীয় সমাজসেবীরা নেমে এল জনতার মধ্যে, সমস্যার পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণ-প্রতিকারে; কোন আর্থনীতিক মতবাদ নিয়ে নয়, নৈতিক শুদ্ধির ডাক দিয়ে। ১৮৯১ সালে পোপ লিও চার্চীয় রাজনৈতিক ভাবনার ব্যাখ্যা দিলেন, জনগণের প্রতি সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নিপীড়িত মানুষের 'সামাজিক মুক্তি'র কথা বললেন; বললেন 'আত্মার স্বাধীনতা' নাগরিকতা-নৈতিকতা-ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে; বললেন, সামাজিক ব্যাধি দূর হবে হৃদয়ের পরিবর্তনে, 'যীশু খ্রীষ্ট ও চার্চের কাছে প্রত্যাবর্তনে'। রাজনীতি-অর্থনীতি প্রসঙ্গে এটিই খ্রীষ্টানতান্ত্রিক ম্যানিফেস্টো। তদনুসারে, দেশে-দেশে সমাজসচেতন খ্রীষ্টানগণ এবং দলগুলি আজও সক্রিয়। ইতিমধ্যে মার্কসবাদী ভাবনাও প্রসারিত সুদূরে, গভীরে।

•

ধর্ম এবং বিজ্ঞান ও দর্শন। মধ্যযুগ ধর্মের অধিকারে। শিক্ষা-দীক্ষা শাস্ত্রীর অধিকারে। সৃষ্টিতত্ত্ব-বিশ্বতত্ত্ব-মুক্তিতত্ত্ব শাস্ত্রের অধিকারে। যে-মুহূর্তে বিজ্ঞান বিপরীত ভাষ্য দিতে লাগল, ধর্মের সঙ্গে বাধল লড়াই। ফল: গ্যালিলিওদের বলি, ব্রুনোদের নির্বাসন, বিজ্ঞানচর্চা অব-দমিত। তবু কোপার্নিকাস-গ্যালিলিও-নিউটনের জ্যোতির্বিদ্যা-বলবিদ্যা-মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সত্যতাকে ঠেকানো গেল না। টলে উঠল অনড় বিশ্বাস। নিয়মে আবদ্ধ বিশ্ব-প্রকৃতি, পৃথিবী একটি মেশিন, সবই অঙ্কে বিধৃত ও ব্যক্ত করা যায়—এই জ্ঞান থেকে এল তথ্যের চেতনা, পরীক্ষার মনোভাব, সত্য-সন্ধিৎসা, আত্মবিশ্বাস; সন্দেহ জাগল অলৌকিকতায়, বাইবেল-কথিত সমাচারে, তস্য তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়। সেই সঙ্গে আঘাত ও ভয়ও পেল মানুষ—তার বিশ্বকেন্দ্রিকতার ভাবনা, আত্মার অমরতার কল্পনা, স্বাধীন ইচ্ছার অহংতো, সবই যে বিনষ্টির মুখে। তদুপরি দুর্মর সংস্কার। সেকারণে নিউটনসমেত

সেকালীন বিজ্ঞানীরা 'ধার্মিক' ছিলেন, মানতেন "ঈশ্বরই আদি কারণ, মূল যন্ত্রী, এই বিশ্বযন্ত্র সৃষ্টি-অন্তে সরে আছেন, প্রয়োজন হলে এগিয়ে এসে তার সংশোধনও করবেন।" অতএব বিজ্ঞানে-ধর্মে মিশে গেল; "বস্তুত, ঈশ্বরেরই মহিমা বিজ্ঞান প্রচার করছে, তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপনের পথ খুলে দিচ্ছে।" কিন্তু অসম মিলন ক্ষণস্থায়ী, বিচ্ছেদ ঘটল পরের শতকে, ক্লাসিক্যাল সায়েন্স হয়ে উঠল নিরীশ্বর বিজ্ঞান-চেতনা, গৃহীত হল 'নিউটনের ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নিউটনের পদার্থ-বিদ্যা'। ধর্মতন্ত্রের সওয়াল-জবাব মনে ধরল না, নতুন করে প্রশ্ন জাগল, কান্টের ভাষায় : জ্ঞান কী, কর্ম কী, কিসের অন্বেষণ? ভলতেয়রের নৈরাশ্য : তাকে আক্রমণ করে মূল্যের সংস্কারবদ্ধ ধারণাকে আঁকড়ে ধরা, কোন দর্শনেই আত্মসমর্পণ করতে না পেরে যন্ত্রণাকাতর দিদেরো প্রেমিকাকে লিখলেন : "আমি এমন এক বিভ্রান্ত দর্শনে জড়িয়ে পড়েছি যাকে আমার মন চায় কিন্তু হৃদয় দেয় খারিজ করে!"

দর্শনে ভাববাদ ও বস্তুবাদ যেমন, তেমনি নব্য নীতিশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র রচনার চেষ্টা ধর্মের বাইরে এবং ভেতরেও, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট, উভয় চার্চেই। তার অন্যতম ফসল 'এনলাইটেনমেন্ট'। 'বুদ্ধির সার্বিক প্রাধান্য' এই মটো নিয়ে গড়ে উঠল 'র‍্যাশনালিস্ট প্রেস অ্যাসোসিয়েশন'। হাক্সলে গড়লেন নতুন শব্দ ('গ্নস্টিক' থেকে) 'অ্যাগ্নস্টিক' বা 'অজ্ঞেয়বাদ'। শেষে, উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের বুদ্ধিজীবী পরিবারগুলির অবদান 'ভিক্টোরীয় মানবতা'। পর-শতক তার উত্তরাধিকারী।

প্রাণের রহস্যটা ঠিকই ধরেছিলেন চেম্বার্স। তবু তাঁর 'ভেস্টিজেস অফ ক্রিয়েশন'-এর আত্মীয়তা যাঁর সঙ্গে, তিনি নিউটন, যাঁর 'যান্ত্রিক বিশ্বে'র 'গতি' আছে, 'বিবর্তন' নেই। ডারউইনের বিবর্তন-বাদ একদিকে নিউটনীয় 'অপরিবর্তনীয় বিশ্ব'র, অন্যদিকে খৃষ্টানতন্ত্রের সৃষ্টি-পালার বিরুদ্ধে বিরাট চ্যালেঞ্জ। হাক্সলে এবং উইলবারফোর্সের প্রাসঙ্গিক বিতর্ক ইতিহাস হয়ে আছে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের টান, আঘাত সত্ত্বেও, সত্বর ও সহজে কাটিয়ে ওঠা গিয়েছিল; ডারউইন এসে নাড়া দিলেন মূলে ধরে—ঈশ্বরের হাতেগড়া মানুষ নেহাতই প্রাণিবাচক বিশেষ্য! প্রকৃতির মধ্যমণি মানুষের যে অনন্য স্থানটি ছিল, ধ্বসে পড়ল, অস্থির হয়ে উঠল 'স্ব-অধীন' মানুষ। টেনিসনের ভয়, ব্রাউনিংয়ের বিরক্তি, আরনল্ডের বিষাদ, সুইনবার্নের মৃগীরোগ, হার্ডির হতাশা, জর্জ এলিঅটের ঔদাসীন্য, এবং হিতবাদী মিলের ব্যাখ্যা : 'বিশ্লেষণ নির্ধন করছে অনুভূতিকে'। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞান মানুষকে তার কাল্পনিক সিংহাসন থেকে সরিয়ে বসিয়ে দিয়েছে বাস্তব মসনদে, তার সত্য স্থানটিতে, আরও বড়, আরও অসাধারণ ক্ষমতায়, মর্যাদায়, অমেয় মহিমায়। কিন্তু সে তো পরের কথা। এই মুহূর্তে যে 'মহৎ' বিপদ, তা থেকে বাঁচাল পিউরিটানিজমজাত 'মানবতা' (এভাঞ্জেলিস্ট, পজিটিভিস্ট, অক্সফোর্ড আন্দোলনের ভূমিকাও স্মরণীয়) : কোন মতবাদ না, তত্ত্ব না, সিদ্ধান্ত না, শুধু মানবতাবোধ, মানব-অবস্থার স্বীকৃতি ও পর্যবেক্ষণ, (ভিক্টোরীয় নভেল-ধৃত) সততা-সত্য-বাদিতা-সংযম-পরিশ্রম, ক্লিংগোপিউলসের ভাষায় "love, loyalties, duties, respect for intelligence and feelings who are no less relevant to religion than to art and science" (*From Dickens to Hardy*)। সেই মানসিকতা, যখন কিশোরী বিয়েট্রিস ওয়েব নিষিদ্ধ গ্রন্থ পড়তে চাইলে পিতা জবাব দেন 'Buy it, my dear' (*My Apprenticeship*)।

উনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি, নব নব আবিষ্কার, নতুনতর তত্ত্ব চিন্তাজগৎকে আলোড়িত করল; চিত্ত সুখী হল ভেবে যে জীবন বদ্ধ জলাভূমি নয়, তার গতি আছে, জগতের উদ্দেশ্য আছে। অবশ্য বিবর্তনের ভাবনাটা একেবারে নতুন নয়, কোন-না-কোন আকারে ছিল আদিম মৃত্যু-পুনর্জন্মতত্ত্বে, ধর্মশাস্ত্রধৃত তার পরিমার্জিত-পরিবর্ধিত রূপান্তরে, আদিসন্তগণের বিজ্ঞান-মনস্কতায় ও কাব্যশাস্ত্রে, জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যায়, গেটে-শেলী-কোঁৎ-হেগেল প্রভৃতির সাহিত্যে

ও দর্শনে। এক-এক ক্ষেত্রে এক-এক নাম ও রূপ, মূল কাঠামো প্রায়-অভিন্ন। অন্যপক্ষে, সংস্কার-আচ্ছন্ন মানুষ ঈশ্বর-বিরহে স্থির হতে পারে না, তাকে নানা নতুন নামে ডাকে, সন্ধান করে, বিশ্বাস করে তিনি এই বিজ্ঞান-বিশ্বের পেছনে কোথাও-না-কোথাও আছেন, হয়তো 'গাণিতিক ঈশ্বর' হয়েই। প্রস্তুত হল বিবর্তময় আধ্যাত্মিকতা : অরূপ থেকে রূপে, অমিল থেকে মিলে, জীবন্ত থেকে ঈশ্বরত্বে। বিবর্তনবাদ হল ঈশ্বরপ্রেরিত নতুন বিশ্বাস। রাউল্যান্ড সিম্‌স্ লিখলেন : 'Some call it evolution, some call it God'.

মেলালেন তিনি বিজ্ঞান ও ধর্মকে। চার্চ ঘোষণা করল : 'এই পৃথিবী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন মানুষের বাসের জন্যে। বস্তু ও বাস্তব তাই ভালো, এবং বিজ্ঞানের চর্চা উচিত ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ, এতদ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হচ্ছে। তাই চার্চ বিজ্ঞানের অনুশীলনে যথোচিত উৎসাহ দিচ্ছে। এর আবিষ্কারের সঙ্গে শাস্ত্রীয় সত্যের কোন সংঘাত নেই; যেহেতু একটি জাগতিক, অন্যটি অলৌকিক ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত। যদি কখনও সংঘাত বাধে, বুঝতে হবে, কোথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে—হয় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের, নয় খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের অনুধাবনে অথবা উভয়ের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে, এবং অপেক্ষা করতে হবে ত্রুটি-সংশোধন মাধ্যমে সমাধানের জন্যে। ধর্ম-বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান অসৎ-এর উৎস; চতুর্দিকের এইসব বিপর্যয় যুদ্ধ ক্রোধ উদ্বেগ তারই অবদান। ধর্মশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ঈশ্বরের সৃষ্টিবিষয়ক জ্ঞানকেই উজ্জ্বলতর করে, তাঁর ইচ্ছা লীলা মহিমাকে প্রকটিত করে। ঈশ্বরে বিজ্ঞানকে এবং আত্মাকে নিবেদন করাই মুক্তির একমেব পন্থা।'

কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম বছর থেকেই আধুনিক বা নব্য বিজ্ঞান, প্লাংক-আইনস্টান প্রভৃতির নেতৃত্বে, আবিষ্কারকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেল, ক্লাসিক্যাল সায়েন্স, যান্ত্রিক-তত্ত্বের একাধিপত্য ভেঙে তার ওপর সংশোধনীর পর সংশোধনী চাপাতে লাগল, যেভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত মার্কসবাদ ব্যবহারিক রূপ নিতে লাগল, চার্চের দিকে পিঠ রেখে নব্য দর্শন (এবং যাবতীয় বিদ্যা-জ্ঞান-শিল্পাদি) যেভাবে বস্তুতে-বিশ্বে-মানবে একাগ্র হয়ে উঠল, তার সঙ্গে খ্রীষ্টানতন্ত্র (বস্তুত, কোন ধর্মতন্ত্রই) আর তাল রাখতে পারল না, পরিপাটি মেলবন্ধন ছিঁড়ে গেল একে-একে। ফোটোন, আপেক্ষিকতা, অণু-পরমাণু ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি ও ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষণ-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে উঠে এল চমকপ্রদ সব সিদ্ধান্ত এবং নতুনতর জীবনদর্শন, উড়ে চলল রকেট মহাবিশ্বে, সৃষ্টি নিয়ে মানুষের অনায়াস লীলা। এইবার, এতোদিন পরে, এল সেই অনিবার্য ও ভয়ংকর মুহূর্ত দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নেবার—অদৃষ্টবাদ না স্বাধীনতাবাদ? নাস্তিক ঈশ্বরে বিশ্বাস অথবা আস্তিক জীবনে আস্থা? ডিটারমিনিজ্‌ম্ না ফ্রী উইল?

দীর্ঘদিন মানুষ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তোলপাড় করেছে সত্যের সন্ধানে। ব্রত-কৃত্যের পথ দিয়ে ধর্মতন্ত্র তাকে টেনে নিয়ে গেছে, মানুষ চোখ বুজে আত্মদান করেছে; পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে বিজ্ঞান তাকে ঠেলে দিচ্ছে, মানুষ চোখ খুলে আত্মসমর্পণে উদ্যত। কিন্তু কোন্ মানুষ?

দিন-বদলের পালা যখন আসে, সবকিছু বদলে যায়, মানুষও; সব মানুষ না, রাতারাতি না, সমতালে-সমস্তরেও বদলায় না; সংখ্যাগত ও গুণগত, দুদিক থেকেই ফারাক থেকে যায়। কেউ যায় এগিয়ে, সর্বসংস্কারমুক্ত; কেউ থাকে পিছিয়ে, অতীতের বোঝা কাঁধে। অস্যার্থ : আধুনিক মানব-মনে অনাধুনিক চেতনা-সংস্কার প্রবলভাবে খেলা করতে পারে, এবং বিবিধ প্রকারে খেলা করেও। তাই যখন বাহির-জগতে ফ্রী উইল বনাম ডিটারমিনিজ্‌ম্-এর ফৌজদারি মামলা খতম হয়ে গেছে, রায় বেরিয়ে গেছে, অন্তর-জগতে এখনও তার সওয়াল-জবাব এক্‌জিবিট-এফিডেভিটের পালা চলছে।

সুতরাং চার্চ-সংস্কৃতির মৃত্যুসংবাদ ঘোষণার নির্ধারিত সময় এখনও আসেনি। তবে,

নিঃসন্দেহে সে ভেঙে পড়ছে। এবং সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার আগে এ-তথ্য স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতার স্বাধীনতা, সাম্যের বোধ চার্চ-সংস্কৃতির অন্তঃপুরে—সে চাক বা না চাক, স্বরূপে বা পরস্বরূপে—জীবন্ত ও সক্রিয় ছিল। এবং তা ছিল বলেই মানুষের ইতিহাসে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার আবির্ভাব এক তুলনারহিত ঘটনা।

দুই ট্রাডিশন। স্কান্দিনেভিয়ার 'সমুদ্রপাখি' ভাইকিংরা একদা দুর্ধর্ষ 'প্যাগান' ছিল। সেই লড়াকু ধর্মমতের দেহে-মনে ক্রমে নানা দলীয় তত্ত্ব ও সাধন আরোপিত হতে থাকে। যখন খৃষ্টানধর্ম পরিগৃহীত হল, যীশু খৃষ্ট রূপান্তরিত হলেন 'যুদ্ধদেবতায়', তাঁর দেহে ভয়ংকর লড়াইয়ের সাজ। ধর্ম-সংস্কৃতিগুলির সংঘাত-সমন্বয় এইভাবেই ঘটে। প্রায়ই দেখা যায়—বড় ধর্ম ছোট ধর্মকে গ্রাস করে ফেলে, তারপর কনিষ্ঠ একদিন জ্যেষ্ঠের সর্বাঙ্গ ফুঁড়ে বেরোতে থাকে। স্বভাবতই একপক্ষ দমন করে, অন্যপক্ষ আত্মগোপন করে, আবার আত্মপ্রকাশ করে, অন্যরূপে। কতদিনে, কীভাবে করবে, সবই নির্ভর করে স্থান-কাল পাত্র-পাত্রীর ওপর। এইভাবে সংস্কৃতি জটিলতর হয়ে ওঠে। খৃষ্টানতন্ত্রে, খৃষ্টান সংস্কৃতিতেও এই টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়।

শব্দ দুটো পরস্পর-বিপ্রতীপ, অর্থে (এবং অক্ষর-বিন্যাসেও) : ROMA এবং AMOR—ধর্মতন্ত্র এবং প্রেমতন্ত্র। এইরকমই বৈপরীত্য নিয়ে গঠিত AGAPE এবং EROS—দুই-ই ভালবাসা; একটি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট, অন্যটি হৃদয়-নির্দেশিত; দুই-ই আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত।

'ঈরস' তথা রতি। দেহাতীত প্রেমের সাধনা, যাকে পাওয়া যায় জীবন পেরিয়ে মৃত্যুর উপান্তে, যাকে ব্যক্ত করা যায় দিন-রাত্রি, আলো-অন্ধকার ইত্যাদি রূপক-সহায়ে; এদের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব, একমাত্র মরণই দেয় পূর্ণতা, স্থিতি। এই মৃত্যু আত্মার, এই মরণ দেহের—অনেকে তাই আত্মহত্যা করত, অনেকে যৌনাঙ্গ কর্তন করে নপুংসক হয়ে যেত। ঈরস 'দিব্য-রতি' এবং 'ডেথ্-কাল্ট', মৃত্যু-সাধনাও।

'অ্যাজেপী' তথা প্রেম। শাস্ত্র-অনুগ প্রেমের পূজা। ঈশ্বরের প্রেম তাঁর সৃষ্টির জন্যে; তাঁর কৃপায় ওয়র্লড'-এ এল 'ওয়র্ড', বিশ্বে জাগল শব্দ, অন্ধকারে আলো ফুটল, মৃত্যুর বুকে জীবন। যীশুর প্রেম মানুষের প্রতি; যাদের জন্যে তিনি প্রাণ দিয়েছেন, মরণের মধ্যে থেকে নিয়ে এসেছেন জীবন। খৃষ্টানের প্রেম উপসংহৃত করুণায় ঘন 'প্রতিবেশী-প্রীতি'-তে, নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার বহুর মধ্যে। মুক্তি তাই চার্চে প্রত্যাবর্তনে, খৃষ্ট-সকাশে শরণাগতিতে, ঈশ্বরে আত্মনিবেদনে। অ্যাজেপী 'দিব্য প্রেম' এবং জীবনের সাধনা।

সাজে-আবেশে, ঋতে-কৃত্যে, যৌন-যোগে-বিয়োগে আরাধ্যার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাওয়া, তারপর মৃত্যুর মাধ্যমে ফিরে আসা, এই জীবনকে সম্মুখ করে তোলা—এই আদিম কল্পনা-ভাবনা ও সংশ্লিষ্ট জাদুক্রিয়া মধ্যযুগে এসে দ্বিধা-বিভক্ত, রূপান্তরিত হয়েছে, চলে গেছে দুই দিকে। ঈরস প্যাশন, অ্যাজেপী কমপ্যাসন; ঈরস ঈশ্বরসাযুজ্য, অ্যাজেপী ঈশ্বর-সংযোগ; ঈরসে লৌকিক ভাব থেকে অলৌকিক রসে উত্তীর্ণ হওয়া, অ্যাজেপীও অলৌকিকের স্পর্শে লৌকিক জগতেই বিস্তৃত হওয়া; ঈরস দেহযোগকে মনে করে বন্ধন, অ্যাজেপী মনে করে বিবাহেই মুক্তি। ঈরস প্রাচ্যের, অ্যাজেপী পাশ্চাত্যের অবদান। স্বভাবতই প্রাচ্যের পক্ষে 'বন্ধনহীন প্যাশনেট', পাশ্চাত্যের 'নিস্প্যাশনেট বিবাহিত' হওয়াই যুক্তিসংগত। কার্যক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টোটা। প্রাচ্য সংস্কৃতিতে প্যাশন নিম্নস্তরের বৃত্তি বলে পরিচায়িত, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে প্যাশন মহিমামণ্ডিত। প্রাচ্যের আনুকূল্যেই এটা ঘটেছে এবং সে যোগাযোগ একাধিক স্থানে ও কালে। ক্রমশ সমন্বয়ীভবন।

তৃতীয় শতকে আরব ও পারসিকদের মাধ্যমে রতি-সাধনা পৌঁছয় কেল্টদের কাছে। তারা

ছড়িয়ে দেয় য়োরোপের পথে-প্রান্তরে। গ্রীক ঈরসও প্রাচ্যসম্ভূত। মিশরের ঈসিস-কাল্ট-এর প্রতিচ্ছায়া অর্ফিউস ও ব্যাকাস দেবের উৎসবে। পারস্যের সন্ত মেনিস-এর রসতত্ত্ব ইসলাম ও বৌদ্ধ ভাবনার মধ্যে দিয়ে পৌঁছয় খ্রীষ্টধর্মের কাছে। একটি স্তরে স্মৃত হয়েছেন মেনিস-যীশু-ওমজুদ-শাক্যমুনি! গ্নেস্টিকদের এক শাখা 'প্রিস্‌সিলিয়ানিস্ট'—যারা ড্রুইডদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল—ইরানীয় দ্বৈতবাদের প্রেরণায় যে ধর্মমত গ্রহণ করেছিল, তার মূল তত্ত্ব : প্রেম, 'চার্চ অফ লাভ' : ঈশ্বরই প্রেম; স্বর্গচ্যুত মানবের পতন ঘটেছে অসৎ বস্তু-বিশ্বে; যীশু খ্রীষ্ট এসে দেখালেন প্রত্যাবর্তনের পথ। এঁদের উপাস্য-ত্রয়ীর অন্যতমা Mother of God, প্রেমের নায়িকা-শক্তি। গৃহী-শিষ্যরা বিয়ে করতে পারত, তবে অবিবাহিত বা স্ত্রীত্যাগীরাই যথার্থ সাধক। যাদের লক্ষ্য বৈদেহী রতিসাধনার স্তর পেরিয়ে পেরিয়ে পরম-ঈরসে উপনীত হওয়া। এশিয়া মাইনরের আশেপাশে কেল্টীয়-আইবেরীয়-ম্যানিকেইনীয়-নিও-প্লেতোনিক ইত্যাদি তত্ত্বমতের মিশ্রণ ঘটে, যেখানে ইব্‌ন্‌ অল্‌ ফরিদী প্রভাবিত আবেগ-আত্মপ্রীতি-মৃত্যুমাধ্যম প্রেমতত্ত্বের প্রাধান্য দেখা দেয়। এই মতবাদ ক্রুসেডের সময় স্পেন হয়ে পৌঁছয় দক্ষিণ ফ্রান্সের 'ক্যাথার' বা 'ক্যাথারিস্ট' সম্প্রদায়ের কাছে। পরে, এখানে অল গয্‌যালী, অল হিল্লাজের মতো প্রেমযোগীদের বাণীও উপনীত হয়। ক্যাথারিস্টদের অনুভূত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত হয় সন্ধ্যাভাষায় লেখা অধ্যাত্মগীতিতে, যার মধ্যে যৌন পরাতত্ত্বও পরিস্ফুট : দেহপিঞ্জরে বন্ধ আত্মা অন্ধকার থেকে মুক্তি চায় আলোয়, লৌকিক কাম থেকে লোকাতীত রতিতে, বাস্তবজীবন থেকে দিব্যজীবনে; এই পথ মৃত্যু-চিহ্নিত; যার কেন্দ্রে Amor, এক রহস্যময়ী নারী যাঁর আকার নেই, আভাসমাত্র পাওয়া যায়, যিনি হয়তো একবারই দেখা দেন আর সারাজীবন বিরহের আগুনে পুড়িয়ে মারেন; সেই রক্তাক্ত যন্ত্রণার সরোবরে ফোটে ভালবাসার প্রথম কদম ফুল। যৌনতার উদ্বর্তনে রতিপ্রেমের পূর্ণতা।

রহস্য-রোমাঞ্চ-উত্তেজনা সবই আছে এই অধরা মাধুরীতে, কৃত্য তো আছেই। সুতরাং জনপ্রিয়তালাভে বিলম্ব ঘটে না। অথচ খ্রীষ্টীয় ধর্মমতে বিবাহই বৈধ। এবং তারই কথা বলা হয়। কিন্তু পুরুষানুক্রমিক সংস্কার-বিশ্বাসকে এতো সহজে ত্যাগ করা যায় না, ছাড়া যায় না প্যাগানের ব্যসন। 'বর্বর' রক্ত বিদ্রোহ করে। দমন-নির্বিন্ধকরণ-সংকুচন, গুপ্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হয় দলগুলি, সেইখান থেকেই সমাজের ওপরতলায় প্রভাব ছড়াতে থাকে। অবশেষে, ত্রয়োদশ শতকে 'ক্রুসেড'—ব্যাপক গণহত্যা, গ্রামকে গ্রাম অগ্নিসংযোগ, গির্জার পর গির্জা ধ্বংস। তবু নিশ্চিহ্ন করা গেল না। ক্যাথলিকচক্রে প্রবিষ্ট হল প্যাগানধর্ম ছদ্মবেশে। প্রশ্রয় পেল কুমারীপূজো 'ভার্জিন কাল্ট' বা 'আওয়ার মেরী', সাধুরা 'নাইট্‌স্‌ অফ মেরী'। একদিন মেনে নিলে খ্রীষ্টানতন্ত্র।

অন্যদিকে, মরমীয়া, নিওপ্লেতোনিক প্রেমভাবনার সহায়ে, যাজক-ব্যারনদের মাধ্যমে এই সাধন-রহস্য উপনীত হল সামন্তসমাজে, পরিণত হল 'কোর্টলী লভ' বা 'দরবারী প্রেমে'। সন্ধ্যাভাষায় লেখা সে-প্রেমের কবি দক্ষিণ ফ্রান্স প্রভাঁসের ত্রবাদুররা। ত্রবাদুররা ধর্মমতে ছিল ক্যাথারিস্ট। স্বভাবতই, এদের কাব্যধৃত প্রেম অসুখী ও অতৃপ্ত; না-পাওয়ার বেদনায় নয়, কারণ পাওয়ার মধ্যেই তো যতো অপূর্ণতা-লৌকিকতা-অসুন্দর, না-পাওয়ার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা-অনুভূতি তীব্র; মিলনের দাবানলে শুধু জ্বলা, বিচ্ছেদের দহনেই জ্বলন্ত সুখ, আলোর উত্তরণ; সে-ই তো Amor, Eros, দিব্যরতি! বিরহ তাই সুমধুর; আর তার ওপরে মধুরং মধুরং A fair lady who ever says 'no'! গেটের 'চিরন্তনী নারী'।

উত্তর ফ্রান্সে গ্রীক উপকথা, কেল্টীয় লোকগাথার ঐতিহ্য। দক্ষিণের প্রেমকাব্য (বা গীতি) উত্তরে গিয়ে হল প্রেমকাহিনী। এখানে আখ্যান অন্য; কল্পনা বিভিন্ন, অধ্যাত্মতত্ত্ব সেই এক—দেহাতীত রতির আর্তি। সিদ্ধরতি গ্যালাহেড তাই যেখানে সফল হন, সেখানে ব্যর্থ হন ল্যান্সলট,

যেহেতু দেহযোগ মাধ্যমে তিনি পাপ করেছিলেন, ক্যাথারিস্ট বিশ্বাসের প্রতি করেছিলেন বিশ্বাসঘাতকতা। শুরু হল 'রাউন্ড টেব্‌ল্ কাহিনী, আর্থারীয় রোমানস, ট্রিসটান-ইসাল্ডা' ইত্যাদি। দেহরতি-বিশ্লিষ্ট নিছক প্লেতোনিক লাভ নয়, প্যাশন-নির্ভর 'পরমা রতি'র আরাধনা, যাকে অটো রাহ্‌ন্ বলেছেন 'Secret Chronicles of the Persecuted Church'।

সম্প্রদায় হিসেবে ক্যাথাররা বিলুপ্ত হয়ে গেল, তাদের প্রেমের মন্দির 'চার্চ অফ লাভ', তাদের অমর্ত্য রতির রাহস্যিকতা বেঁচে রইল গুপ্ত সাধনমত হয়ে, এবং সাহিত্যে শিল্পে প্রবাহিত হল, রূপ-রূপান্তর। [উদাহরণত, দান্তের মহাকাব্যের প্রেরণা-উৎস : ইব্‌ন্-অল আরবীর 'নিশীথ যাত্রার কাব্য', সেখানেও আত্মার পরিভ্রমণ তিন স্তরে : হেল-'পারগেটরী-প্যারাডাইস'। এবং স্মরণীয়, দান্তে ছিলেন 'টেম্পলার'।]

এইভাবে The passionate love actually became, in the twelvth century, a religion in the full sence of the word, and, in particular, Christian heresy historically determined (Denis de Rougemont)। শুধু প্রসঙ্গ নয়, প্রকরণও তথা হেরেটিক, মিস্টিক ও দরবারী রতিকাব্যের ভাষা-ভঙ্গিও গৃহীত অনুসৃত হয়েছে চার্চীয় মিস্‌টিকতায়, সেন্ট ফ্রান্‌সিস, সেন্ট জন, মাস্টার একহার্ট, সন্ত থেরেসা প্রভৃতির কাব্যিক আত্মপ্রকাশে।

ক্রমে, এ-পর্বও অতিক্রান্ত হল। কাব্য ধর্ম থেকে বিশ্লিষ্ট হল, উপকথার দেহে পরানো হল ঐহিকতার সাজ, লোকে ভুলে গেল অধ্যাত্ম-রাহস্যিক অর্থ, বাস্তবের নারীই এখন আদর্শায়িত, ব্যক্তি-কল্পনা প্রধান, 'পরমা রতি' পর্যবসিত মানস-রতি বা দেহরতিতে। ১২৩৭ ও ১২৮০, দুই খণ্ডে কবির লেখা 'গোলাপের রোমানস'; প্রথমটি নীতি-চেতনার, দ্বিতীয়টি রতি-উত্তেজনার। মহৎ কবিদের দৃষ্টিতে ও লেখনীতে নীতি হয় ব্যক্তিক দর্শন, রতি হয় আরতি দান্তের বিয়াত্রিসেকে ঘিরে, পেত্রার্কের লরাকে ঘিরে, মিলটনের 'স্যড্ ভার্জিন' প্রদক্ষিণে। এবং ক্রমশ-ক্রমশ ফরাসী ইমেজিস্টদের 'ফাম্ ফাতাল'-এ।

খৃীষ্টীয় এবং (তথাকথিত অখৃীষ্টীয়) হেরেটিক, অ্যাজেপী এবং ঈরস, প্রেম ও রতি—পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে দুই ট্রাডিশন, দ্বন্দ্বে-সামঞ্জস্যে মিল-অমিলে আবর্ত রচনা করতে করতে বহমান হয়ে চলেছে আর সাহিত্য-শিল্পাদিকে কেবলই উসকে-উসকে দিচ্ছে। ১৫৫৪ খৃীস্টাব্দে স্পেনের প্রকাশনী "খৃীষ্টজীবনী" আর্থারীয় রোমান্সের ছাঁচে ঢালাই করা : যীশু খৃীষ্ট—লায়ন নাইট, শয়তান-সারপেন্ট নাইট, সেন্ট জন—ডেমার্ট নাইট, সংগী সাধুগণ—দ্বাদশ নাইট। অন্যদিকে, জীবন-রসিক সারভেন্তি সমকালীন রোমান্সকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন—তারা এমন একটা ইলিউশনকে আঁকড়ে ধরে আছে, যার চাবি তারা হারিয়ে ফেলেছে। ডন কিহোকে কার্টুন করে তুলেছেন—সে অমৃত চেয়েছিল, যার জন্যে সে দীক্ষিত নয়; জীবন চেয়েছিল, যা বিগতকালীন। এবং আর একদিকে, ইতালির ভেরোনা, যেখানে ক্যাথারিস্টদের মূল কেন্দ্র, যেখানে দুটি অপাপবিদ্ধ তপ্ত হৃদয়, অতৃপ্ত; মিলনে ব্যাকুল, বিচ্ছেদ অনিবার্য; একজন বিষামৃতে মৃত, অন্যজন পান করলেন সেই অমৃত বিষ, এবং Thus with a kiss I die!

উপসংহার। এডিথ সিটওয়েলের 'নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্‌টি ফোর', টি এস এলিঅটের 'জার্‌নী অফ দ্য ম্যাজাই' এবং রবীন্দ্রনাথের 'দ্য চাইল্ড'—তিনটি অনন্য কবিতায় বর্তমান য়োরোপীয় সভ্যতার চেহারা ও চরিত্র সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট ধরা পড়েছে—হ্যাঁ, রবীন্দ্ররচনাতেও।

আদিম যুগের বর্বরতা থেকে শুরু করে নব্যকালের সভ্যতা পর্যন্ত তার ইতিহাসে যে-যে উপাদান লগ্ন ও শ্লিষ্ট হয়েছে, যে রূপে ও রীতিতে হয়েছে, যা যা ঘটে গেছে, তার সমস্ত কিছুই

আজ তার সংস্কৃতিতে, বিভিন্ন স্তরে, বিচিত্রভাবে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে চলেছে। এখনও কোন-একটা স্থির বিন্দুতে সে উপনীত হতে পারেনি। য়োরোপ আজও স্থিরহীন, বিপর্যস্ত, উত্তর কোটির প্রাণান্তকর টানাপোড়েনে : মঠ না চার্চ? প্যাগানিজম না রিলীজিয়ন? অ্যাজেপী না ঈরস? রীযন্ না প্যাশন? বিবাহ না অবাধ-যৌনাচার? ম্যাজিক না সায়েন্স? যুদ্ধ অথবা শান্তি? ফ্রী উইল অথবা ডিটারমিনিজম? ব্যক্তি না সমষ্টি? ধনতন্ত্র না সমাজতন্ত্র? ঈশ্বরপ্রীতি অথবা মানবিকতা? অস্তিত্বের গভীরে ডুব দেওয়া অথবা জীবনকে অনায়াস উপভোগ? ধনতন্ত্রে-সমাজতন্ত্রে ভাগাভাগি হয়ে-যাওয়া য়োরোপ অন্তর-সংগ্রামে লিপ্ত, প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত, দ্বিধান্বিত ও বহুধান্বিত। উত্তরপত্র সে এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে, ওয়েটিং ফর গোদো -জীবনে, সংস্কৃতিতে, শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে।

আজ বলে নয়, সেই প্রাচীনকাল থেকেই - ড্রুইড আশ্রম, গ্রীক ভাস্কর্য, রোমান স্থাপত্য, মধ্যযুগীয় চিত্রকলা, রেনেশাঁস আর্ট, সাহিত্য-নাট্য-নৃত্য-চলচ্চিত্র, সর্বত্র। ওটা তার দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে- একই সঙ্গে তার দুর্বলতা ও সবলতা। একদিকে চার্চের, খ্রীষ্টের কাছে, প্রশ্নহীন নির্ব্যূঢ় আত্মসমর্পণ, অন্যদিকে সেই খ্রীষ্টের, চার্চেরই সত্যাসত্য, যৌক্তিকতা, ক্রমে মৃত্যু তৎপর পুনরুজ্জীবন বিষয়ে অবিশ্বাস অথবা জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা। 'র‍্যাশ্টার্, অ্যাথেয়িস্ট, ফিলসফে' ইত্যাদি গোষ্ঠীর সমালোচনা স্মরণীয়। যাঁরা বুনুএল-ব্রেস'-বেরম্যান-পাসোলিনী-ফেলিনী-গোদারের ছবি দেখেছেন, তাঁরা জানেন, সাম্প্রতিক য়োরোপীয় সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে কোন্ জিজ্ঞাসা, কিসের অস্থিরতা, উত্তর-সন্ধানের কী বিপুল ব্যাকুল প্রয়াস! তাই 'মিথ্' নিয়ে এতো আতিশয্য সাধারণ একটা লেখায় বা ছবিতেও; এবং জীবনচর্যা ও জীবনলীলাতেও। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে-নাটকে-চিত্রে-চলচ্চিত্রে যীশুকে কেবলই নেড়েচেড়ে দেখা, নাড়া দেওয়া (সে তো নিজেকেই), যে কারণে Jesus Superstar আজ একটা 'লেজেন্ড' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি, তাঁর যৌনজীবন নিয়ে লেখার ও ছবি করার কথাও শোনা যাচ্ছে।

পাশাপাশি লক্ষণীয় য়োরোপের বাস্তব জীবনে যৌনাচারের বাধাহীন স্বাধীনতা, সাহিত্যে, শিল্পে তার অবাধ বিবরণী ও বিশ্লেষণ। তার মধ্যে কুশ্রীতা, প্রগল্ভতা, কামুকতা যেমন আছে, তেমনি আছে গভীর জীবনজিজ্ঞাসা। নতুবা সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ বা পাসোলিনীর মার্কসবাদের সঙ্গে যৌনসংগম ও বৃত্তি অতো সহজে শিলষ্ট হতে পারত না, কিউবিস্ট ন্যূড হতে পারত না গুয়েরনিকার আশ্চর্য প্রতিচ্ছবি। প্যাগানিজম-হেরেসী-চার্চ, তিনটেই মিশে আছে য়োরোপীয় যৌন-দৃষ্টিভঙ্গিতে, যেখানে নিষ্কাম-সমকাম-পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-কাম সমান্তরাল এবং পরস্পর স্পর্শও করছে। যেখানে নারী-স্বাধীনতার পাশেই 'ইউনিসেকস'-এর সতেজ আন্দোলন। ইংরেজী সাহিত্যজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী ব্রিজিদ ব্রফীর "ইন ট্রান্‌যিট" উপন্যাসের পরিচায়িকা "*In Transit* is a dirty book. .perceptively accurate about the mind of the contemporary travelling human being. .lanky, elegant and very nice—a tract for unisex—a labyrinth, a puzzle. . *In Transit* has a heroine who may be a hero, *In Transit* is not straightforward. Who is?" (১৯৬৯)

য়োরোপীয় সংস্কৃতি 'লাওকুন' না, 'সিসীফাস' না, 'কম্প্যুটার'ও না। সে নাবিক সিন্ধবাদ। গোটা অতীতের দায়ভাগ তার কাঁধে। ঝেড়ে ফেলতে চাইছে, পারছে না। বোঝা আরও ভারী, জট-পাকানো হয়ে যাচ্ছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. The European Mind—Paul Hazard.
2. The Interpretation of the Renaissance—W. K. Ferguson.
3. The Renaissance and the Reformation—H. S. Lucas.
4. Catholicism, Protestantism and Capitalism—A. Fanfani.
5. Diagnosis of Our Time—Karl Manuheim.
6. Christian Socialism—Y. Christensen.
7. My Apprenticeship—Beatrice Webb.
8. Churches and the Working Class—K. S. Inglis.
9. Science and Religion—Herbert Dingle
10. Christian Faith and Natural Science—Karl Heim.
11. Torture through the Ages—G. R. Scott.
12. The Waning of the Middle Ages—Le Huizinga.
13. The Role of Religion in Modern European History—*ed.* S. A. Burrel.
14. Secret Societies—Arkon Daraul.
15. Passion and Society—Denis de Rougemont.
16. An Historian's Approach to Religion—Arnold Toynbee.

পতঙ্গ-পিঞ্জর

শওকত ওসমান

আধা গ্রাম, আধা শহর নয়। নিছক মফঃস্বল এলাকা। ঘোড়া-টানা টাংগা আছে, ঘোড়্‌শক্তি-বাহিত কিছুই নেই।

বাংলাদেশের অখ্যাত জরীপ-বহির্ভূত এই এলাকার অন্য পরিচয় আপাতত অবান্তর।

একদম নরকের কুণ্ড নেমেছিল গোটা গৌড়গ্রাম অঞ্চলে। এমনই কাঠফাটা রোদ্দুর। সকাল আটটার পর আর সূর্যের চাঁটি সামলানো দায়। সর্দিগর্মিতে বেশ কিছু লোক মারা গেল। সামান্য বেলা উঠলে রাস্তায় লোকজন কমতে থাকে। কিন্তু সবাই তো ঘরে বসে দিন কাটাতে পারে না। পেটের ধান্দা আছে। তা বাদ দিলেও বাজার-হাট আছে। ছ-মাসের রসদ বেঁধে কেউ সংসার চালায় না। তলা-ফাঁক চাষীমজুরের সংখ্যা অনেক। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তাদের জগৎ অন্ধকার।

অসহ্য গরম। ত্রাহি-রব ছাড়তে লাগল গোটা গ্রাম।

রহিম গাড়োয়ান তার গোরুর গাড়িতে প্যাসেঞ্জার আর মাল নিয়ে গিয়েছিল তিন গাঁয়ে পাঁচদিন পূর্বে। এলাকায় ঢুকে সে অস্থির হয়ে ওঠে। বলদ জোড়া এক পা এগোতে নারাজ, হাজার চাবুকের চোট সত্ত্বেও। গাছতলায়.শেষে বলদ দুটো খুলে দিয়ে জিরোতে লেগেছিল। কিন্তু ছায়া পর্যন্ত গরম। চারপাশে তাতা মাটি, ছায়া অসহায়। নির্বায় সমুদ্রে চতুর্দিক খাবি খাচ্ছিল। বুড়ো গাড়োয়ান আধ ঘন্টার মধ্যে নিজে খাবি খেতে লাগল। আর-এক গাড়োয়ান সেখানে পৌঁছায়। সংগে জলের কলস। তাই কোনরকমে সন্ধ্যার দিকে তাপের প্রকোপ কমতে রহিম বাড়ি রওয়ানা দেয়। কিন্তু বেচারা ভিটের সীমানায় এসে সর্দিগর্মিতে মারা গেল। কেউ মুখে পানী দেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি। ওর জোয়ান ছেলে গফুর লাশের পাশে বসে ছিল একদম হাউড়ের মতো। গরমে তারও মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। পুকুরে স্নান করা দায়। জল তেতে থাকে। তার চোটে সব মাছ ভেসে উঠেছিল। গফুর বাপের জন্যে চোখের জল ফেলেনি। রাতারাতি লাশ দফন হয়ে যায়। দিনে কে কবর খুঁড়বে? গফুরের বোনেদের বিয়ে হয়েছে চার-পাঁচ মাইল দূরে গ্রামে। এমন কী দূরে? খবর দেওয়া যেত। জন্মের মতো বাপের মরা মুখ একবার দেখে নেবে। কিন্তু অত সামাজিকতা করতে গেলে লাশ পচে উঠবে। আর খবর দিতে যাবে কে? সকলে হাল্লাক হয়ে আছে। রাত্রির ছায়ায় তবু কিছুটা আরাম। হেঁটে পরদিনের জন্যে কাহিল হওয়ার বান্দা কম। লড়াই চলছে তপ্ত দাপটের বিরুদ্ধে। তাগদ জমা রাখতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রের জন্যে। খামখা নষ্ট করা চলে না। বোনেদের খবর না দিয়ে ক্ষতি কতটুকু? মেয়েছেলে ইনিয়ে-বিনিয়ে ঘ্যানঘ্যান কিছু চোখের জল ফেলত। এই তো? তা ঘরে বসেও ফেলতে পারবে। শোক আর তাপে তাদের অসুখ বাধত বৈকি। তখন একটা বুড়োর দায়ে কত হাঙ্গামা। গফুরের বোনেদের বাচ্চাকাচ্চা আছে। মায়ের অসুখ মানে তাদেরও দুর্দশা। ভাইকে হয়তো সারাজীবন বোনেদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাদের অবোধ মুখ গফুরকে কয়েকবার অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু নিরুপায়। লাশ নিয়ে বসে থাকা চলে না। মসজিদের ইমাম থাকে এক মাইল দূরে। অন্তিমের ক্রিয়াচার কে করবে? একে আত্মা (রুহ্‌) একফোঁটা পানী পায়নি মরণের অন্তে, তার উপর দেহের পচন। রাতারাতি কাজ শেষ করাই উচিত ছিল। দুঃখ তো নানাদিকে। একটা মরা মানুষ না হয় অ-দেখাই থাকল।

গোটা এলাকার সমস্যা এইভাবে নতুন নতুন আকারে উপস্থিত হয়েছিল।

যারা ঘরে বসে ছায়া ভোগ করত, তাদেরও প্রাণ আইঢাই। হাতপাখা কতক্ষণ নাড়া যায়? টানা-পাখা আরো গরম বাতাস ঘেঁটিয়ে আনে। লড়াইয়ের আঁচ কোথাও কম নয়। গড়পড়তা স্বস্তির নিশান কোথাও-কোথাও উড়তে পারে।

হঠাৎ বাজারে মাছ সস্তা হয়ে গিয়েছিল। বিলে পুকুরে খাবি খেতে খেতে ভেসে উঠছে, মরে যাচ্ছে আবার ভাসছে। জেলেদের কল্যাণে হঠাৎ মাছ কেনার ধুম পড়ে যায়। কিন্তু গেরস্থর ভুল পরক্ষণেই ধরা পড়েছিল। মাছ জ্বাল দিয়ে না রাখলে নষ্ট। তখন আবার আগুনের সামনাসামনি। একে গোটা ভূখণ্ড আগুন, তার উপর আবার আগুনের কিনারায়! অত গরমে হজমের সমস্যা আছে। দু-একটা ভেদবমি হতে মৎস্য আহার সিকেয় উঠল। একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় কতরকম আপদবিপদ এবং লেজুড়ে-লেজুড়ে নানা হাঙ্গামা, অসোয়াস্তি কি শান্তিহর খোঁচানি ডেকে আনতে পারে, তা মজফ্ফর এলাকায় থাকলে আপনার বোধগম্য হত। কেয়ামত তক্‌ আর ভুলতেন না।

গরমে নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত দায় হয়ে পড়েছিল। হাঁসফাঁস দিন-গুজরান সুখের নয়। দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে যায়। এই অবস্থায় ভেসে-ভেসে সোলার ছিপির মতো এদিক-ওদিক করা চলে। কিন্তু মাথার উপর দায়িত্ব থাকলে যতই ভাসমান থাক না কেন, কোথাও থই মিলবে এমন আশা দুরূহ।

প্রৌঢ় কবি মোহাম্মদ আলী এবার কাব্যসাধনার নিভৃতি খুঁজে এই এলাকায় এক আত্মীয়ের অতিথি-রূপে এসেছিল। প্রকৃতির রাজ্য এখানে অঢেল। মন নানা রসদ খুঁজে পাবে। পাখির ডাক, বাতাসের সরসরানি, ঝিঁঝিঁর চ্যাঁচানি ভেজা নিসর্গের আবেদন চিরন্তন। আলীর সেই সুবাদেই আগমন। কিন্তু গরমের চোটে ঘা খেয়ে গেল ভদ্রলোক। ভেবেছিল, পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাবে আর কোন তপ্ততাশূন্য রাজ্যে যেখানে অবসর-মৌতাতে তার কবিতার ভাণ্ডার ভরে উঠবে। কিন্তু আটক পড়ে গেল। কোন গাড়োয়ান এলাকার বাইরে যেতে নারাজ। রহিম গাড়োয়ানের অপমৃত্যুর নজীর তো চোখের সামনে রয়েছে। মোহাম্মদ আলী তখন ভাবলে, ভাবের রাজ্যে ডুব দিয়ে এই দুর্বিপাক থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। জোর কাব্যসাধনায় মন দিলে সে। কবির আত্মীয়বর্গ কিছু সংগতিপন্ন। টানা-পাখা আছে বাড়িতে। তার তলায় বসে আলী তন্ময়তার সবক নিয়েছিল। কিন্তু গা ঘেমে উঠতে লাগল। তখন মগজকে বিশেষ পর্যায়ে রেখে ভাবসমুদ্রে অবগাহন। কিন্তু মগজও ঘেমে উঠেছিল একদিনেই। তখন কবি ভেবেছিল, যেমন দুই বিন্দুর কোণের তুলনা থেকে কোন বস্তুর উচ্চতা জানা যায়, শীতলতা এবং তপ্ততা থেকে সে তেমনি চিন্তার উচ্চতায় পৌঁছবে। কিন্তু মনে কিছুই স্থির থাকে না, জমা রাখা তাই দায়। প্রেম এক ধরনের পাথেয়। এমন পাথেয় পেলেও বিহিত হত। কিন্তু বাড়িতে সব বিবাহিতা জন। সুতরাং ক্ষেত্র অনুর্বর। মোহাম্মদ আলী তাই ভেবেছিল, মানসিকতাসর্বস্ব প্রেমের সন্ধান করা যেতে পারে। কিন্তু মাতৃবৎ পরদারেষু। চিরাচরিত বিবেকের ধমকানি খেয়ে কবি চুপ করে গিয়েছিল। প্রকৃতিও বিরূপ। তার তামাটে খাঁ-খাঁ-মূর্তি এমন ভীষণতার প্রতীক আর পূর্বে সে দেখেনি। চিন্তার রণপা-যোগেই সব সমস্যা ডিঙিয়ে যাওয়া যায়। হঠাৎ এই এলাকা বেশ খটকা তুলেছিল। কদিনে নিজের উপর বিরক্তিতে ফেটে পড়ছিল কবি। বদহজমের ফলে চোঁয়া ঢেঁকুরে-ঢেঁকুরে তার মনে হয়েছিল, হয়তো সে পাগলামির দিকে এগোচ্ছে। মন জালাজালা, সেখানে নানা ডালপালা। এসব সাফ করা দরকার। নামাজ পড়লে কিছু হতে পারে। ধ্যানস্থ মৌনের দ্বারা পেটের ভুড়ভুড়ি, মনের ভুড়ভুড়ি সে দূর করবে। কিন্তু নামাজের ক্রিয়াচারে দুবার ওঠ্-বস্ করতে গিয়েই মাথা দপদপিয়ে উঠল। অসহ্য গরম আল্লার নাম নিতেও বাধা দিচ্ছে। প্রকৃতির জন্যে মনের নাগাল দুর্বোধগম্য রয়ে যাচ্ছিল। সংবেদনশীল এমন ক্ষেত্রে কোন বিকৃতির দিকে ঝুঁকতে পারে। কিন্তু মোহাম্মদ আলী হুঁশিয়ার ব্যক্তি। পৈতৃকসূত্রে পাওয়া তার বিবেক আর-এক কালের

কাছে বন্ধক থাকে। সেখানে কোন জটিলতা নেই। তার উপর মোহাম্মদ আলীর এমন অগাধ আস্থা যে মানুষ-যাচাইয়ে সে আর কিছু দেখে না। সে দেখে, ওই লোকটার তার মতো অবিকল বিবেক আছে কিনা। অর্থাৎ সে যা বিশ্বাস করে, সংশ্লিষ্ট জনের বিশ্বাস মিলিয়ে দেখলে এদিক-ওদিক না হয়। দুনিয়া বৈচিত্র্যের সমুদ্র। দুনিয়া পরিবর্তনের হিমবাহ। এসব প্রশ্ন তোলা নিষিদ্ধ। শুধু ছকে ছকে মেলাও। দেখে নাও। একটু এদিক-ওদিক হলে বাতিল। যদি সব সাদৃশ্য পাও মাপে মাপে, খালি কোনায় একটু গরমিল, তখন কবির রায় এক চিৎকারে : বাতিল। মোহাম্মদ আলীর তাই বন্ধু নেই, স্তাবক প্রচুর। তাদেরই ভালোবাসতে হয় স্নেহ-করুণা মিশিয়ে। ওই বিবেকের মাপকাঠি দিয়েই মজকুর কবি নিসর্গ দর্শন করে। দুদ্দাড়-বেগে-প্রবাহিত মেঘে তার মন উল্লসিত বা ভাবমুখী হয় না। শান্ত জলধর তার সঙ্গী। এবং শান্ত মেঘে যদি দেবালয় কি তীর্থ গড়ে ওঠে —অন্যান্য আরো কিছু গড়ে উঠতে পারে—তখন মোহাম্মদ আলী হারিয়ে যায়, অসীমের ডাক শুনতে পায়। এক সমালোচক সম্প্রতি ঠাট্টা করে লিখেছিল, কবির অনন্ত মাত্র তিন-চার মাইলের মধ্যে ঠেকে যায়। মোহাম্মদ আলী গোস্‌সায় মন্তব্য করেছিল, শুয়োর-কা-বাচ্চা। কবি নিজের ইমানে এমনই অটল। দুনিয়ার উপর দিয়ে তাণ্ডব চলে যাক, ধ্বংস-মহামারী ছুটে আসুক, সে তখনও ছুটবে ছাঁচ হাতে। মানসিক রিরংসায় যে-ভুগছে তার কাছে সুন্দরী রমণী এগিয়ে ধরা বৃথা। মোহাম্মদ আলীর ধ্যান-সীমানা জ্ঞান-সীমানা এড়িয়ে চলে। গরমের চাপে কবি এবার ভয়ানক সিদ্ধ হচ্ছিল। ভিয়েন সিদ্ধির নয়, ঘামের। কবির মেজাজ খিঁচড়ানো তাই বেড়ে গিয়েছিল। অবিশ্যি অপরিচিত জায়গা, তাই ভেতরে সব চেপে রাখতে হয়। তাই মোহাম্মদ আলীর বর্তমান ধ্যান : "হেথা নয়। অন্যত্র—অন্যত্র।"

কিন্তু কে তাকে জায়গায় নিয়ে যাবে?

এই এলাকার চতুর্দিকে বেবহা তেপান্তর মাঠ। এখন বলা যায় মরুভূমি, যেভাবে তেতে থাকে। কারো পার হতে সাহস হয় না। তার চেয়ে যেখানেই আছ, সেখানেই থাকো। মরলেও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে দরদের অভ্যন্তরে পৃথিবী ত্যাগ করতে পারবে। অপঘাত মৃত্যু কারো কাম্য নয়।

মোহাম্মদ আলী অসীমের দর্গায় অনেক মানত দিয়েছিল। হোক তা তৃণশূন্য সবুজের চিহ্নহীন যোজন-যোজন বিস্তার মাঠ। বর্তমানে এলাকার মাঠের দিকে সে আর চোখ মেলার চেষ্টা করে না। গা দিয়ে ঝরা ঘাম মুছবে, না চিন্তার ঘোড়া দৌড়বে। গা তো জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ঘামাচি বেরুচ্ছে প্রতিদিন শত শত। যেন মুহূর্তে মুহূর্তে কদম্ব ফুলের প্রথম স্তর। ভাবে নাকি এরকম দেখা দেয়। এখানে তা ঘামাচি এবং গায়ে হাত দেওয়া দায়।

মোহাম্মদ আলী কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা স্থৈর্য বজায় রেখেছিল। কেউ উপদেশের জন্যে এলে বলে দিত—দুনিয়ায় অনেক রহস্য ঘোরাফেরা করে। হঠাৎ গ্রীষ্মঋতুর যদি এমন মতিগতি খারাপ হয়ে যায়, সাধারণ মানুষ কিছু করতে পারে না। বিশ্বের সৃষ্টিকার বলতে পারে তাঁর মহামহিম ইচ্ছা কোথায় নিহিত। হয়তো সকল শারীরিক কষ্টের পশ্চাতে অমোঘ মঙ্গলময় কিছু আছে। একদিন গাঁয়ের মাদবর আরো লোকজনসহ কবির নিকট সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। অখ্যাত জায়গায় খ্যাতনামা কবির আগমন কাক-চিলও জেনে ফেলে। গাঁয়ের লোক মোহাম্মদ আলীর আত্মীয়দের কাছ থেকে জেনেছিল, তাদের গ্রামই হবে কাব্যসাধনার পীঠভূমি। স্থানমাহাত্ম্যে বহু অখ্যাত জায়গা দেশের বিশাল ম্যাপের মধ্যে বিশেষ মর্যাদায় শোভা পায়। তাদের গ্রাম যদি কোন কবিকে অনুপ্রাণিত করে তোলে, তা সকলের গর্বের বিষয় বৈকি। গ্রামাঞ্চলে পরিচয়-পত্তনের প্রয়োজন হয় না। নমস্কার কি সালামালেকুম দিয়ে শুরু হয়ে যায়। তারপর মানুষে মানুষে অপরিচয়ের বেড়া উধাও। কে কী করে, কত রোজগার, উপরি আছে কিনা—এমনতর বাহ্য-গুহ্য সংবাদ সচ্ছন্দে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে

এসে যায়। তখন কেউ অপরাধ গায়ে মাখে না। সেদিন কবিকে দেখে সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। রাশভারী লোক নয়। পাতলা চিবুক। তার উপর কয়েক গাছি মাত্র দাড়ি। কিন্তু চোখ তাঁর জ্যোতিষ্মান। সমীহা এসে যায়। তা ছাড়া, গ্রামে চাপরাশীই সাহেব বা বাবু। এটুকু মনে রাখলেই পরিবেশ হাতের মুঠোয়। মাদবরের আক্কেল পর্যন্ত ঘুলিয়ে গিয়েছিল কবিসন্দর্শনে। কিন্তু সেদিন কেউ কাব্য শুনতে আসেনি। এই গ্রামেও কবি নয়, কবিয়াল ছিল। শ্রীবাস বাগদী এবং রউফ মণ্ডল। দুজনেই পরলোকে। আজ তাঁরা বেঁচে থাকলে হয়তো এত গরমেও শীতলতা পরিবেশনে গান বেঁধে বসত। মনে মনে আফশোস করেছিল মাদবর দুই আত্মার জন্যে, জীবন্ত কবি যদিও সম্মুখে। দুই হাত প্রায়-জোড়, মাথা নিচু করে গ্রামের প্রধান প্রথমে উচ্চারণ করেছিল—হুজুর। আপনের কাছে আইলাম। আর মুখ দিয়ে কথা সরেনি। কবি এগিয়ে এসেছিল মাভৈঃ স্বরে—কী চান, ভাইসব। এমন স্নেহময় আহ্বান।. উপস্থিত গ্রামবাসী আরো ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারা মূর্খ মানুষ, তবু সহজে এমন সম্পর্ক কজনে ছড়াতে পারে? দুই পক্ষে বেশ অপেক্ষমাণ নীরবতার পর মাদবরই প্রথমে মুখ খুলেছিল হুজুর' মোহাম্মদ আলী বাধা দিয়েছিল- আমাকে হুজুর বলে ডাকবেন না। আমরা ভাই-ভাই। মহৎ মানুষ মাটিতে মিশে গেলে মাদবর কেন, অনেকেই জবাব দিত—আপনে বড়। আপনেরে হুজুর বলতে দোষ নাই। আমরা আইছি- আর তো বাঁচিনে। ফসল মাঠে শুখায়, গতর চুলার লাহান জ্বলতেছে। কোন উপায় বাৎলান, হুজুর। মোহাম্মদ আলী সেদিন আরো মাটিতে শুয়ে জবাব দিয়েছিল ভাইসব, আমিও আপনাদের মতো মানুষ। কী উপায় বাৎলাব? প্রকৃতির খেয়াল। কী বলব আপনাদের?

-হুজুর, এমন খেয়াল হৈল ক্যান? আমার বাপেও কহনও এমন গরম দ্যাহে নাই।

- গজব (অভিশাপ), ভাইসব গজব। একেই বলে গজব।

কবির উত্তর "গজব, গজব", কথাটা সেদিন উপস্থিত সকলের ঠোঁটে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, অস্পষ্ট। গরমে খিলু তাতা। কথা বলার ইচ্ছা কারো ছিল না। কবির হাত-পাখা চলছিল। বেচারাকে তকলীফ দেওয়া অনুচিত। তাই দল বেঁধে গ্রামবাসীরা উঠে পড়েছিল অবিশ্যি শিষ্টাচার ষোল আনা পূর্ণ রেখে। কিন্তু এই ভিটে পার হওয়ার পরই ডোবা-ঘেরা একটা গাছগাছালির ছায়ায়, যেখানে পূর্বে সব সময় বনজ শীতলতা মজুদ থাকত, বর্তমানে ঈষৎ বর্তমান— এমন জায়গায় মাদবর হেসে উঠেছিল। ব্যঙ্গ-করুণ হাসি। হয়তো মনের স্বতঃস্ফূর্ততা।

চাচা, হাসেন ক্যান?

সঙ্গী গফুর গাড়োয়ান তৃষ্ণার্ত তকলীফের মধ্যেও তাগদ সঞ্চয়ের পর জিজ্ঞেস করেছিল :

—হাসুম না? হালা গেলাম কবির নজ্‌দিগ। হে যা কইল, হে তো মসজিদের ইমাম সাবও কইবার পারে। তয় কবির নিকট গেলাম ক্যান?

—ঠিগ্ কইছেন, চাচা।

—ঠিগ্ কইছি না। গরমে হের মাথা ঠিগ্ নাও থাকার পারে।

- টানা পাংখার তলে ঘুমায়। নেপথ্য মন্তব্য।

—এ হালা ইমাম হৈতে পারে।

—না, মিয়াবাড়ির মেহ্‌মান। হেরা কয় কবি।

—চাচা, ফালসা কথা কইয়া কোন লাভ নাই। চলেন ইমাম-সাব কী কয় দেহি।

তখন সকালের আচ্ছন্নতা কাটেনি। বেলা জোর আটটা। মসজিদের ইমাম বাৎলেছিলেন, মাঠে বৃষ্টির প্রার্থনাসূচক নামাজের ব্যবস্থা হোক। অবিশ্যি খুব ভোরে, রাত থাকতে। দিনে মাঠ তাতা কড়া। পরদিন গোটা এলাকার মানুষ মাঠে ভেঙে পড়েছিল। মেয়েরা পর্যন্ত উঠানে জমায়েত, ধর্ম-

নির্বিশেষে, আকাশের দিকে প্রার্থনার ভঙ্গি-উত্থিত দুই হাত—মেঘ দে—পানী দে—।

ভয়াল পরিস্থিতি চতুর্দিকে। সন্ধ্যায় গাছে গাছে পাখির কিচিরমিচির আর শোনা যেত না। অন্য এলাকার বিবাগী বা আর কিছু। গোটা এলাকা যেন নির্বিহঙ্গ, নির্বৃক্ষ। সবুজ পাতা ঝলসে-ঝলসে ঝরে পড়ছিল শব্দের ঝঞ্জনা ভুলে। কারণ, শুকনা মাটি একদম খটখটে। আলতো বিচরণ ভুলে গিয়েছিল পাতার দঙ্গল।

আর্ত মানুষ প্রায়ই হাত তুলতে লাগল আকাশের দিকে ফরিয়াদ ছুঁড়ে।

শোকের মাতম এবং মোনাজাত (প্রার্থনা) হয়তো পৌঁছেছিল সব সৃষ্টির রহস্যের মূলে। তাই একদিন আকাশে মেঘ দেখা দিল। অবিশ্যি তার পূর্বে বহু অপঘাত, অকালমৃত্যু ঘটল। হেতু সর্দিগর্মি, ভেদবমি, উত্তাপবিরোধী অতিশ্রম ইত্যাদি।

হঠাৎ ঢেকে গেল সূর্যের মুখ।

তাতা লোহা যেন বরফ হচ্ছিল।

মানুষ আঃ-শব্দে আদুলে বা বস্ত্র-জড়ানো গা নির্বস্ত্র করে হাঁফ ছাড়লে।

প্রভু, দয়াময় তোমার করুণা!

শোকর (কৃতজ্ঞ) মাবুদ (প্রভু) তোমার দর্গায়!

ছেলেপুলে বুড়ো-জওয়ান সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল আবার উন্মুক্ত ময়দানে। মসজিদে-মন্দিরে প্রার্থনার ঘটা। মেঘ যখন দেখা দিয়েছে, বৃষ্টি নিশ্চয় এবার নামবে। হয়তো দু-এক ঘণ্টার মধ্যে, এত পুরু মেঘ। গরম বিদায় নিচ্ছে।

গাছপালা নেচে উঠল।

রাখাল ছেলেরা গান ধরলে। যৌথ স্বর। সহস্র সহস্র কণ্ঠের ঐকতান।

ভগ্ন মন্দিরের পুরোহিত ঝাপসা আকাশের দিকে চোখ মেলে, কিছুক্ষণ স্তব্ধ, উচ্চারণ করেছিল- প্রভু, দয়াময়, তোমার করুণা!

হাঁফ-ছাড়ার সুযোগ থাকলে নিঃশ্বাস হয় সংগীত, প্রাণ, প্রেম, সহস্র অভীপ্সা।

মাদবর আনন্দে কেঁদে ফেলেছিল তার নাতিকে বুকে জড়িয়ে। পুরাকালে শিষ্য ইলেম-গ্রহণের উপচার হিসেবে গুরুর বুকে বুক রেখে মন্ত্র উচ্চারণ করত। এইভাবে নাকি গুরুর পুনর্জীবন শুরু হয়। মাদবর সেই পদ্ধতিতে নাতির বুকে বুক।

কে কাঁদবে না, উল্লাসের এই ময়দানে?

দুই

প্রভু, দয়াময়!

পরদিন বৃষ্টি নামল না। কিন্তু মেঘ ক্রমশ ঘনীভূত। বাতাস কেমন-কেমন ঠাণ্ডা। সকলে ভয়ানক খুশী। গরম গ্যাছে গ্যা। হালার গরম।

বাদলান্ত অন্ধকার মনে মোহ বিস্তার করে। বিপদ-মুক্তির পর মানসিক এই অবস্থা চিরাচরিত ব্যাপার। চাষী চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। কবির মতো তার চোখ। কত স্বপ্ন, কত সম্ভাবনার ইঙ্গিত। সবচেয়ে ফূর্তি লোটে কুচো ছেলেপুলের দঙ্গল। তামাম গৌড়গ্রাম এসরাজের তারে পরিণত। সকলে খোলা মাঠে, খোলা সড়কে ফিরে এসেছিল। আবছা-আবছা মেঘলা রঙের জন্যে চরাচর মায়াময় ঠেকে। যেখানে গাছপালার আলিঙ্গন সেখানে যেন দুপুর রাত শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ছেলেপুলেরা জানে, আবছা অন্ধকারে থাকলেও দিন চলছে। সুতরাং নির্ভর প্রাণভরে

ছুটোছুটি করো, লুকোচুরি খেলো। ভূত বিদায় নিয়েছে চিরদিনের মতো। বরং আর যেন সূর্য না ওঠে আকাশে। এমন অনন্ত দিনই তোফা। গায়ে কত সুখের সুড়সুড়ি। অথচ ঘামাচির চোটে অস্থির ছিল কদিন পূর্বে। গায়ের এই বিন্দু-ব্যাধি ক্রমশ চুঁয়ে যাচ্ছে। এখন কেবল দু-ফোটা বৃষ্টি নামলেই সব তোফা হয়ে যেত। আরো শীতলতা, আরো নিরাপত্তা। মুরুব্বিরা বললে, একসঙ্গে এত সুখ ভাল নয়। না-ই আসুক বৃষ্টি আরো দু-চার দিন। এই মেঘ-ছায়া তো ধ্বসিবং থেকে নিরাপদ রাখার ঢাকনি। বাদল যখন খুশি মাদল বাজাক।

তাঁদের দৌরাত্ম্য হটে যাওয়া মাত্র গলায় গান আপনি এসে জুটেছিল। রাস্তাঘাট ছায়াময় থাকার ফলে কণ্ঠ বেলাগাম। বেসুরো গাইতেও কারো লজ্জা নেই। কারণ মুখ আবছা রঙে ছোপানো। কে গাইছে ধরা পড়ে গেলেই না বিদ্রুপের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। এখন দেদার গাও, এন্তার গাও। গ্রাম গান হয়ে গেল নিমেষে। যারা চোখে কম দেখে তাদের অসুবিধা বাড়লেও অশেষ আনন্দিত। কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই কঠিন। এখন না হয় দৃষ্টিক্ষীণতার জন্যে কারো সাহায্য লাগবে। কিন্তু মানুষের মদত, ঈশ্বরের নয়। অন্য দুর্বিপাকে জীব অসহায়। অতি বৃদ্ধ চোখ, তেড়ে-তেড়ে যার ঠাওর করতে হয়, তারাও লাঠি হাতে বেরিয়ে এসেছিল হাওয়া খেতে। হয়তো হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা থাক। মন বা শরীর কাহিল করতে পারে না বর্তমান প্রাকৃতিক অবস্থা। তাই ঘরে বসে থাকা কষ্টকর। ফলে, রাস্তা গমগমে। আরো আশ্চর্য, সবাই যেন কাজ-পাগল। একটা কিছু করার দাও। নচেৎ অকাজেই মেতে যাও। ইস্তার গান গাও।

মসজিদের ইমাম ঘোষণা করলেন—এবার মাঠে শোকরের (কৃতজ্ঞতা) নামাজ হওয়া উচিত। সকলে রাজী। যারা নামাজের ধার ধারে না তারা আরো গলা চড়িয়ে বললে—ঠিক হ্যায়। একটা কাজ অন্তত পাওয়া গেছে। চাঁদা তোলো। মিষ্টি চাই। মাঠের জমি উঁচু-নিচু সমান করা দরকার। নচেৎ নামাজীদের মাথা প্রার্থনাকালে মাটিতে ছোঁয়ানোর সময় ঠিকমত পড়বে না, আঘাত লাগতে পারে। এবার মিষ্টি না, কারো কারো অভিমত, ক্ষীর দরকার। সুতরাং আনুষঙ্গিক চাল, চুলো, গুড় ইত্যাদি। কাজের লোকের অভাব ছিল না। ওদিকে আকাশ আর দেখা যাচ্ছিল না মেঘের জন্যে। মনে হয়, আকাশ ক্রমশ নেমে আসছে, যেন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বে। ঘনীভূত মেঘ তখন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখা যাবে। ছায়া বাড়ছে, তাই অন্ধকার বাড়ছে। বাড়ুক। আরো ঘন হলেই বৃষ্টি নামবে। শীতল হবে গোটা বসুন্ধরা। ভাঙা মন্দিরের পুরোহিত পর্যন্ত মেতে উঠলেন। যেন কোন সম্প্রদায়ের প্রার্থনায় ফাঁক না থেকে যায়। বেচারা পুরোহিত ক্ষীণদৃষ্টি, এক বালক-ভৃত্যের সাহায্যে কোনরকমে পুজাদি সারেন। সেদিন তাঁর সহায়কের অভাব ছিল না। ভগবানকে ডাকতে হয় এক-যোগে একসঙ্গে। নরকাগ্নি থেকে যিনি এত সহজে মুক্তি দিয়েছেন, এত প্রাণীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন, অপার তাঁর করুণা! হে প্রভু, তোমার সৃষ্টির মুখে উল্লাসের রঙ আরো রঙিন করে তুলতে এসো। পৃথিবী কলঙ্কশূন্য হোক! হোক ব্যাধিমুক্ত। পুরোহিত হঠাৎ যৌবনের দিনগুলো উল্টেপাল্টে দেখেন। মন্ত্রপাঠের তাগদ ও উন্মাদনা ফিরে পান। নিষ্প্রাণ মানুষগুলোর সহসা হল কী? একসঙ্গে একজোটে অভিশাপে প্রস্তরীভূত রূপকথার রাজ্য যেন মন্ত্রভূত জলসিঞ্চনে জেগে উঠেছিল। এক নিমেষে সকলে অতীত জীবনের স্বপ্ন-উজান বিস্ময়-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। এমন স্রোত কোন আবিলতা টিকতে দেয় না, জমতে দেয় না।

কবি মোহাম্মদ আলী সারাদিন আর ঘরে থাকে না বললেই চলে। হঠাৎ প্রকৃতির ডাক তাকে অস্থির বিবাগী করে তুলেছিল। কাগজ-কলম হাতে সে গাছতলায় বসে পড়ে, কখনও মাঠে আকাশের নিচে। অনাগত সুখ যেমন দুর্দম অভীপ্সার ছাতা মেলে ধরে ঘোলাটে-ছুর্ণী মাথার উপর, কবির মানসপটে তেমনই এক বিশ্বগ্রাসী আবরণ। আলীর আর কোন শারীরিক দুর্বিপাক

নেই। তখন মগজ ছুটে বেড়ায় অশ্বমেধের ঘোড়া। গুনগুন করে সর্বদা মোহাম্মদ আলী। খেতে বসে তার মন তরকারির পেয়ালায় থাকে না, উপচে পড়ে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর প্রচুর কবিতা লেখে সে। আহ্, কী স্নিগ্ধতা বিশ্ব জুড়ে! এমন অবগাহনের সুযোগ সে হারিয়ে ফেলত কোন-রকমে এই এলাকা থেকে পালিয়ে গেলে। কিন্তু আর কোথাও সে যাবে না, যদ্দিন না একঘেয়েমি লাগে। কয়েকটা গান লিখে ফেললে মোহাম্মদ আলী। সুরকার নিজেই। গাঁয়ে গলা-ও পাওয়া গেল। গ্রামবাসীর জন্যে এমন কবিসঙ্গ তো দুর্লভ। কবিও চারণের মতো তাদের সঙ্গে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতে লাগল নিজের দলবলসহ। হে পর্জন্যদেব, পৃথিবী কালে শস্যশালিনী হয়ে উঠুক। তোমার শ্যাম-মনোহর স্পর্শ দাও। তৃষিত-চাতক এতদিন তারই অপেক্ষার্থী ছিল...ইত্যাদি-ইত্যাদি বৈদিক রণন উঠল এইমাত্র সৃষ্টির সম্মুখে। মোহাম্মদ আলী কয়েকটা সভার সভাপতিত্ব করলে, বক্তৃতা দিলে। সৃষ্টির রহস্যভেদ অত সহজ নয়। মাত্র কয়েকদিন আগে এই এলাকা ছিল পাতকী-পাচনেব কুণ্ড আর এখন স্বর্গোদ্যান। বিভু-লীলা বোঝার সাধ্য সকলের নেই। শুধু নিজের চোখ তৈরি করো আর তা দিয়ে যত অঞ্জন মাখানো আছে সৃষ্টির নানা লীলার মধ্যে, তুমি তুলে নাও। বেশি প্রশ্ন তুললে তুমি ঠকবে। বেশি যুক্তির লাঙল দিয়ে চষলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। দ্যাখো, দ্যাখো হাতে-হাতে তার প্রমাণ। এবার এসো বিটপীছায়ায়, এসো আকাশের নিচে, রাজতোরণ দ্যাখো। এখানে পার্থিব নৃপতি তুচ্ছ। কেবল তুমি নয়ন-কারিগর হও, সব তোমার হাতের নাগালে, সব তোমার পায়ের তলায়। কবির বাণী সহজে গাঁ মাতিয়ে তুলেছিল। এমন বাদল-ছাওয়া অন্ধকার। এখন কিছু কাবাব আর প্রিয়ার সঙ্গে মিলন ঘটলে মোহাম্মদ আলী ইরানের কবি হাফিজ বনে যেত। কাবাব গাঁয়ে কেউ তৈরিই জানে না। সুতরাং ও-পদ বাদ। মোহাম্মদ আলী তাই প্রিয়াসন্ধানে তৎপর হয়েছিল। চাষীপাড়ায় এক চতুর্দশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল হঠাৎ। অস্থির পায়চারি, ঘোরাঘুরি-রত কবির চোখে পড়ে গিয়েছিল এক কিশোরী মাচাঙের নিচে। কয়েকটা লাউ ঝুলছিল ইতঃক্ষিপ্ত। সবুজের উপর আবছা প্রলেপ। কবিপ্রিয়া ডাগর চোখ মেলে সড়কের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ চোখে চোখ। মোহাম্মদ আলী আর দাঁড়ায়নি সেখানে। এই চকিত চাহনিটুকু অনন্তের পাথেয়-রূপে সে ধরে রাখবে। কিন্তু পরদিনই কবি আবার এই ভিটের চারপাশে ঘুরঘুর করছিল। অনন্ত এগিয়ে যাচ্ছিল। আবার চকিত চাহনি। কিন্তু কিশোরী তখন ভীত হরিণী, ঘরের ভেতর চলে গিয়েছিল। কবি পরদিন চারণ-দলসহ গান করতে বেরোয়। বউ-ঝি বেরিয়ে এসেছিল উঠান ছেড়ে। সবাই শোনার অভিলাষী সেই তাপহর সংগীত। আবার ফসল দুলে উঠবে গোটা গাঁ জুড়ে। কবির গানের ধুয়োয় তার ইঙ্গিত। কোরাসের মধ্যে কবির গলা নেই। তার চোখ বউ-ঝিদের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখার প্রার্থনা-মগ্ন। কোথায় মানবী-অরণ্যে তার প্রিয়তমা চিকন লতার মতো জড়িয়ে আছে অথবা হারিয়ে গেছে। কিন্তু আবছা ছায়া যা প্রায় অন্ধকারে তা আবিষ্কার কঠিন। মেঘ ক্রমশ পুরু হচ্ছে। যেন মাথার উপর এসে ঠেকবে। মোহাম্মদ আলীর মনে তাই অশেষ খেদ। হঠাৎ সাবেক সূর্য আবার তাপসহ ফেটে পড়ুক। এক মুহূর্তের জন্যে। নয়ন সার্থক হোক। কিন্তু কবির দুর্ভাগ্য, ক্রমশ গ্রামের উপর মেঘ এমন জমা হতে লাগল যেন রাত্রি নামছে। দুপুরেই প্রদীপ জ্বালাতে হয়। তার জন্যে কারো কোন ক্ষোভ নেই। বৃষ্টিই এখন একান্ত প্রয়োজন। মাঠ কাঠ-ফাটা। বিল শুকনা, নদীর জল তলায় ঠেকেছে। বৃষ্টি দরকার। কবির অসোয়াস্তি সেদিকে নয়। এমন বাদল-ছাওয়া অন্ধকার বৃথা যায়। প্রিয়ার মিলন স্বর্গসুখ। সেখানে একবার দর্শন ঘটলে অন্তত আপাতত প্রাণ বাঁচত। অতএব, বিশ্বময় তিলোত্তমাকে আবার তিল বানালে কবি। গাছে-পালায় অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে কবি তার দয়িতাকে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ কয়েকটা কবিতা লেখা হয়ে গেল এই বাবদ। যার মধ্যে খালবিল, আমলকী গাছ, সজিনাপাতা বাদ গেল না। তমালের কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু কবি

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত নয়, তাই ঘৃণায় হটিয়ে দিয়েছিল বেশ দূরে। এক গোপিনীর তল্লাসে গলদ্‌ঘর্ম, ষোলশ কোথা থেকে জোটাবে? লায়লী-মজনুর প্রতিও কবির বিরাগ। মজনু লায়লীর কুকুরের গালে চুমু খেয়েছিল। থুঃ থুঃ, ছিঃ ছিঃ। উন্মাদ ছাড়া জানোয়ারের প্রতি এমন আচরণ আর কে করবে? চারদিক ঘুরেও কবির অশান্তি দূর হয়নি। বিষাদ ছেয়ে আসে। তাই অন্ধকার মেঘের নিকট মোহাম্মদ আলী নিজেকে সমর্পণ করেছিল। অতি-আবছা মিশকালো মেঘই সঙ্গী। কালিদাসের মতো দূত পাঠাতে পারত কবি ওই আসন্ন বারিভাণ্ডারকে। কিন্তু কেমন যেন অনাত্মীয় গন্ধ তার মধ্যে। মোহাম্মদ আলীর স্থৈর্যহীনতা আরো বৃদ্ধি পায়। একবার সাহস-ভর বুকে চেপে ধরতে পারলে পাড়াগেঁয়ে আর শরমে চিৎকার দেবে না। কিন্তু তার ঈষৎ সুযোগও নেই। মেয়েটির ডাকনাম জেনে নিয়েছিল কবি এক বালক-চারণ মারফত। হাবেরা। ওর সাবেরা নামে আর-এক বোন আছে। সে নাকি আরো সুন্দরী। রোমান্টিক কবিরা যখন গাঁ হাতে পায় না, তখন গাছের দিকে ছোটে। মোহাম্মদ আলী বিটপীসজ্জিত সড়কে তাই পায়চারি আরম্ভ করেছিল। কখনও দ্রুত, কখনও শ্লথ। কাপড়চোপড় বিস্রস্ত। ভাবরাজ্যের মুসাফির। গাঁয়ের মানুষ গর্বের দৃষ্টি মেলে চেয়ে-চেয়ে দেখলে। এমন কি, যখন নোংরা কাপড়চোপড়ে কিছু দুর্গন্ধসহ মোহাম্মদ আলী সড়ক-জরীপ করতে লাগল, তখনও মন্তব্য উঠল - আমাগো কবি, আমাদের কবি...আমাদের কিনা তা-ই...।

মাদবর আসন্ন সুদিনে মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। পূর্বের সংকোচ গায়েব। গেঁয়ো যুগী ভিখ পায় না। হামেহাল কবিকে তারা হাঁটিতে দেখেছে হেথাহোথা বনে-বাদাড়ে। সুতরাং সকলের চেনা বইকি। রহস্যের ভাব কেটে গেছে অতিপরিচয় মারফত। মাদবর তাই সাঙ্গোপাঙ্গসহ কবির নিকট হাজির হয়েছিল। অন্যানাদের কৌতূহল উচ্ছল। গাঁয়ের শ্রদ্ধার পাত্র মাদবর। তিনি আবার শ্রদ্ধা করেন, এমন মানুষও আছে! সমীহাজাত ভয় কৌতূহল স্বাভাবিক। ওদের কথাবার্তা শোনার মতো কিছু হবে, এই হিসেবও সঙ্গে জড়িত। সঙ্গে থাকারও আনন্দ আছে। যারা মনে মনে গাঁয়ের পরবর্তী মাদবর হওয়ার আশা পোষণ করে, তারা তো এমন মওকা হারাতেই পারে না।

মোহাম্মদ আলী সেদিন সকাল থেকে গগনবিহারী। কতো কালো কালো রঙ ওই সুদূরে। এমন কাজল আভাস গ্রন্থিল চিন্তার খনি। মন বিবাগী হতে চায় সর্বদা। সকালে কিছু খেয়েই কবি বেরিয়ে পড়ে আর কী। সেই মুখে গ্রামবাসীরা এসে পৌঁছেছিল। সকলের মুখে-মুখে-ফেরা কবির একটা জনপ্রিয় গানের কথা দিয়ে মাদবর খেই ধরেছিল। তোষামোদপ্রিয় নয় মোহাম্মদ আলী। কিন্তু সেদিন ভক্তদের কথায় বেশ বিগলিত হয়ে পড়েছিল। বাইরে বেরুনোর তাগিদ থাকলেও সে আসন গ্রহণ করলে বেশ জাঁকিয়ে। অনেক কথার বয়ান শ্রোতারা শুনলে। শহরে থাকলেও গোরু দেখলেই কবির গ্রামের কথা মনে পড়ে। বুধী নামে তাদের একটা গাই ছিল। বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাওয়া যেত, গুঁতোত না। হঠাৎ গাইটা মরে গেল। পেটে ব্যথা, ব্যথানে বার দুই গোঙানি, শেষে খতম। সজল চোখে কবি তার বর্ণনা দিলে। ওই দুর্ঘটনার পর মোহাম্মদ আলীর মনে বৈরাগ্য জন্মেছিল। ফলে, পশুচিকিৎসক হওয়ার শখ। কিন্তু অবস্থাবৈগুণ্যে তা সম্ভব হয়নি। কবিতা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আর-এক জগতে। অবিশ্যি ভেটারনারি চিকিৎসার প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা। শহরে গোরু পোষা ঝামেলা বিধায় মোহাম্মদ আলী আর গোরু পোষেনি। বাগ্‌খোরা চাষবাস, শাকসবজি ইত্যাদি কথা শুরু হয়েছিল। মাদবরের উশখুশানি থামেনি। একটা কথা তার মনে বিঁধছিল কয়েক-দিন থেকে। কবির কাছে মুখ খুলতে সাহস পায়নি। চুল পেকেছে, বয়সে বড়। কিন্তু ইলেমে তো কবির কাছে সে গোরু। সংসারে রহস্য এত বেশি যে তলিয়ে দেখার তাগদ নেই তার। কত কথা মনে ওঠে। তারা মূর্খ। তাই বলে চোখে যেমন নানা জিনিস পড়ে, মনে কি সেসব সামগ্রী ধরা

দেয় না? প্রথম ক্ষেত্রে, চোখ দেখে কিন্তু নাম জানে না। শেষ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়। মাদবর সাহস করেই মুখ খুলেছিল। তার মগজে কিছু নেই, এমন কথা এই গাঁয়ে কেউ বলবে না। কত কাইজ্যা ফ্যাসাদ তার কথায় মিটে যায়। বহু বিয়া-শাদীর হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয়। টাকা হয়তো বিয়ে-বাড়ির। কিন্তু আয়োজনের খুঁটিনাটি কার চোখে থাকে? কবি পারবে নাকি সেসব ঝামেলা পোয়াতে? মাদবরের সাহসের গোড়া সেইখানে। এক ফাঁকে মুখের কথা খালাস করে সে বড় লজ্জায় কবির মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

—কবি-মহাশয় (সম্বোধনটি শিখে নেওয়া), হঠাৎ যা হয় বা হওয়া উচিত, তার বাইরে কিছু দেখলে আমাদের কেমন-যেন অসোয়াস্তি লাগে। ভয় পাই।

—কী ব্যাপার, মাদবর সাহেব? মোহাম্মদ আলী আনাড়ী চাষীর মুখে এমন আপ্তবাক্য শুনে তাজ্জব না, বেশ হয়রান হয়ে উঠেছিল।

—আমরা মুরুক্ষু মানুষ আপনাকে কী বোঝাব? যা হামেহাল ঘটে, তা না ঘটলেই আমরা অবাক হই।

—নিশ্চয়।

—ভয়ও পাই।

—তা পেতেও পারেন, যদি ঘটনার মধ্যে ভয়ের কিছু থাকে।

—অবাক হলেই ভয় পেতে হয়।

—তা তো বটেই।

—আপনি এসব কথা তুলছেন কেন? ভয় পেয়েছেন নাকি কোন কারণে?

—তা পেয়েছি বৈকি।

—কিসের ভয় পেলেন?

মাদবর এই সময় নিজেকে প্রায় মাটিতে মিশিয়ে জবাব দিয়েছিল—কবি-মহাশয়, আমরা মুরুক্ষু মানুষ। বুঝি না সুঝি না। আসমানের দিকে চেয়ে ভয় পাই। খুব গরমে কষ্ট পেয়েছি। এখন শুধু ছায়া আর ঠাণ্ডা। এই মৌসুমে কিছু গরম থাকা উচিত ছিল। তাই ডর লাগে...।

হেসে উঠেছিল মোহাম্মদ আলী। বাইরে প্রকৃতি ডাক দিয়েছে। আর বসে-বসে ভালো লাগে না। এখন সংলাপ সংক্ষিপ্ত হোক। মাত্র বজায় রাখতে মোহাম্মদ আলী মুখ খুলেছিল, দুনিয়ায় অনেক রহস্য আছে। ভয় পাবেন না।

—হুজুর, আমরা গরিব মানুষ। ভয়েই মারা যাই। কী থেকে কী হয়, কে জানে?

—ভয় পাবেন না। এমন ঠাণ্ডা জায়গা। কার কপালে এসব জোটে? আমার মতো বাইরের কত অতিথি আসবে এই গাঁয়ে। অভয়বাণী নিক্ষেপ করেছিল মোহাম্মদ আলী। মাদবর আর সেখানে অপেক্ষা করেনি। কবির আশ্বাসের মধ্যে কোন উৎপ্রেক্ষা ছিল না। গ্রামের লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল তিন-চার দিনের মধ্যে। কারণ, সকলেই আরো অনুকূল পরিবেশ চায়। যাদের গরমে বাস, আরো অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা জায়গা তাদের পছন্দ। খামখা কেউ কষ্ট করতে চায় না। সেক্ষেত্রে, একদম ছায়া-এলাকা তো আশাতীত। কাজেই তীর্থযাত্রার মতো অনেকে এ-গাঁয়ে এসেছিল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতে। যাদের জমিজায়গা ছিল এই গাঁয়ে তারা কেবল খাজনা আদায়ে আসেনি। ফাউ হিসেবে এমন শীতলতা পাওয়া যায়, মন্দ কী। তাদের কেউ কেউ কাছারি তৈরির কথা ভাবতে লাগল, সময়মত এসে থাকার জন্যে। এই এলাকার আবহাওয়া আরো মনোরম হবে, তেমন ভবিষ্যতের আকর্ষণ স্বাভাবিক। একবার মোহাম্মদ আলী ভেবেছিল, গরমের চাপে যানবাহন (শুধু গো-শকট) চলাচল শুরু হলেই সে আর কোনদিন এই অঞ্চলে ফিরবে না। একবার ছাড়া পেলে হয়! কিন্তু

আবহাওয়ার খেয়ালী আবির্ভাবে সেও কম খেয়ালী হয়নি। এমন সহজ অবকাশভোগ সহজে মেলে না। বরফ-পড়া পাহাড়ী এলাকায় কল্পনায় মোহাম্মদ আলী বহুবার ছুটে গেছে। কিন্তু স্বল্প খরচায় এমন শীতলতা-মধুর জায়গা তো নসীব-গুণে মেলে। এই এলাকা ত্যাগ করার কথা তাই কবি ভুলে গিয়েছিল। নিসর্গবিলাসের জায়গা বটে! এখানেই ভদ্রাসন থাকা উচিত। প্রেমের নেশায় মোহাম্মদ কৃষকপল্লীর আশেপাশে বিচরণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। মাদবরের চিন্তা কিন্তু তাকে সোয়াস্তি দেয়নি। অভিজ্ঞতায় প্রবীণ অমন মানুষকে সে শ্রদ্ধা করে। দুনিয়ার পাঠশালা থেকে তারা সবক পায়। আর-একভাবে তারা সং ইলেম অর্জন করে। হঠাৎ-ছায়া মাদবরের কাছে অপচ্ছায়া। কিন্তু অমঙ্গলের আশঙ্কা কেন তার মনে জাগল? মোহাম্মদ আলী মন থেকে এই দুশ্চিন্তা কোঁটিয়ে বিদায় দিতে তৎপর। তার প্রধান উপায়, নির্জন মাঠে গলা ছেড়ে গান। রাত্রে অন্ধকারে রাখাল বালকেরা এই ব্যবস্থা ধরে। কিন্তু কবি তো গো-পালক নয়, উর্ধ্বচিন্তা-বিহারী। জীবনকে সবচেয়ে সুশৃংখল প্রবাহ হিসেবে ধরে নিলে আর কোন ঝঞ্ঝাট থাকে না। দুঃখ, দারিদ্র্য, অবিচার, কষ্ট ইত্যাদি সব এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়। মোহাম্মদ আলী গ্রাম্য মানুষকে এই পর্যায়ে পৌঁছানোর কৃতিত্ব দিতে নারাজ। অনেক দিন, অনেক অবসর দরকার হয় অমন মানস-গঠনে। আম লোকের হাতে সময় কোথায়? তাই তাদের জন্যে কয়েকটা বাঁধা গত খুলে রাখতে হয়। সমাজে যা আইন, আপ্তবাক্য, আদবকায়দা ইত্যাদি নামে বিদিত। বাঁধা গত, বাঁধা সড়ক। তবেই সমাজ, দেশ এগোয়। কিন্তু রাস্তা এক থাকে না, যখন মোড় এসে পড়ে। তখনই যত মুশকিল। সুতরাং মানুষকে জ্ঞান-হাতিয়ার যুগিয়ে যাও যেন সে নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে পারে। সেখানেও সমস্যা আছে। সকলের কাছে কি তেমন সুযোগ আছে যে হাতিয়ার ধরে নিতে পারে। এই দ্বন্দ্বের মুখোমুখি আবার তার নিজ বিশ্বাসে ফিরে যেত মোহাম্মদ আলী। যা ঘটে তাই সুন্দর বলে মেনে নিলে খামখা ভালো-মন্দের প্রশ্ন ভুলে মেজাজ বিগড়ানো থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সেখানে চিন্তার লড়াই নদারাত। অপরের ঘাড়ে সব সোপরদ্দ করে বুঁদ হতে পারা যায়। ধ্যানীরা তা-ই করে। অস্থিরতা চাপা দিতে আঙুলের গাঁটে নামকীর্তন আবৃত্তি ঢের ফলপ্রসূ।

মোহাম্মদ আলী খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছিল মাদবরের উপর। লোকটা তার চোখে এমন বিভীষিকা ছড়িয়ে গেল কেন? বেশ কয়েক ঘণ্টা অসুবিধা ঘটায় চারণ-কবির। যৌবনে মোহাম্মদ আলী তাড়ি খেয়েছিল শুঁড়ির দোকানে। নেহাত কৌতূহল। বহুদিন পরে তার আবার নেশার বাতিক চেপেছিল। একটু তাড়ি পেলেই সব যন্ত্রণা দূর হয়ে যেত। অন্তত চোখে চোখে কি সংলাপে-আলাপে কোন প্রেমের প্রতিমা (হাবেরা নামক কিশোরীর মতো) পেলে তার চিন্তা সঠিক রাস্তা ধরত। কবিতা আর এগোচ্ছিল না। কারণ, ভাব, শব্দ তালগোল পাকিয়ে যায়। অথচ হররা চলছে নানা জায়গায় নানা কাজ জুড়ে। ছোট ছেলেরা দোলনা বেঁধেছিল গাছের ডালে। অস্তিত্বের মজা আর কখনও এমন করে লুঠ হয়নি। মাঠ ফেটে চৌচির। তবু চাষীরা মনের বল হারায়নি। ছায়ার নিচে জমিন অথবা আবাদের ভূমিকা তৈরি করছিল। গুনগুন গান গায় চাষীবৌ পুকুরঘাট থেকে যখন হাঁড়িপাতিল মেজে ঘরের দিকে এগোয়। রাজ্যের পাখি এসে জুটেছিল গাছে গাছে। কিচিরমিচির লেগেই আছে কোথাও না কোথাও। কোন গোপন আনন্দের ঈষৎ ঝিলিক দিতে পাখির ডাক যেন ওত পেতে থাকে। গোধূলিলগ্নে ছায়াময় পৃথিবী। কৃতজ্ঞতায় অবনত প্রার্থনা করছিল কেউ কেউ আকাশের নিচে বসে। খরার কোপ অব্যাহত থাকলে এতদিন বহু কবরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। এমন দুর্বিপাক থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে যদি প্রার্থনা না করে, তবে কিসে সুযোগ আসবে? হা-ডু-ডুর ডাক শোনা যায় মাঠে মাঠে—আমার খেলো মরেছে, কাঠ দে না ভাই পোড়াতে। চুরে রাং তাং...। যারা এই গাঁয়ে ছায়া উপভোগের জন্যে দু-চার দিনের অতিথি, তারা যেন না-

ঘুমোনোর কসম কেটে বসে ছিল। হাটছে, থেমে-থেমে গল্প করছে। গাঁয়ে গোটা দুই ঘোড়া ছিল, মনিবেরা বেঁধে রেখেছিল। নচেৎ দুষ্টু ছেলের দল কি ফরশুত দেবে? বিনা-গদী পিঠে সওয়ার এমন দম দেবে আর দশ সের ছোলা খাইয়েও চাঙ্গা করে তোলা যাবে না। তার চেয়ে আস্তাবলেই থাক। পুকুরের সমতলে মাছের মেলা। চিল উড়ছে। কাক খেয়ে আসছে, তখন ভাসা মাছগুলো টুপ করে ডুবে যায়। জলশ্রী সে এক শোভা। মাছ জলের নিচে তখন নিশ্চিন্ত। কিন্তু উপরে নানা আলোড়নের নকশা। ছায়ার রাজ্যে নানা অস্থিরতা। তখন কে-ই বা বসে থাকতে পারে? সব কাজকর্ম চুকিয়ে গাঁয়ের নতুন বৌ হয়তো বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে আকাশ দেখত, সেদিন তার খোঁজ সমবয়সীর জন্যে—বাপ-মার বিরহ-বিস্মরণে। মেঘে অন্ধকার চতুর্দিক। তাই গোরুর পাল শিগগির বাথানে তুলতে হয়। হঠাৎ বৃষ্টিও নামতে পারে। গফুর গাড়োয়ান বাপের শোক ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু অনুতাপ দূরে হয় না। মাত্র কটা দিনের ব্যবধান। অমন দড়, শক্ত মানুষটা মরুভূমির হলকায় খতম হয়ে গেল!

হঠাৎ সেদিন গফুরের সঙ্গে মোহাম্মদ আলীর সাক্ষাৎ। পূর্বে ভাড়া যেতে গফুর রাজী হয়নি। সেকথা মনে আছে। তাই কবির সান্নিধ্য এড়িয়ে চলত। সংকোচও ছিল তার উপর। নিজের পর্যায়ের লোক না হলে কে-ই বা অন্য গা ঘেঁষে? কবি এই ফারাক রাখতে নারাজ। তা ছাড়া, গোরুর গাড়ি ইমেজ হিসেবে কবিতায় পাড়াপড়শী। মোহাম্মদ আলীর অনেক লেখায় গো-শকটের উল্লেখ আছে। কবি এই প্রাগৈতিহাসিক বাহনের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত। পাড়াগাঁয়ে অন্য গাড়ি যেন মানায় না। বহু দূরে যেতে কিছু কষ্ট হয়। অবিশ্যি ভেতরে খড়ের উপর গদী, আর তা না জোটে যদি, নিদেনপক্ষে কাঁথা বিছিয়ে নিলে, হাড়ে এবড়োখেবড়ো রাস্তা আর জানান দিতে পারে না। তখন শুয়ে-বসে, সবচেয়ে ভাল হয়, কাত হয়ে মাথায় হাত রেখে চারিদিকে তাকানো যায়। অলস মন্থর গতি দূরের আমেজ বহন করে। প্রকৃতির রঙ যেমনই থাক, তা চোখের পর্দায় বিস্ময় জাগায়। এই স্পর্শ যেন জন্মজন্মান্তর লেগেই থাকে, মনের ভেতর যখন বিক্ষুব্ধতাজাত প্রশান্তি শুধু ধীরে ধীরে ঢেউ তোলে। মোহাম্মদ আলীর তা-ই ধারণা। এই গাঁয়ে সে ঢুকেছিল গোযানে। যখন ফিরে যাবে তখনও ওই বাহন হবে ব্যবস্থা।

রাস্তায় গফুরকে দেখে কবি এগিয়ে এসেছিল। সরল মানুষের সান্নিধ্য তার খুব পছন্দ। খুব বেশি বাক্যব্যয় করতে হয় না এদের সঙ্গে। মোহাম্মদ আলীর এইজাতীয় ব্যক্তিকের সূত্র ধরা কঠিন। বালক-কাল তারও গ্রামে কেটেছিল। স্মৃতির ছোঁয়াচ হয়তো তখনও লেগে ছিল। এসব গবেষণাসাপেক্ষ।

সিলুরেট গাছপালা। ছায়াস্তীর্ণ রাস্তা। মোহাম্মদ আলী গফুরকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠেছিল। প্রথমে সে-ই মুখ খুলে ফেলেছিল—কী ভাই গফুর, এবার গাড়ি ঠিক আছে তো?

গফুর ঘাবড়ে গিয়েছিল। জোয়ান মানুষ। সাধারণত তার মধ্যে বেশ জঙ্গী-ভাব আছে। কিন্তু কবির সম্মুখে সে থ'। সহজে মুখ দিয়ে রা বেরোয় না। মোহাম্মদ আলী পুরাতন ঘা খুঁচিয়ে তুলছিল। সেজন্যেও তার অসোয়াস্তি হতে পারে। কিন্তু সে নিজেকে জলদি শুধরে নিয়েছিল।

—আপনি যেদিন বলেন, গোলাম তৈরি। এটুকু উচ্চারণ করতে তার বিলম্ব হয়নি। কিন্তু পরক্ষণে পাল্টা প্রশ্ন—কবে যাবেন, কবিসাহেব?

মোহাম্মদ আলী দিলখোলা হাসির পর ঈষৎ থেমে জবাব দিলে—আর যাব না এ গাঁ ছেড়ে। তোমাদের মেহমান (অতিথি) করে রেখে দাও। রাখবে না?

গফুর ভড়কে গিয়েছিল। তবে জবাব দিতে দেরি হয়নি,—আমাদের নসীব! আপনার মতো মানুষকে কি আমরা রাখতে পারি?

—কেন পারবে না?

গফুর থমকে ভাবে, গোলমাল না হয়ে যায় এমন মানী মানুষের সঙ্গে,—কথাবার্তা বলার সময়। মাথা চুলকে সে উত্তর দিয়েছিল—হুজুর, আপনারা সেরা মানুষ। আমরা তো পায়ের খাক্ (মাটি)।

জবাবে বেশ বিরক্ত, মোহাম্মদ আলী বাধা দিলে—ভাই, এসব আমার সামনে বোলো না। তুমি মানুষ হিসেবে কিসে ছোট?

গফুর চুপ করে গিয়েছিল। কবিই আবার তার উদ্ধার-কর্তা,—জানো, এমন কথা বললে গোনাহ্ (পাপ) হয়।

গফুর তখনও মুখ খোলেনি। ব্যবধানের খাদ যেন ক্রমশ হাঁ করছিল। অবিশ্যি লাফ দিয়ে সে তা পার হওয়ার চেষ্টা পায়—আমরা কত গরিব তো জানেন। আপনাকে মেহ্মান রাখার মতো অবস্থা খোদা আমাদের দেয়নি।

অবিশ্যি তখনই গফুরের মনে হয়েছিল গোটা গ্রাম মিলে তো কবির খাতিরদারি করা সম্ভব। অবিশ্যি বাইরের কবি বিধায় গাঁয়ের লোক বেশি মাতামাতি করছিল। নচেৎ তাদের গাঁয়েও কবি ছিল এবং বর্তমানে একজন আছেন সুরত মন্ডল। এখন আশির বেশি বয়স, চোখে দেখেন না। সংসারে একা, সবাই মরে-হেজে গেছে। প্রতিবেশীদের দয়ায় দিন-গুজরান। জওয়ান কালে তিনি গোটা গাঁ মাতিয়ে রাখতেন। ছেলেবেলার কথা গফুরের আবছা মনে পড়ে। এক মাস সুরত মন্ডলের সঙ্গে তার দেখা নেই। সামনে এক জীবন্ত কবি দেখে সে উৎসাহিত হতে পারত। কিন্তু তার কথার ভঙ্গিমায় সে এমন অভিভূত যে কিছু ভেবে পাচ্ছিল না।

মোহাম্মদ আলীর চোখ হঠাৎ দিগন্তের দিকে ভেসে যায়। ছায়া,ছায়া কতো শীতল ছায়া ওইখানে। আর আত্মস্থ থাকতে পারে না সে। তাই সাক্ষাৎ সংক্ষিপ্ত করতে কবি বলেছিল—গফুর মিয়া, অতিথি এক জায়গায় থাকলেই হল। এই গাঁয়েই তো আছি। কয়েক দিন পরে ফিরে যাব। তবে তোমরা যা তোফা জায়গা বানিয়েছ আর কোথা যেতে ইচ্ছে করে না।

যেদিন যান, বলবেন। আমি আপনাকে পৌঁছে দেব। গফুরের জবাবে আত্মশ্লাঘার সুর ধ্বনিত। কবিকে তা বেশ স্পর্শ করে। কিন্তু তখনই তার নিঃসঙ্গ হওয়া দরকার। তাই আবার সালাম বিনিময়ের পর মোহাম্মদ আলী পাশ কাটিয়ে রাস্তা ধরেছিল।

তখনও গফুর নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। কবির দিকে আর তাকায়নি। গোটা গাঁয়ের ছবি তার সামনে ভেসে ওঠে। সত্যি, ছায়া-ছায়াময় কত রূপের না খোলতাই হয়েছে। প্রায় পাঁচ-ছ বর্গমাইল গ্রাম। খুব 'নাইওর' যাচ্ছে মেয়েরা। তার গাড়ির বলদ দুটোর বিশ্রাম নেই। কিন্তু সেদিন কোন কাজ না-করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়েছিল সে। গল্পগুজবে এবেলা কাটিয়ে দেওয়া চাই-ই। হঠাৎ মনে মনে সে হেসে উঠেছিল। এমন ছায়া-রাঙা। সন্ধ্যার পর বউ নিয়ে ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়? ছোট মেয়েটাকে মার হাতে সঁপে দিয়ে তারা স্বচ্ছন্দে বিবাগী হতে পারে। গফুরের বউ সখিনা এই গাঁয়েরই মেয়ে। শুধু মেয়ে? গফুর মনে মনে আরো হেসেছিল। ওকে পোষ মানিয়ে, বাগিয়ে আনতে বহুত কাঠখড় গেছে। ওদিকে আবার মেয়ের বাপ নারাজ। তাকে ঠান্ডা করা গেল, তখন আবার নিজের বাপ মাকু ঠেলতে লাগল...।

চাষীর ঘরের মেয়ে, স্বাধীনতা তেমন ছিল না। কিন্তু ফন্দী সৃষ্টি করত বটে। আর গুরুজনদের চোখে ধুলো দিতে হয় না। বাপের চোখে তো আল্লা সেদিন মাটি ছিটিয়ে দিলে সর্দিগর্মি'র চোটে। ধীরে ধীরে মাটি হচ্ছেন তিনি। সখিনার বাবা নিরুদ্দেশ। সংসার-বৈরাগী। সে ঘটনা তাদের বিয়ের পরের বছর। শান্ত লোক এমনিতে। কিন্তু প্রথমে মেয়ের উপর ভয়ানক চটেছিল—কে কারে

বিয়া কইরব হে মাইয়া পোলার হুকুমে হেব? পুরাতন স্বর এখন চিৎকারে দীর্ণ। ভিটার পাশের হিজলগাছের ঝাঁকড়া ডালপালা গফুরের সামনে অতীতের ইঙ্গিতের মতো। সন্ধ্যার পূর্বেই সে হিজলগাছে চড়ে বসে ছিল। সখিনা জানত বইকি। তাই নিচে ডোবার হাতমুখ ধোয়ার অছিলায় সে-ও গাছে উঠে এসেছিল। গাছচড়ুনী মাইয়া। গাঁয়ে বদনাম ছিল যথেষ্ট। বেশ দেরি দেখে সখিনার মা এসে ডাকাডাকি করে, তারা চুপ করে গিয়েছিল। ফন্দী আঁটতে দেরি হয়নি। উপস্থিতবুদ্ধি ছিল, এখনও আছে বটে সখিনার! গাছ থেকে চুপিচুপি নেমে এসেছিল সে। মা দেখতে পায়নি। তারপর হুড়মুড় মাকে জড়িয়ে বাড়ির দিকে দৌড়। মুখে সারা দেহের কম্পনসহ 'ভূত-ভূত' চিৎকার। মার সঙ্গে একদম উঠানে। সেই ফাঁকে জ্যান্ত ভূতের পলায়ন। তখন সংসারের চাপ ছিল না ঘাড়ে, বাপ বেঁচে। সাহস প্রচুর। কত ছুতোয় না সে সখিনার কাছাকাছি হত। পিটিয়ে বাপ সিধা করে ফেলত ধরা পড়লে। কিন্তু নসীবের জোর, খাদে পড়েনি কখনও, তারপর শাদী পয়গাম অর্থাৎ বিয়ের প্রস্তাবপর্ব। এক পাড়া-সম্পর্কীয় বৃদ্ধাকে নানা ঘুষ দিতে হয়েছিল। ঘুষদানের ক্ষেত্রেও দুজনে সমান শরীক। সখিনা বৃদ্ধার কত পাকা চুল না তুলে দিয়েছে। ফোগলা বুড়ি। পান খেত গাদা গাদা। হামানদিস্তায় তার পান ছেঁচে দিতে হয়েছে বহুত। কত কান্ড। তারপর না বিয়া।...

হঠাৎ-খেয়ালের শিকার হল গফুর : এই ছায়াস্নিগ্ধ অন্ধকারে বৌ নিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরা তার বড় সাধ। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে সে। আকাশে চাঁদ আছে কোথাও, অনুমানসাপেক্ষ। মেঘের জুলুমে রোশনাই স্পষ্ট নয়। সকাল-সকাল খেয়েদেয়ে পায়চারি করা যেতে পারে। বেগানা কেউ সামনে পড়লে লজ্জার কী আছে? কোন একটা বাহানা করবে এই বিবাগীপনার সাফাই দিতে। কিন্তু তখনই গফুরের মনে পড়ল প্রাচীন কবিয়াল সুরত মন্ডলের কথা। বড় রসিক মানুষ। জীবনের সব খুইয়ে বসে আছেন, তবু জওয়ানদের পেলে বড় মজার-মজার গল্প ফাঁদেন। আর তিনি হাঁটতে পারেন না। চোখের দৃষ্টি কমে গেছে। কিন্তু বৃদ্ধা মরে যাননি। এই ভরসাবে মন্ডলের কাছে যাওয়া উচিত। গ্রাম-সুবাদে সুরত দাদু বড় স্নেহের চোখে দেখেন সকলকে। তাঁর কণ্ঠস্বরেই কী যেন আছে। সেই ডাকে আপন-পর ভেদ মুছে যায়। গোরুর লেজ মলে-মলে দিন গেল। নচেৎ এক কালে তার বড় সাধ বা শখ ছিল দাদুর সাগরেদ হওয়ার। সখিনাকে বিয়া করার সময় বৃদ্ধ কী ঠাট্টা না করতেন। আশনায়ের ফাঁস/বাঘের ত্রাস/বর্ষাকালে তরমুজের চাষ/...নাকি একই কথা। মৃত্যুভয়, মেহনত, দুরাশা—একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে। বড় রসিয়ে-রসিয়ে বৃদ্ধ কবিয়াল ব্যাখ্যা দিতেন। বহুদিন মন্ডলপাড়ার দিকে মুখ ফেরাতে পারেনি গফুর। লজ্জার বাধা সত্ত্বেও সেদিকেই আকর্ষণ বেড়ে যায়। ঘরের বউ সখিনা। সে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আজ না হয়, কাল হবে। কিন্তু দাদুর দিন ঘনিয়ে আসছে। পাকা ফল, যে কোন দিন বোঁটা থেকে খসে পড়বে। তখন আফশোসের অন্ত থাকবে না। বাপজান দাদুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। কবিয়াল মদত না দিলে বিয়ে নির্ঘাত ফসকে যেত। অথচ অমন মানুষের কথা সে ক্রমশ ভুলে গেছে। বিয়ে ফুরোলে ছাদনায় লাথি, মিথ্যে নয়। আবহাওয়ার কথা খোদা বলতে পারে। কখন কী হয়। এই ফাঁকে কবিয়াল দাদুকে দেখে আসা উচিত। সেদিন সংকল্প অনুযায়ী গফুর হনহন মন্ডলপাড়ার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। পাড়াটা গ্রামের মাঝামাঝি পুব-কোণে। পথে একটা বড় দীঘি আছে। পাড়ে রাজ্যের গাছপালা। এককালে গফুরই ওই আস্তানায় বহুত রাত-তক কাটিয়ে দিত। কত লোকের গুলতানিতে মুখর। গফুর সেদিন সোজা মন্ডলের পায়ে সালাম জানিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। বৈঠকখানায় থাকেন কবিয়াল সুরত মন্ডল। প্রতিবেশীরা সাহায্য করে। নিজে কখনও কোন সঞ্চয় রাখেননি। নিজের শুধু ফলাকর গাছ আছে কয়েকটা। যারা অন্ন যোগায়, তারাই দেখাশোনা করে। সেখানে কিছু আয় হয়। তাছাড়া গ্রামের অনেকে এটা-সেটা দাদুকে দিয়ে যায় খেতে। হরি জেলে এদিকে মাছ ধরতে এলে

দাদুর জন্যে কিছু বরাদ্দ রাখবেই। কবিয়ালের সাবেক কালের খ্যাতি এখনও অনেকের কাছে টাটকা। অবিশ্যি প্রাচীন লোকেরা খসে যাচ্ছে। নতুন ছেলেছোকরারা তেমন আমল দেয় না। সেদিন গফুরকে পেয়ে সুরত মণ্ডল এমন খুশি হয়েছিলেন যে বারবার উছলে-উছলে পড়ছিলেন। ওদিকে গফুর লজ্জায় হাবুডুবু খেয়ে অস্থির। বারবার ক্ষমা প্রার্থনা আর নিজের লম্বা অনুপস্থিতির কৈফিয়ত দিতে থাকে। মণ্ডল কিছুই গায়ে মাখেননি। অনুতাপহীন কণ্ঠ। মৃদুভাবে উচ্চারণ করেছিলেন—এ-ই দুনিয়ার নিয়ম। বুড়ো গাছ বাগানের আওতা।

—দাদু, আপনার সময় কী করে কাটে? অন্য পক্ষ থেকে প্রশ্ন।

—কেন? আগে যা করতাম, এখনও তা-ই করি। তালপাতায় সব লিখে রাখছি। গাঁয়ের কেউ না কেউ একদিন এসব গান করবে। সুরত মণ্ডল তারপর আঙুল বাড়ান বৈঠকখানার এক কোনার দিকে এবং বলতে থাকেন—ভাই গফুর, নিজের মনে গুনগুন করি আর লিখে রাখি। সারাজীবন এ-ই তো কাজ ছিল। একটা দোয়াত, খাগড়ার কলম আর কিছু তালপাতা আমার কাছেই থাকে।

—এত তালপাতা পান কোথা থেকে?

—পাড়াগাঁ। (ফোকলা গালে মৃদু হাসি) তালগাছ যখন আছে, পাতার অভাব কী? সবাই আমাকে পাতা কেটে শুকিয়ে দিয়ে যায়। ঝাপসা চোখ। তবে পদ এখনও সোজা লিখতে পারি। আঁকাবাঁকা হয় না।

গফুরের তখন আফশোস হয়, একদম খালি হাতে তার দাদুর কাছে আসা উচিত হয়নি। কিছু আনা উচিত ছিল। বুড়ো মানুষের জন্যে অন্তত একটা ফল। সহজে খেতে পারেন, তালশাঁস আনা যায়। গফুরের চোখে পড়ল বৈঠকখানায় একটা বাঁশের মাচাঙে অনেক তালপাতা ছোট ছোট আঁটি-বাঁধা। দাদুর সময় কাটার হদিশ বুঝতে তর বিলম্ব হয় না।

দেখা গিয়েছিল, মণ্ডল অতীতে ডুব দিতে নারাজ, অথচ গফুরের টান সেদিকে। মণ্ডল গ্রামের খোঁজখবর নিতেই বেশি উৎসাহী। তাই কাছি টানাটানিতে গফুর ঢিলা দিল। কারণ, দাদু নিজের কথা বলতেই চায় না, বরং চাপা দিতে পারলে যেন খুশি। সংবাদের যোগান আসে। কার সংসার কেমন চলছে, ওপাড়ার দু-ভায়ে কাইজ্যা ছিল মিটেছে কিনা, এবার চাষাবাদ কেমন, কেউ গাঁ ছেড়ে গিয়েছিল, কবে? ইত্যাদির প্রবাহ। বৃদ্ধ কবিয়ালের রেখাঙ্কিত মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। বাত আছে পায়ে। তা নিয়ে কোন আদিখ্যেতা নেই। লক্ষ্য করা যায়, মণ্ডল শুধু কথা বলার জন্যে কথা বলছেন না, নিজেও তার মধ্যে হাজির আছেন। শেষে প্রসঙ্গ উঠল, গ্রীষ্মের এবং হালফিল মেঘলা ছায়ার। চোখ ভাল নয়। সুরত মণ্ডলের বড় আফশোস। নচেৎ তিনি একটা নিজ মন্তব্য দিতে পারতেন। গফুর কথা সংক্ষেপ করতে মনে মনে উশখুশ করছিল, তৎপূর্বেই কবিয়াল জিজ্ঞেস পেড়ে বসলেন—ভাই, তোমার কোন অসুখ আছে নাকি?

—অসুখ? না। আৎকানো জবাব।

—তবে বুড়ার সঙ্গে এত পীরিত। ঘরে নাতবৌ আছে না? না, কাইজ্যা করে বেরিয়েছ?

গফুরের বিস্ময়ের কূলকিনারা থাকে না। রোগে শোকে জর্জরিত, তবু আশ্চর্য প্রাণশিখা। নজর সবদিকে ঠিক আছে। সমীহায় বিগলিত জবাব দিয়েছিল,—নাতবৌ তো আছে। তবে আপনাকেও দরকার।

—কেন?

—আপনি রসিক মানুষ। গোটা গাঁর মানুষকে কত হাসিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন। আপনার ধার কত। একটা ছুরির ধার ক্ষয়ে গেলে অন্য ধারাল ছুরির সঙ্গে ঘষে নেয়, আপনি বুঝি জানেন না?

দুর্বল হাতে নাতির পিঠে স্নেহের থাপ্পড় কষিয়ে জবাব দিয়েছিলেন—ভাই, তুমিও কম

যাও না। এখন বাড়ি যাও, না হলে নাতবৌ আমার উপর গোস্সা হবে।

—তা যাব। আর একটু ধার দিয়ে নিই। খিকখিক হাসি উঠেছিল তারপর দুই পক্ষেই।

—বসো, ভাই। আর একটা কথা জিগাই।

—বলেন।

—হঠাৎ গরম, হঠাৎ ছায়া হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী?

—মেঘ করেছে। বাদলা দিন।

—নিজের চোখে দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—আমার চক্ষু নেই। ভাবছি, কী হল? তোমাদের শোনা কথাই সম্বল।

—সবাই দেখেছে। গাঁয়ে এক কবি এসেছেন, তিনিও—।

—শহরের কবি?

—হ্যাঁ।

—কী বললেন?

—সব ভালোর জন্যে।

—মেঘ ঠিক তো?

—হ্যাঁ, মেঘ। দেখেন না কত পুরু ছায়া। এতদিন গরম চললে বেবাক মরতাম। বাপ্জান—।

গফুরের কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই তার চোখ ভিজে ওঠে। বৃদ্ধ সান্ত্বনা দিতে থাকেন—ভাই, কেঁদো না। সংসারে মৃত্যু হয়তো থাকবে। কিন্তু অপঘাত, অকালমৃত্যু হয়, এই বড় দুঃখ।

বৃদ্ধও এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। দুই চক্ষু আর শুকনা নয়।

দুই পাশে দুই শতাব্দী। মাঝখানে যুগ-যুগান্তের স্তব্ধতা।

এক ফাঁকে হঠাৎ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কবিরাজ উচ্চারণ করেছিলেন—বাড়ি যাও ভাই। ফুরসুত পেলে আবার এসো।

গফুর তখনও নিজের দুঃখের জের কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভারাক্রান্ত মনেই তাকে সঙ্গত্যাগ করতে হয়েছিল, অথচ আর কখনও এমন ঘটেনি। সুরেত মণ্ডল কথা মারফত সব অসোয়াস্তি মুছে নিতে সক্ষম, যখন অপরকে হাসানও প্রচুর। অথচ তিনিই ঝিমিয়ে পড়লেন। গফুরের প্রথম মনে হয়, দাদু সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছেন। বুড়ো কী? দাদুও মরে যাবে। বাপজানের মৃত্যু ওকেও ঘায়েল করে গেছে। অকালমৃত্যু হয়, এই বড় দুঃখ। সত্যি বা-জান তো ওঁর চেয়ে কত ছোট ছিলেন।

সখিনাকে নিয়ে সেদিন ঘোরার কল্পনা মাটি। বেচারা সারাদিন কাপড়-কাচা এবং গেরস্থালির অন্যান্য এত কাজ করেছে যে বেশি তাগদ বাকি ছিল না। প্রস্তাব পেশ করার ফলে সখিনা দুঃখিত। অমন অবকাশের লোভ সবসময় থাকে বৌকি। বাপের বাড়ি একই গাঁয়ে। অথচ কমাস যেতে পারেনি। অতীতের মমতাস্রোত তোড়ের দিক থেকে কিছু কমতে পারে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী আঠা-কাঠি। জড়িয়েই আছে তারা। গফুরের বিপদ-অগ্রাহ্য বেপরোয়া শক্তির হদিস এইখানে প্রচ্ছন্ন। একেবারে কৈশোরেই সে গান বাঁধতে শিখতে চেয়েছিল। কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষীরা আর ওই পথে এগোতে দেয়নি। সুরেত মণ্ডল নজীর। জীবন সুখের হয় না। কারো মতে, গান শাস্ত্রবিরুদ্ধ। হয়তো তাদের কথাই ঠিক। বাপ প্রথম থেকেই এমন ধমক দিয়েছিল যে আর সাহস পায়নি, ওদিকে পা বাড়ায়। কিন্তু মণ্ডলের সঙ্গে তার সাহচর্য ছিল সবসময় অটুট। অনেক উপদেশ সে শুনেছে বৌকি। অন্তত একটা ফল ফলেছে। গাঁয়ে গফুরকে সকলে খাতির করে। যেহেতু সচ্চরিত্র। অপরের বিপদ-আপদে কল্প-দাতা। তার নানা কাহিনী মুখে মুখে চালু আছে। জওয়ানদের দলে গফুরের কথা তাই বিশেষভাবে

খাটে। দু-বছর আগেও তার মিষ্টি গলা ছিল। সান্নিপাত-জ্বরে সে বেঁচে যায়, কিন্তু গলা বাঁচেনি। নচেৎ কত চাঁদনী রাতে একদণ্ডলে সে মাঠ গুলজার রাখত। এখন আর গলা ছেড়ে সে গান গায় না। মনে মনে গুনগুনোয়। সুরত মণ্ডলের আফশোস তার আর সাগরেদ জুটল না। দিনকাল কেমন যেন হয়ে আসছিল। মানুষের প্রাণে ফুর্তি নেই, গানও গায়েব। কবিয়াল নির্জনতার সমুদ্রে থ' দেয়। অনুভূতির নানা রূপো বন্দরে নিয়ে যায়, সেখানেই যত সোয়াস্তি। এবং তরুণ কেউ কাছে এলে বৃদ্ধ যেন স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

মাদবর প্রাচীনদের দলে পড়ে। কিন্তু সুরত মণ্ডলের চেয়ে বারো বছরের ছোট। দুইজনে একটা মিল ছিল। উভয়ে গাঁয়ের সুখে-দুঃখে একাত্মা। যে-যার ধান্দায় ব্যস্ত, দুজনে দেখা-সাক্ষাৎ প্রায় নেতি। তবু অনেক সময় ভোর রাত্রে মাদবর তার মণ্ডলকাকার কাছে হাজির হত। মাদবরের জানা আছে, খুব ভোরে ওঠে মণ্ডল সাবেক অভ্যেস অনুযায়ী। তাই ছুটে যেত অমন অসময়ে। মাদবরের ঝঞ্ঝাট কম নয়। তার কাছে সকাল মানেই ঝামেলা। নানা জনের নানা ব্যাপারে পরামর্শ দিতে হয়। সুতরাং ভোরেই কিছুক্ষণ প্রাণ খুলে কথা বলা যায়। খরার সময় মণ্ডলকাকার খবর সে নিতে পারেনি। অপরাধবোধের তাড়না ভেতরে অনেক। অবিশ্যি কাকার সংবাদ সে রোজই নিত লোকমারফত। মাদবরের মনে হয়েছিল, এই খরা-ছায়ার ব্যাপার বুঝ করতে একবার কাকার কাছে গেলে কেমন হয়? ছায়া চতুর্দিকে। ঠিক যেন বাদলা দিন। অথচ বৃষ্টি নামছে না কেন? কাকা অভিজ্ঞ মানুষ। একটা কিছু ভালমন্দ বলতে পারবেন। কিন্তু মাদবরের তা দরকার হয়নি।

সেদিন রাত্রে স্ত্রীর আলিঙ্গনে সমাহিত গফুর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল :

..ঠাণ্ডা শিরশিরিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের উপর দিয়ে। যেদিকে তাকাও, তাবৎ সবুজের বন্যা। কত ফসল, কত সবজি। তার গোযান উড়ে চলেছে শূন্যে, রাজ্যের তরুণ-তরুণী শিশুর দঙ্গল। গান গাইছে ছাউনিহীন গাড়ির আরোহীরা এবং নাচছে কোমর-জড়াজড়ি, করতালির শ্বাসাঘাতে চঞ্চল। তারও কণ্ঠ নীরব নয়। আবার সাবেক গলার গান শুনছে সে। তেপান্তরে পাড়ি অসীম শূন্যে যেন মাটির জমিনের সহোদর- -আঁকবাঁক আছে, নানাকারের বন্ধুরতার অর্কেস্ট্রায় অন্তহীন, কেবলই ইঙ্গিতের তরঙ্গ ভাসিয়ে উধাও হয়ে যায়। তার গতিবেগ সম্বাদীস্বরূপে রক্ষার জন্যে মণ্ডল দাদু কখন পলিত-কেশ নয় একদম জোওয়ান কালের চারণ-বেশে দলে এসে ভিড়েছেন কেউ খেয়াল করেনি, যদিও তাঁর করতালি হাজার অনুরণনের মধ্যেও নিজস্ব চারিত্র্যে ধ্বনিত। মানুষের কাছে শোনা, তাঁর যৌবনের সেই বাবরী-কুঞ্চিত দোলভঙ্গী আদল। ফুলের মালা তরুণী-দের খোঁপায়, নিতম্বে ফুলেরই চন্দ্রহার। মাটির উপর শূন্যে একই সুর। তার গো-যানের উঁচোনো চাবুক যেন দূর-বন্দর অভিমুখী কোন বিনামা জাহাজের মাস্তুল—সুরের ধাক্কায় ঈষৎ-ঈষৎ কাঁপছে, যখন আবীর-প্রমাণ বিন্দু-বিন্দু ইলিশ-ডিম বৃষ্টি নামল...

তিন

এই গ্রামের ক্ষেত-খামার প্রায় এক-দেড় মাইল দূরে আরম্ভ। বিরাট মাঠ ক্রোশ দুই জুড়ে। জমি শুধু গোড়গ্রামের অধিবাসীদের নয়। অন্যান্য মালিকও আছে। কেউ কেউ গাঁয়ের ভেতর বসত-বাড়ি থাকলেও মাঠে খামারের সঙ্গে বসবাসের ব্যবস্থা রেখেছে। অধিকাংশ চাষী সন্ধ্যা হলেই গাঁয়ে ফিরে আসতে ভালোবাসে।

ঈশ্বর পণ্ডিত বহুকাল থেকে তার খামারবাড়ির অধিবাসী। গ্রামে রোজ-রোজ আসা তার পছন্দ নয়। তাকে আর এই পল্লীর অধিবাসী বলা খামখা। মাঠের সঙ্গে তার যেন গাঁটছড়া বাঁধা।

আজ নয়, যৌবনেই ব্যাপারটা ঘটে। অবিশ্যি ওকে নিয়ে একটা কুৎসা চালু আছে। শ্বশুরের অবস্থা ভালো নয়, এক বিধবা শালী এসে তার ঘরে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে তার সঙ্গে গোপন প্রণয় দানা বাঁধে। কৃষকপরিবারের মেয়ে বসে-বসে অন্নধ্বংস করত না। চাষের নানা কাজে সে ছিল পণ্ডিতের দোসর। বোনের কোন কোন দিন বাড়িতে ফিরতে দেরি হত। রুগ্ন দিদি কিছু মনে করত না। এসবের বহু পূর্বে ঈশ্বর খামারবাড়ি তৈরি করেছিল। বহু রাত্রি সে একা সেখানেই কাটিয়ে দিত। ফসলের সময় তার ফুরসুত থাকত না। কাছে নদী। গঞ্জের ব্যাপারীরা নৌকা নিয়ে হাজির হত মৌসুমী আনাজপত্র কিনতে। সেদিক থেকে ঈশ্বর পণ্ডিতের অনেক সুবিধা। যেমন, কুমড়ো গাঁয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মেহনত আছে। জনমুনিশ প্রয়োজন। মাঠে খামারবাড়ি থাকার ফলে এই খরচ আর লাগত না। বিধবা শালী মেহনতে যে-কোন পুরুষের সমকক্ষ। আবাদের সময় নিজেই নানা কাজে লেগে যেত, রান্নাবান্না তো আছেই। তখন জন-মজুরদের খেতে দিতে হয়। তারা গ্রামে খেতে গেলে তো সময় নষ্ট। এমনতর নানা সুবিধা। ধীরা ভগ্নীপতির ডান-হাত, বাঁ-হাত। এইভাবে দুই জনে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, যখন অঙ্গের সান্নিধ্য আর অশোভন কিছু নয়। ঈশ্বরের বারো-মেসে রুগ্ন স্ত্রী ব্যাপারটা সহজে মেনে নিয়েছিল। অল্প বয়সে বিধবা বোন। তার প্রতি দিদির টানও ছিল প্রচুর। সারাজীবন নরকবাসের চেয়ে ভালোই হয়েছে। বোনের চেয়ে বয়সে বড়। তা ছাড়া নিজের ছেলেমেয়ে চার-পাঁচ জন। স্বামীর উপর ষোলো আনা ভাগ বসানোর কোন লোভ বা জিদ ছিল না। চাঙারি মাথায় বোন মাঠে যাওয়ার সময় সে বরং তেলচুকচুক তার চুল বেঁধে দিত। গ্রামে সবাই আঁচ করত। কিন্তু কারো চোখে তো দেখা নয়। তখন অপবাদ খামখা। ফলিয়ে লাভ কী? ঈশ্বর যৌবনে ভারী জাঁহাবাজ লোক ছিল। তাকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস করত না।

অতীতের কথা।

ঈশ্বরের বয়স তখন সত্তরের বেশি। ছেলেরা গাঁয়েই থাকে। তাদেরও ছেলেমেয়ে প্রচুর। ঈশ্বরের স্ত্রী বহুদিন মারা গেছে। শ্যালিকাও তারপর খুব বেশিদিন বাঁচেনি, কিন্তু ঈশ্বর পণ্ডিত যমের মুখে নুড়ো জেবলে দিয়ে বহাল-তবিয়ত মাঠ সরগরম রেখেছিল। ঠুকঠাক লাঠি হাতে বেশ হেঁটে বেড়ায়। গাঁয়ে আর পা দিত না। অন্তত গত দশ বছর। উন্মুক্ত মাঠের আলিঙ্গন মুগ্ধ আর ভুলতে পারেনি। তার খামারবাড়ি কালে কালে সুন্দর গাছপালা-ঘেরা বসতবাড়িতে পরিণত হয়। চার-পাঁচটা তালগাছ ভিটের সামনেই। দুটো বারো মাস ফলে। কিন্তু ঈশ্বর তালের নয়, তাড়ির প্রেমিক। সবাই বলত, নেশা করেই বুড়ো এতদিন বেঁচে আছে। ওর ছেলেরা অবিশ্যি মাঠে এসে কাজ করত দিনে। সন্ধ্যায় আবার গ্রামে। বুড়োর সঙ্গে কোন না কোন এক নাতি থাকত। ছেলেরা সকলে খুব মেহনতে। স্বচ্ছল অবস্থা। বুড়ো মাঠে থাকার ফলে অনেক সুবিধা। ফসল পাহারা দিতে আর লোক লাগে না। বুড়োমানুষের ঘুম কম। তামাক টানছে আর কাশছে—এই তো রুটিন। ঈশ্বর পণ্ডিতের দেখাদেখি আরো কয়েক ঘর চাষী মাঠে বাস তুলে নিয়ে এসেছিল। তাদেরও কেউ কেউ সন্ধ্যায় পর চলে আসত বুড়োর সঙ্গে গল্প করতে। ঈশ্বর পণ্ডিত বলত- সাঁঝপহর আমার বেশ ঘুম হয় নেশার ঝোঁকে। তারপর তো জেগেই থাকি। তামাক নিজেই সেজে নিতে পারত সে। কোন সাহায্য দরকার হত না।

ঈশ্বর পণ্ডিতের খ্যাতির আরো হেতু ছিল। বিরাট বিরাট তরমুজ ফলত তার খেতে। আধ মণ, তিরিশ-সের ওজন এক-একটার। গোটা তল্লাটে বিয়েবাড়ির উৎসবে, দান-যৌতুকে পণ্ডিতের খোঁজ পড়ত ওই পেল্লায় তরমুজের জন্যে। অনেক চাষী মনে করত, পণ্ডিত মন্ত্রবিশারদ। তাই অমন ফসল। সে পালটা দিত, আসল তেজ মাটির, তারপর মেহনত। মন্তরটন্তর ফু-ফু…। ছেলেরা বাবার কাছ থেকে চাষের ইলেম শিখে নিয়েছিল। কিন্তু চল্লিশ বছর আগেকার বড় তরমুজ আর

ফলাত না। ঈশ্বর মন্তব্য করত, মানুষ বুড়ো হয়, আর মাটি বুঝি জোওয়ান থাকে? তবু তরমুজ-খেতের প্রতি বুড়োর প্রেম ছিল অকৃত্রিম। মৌসুম এলে নিজেই ছেলেদের কাজ তদারক করত। মাথায় ছাতা, দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ কৃষক। এককালে অবিশ্যি তার মাথায় টোকা পর্যন্ত লাগত না। রোদ্দুর মধুর-মধুর। ছড়া কাটত পণ্ডিত। চেহারায় সাবেক জৌলুস পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু বুড়োর তেজোদীপ্ত জোড়া চোখ স্পষ্ট জানিয়ে দিত, এককালে ওই দেহ থেকে কী বিদ্যুৎ চমকাত মাটির সঙ্গে লড়াইয়ে।

ঈশ্বর পণ্ডিত বহুদিন আর গ্রামে ঢোকেনি। লোক মশকারা-যোগে মন্তব্য করত—খালীকে নিজের হাতে শ্মশানে পুড়িয়ে এসেছে, সে আর গ্রামে যায় না, বুড়ো তখন কী করে যায়?

সেদিন রাত্রে ঈশ্বরের কাছে ছিল তার মেজো ছেলের ছেলে বুলান। বছর চোদ্দ বয়স, দাদুর বড় ন্যাওটা। মাঠে এলে সহজে গাঁয়ে যেতে চাইত না। তার লেখাপড়া আছে, বাবা বকাবকি করত। কিন্তু মাঠে টইটই চরে বেড়ানো বা দাদুর টান—যে-কোন কারণেই হোক, সে নাছোড়বান্দা। একবার এলেই অন্তত তিন দিন। লেখাপড়া শিকেয় তোলা থাক। বাপ ধমক দিলে, পিতামহ উল্টে চোট মারত - চাষীবাসির ছেলে, পড়ে কী হবে কেউ জানে। তার চেয়ে মাঠের কাজ দেখুক..., ইত্যাদি। সুতরাং পৌত্র-পিতামহ একাত্ম। ন্যাওটা কী সাধে।

সেদিন ভোর রাত্রে বুড়ো তরমুজ-খেত তদারকে বেরিয়েছিল। যৌবনের এই বাতিক আর যায়নি। তরমুজের লতা কোথাও হেলে পড়েছে গর্তের ভেতর, পণ্ডিতের তা সহ্য হবে না। নিজের হাতে একটা আবছা আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে, তবে নিস্তার। বুলান বারণ করত, দাদু, কোনদিন আপনাকে সাপে খাবে। এত রাতে ওঠেন কেন? জবাব মজুদ ছিল, সাপ আমার স্যাঙাত।

বুলান জেগে গিয়েছিল। দাদুর সঙ্গে যায়নি। বুলানের লোভ হয়েছিল। কিন্তু তামাক সাজতে ভাল লাগে না এই ভোর রাত্রে। দাদুর ফরমাশ সম্পর্কে সে বেশ ওয়াকিবহাল। তাই মটকা মেরে শুয়ে ছিল। বেশিক্ষণ যায়নি। হঠাৎ দাদুর তীব্র চিৎকার তার কানে ধাক্কা দেয়। ধড়মড়িয়ে উঠে লাঠি হাতে সে বেরিয়ে পড়েছিল। মাঠের সব ঘরেই ওই অস্ত্র মজুদ থাকে। সাপ মারতেও তো লাঠি প্রয়োজন হয়। বুলান তরমুজ-খেতের দিকে ছুটে গিয়েছিল। দাদুর বাতিকের সঙ্গে তার পরিচয় তো আজকের নয়।

-বুলান- বুলান- এদিকে আসিস না - পোকা -পোকা- গাঁয়ে খবর দে। দাদুর এই আর্ত-চিৎকার তার কানে স্পষ্ট বিঁধেছিল, সোজা। বিঘে চার জমি দূরে তরমুজ-খেত। দৌড়ে যেতে আর কতক্ষণ? কিন্তু ঈশ্বর পণ্ডিতের নিষেধবাণীর জন্যে সে ত্রস্ত থমকে দাঁড়িয়েছিল। শুক্লপক্ষের রাত্রিশেষ। আবছা চতুর্দিক দেখা যায়। চোখে যেটুকু ঘুমের অবশেষ ছিল, তা বুলানের চোখ থেকে ছুটে যেতে দেরি হয়নি। হুঁশিয়ার কিশোর সে। সরেজমিন বুঝে নিতে তৎপর, কী ঘটছে।

বুলানের চোখে পড়ল, চাপবাঁধা কালো মেঘের স্তূপের মতো কী যেন ঘেয়ে-ধেয়ে আসছে আর দাদু লাঠি ঘোরাচ্ছেন। তার চিৎকার তখন স্পষ্ট, বুলান আসিস নে—আসিস নে। গাঁয়ে গিয়ে খবর দে -।

কিশোর বালকের আক্কেলে কুলায় না। ভয় পায় সে। কী অমন দলে দলে উড়ে আসছে। কোন হিংস্র বাদুড় নয় তো? রক্তপায়ী বাদুড়—বইয়ে যা সে পড়েছে।

দাদুর লাঠিনাড়া সে দেখতে পায়। তারপরই ঈশ্বর পণ্ডিত মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বুলান তখনও কর্তব্য স্থির করতে পারেনি। এখনই দাদুকে কোলে তুলে নেওয়া উচিত। কিন্তু শেষ চিৎকার শোনা গেল - পালিয়ে যা—গাঁয়ে খবর দে—আমাদের ক্ষেত খেয়ে ফেলেছে—। দাদু পাগল হয়ে যায়নি তো? যার ফলে, এসব বিকার-বক্তৃতা?

কিন্তু আবার চিৎকার শোনা গেল—যা পালিয়ে যা— এখনও দাঁড়িয়ে কেন? তখন আর কোন সন্দেহ থাকে না বুলানের। অমন খনখনে গলা, টনটনে বুদ্ধি দাদু পাগল হয়ে গেলে দুনিয়ার আর সব মগজই ঘোলাটে হতে বাধ্য।

হিসেব-নিকেশ খুব দ্রুত। শেষবারের মতো দাদুর কণ্ঠস্বরের দিকে মনোযোগী হয়েছিল বুলান। কিন্তু সব ঝাপসা ক্রমশ। বাদুড়ের ডানার মতো তেমন কালোয়-কালোয় ঢাকা, আর কিছু দেখার যো নেই। একটা বিকট গোঁ-গোঁ আর্তনাদে তখন সারা মাঠ নাড়া খাচ্ছিল। গোঙানি কী মানুষের ভাষা নয়?

স্পন্দিতবক্ষ বুলান এক দৌড়ে নিকটস্থ খালের পাড় থেকে নিচে নেমেছিল। এঁকেবেঁকে সোজা গাঁয়ে ঢুকেছে এই সোঁতা। বর্ষাকালে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। তারপর এমন প্রাকৃতিক খেল কেবল কোটালের বানের উপর নির্ভর। খালের গায়ে গায়ে খাগড়া-বন। বন-বাদাড় ঠেলে বুলান দৌড়তে লাগল। পেছনে ফিরে দেখার অবকাশ কোথায়? দাদুর আর্তনাদ পিছু ধাওয়া-রত। বুলান চোখের জল মুছছিল। দিশাহারা সে দৌড়য়, শুধু দৌড়য়, শুধু—।

মেহনতী মানুষ সব। ভোরের দিকে ঘুমের ঈষৎ আয়েস উপভোগ করে। গ্রীষ্মকালে চাঁদনী রাতে সকলেরই শুতে দেরি হয়। তখন সারাদিনের খাটুনির পর দাওয়ায় বসে তামাক খাওয়া আর খোশগল্পের চেয়ে মজাদার আর কী আছে এই এলাকায়?

কিন্তু বুলানের চিৎকারে তার বাড়ি কেন গোটা পাড়ার ঘুম ছুটতে দেরি হয়নি। কাছেই গফুরের বাড়ি। সে কোন বিপদ আঁচ করে একদম লাঠি হাতে বেরিয়ে এসেছিল। তার দেখাদেখি অনেকের হাতেই হাতিয়ার, যেন শত্রুর মোকাবিলায় বিলম্ব না ঘটে।

সকলেই তখন মাঠ-অভিমুখী, দৌড়-রত। এক-দেড় মাইল পার হতে কতক্ষণ আর লাগবে? দাদুর ন্যাওটা, তেজী বুলান ক্ষমতা বা যে-কোন টানেই হোক বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছিল, যদিও একই পন্থায় তার একদফা পাড়ি আগেই দেওয়া।

একুনে দশ-বারো জন। তরমুজ-খেতের কাছাকাছি পৌঁছে সকলে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশ সেদিকে ফর্সা। একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মেঘ করে ছিল এতদিন। তবে কি ওদিকে তা কেটে গেছে? জোছনা অবিশ্যি মাকড়া। কারণ, মেঘে ঢাকা থাকলে জোছনায় ফিন ফোটে না। কিন্তু ঈশ্বর পণ্ডিতের জমির উপর জ্যোৎস্না পর্যন্ত স্বরূপে প্রকাশিত।

থমকে দাঁড়িয়েছিল গোটা দঙ্গল। বুলানের বর্ণনা অনুযায়ী তারা ভয়ানক বিপদ আঁচ করেছিল। তার কোথাও কোন চিহ্ন (আলামত) নেই। এই মাঠে বারো মাসই কোন না কোন ফসল থাকে। বর্ষার সময় নৌকা-চলাচল করে খাল-পথে। অতিপরিচিত জায়গা। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা তো আগে থেকে জানান দেয়। এখানে তার কোন লক্ষণ নেই। তাই সকলে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তবু এগিয়ে গিয়েছিল গ্রামবাসীরা, মনের ভেতর হুটোপুটি যতই থাক। বুলান প্রথম কাতারে প্রথম জন। অবিশ্যি জমির উপর যাওয়ার পূর্বেই সকলকে থামতে হয়েছিল।

সম্মুখে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঈশ্বর পণ্ডিত! পাশে ইহলোকের সঙ্গী লাঠি মোতায়েন।

হাউমাউ বিলাপ শুরু করে দিয়েছিল বুলান, ঈশ্বরের ছেলেরা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যারা দলের সঙ্গী। বুলান ঠাওর করতে অক্ষম, চারপাশে কী ঘটছে। একটু আগে যে-দাদু তাকে

সন্দেহে ডাক দিয়েছে সে আর কোনদিন মুখ খুলবে না। মৃত্যু ছিল বুলানের নিকট অপরিচিত ঘটনা। তাই হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, চোখের পানী পর্যন্ত বন্ধ। আত্মীয়স্বজনেরা শোকের প্রথম ধাক্কা সামলে কর্তব্যের মুখোমুখি শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এমন অপঘাত মৃত্যু। কারণ কী? এই হদিস প্রথমে তাদের জানতে হয়, এখনও যাদের ধড়ে প্রাণ ছিল।

ঈশ্বরের মুখ ঢাকা দেওয়ার পূর্বে এক আত্মীয় ভালো করে দেখে নিলে, দম হঠাৎ বন্ধ হয়ে মৃত্যু। মুখে তার ছাপ রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটল কী ভাবে?

বুলানকে কয়েকজন জেরা শুরু করেছিল।

—তোকে পালিয়ে যেতে বলেছিল?

—শুধু পালিয়ে যেতে? চিৎকার দিয়ে বললে, পালা—পালিয়ে যা—সব খেয়ে ফেলবে।

কী খেয়ে ফেলবে?

—তা আর বলেননি। হঠাৎ ঘুম-ভাঙা। আমি হয়তো শুনতে পাইনি।

—তবে বিপদ কিসের?

তা জানি নে। দাদুকে আমি লাঠি ঘোরাতে দেখেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

কার বিরুদ্ধে লাঠি?

লাশ সামনে রেখে বেশি কথা-কাটাকাটি চলে না, অশোভন। গ্রামে খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল। দলে দলে লোক আসা আরম্ভ হয়। বুড়ো মানুষ মসিবতের কথা বলে গেছেন। তাই তালগোল পাকিয়ে যায়। নচেৎ মৃত্যু আবার কোন বৃদ্ধের হয় না? প্রচুর বয়স, সফল জীবন আনন্দের মরা। তার জায়গায়, সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

মানুষ নিয়ে সকলে মশগুল। পায়ের তলার মাটির দিকে কারো খেয়াল ছিল না।

ঈশ্বর পণ্ডিত ভোর-ভোর তরমুজ-খেত জরীপে বেরিয়েছিল। সবুজ ওই ফসলের উপর তার দরদের কথা অন্তত দশ হাটের ফড়ে-ব্যাপারীদের জানা। বুলান অকুস্থল সম্পর্কে আগেই বয়ান দিয়েছিল। তবু শোকের মতো বিপদে তলিয়ে গিয়েছিল অন্যান্য বিচারবুদ্ধি।

হঠাৎ গফুর পায়ের দিকে চোখ পড়ামাত্র আঁৎকে উঠে শুধিয়েছিল,—তরমুজ-খেত কোথায়?

লাশের কাছ থেকে বেশ কিছু দূরে গফুর দাঁড়িয়ে। ক্রিয়াচারের প্রশ্ন আছে। তাই পরলোকবাসী বৃদ্ধের প্রতি সে প্রতিবেশিসুলভ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনে নিজে উত্তম জায়গা ঠিক করে নিয়েছিল।

উপস্থিত সকলের চৈতন্য তখনই নাড়া খায় একটি বিস্ময়ে- তরমুজ-খেত কোথায়?

তরমুজ-খেত এখানে কোন কালে ছিল তাও কেউ বলতে পারে না। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামল জমিন তখন ধবধবে মাটির দাঁত বের করে হাসছিল সকলের দিকে বিদ্রূপ ছুঁড়ে-ছুঁড়ে। কত বড়ো বড়ো তরমুজ-ক্ষেত! তার চিহ্নমাত্র নেই। লাল লাল দানা কোথাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। তাও বেশি নয় সংখ্যায়।

যুক্তির ধারা তখন অন্য খাতে বইতে শুরু হয়েছিল।

—কোন মহাপতঙ্গ সব খেয়ে গেছে।

—কোন হিংসুটে জন্তু।

—অথবা চোর।

—চোর তো তরমুজ নিয়ে যাবে। খেত ধ্বংস করবে নাকি?

—তাই তো—।

—কোন পোকার কারবার।

—এমন বাপের বয়সে শুনিনি।

সকলের দৃষ্টি জমিনের উপর, যদি কোন হদিস পাওয়া যায়।

গফুর মাটির উপর বসে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল। উবু বসেই সে ঘষ্টে-ঘষ্টে এগোয়। এক-একবার মাটিতে হাত দিয়ে দেখে।

আকাশ ইতিমধ্যে ফরসা হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এই জমিনের উপর আর কোন মেঘ-ছায়া নেই, যদিও অন্যান্য দিকে পুঞ্জীভূত স্তূপ বর্তমান।

গফুর উঠে পড়েছিল। সোজা খাড়া। হাতে কী যেন। একটা জিনিস। হাতের চেটোয় তুলে নিরীক্ষণ করে, পরে অন্য চেটোয় বদলি করেছিল।

স্তম্ভিত সকলের মধ্যে সে-ই প্রথম মুখ খুলেছিল—পণ্ডিত-ভাই, দ্যাখেন তো এটা কী? রহস্য আছে মৃত্যুর পেছনে। কাজেই সকলের কান খাড়া থাকা স্বাভাবিক।

ঈশ্বর পণ্ডিতের এক ছেলে গফুরের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তার চেটো থেকে কী যেন নিয়ে সে মন্তব্য ছুঁড়লে—এ তো কোন পতঙ্গের ডানা।

—আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।

তখন সমবেত জনতা দুটো পোনে ইঞ্চির বেশি লম্বা না, আধ-ভাঙা পতঙ্গ-ডানার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, লাশের দিকে মনোযোগহীন।

—কোন মহাপতঙ্গের ডানা। এই সিদ্ধান্ত সকলের মুখে।

—কিন্তু পোকা কি গলা টিপে মানুষ মারতে পারে?

—কে জানে, কী ব্যাপার।

—গাঁয়ে মাদবর, মৌলবী-পুরুত আছে, তাদেরই জিজ্ঞেস করে দ্যাখা যাক। ডানা দুটো ভাল করে গামছায় বেঁধে রাখো হে। নেপথ্যে এই সিদ্ধান্ত রূপ নিয়েছিল।

—হাতের লাঠি দিয়েই আমরা একটা খাট বানিয়ে নিই। বাবার লাশ তো গাঁয়ে নিয়ে যেতে হয়। ঈশ্বর পণ্ডিতের বড় ছেলে প্রস্তাব দিয়েছিল।

—তিনি তো মাঠে থাকতেই ভালোবাসতেন। আর-এক মন্তব্য।

—কিন্তু বাড়ির মেয়েরা আছে—। এই যুক্তির উপর আর কথা চলেনি। বুড়োমানুষ। কিন্তু মায়া-মমতার বয়স সাধারণভাবে পরিমাপ অচল।

বুলান তখন দাদু-দাদু রবে হাঁক-ফুকার কান্না শুরু করেছিল। হারানো চিজের জন্যে আফশোস-অনুতাপ দমকা আচমকা ধাক্কা দিয়ে যায়। বুলান এতক্ষণ আনমনা ছিল, যেন কোন তামাসার মধ্যে ডুবে।

অতঃপর ঈশ্বরের লাশ নিয়ে সকলে গ্রামের দিকে এগোতে লাগল। নিকটে একটা শ্মশান। কিন্তু দাহব্যবস্থা নিয়ে তখন কেউ পীড়িত নয়। অপমৃত্যুর নিজস্ব ছায়া থাকে।

চার

হয়রান তামাম গ্রাম।

অমন জলজ্যান্ত লোকটা হঠাৎ নেই হয়ে গেল। হদিসের রেখা কোথায়? আকাশ তখনও খোলা-মুখ। কিন্তু বৃষ্টির নাম-নিশানা ছিল না।

ভাঙা ডানা দুটো বড় যত্নে কাগজের মোড়কে রেখেছিল গফুর। পণ্ডিতের সন্তানেরাও পরামর্শ দিয়েছিল, যদি কোন লুলুক-সন্ধান পাওয়া যায় ঐ সূত্র থেকে।

বিজ্ঞজন মোহাম্মদ আলী। তদুপরি কবি। মাদবর দলবলসহ তার কাছে পৌঁছেছিল। তাদের সৌভাগ্য বইকি, গ্রামে অসময়ে এমন মানুষ পাওয়া। গুণীর কদর আস্তাকুড়ে। প্রবাদটা বাসখা আসেনি। রহস্যভেদের জন্যেই হয়তো অমন ব্যক্তির আবির্ভাব এই পাণ্ডববর্জিত দেশে।

একটা লোক মরে গেল, জমিনের ফসল গেল, অথচ কিছু বুঝা গেল না। আপনি যদি কিছু পারেন। আমরা মুরুক্ষ মানুষ—। ভাঙা ডানা দুটো কবির হাতে তুলে দিতে-দিতে গাড়োয়ান গফুর সভয়ে উচ্চারণ করেছিল।

অবিশ্যি ঘটনাটা মোহাম্মদ আলীর কানে গিয়েছিল বইকি। 'ছোট গ্রাম। চাপা থাকতে পারে না।

বৈঠকখানায় একদল গ্রামবাসী। জিজ্ঞাসু নেত্র, উৎকণ্ঠায় উৎকীর্ণ।

সম্মুখে সমস্যা।

মোহাম্মদ আলী ডানার দিকে তন্ময়-নয়ন, যেন গভীর সৌন্দর্যবোধে অভিভূত। সকল চক্ষু কবির মুখের উপর। সকলে লক্ষ্যরত। মুখের রঙ কেমন হচ্ছে, চোখের পাতা কী ভাবে পড়ছে। কপালে রেখা কী ধারায় জড়ো বা বিস্তারিত। ডানার কথা তখন গ্রামবাসী বিস্মৃত।

অন্তত পাঁচ মিনিট অতিবাহিত।

সকলে অস্থির, তবু বাহ্যত স্থির। ফাঁসির আসামী জজের রায়ের জন্যে উৎকর্ণ, যখন সওয়াল-জবাব সব শেষ।

—আশ্চর্য, আশ্চর্য! তাজ্জব ব্যাপার! তন্ময়তার মধ্যে কবির প্রথম বাণী।

গ্রামবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য, কিন্তু মাত্র কয়েক নিমেষ। আবার সকলে ওতপাতা গেরিলা সৈনিকের মতো স্তব্ধ। এ তো শেষ বাণী নয়।

কবি স্তব্ধ।

ডানার দিকে তন্ময় দৃষ্টি।

কাল বয়ে যায়।

গ্রামবাসীদের ভেতরে অসোয়াস্তি চাড়া দিয়ে উঠেছিল। প্রতীক্ষারও মেয়াদ থাকে।

মোহাম্মদ আলী তাদের নিরাশ করেনি।

ভাইসব, এটা দেখে প্রথমত মনে হয় কোন পতঙ্গের ভাঙা ডানা। কিন্তু আসলে সেখানে রহস্য শেষ হয় না। ডানার আরবী অক্ষরে বা অন্য ভাষার অক্ষরে—বুঝতে পারছি না—কী যেন লেখা আছে।

কবির এই উচ্চারণমাত্র গ্রামবাসীরা নেপথ্যে বলে উঠেছিল—সোবহান আল্লা...আল্লা (তোমার মহিমা)—প্রভু, তোমারই লীলা...। এইজাতীয় আরো উচ্চারণ।

কবি সকলকে আবার থামিয়ে দিয়েছিল—আমিও ভেবে পাচ্ছি নে এটা কী। গম্ভীর মুখ, শূন্যোদৃষ্টি মোহাম্মদ আলী।

মাদবর চুপচাপ বসে ছিল। ঈশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে তার বহুদিনের খাতির। সমবয়সীর মৃত্যু নানা ইঙ্গিত দিয়ে যায়। উচাটন-মন মাদবর। শেষে বলেছিল—কবি-মহাশয়, এ কোন্ মসিবত, অমঙ্গলের লক্ষণ নয় তো?

—না, না। তা হবে কেন? ডানায় অক্ষর আছে। অক্ষর কারো ক্ষতি করে না। কবির প্রতিবাদ-প্রতিধ্বনি সরগম করতে লাগল বৈঠকখানায়।

সহজ ব্যাখ্যা মাদবরের মনঃপূত নয়, ধরা যায়, যখন তার মুখেই আবার শোনা গেল—কবি-মহাশয়, মানুষ একটা মরে গেল। তাই ভাবছি—।

—খামখা কিছু ভাববেন না। তাছাড়া মসিবত, অমঙ্গল আসে আমাদের উপকারের জন্যে। কবি মাঝখানে পংক্তি কেটেছিল।

—একটু বুঝিয়ে দেন, কবি-মহাশয়।

—বিপদে ইমানের পরীক্ষা হয়, আপনারা জানেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে শোনেন, সংসারে রহস্যের শেষ নেই। সব সময় বুঝা দায়, কিসে কী হয়। হয়তো দেখছেন ক্ষতি, আসলে লাভ। মানুষের চোখ আর কত দূর যায়। ডানা দুটো পরে দেখব। আমার কাছেই থাক।

—তা থাক।

একজন প্রস্তাব দিলে—কবি-মহাশয়, একবার তরমুজ-খেতটা দেখতে চলুন না।

—আজ না। আর একদিন হবে। সরেজমিন মানুষ দেখতে যায় হুজুগের চোটে। আজ যেতে পারব না। তবে কাল-পরশু যাওয়ার ইচ্ছে রইল।

এই জবাবের পর সকলের মধ্যে ভাব স্তিমিত।

গফুর শুধু মাথা-চুলকানি-যোগে জবাব দিয়েছিল—বড় ডর করে। খরায় বাপ গেল। আবার এই ছায়া—আবার এই অক্ষরওয়ালা ডানা—।

—ভয়ের কিছু নেই। বেটাছেলে কত কী সহ্য করতে হয়। আর মনে রেখো, মসিবত আল্লাই দেয়। ভয়ের কী আছে? তুমি তো বেটাছেলে হে। অভয় বুগিয়েছিল মোহাম্মদ আলী।

এমন প্রশংসা! গফুর কিছু শ্লাঘা অনুভব করেছিল বইকি। কিন্তু নিঃশঙ্ক হয়নি তবু। কবির উদ্দেশ্যেই সে আবার প্রশংসা ফিরিয়ে দিয়েছিল—আপনার ভরসাই আমাদের ভরসা।

গুঞ্জন উঠেছিল গ্রামবাসীদের মধ্যে বাড়ি ফেরার পথে। অস্বাভাবিক কাল, অস্বাভাবিক আবহাওয়া। এই মন্তব্যে সকলে একমত। তাদের মাথার উপর থমথমে ছায়া-মেঘ। অন্ধকার-পতনের পূর্বে আরো কালো কালির স্তূপ জড়ো হয়েছিল চতুর্দিক থেকে।

আল্লার আসমান। সেদিকে সকলে তাকাতে পারে, কোন ফরমান প্রয়োজন হয় না। মাদবর ঊর্ধ্বমুখ চেয়েই থাকে আকাশের পানে। এবং তেমনই যোগাসনে থেকে সম্বোধন করেছিল,—গফুর, চেয়ে দ্যাখো তো, মেঘ যেন নড়ছে। বোধ হয় বিষ্টি হবে।

সকলেই আসমানমুখী।

সত্যি অনেক উপরে মেঘদল নড়াচড়া শুরু করেছিল। বাতাসের শনশন শব্দ শোনা যায়।

মাদবরের মন্তব্য উপরে মেঘের আনাগোনা। বোধহয় বিষ্টি নাববে। বেশ ঠাণ্ডাও লাগছে। চল জলদি বাড়ি ফেরা যাক।

—চাচা, ও-রকম মাঝে মাঝে হয়, আমিও নিজের চোখে দেখেছি। গফুর জবাব দিয়েছিল।

—দেখো বিষ্টি হবে।

—কিন্তু চাচা—।

—কী বাবা?

—মসজিদের ইমাম আর কবি দুজনে একই কথা বলে। দুজনে কোন তফাত নেই?

—ওসব আর ভাবি না। যা-হয় হোক, পরে দেখা যাবে।

দলে একজন স্বল্পভাষী শান্ত চাষী ছিল। মাদবরের সমর্থনে সে প্রথম মুখ খুলেছিল—আমারও তা-ই মনে হয়।

পাঁচ

অনুমানের গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে যে-কোন দিকেই যাওয়া যাক, অনেক সময় দিশাহারা হওয়ার একটা প্রচণ্ড লোভ পেয়ে বসতে পারে—যার তাল সামাল দিতে কোথাও ঠেকলেই সোয়াস্তি। কিন্তু ঘটনা সকল মিথ্যা, মিথ্যার মুরুব্বী বা যাচনদার—যে-কষ্টিপাথরে তোমার চোখ, কল্পনা এবং বিচারবুদ্ধি একখাতে না মিশলে সোয়াস্তি পাবেব।

গৌড়গ্রামের হালেচালে দু-এক দিনের মধ্যে তার জের এমন ধরা পড়ল, তখন 'টাঁ ফু' শব্দ উচ্চারণ করবে কী, তার পূর্বেই তুমি হতবাক এবং চেয়ে থাকবে শুধু একই দিকে ও নিজেকে ধিক্কার দেবে· বিশ্বাসের নৌকা কেন মাঝদরিয়ায় ছেড়ে দিয়েছিলাম।

প্রথম আর্তনাদের মালিক কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ, যে নর বা নারী—তার উল্লেখ এখনই করতে হবে, অপিচ তেমন কৌতূহলে ডুব দেওয়া কোন আক্কেলমন্দের কাম নয়। আর্তস্বর যে-কোন প্রাণীরই হোক, তার মধ্যে যুগযুগান্তের সেই অসহায় নিবেদন মাথা খুঁড়ছে—আমাকে মুক্তি দাও, আমি আর পারছি না। এমন ক্ষেত্রে তুমি কিছু ভেদাভেদ রচনার প্রয়াস যদি পাও, তা নিজের বুদ্ধির অহমিকার নিতান্ত পরিচয়-তৎপরতা ছাড়া আর কী! ভেক এবং সাপ উভয়ে যুগপৎ আহ্লাদ বা বিষাদের মুখোমুখি হতে পারে না, যেহেতু দুই বিপরীতে খাদ্য এবং খাদকের সম্পর্ক-সিংহাসনে তারা আসীন। কিন্তু আর্তির যন্ত্রণা তেমন হদিসের কাছ ঘেঁষে পা ফেলেছে, তা কেউ বলার সাহস রাখতে পারে, এমন কোনদিন শুনিনি। জীবন-নলের দুই মাথা ফাঁপা বলে, বাঁশির মতো তা বাজে এবং সেইজন্যে কিছু ছিদ্র অবশ্যম্ভাবী। যারা মেনে নিতে পারে, তাদের কাছে বাতাসে বিচরণ শুধু অসম্ভব নয়, ঘটনার শিং খাকড়ে-খাকড়ে তারাই যত ছিদ্র সৃষ্টি করে তত সুরের আমদানিও প্রবহমান রাখে। প্রথম চিৎকার তাই বৃথা যাবে কি, আলোড়নের মাত্রা এত ঘন এবং নিরেট হয়ে উঠেছিল যে সকলে অন্তত আর লাটিমের মতো নিজের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে পারল না, বরং ছিটকে-ছিটকে পড়তে লাগল বোমার স্প্লিন্টারের পন্থায়—লক্ষ্যস্থলের চেয়ে বিদীর্ণতাই যেখানে আসল কথা।

বহুকাল স্বামীহারা উত্তরপাড়ার মর্তিবিবি নিঃসন্তান থাকলেও নিজের চিন্তার চেয়ে বেশি মগ্ন ছিল নিজের দৈনন্দিনতাকে কাদায় পোঁতা গোরুর গাড়ির চাকার মতো ধাক্কি-ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। ব্রাহ্মমুহূর্তে না ফজর· এসব মর্যাদা-মক্কর (রহস্য) নিয়ে তর্ক-উত্থাপনের নির্বুদ্ধিতা মুলতুবী রেখে বলা চলে, অতিউষাকালে মর্তিবিবি প্রথম আর্তনাদ গ্রামবাসীর হাড়-গোড় এমন ঢুকিয়ে দিলে যে সকলে কেঁপে-কেঁপে ওঠার জায়গায় বেশ একচোট হেসে নিয়েছিল।

- কলা- কলা -ক...লা। অতিপরিচিত স্বর তীক্ষ্ণ স্তর-পথে এমন দ্রুত হেঁটে যাচ্ছিল যে প্রথমে ভয় পেলেও শব্দার্থের চোটে ঈষৎ রসিকতা-বোধ থাকলে হেসে গড়িয়ে পড়ারই কথা।

রমণীগণ ছলাবিশারদ, শাস্ত্রকারদের উক্তি। তৎস্থলে আনাজের খিস্তি-পর্যায়ভুক্ত সংস্করণ কারো কানে শব্দরূপে ধাক্কা দিলে কোন পবিত্রভাব নিশ্চয় মনে উদিত হওয়ার কথা নয়। এই ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছিল এবং অপরকে সাহায্যের জন্যে যাদের হাত-পা নিশপিশ করে, তারা এক কান-পথে সবকিছু ঢেকালেও, অন্য পথে উগলে দিতে বেশি সময় লাগায়নি। অমন সময়ে অনেকে ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় ঘুমের রাজত্ব-ভোগের কাছে সব বিলিয়ে দিয়ে খোয়ার হতে রাজী থাকে। তারা কাঁথার সুতোয় হাসি মুছে চোখ আরো বেশি করে বুজলে তন্দ্রার ছেঁড়া শিকড় জোড়া দিতে। যারা হাই তুলে তুড়ি মেরে লাঠি হাতে বেরুবে বলে আনচান করছিল, তারা ভোরের নক্ষত্র দেখে হতাশ, দ্বিধার ছাইগাদায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। আলো-অন্ধকার একত্রে মিশে থাকলে, যখন স্পষ্ট হদিস পর্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন ভীরু কাপুরুষ, সাহসী জোয়ান এবং বৃদ্ধের ফারাক প্রায় মুছে

যায়। একতরফা ব্যাপারের যতই ত্রুটি থাক, তার মধ্যে অনিশ্চয়তা ফুট কাটতে অক্ষম। কিন্তু ঘটনা এবং ঘটনাপ্রকাশে আয়োজিত শব্দরাজির নিজস্ব অবয়ব খুইয়ে বসলে অন্ধকারে হামা টানে না কেউ। এখানে চিৎকার ধাপে ধাপে এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে ঘুমের রাজত্ব-ভোগী এক পলকে আলসেমির মাথায় পয়জার কষালে জোর-জোর। এক, দুই, তিন। শব্দের খেই ধরে-ধরে জনপদ একটা মাত্র ধড়ে পরিণত। স্রোত, অন্তঃস্রোত, বিপরীত স্রোত—সকল জলীয় গতির ঘূর্ণিপাক আছাড় খেয়ে অকুস্থলের দিকে এগোতে লাগল। পক্ষিকুল ভাবলে, গাছে গাছে আগুন লেগেছে এবং দাবদাহ কেবল ক্ষুদ্র খাণ্ডবের কোটায় আবদ্ধ থাকবে না।

বুলান প্রায় ভোরে ওঠে ফলমূল বা ফুলজাতীয় কিছু সঞ্চয় করত—যা চৌর্যবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে বা পড়ে না—এমনই সব পার্থিব সম্পদ। কিন্তু সেদিন সে দেরি করেনি, তেজী বাচ্চা যেন শব্দ শোনার পর যখন বয়স্করা পর্যন্ত নানা অর্থ-আবিষ্কারে সময় অপব্যয় করছিল। কারণ, চিরকাল মাঠবিহারী তার পরলোকগত পিতামহের কণ্ঠে যে-শেষ শব্দ উচ্চারিত হতে শুনেছিল, বর্তমান স্বরগ্রামে (মতিবিবির নাম সে জানে না) সে যেন তারই অবয়ব দেখতে পেয়েছিল, যদিও সংগীতজ্ঞেরই শুধু এমন জ্ঞের মনে রাখার কথা।

মা বাধা দিয়েছিল—কোথা যাস? বুলান একটা জবাব যে দিতে অনিচ্ছুক, এমন অশিষ্ট অবাধ্যতার নিন্দালেপ তার মতো পিতামাতা-প্রাণ বালকের উপর বদরাগী বুড়ো কি আজব কায়দায় লেফাফা-দুরস্ত ভদ্র দুর্জন হয়তো মালিশ করতে পারে। কিন্তু বুলানের কাছে তখন সময় ছিল মুখ্য বাক্য এবং তার পরিমাপ আরো মূল্যবান। যেহেতু পিতামহের সতর্কবাণী যথাসময়ে প্রতি-পালন না করলে, শুধু শিষ্টাচার অথবা মুরুব্বী-ভজনা দেখালে তার যে-অবস্থা হত, তাতে নিশ্চয় স্বর্গীয় ঈশ্বর পণ্ডিতের মন-সন্তুষ্টির শাস থাকত তার নতুন ঠিকানায়। মায়ের মর্যাদা গৃহদেবীর তুলনায় অধিক বটে, কিন্তু জনক-জননীর সমাহারের নিকটে কি সে-মূল্য বেশি হতে পারে? বুলান চোখ কচলাতে-কচলাতে, সেই আর-একদিন যেমন করেছিল, তেমনই হন্তদন্ত দৌড় ধরেছিল পড়ি-কি-মরি গোছের শপথ চোখে তুলে নিয়ে। মা ভাবলে, ছেলেটা হুজুগে অবাধ্য অথবা নিজের জিদ-বজায়ে সিদ্ধহস্ত কোন দুর্জন—যে নিজের আবেগের মই যথা-খুশি যেখান-সেখান দিয়ে চালনা করতে পারলেই জয়জয়কার ঠাওরায়। অন্যদিকে, আর্ত চিৎকারের নিজস্ব অর্থ না থাকার ফলে, তা যে-যেমন পারে, তেমনভাবেই গ্রহণ এবং উপায় স্থির করে ফেলছিল। বুলানের পূর্বে যারা অকুস্থলে জমায়েত হয়েছিল, তারা নিছক কৌতূহল মেটাতেই তা করেছিল—এমন অপবাদ দিলে ভুল হবে না। কিন্তু বুলান সেই ঘরপোড়া গোরু—সিঁদুরে মেঘ দেখে সে দাঁড়দড়া ছেঁড়াছিঁড়ি করে গোঠ থেকে পালিয়ে কোন গৃহে নয় গোঠান্তরে যাওয়ারই অদম্য প্রয়াসে। সদ্য ভগ্ন-নিদ্রা এবং ভিড়ের আকারগ্রাসী জিভের সামনে ভ্যাবাচ্যাকা-খাওয়া বুলান সেদিনও বুঝতে পারেনি, কোথায় কী ঘটছে বা সকল ঘটনাস্রোতের উৎসভূমি কোথায় নিহিত। কিলবিল-রত মানুষের চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতার কেন্দ্র—লক্ষ-লক্ষ পায়ে যাদের জমিন-জরীপ, কিন্তু নিমেষে সাপের বিড়ংশে পরিণত হয়। চিৎকার ভাষা বদলে ফেরার দরুন বুলান আরো দিকভ্রষ্ট। তার সরল সুবোধ চাউনি অর্থহীন দৃক-নাৰ্ভের সঞ্চালন ছাড়া আর কিছু না।

মতিবিবির চিৎকার সব হুল্লোড় পেছনে ফেলে যেন দাবড়ে উঠেছিল—সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা...।

বুলানের থাবড়ানি মাত্রায় মাত্রায় এমন চড়েছিল যে তখন বয়োজ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ মরদদের (আহা, নাবালক!) মুখের দিকে তাকিয়েই সে একটা অর্থ উদ্ধারে ব্রতী। দশানন-দশা, যদিও কেউ রাক্ষস নয়, বুলানকে আরো তিরিশ বাঁও জলে ফেলে দিয়েছিল, প্রবীণ যদিও যেখানে থ দিতে অপারগ।

শব্দগুঞ্জনের কোন অর্থ না বুঝলেও, তার আভ্যন্তরিক দ্যোতনা জানান দিচ্ছিল, সকলেই কিছু করতে ব্যগ্র।

ধুলোন দেখেছিল, মতিবিবি ধুলোর উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে, পিটুনি খাওয়ার পর প্রতিবাদ-সিদ্ধ অভিমানে সে যেমন করে। তারপরই তার চোখে পড়ে শোকান্বিত রমণীর অঙ্গুলিনির্দেশের নিশান যা অন্ধেরও দিব্যদৃষ্টি যোজনা করতে পারে। তাকে দ্বিতীয় দফা বিস্ময়ের চাবুক ভোগ করতে হয়, যেহেতু তার দুই চোখের উপর আস্থা সে খুইয়ে ফেলেছিল। সবুজ। সবুজ পাতা। বাউরী বাতাস, বাতাস দিলে অথবা ঝামাল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে সে ওই বনে কতদিন না আশ্রয় নিয়েছে এবং নেমকহারামের মতো ফান্দ এঁটেছে : পাক-ধরা রম্ভা, এবার কাঁদি না হোক, ছড়া তো নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু কোথায় সে কদলীশোভিত উদ্যানের জেল্লা অথবা জৌলুস? খনার বচননির্দেশে অথবা নিজের বুদ্ধিতে মতিবিবি সত্যি তিনশ ষাট ঝাড় কলাগাছ রোপণ করে তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত যোগাড় করত। সেই বাগানের উঠানে, হ্যাঁ উঠানই বলতে হয়, ধুলো না উড়লেও, কলাগাছের কটা গুঁড়ি শুধু উবু বুড়ির মতো বসে ছিল যেন উকুন-চয়ন-রত অথবা নিজের শোকের ভারে ভূলুণ্ঠিত মুখ গুঁজে ডুকরে কাঁদছিল এবং সেইজন্যে মনে হয়, মূর্তিটা আসীন, যদিও বাস্তবে তা নয়। শস্যশ্যামলা মৃত্তিকার যে-মূর্তি সুখ দান করে, বর দান করে, তার চিহ্নমাত্র অক্ষিপটে কোথাও জমা রাখা এখন দুঃসাধ্য। বুলোন স্মৃতির দ্রুত-পরিক্রমায় শবরী কাঁদির কয়েক ফলা অপহরণের আনন্দ সমপরিমাণ যন্ত্রণার সঙ্গে বিনিময় করতে লাগল। এতক্ষণে সে ভিড়, মতিবিবি ও বয়স্কদের উদ্বেগের একটা স্বচ্ছন্দ হিসেব কিশোরসুলভ বুদ্ধি দ্বারা নিজের আয়ত্তে আনতে পারল আর তখনই সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঢেলা ছুঁড়তে লেগেছিল যেন আততায়ীর ওই চাচর, তছনছ জমিনের উপর খাড়া রয়েছে। মার কাছে শোনা মতিবিবির শত-শত কাহিনীর মধ্যে সে একটা প্রতিমা গড়ে তুলেছিল এবং জেনেছিল, সত্যিমিথ্যে যা জানে, মতিবিবির বয়সের গাছ-পাথর নেই বর্তমানেও নির্জাত। বাগানের ফলমূল বিক্রিই যার জীবিকার প্রধান উপায় সে খরিদ্দারের মধ্যে নানা বেড়া তুললে ফলত উপোস মরবে। সাধারণ পশারিনীও জানে এই সহজ ব্যবসার নিয়মকানুন এবং রেওয়াজ। মার কথা, পিতার কথা, শত-শত কিংবদন্তীর রূপকাহিনী-সুলভ জেল্লার তুফানে, বুলোন জনতার মধ্যে, ভেসে যেতে লাগল একটা অন্ধ আক্রোশ বুকে পুষে — যার উত্তাপ সে বের করে দেবেই আজ হোক, কাল হোক।

আকাশ আরো ফরসা হতে কোলাহল-তামাসা জমে উঠেছিল। খুব নিকটে, যেথা কারো চোখ এতক্ষণ ধায়নি। গোড়গ্রামের একটা অশত্থগাছ কত শতাব্দীব্যাপী পুরুষানুক্রমে মানুষ, জীবজন্তুকে দিয়েছে ছায়া, পক্ষীদের আহার, নীড় এবং দুরন্ত-দামাল কিশোরদের ঝড়ের দিনে গুঁড়ির পাশে কোটরে গুটিসুটি আশ্রয়-স্নিগ্ধ নিরাপত্তার উত্তাপ এবং সম্ভব করেছে তুমুল বজ্রাঘাত ও শিলা-বৃষ্টির আতঙ্ক-গর্ভ মনোরম দৃশ্য দেখতে। সেই বৃক্ষ ন্যাড়া তালগাছের মতো ন্যাংটো দাঁড়িয়ে আছে, না ওটা আর কোন বৃক্ষ রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে, প্রাচীন বাসিন্দাদের ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে? সকলে দৌড় মেরেছিল সেই পানে, মতিবিবিকে এবার নীরবে কাঁদতে দিয়ে যেন অমন নায়িকা-ক্রন্দনে কারো কোন কিছু আসে যায় না। অশত্থগাছ। পত্রহীন। সত্যি! বাকলের গা দেখার জন্যে যতই চেষ্টা কর আর দেখতে পাবে না কারো চোখ, তা যতই দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হোক। কিলবিল করছে পোকা সহস্র, নিযুত, অর্বুদ সংখ্যার প্রশ্ন তুললে এখানে, তুমি প্রতারিত হবে। অনেক। অশত্থের গা কুরে-কুরে খাওয়া। জমাট ভিড় থমকে নির্বাক দৃশ্য দেখতে লাগল দুর্দশার নয়, বরং বৃক্ষের— যা এই গ্রামে ঐতিহ্যের মতো দিগ্বিদিক শিকড় মেলে এতদিন ছিল কোন প্রাচীন দেবতার মতো নিজের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেয়ে স্নেহে ও মমতায় উদ্ভাসিত।

বুলোন এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল যদিও এক বিরাট চিৎকার তার অন্তে অন্তে ফুকার দিতে গিয়ে হঠাৎ বায়ুহীন। গলার শিরাগুলো দগদগে ঘায়ের মতো কাঁপল না শুধু ঝিলিক দিলে যন্ত্রণার নয়, নিঃসাড়তার।

অতঃপর সূর্যের আলোর চোখ ফুটতে লাগল তেমনই শুধু কাহিনীর নয়, কত ঘটনার কুঁড়ির। কারো বাগান, কারো গাছ, কারো ফসল, কারো বাঁচার অবলম্বন বা আর কিছু—এমন এনতার শুধু খেই টেনে যাও—শেষ হবে না সব শেষে।

মোহাম্মদ আলী কবির পূর্বোক্ত রায় বহাল রইল যদিও মসজিদের ইমাম যোগ করেছিল আরো এক উপাদান : গজব—অভিশাপ।

বৃদ্ধ সুরেত মণ্ডলের চোখের দৃষ্টি তখন ঝাপসার পর্যায় থেকে আরো এত নিচে নেমেছিল যে তাঁকে অন্ধ বলা আর আদৌ বিদ্রূপ নয়। তার কাছে গফুর গিয়েছিল সংবাদ দিতে, যার জবাব তিনি এককথায় শেষ করেছিলেন, পঙ্গপাল নেমেছে-- পঙ্গপাল। ক্ষেত, জমিন, সবুজ আর কিছু থাকবে না, সব খেয়ে শেষ করে ফেলবে—পঙ্গপাল, পঙ্গপাল।

[ক্রমশ]

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

ক. গণ-আন্দোলনের অঞ্চল

পূর্ব মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার উত্তরে হুগলী জেলার পশ্চিম অংশ—আরামবাগ মহকুমা অবস্থিত। আরামবাগের পশ্চিম সীমান্ত হইতে প্রসারিত হইয়া আছে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত ত্রিভুজাকৃতি বাঁকুড়া জেলা। বাঁকুড়ার দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার উত্তরতম থানা গড়বেতা। পূর্ব মেদিনীপুর হইতে গণ-আন্দোলনের ঢেউ আসিয়াছিল এখানেও এবং সাড়াও কিছুটা জাগাইয়াছিল। অন্যদিকে বাঁকুড়ার পশ্চিমে গণ-আন্দোলনের অন্যতম বিস্তারক্ষেত্র পুরুলিয়া জেলা (পূর্বতন মানভূম জেলার বৃহত্তর অংশ)। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় অবশ্য পুরুলিয়া ছিল বিহারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এখন পরস্পর সংলগ্ন এই এলাকাগুলিকে একত্র করিয়া বলা যায় পূর্ব মেদিনীপুর, আরামবাগ মহকুমা, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা নিয়া গঠিত ভূখণ্ড দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার গণ-আন্দোলনের অঞ্চল।

খ. বাঁকুড়া ও আরামবাগ সম্বন্ধে প্রাক্‌কথন

আগের প্রবন্ধে পূর্ব মেদিনীপুরে গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের কাহিনী বলিয়াছি। ১৯২১ সালে পূর্ব মেদিনীপুরে যখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-প্রতিরোধ চলিতেছে বাঁকুড়ায় সেই সময় অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে গড়িয়া উঠিতেছে কংগ্রেসের গণ-সংগঠন। আরামবাগে গণ-সংগঠনের কাজ শুরু হইয়াছে আরও কিছুটা পরে—১৯২২ সালের শেষ দিকে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ সরকারবিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হইবার আগে সাংগঠনিক ও গণ-সমাবেশের প্রস্তুতি চলিয়াছে দীর্ঘদিন ধরিয়া। বর্তমান প্রবন্ধে এই গণ-সংগঠন গড়িবার কাহিনী বলিব।

পূর্ব মেদিনীপুরের মতো বাঁকুড়া জেলা ও আরামবাগ মহকুমাতেও সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রা মূলত কৃষিভিত্তিক। কিন্তু সাধারণ মানুষের একান্ত কৃষিভিত্তিক জীবন খুব বেশিদিনের ব্যাপার নয়। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তও সুতীবস্ত্র, রেশম, রেশমবস্ত্র, পিতল-কাঁসার বাসন, শঙ্খ, চিনি, লাক্ষা শিল্পে বাঁকুড়া ও আরামবাগের খ্যাতি ছিল সুদূরপ্রসারী। বহুসংখ্যক লোকের উপজীবিকাই ছিল শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা। কাঁচামাল যোগাইবার জন্য অর্থকরী শস্যের চাষও কম ছিল না। তুঁত, কার্পাস, ইক্ষুর চাষ ছিল ব্যাপক। ইংরেজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রভৃতি ইওরোপীয় বাণিজ্য-সংস্থাগুলিকে ও অন্যান্য স্থানে শিল্পদ্রব্য চালান দিয়া বা ঘাটতি পূরণের জন্য কাঁচামাল আমদানি করিয়া স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কারিকর সম্প্রদায়ের অনেকেই বেশ বিত্তবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেঞ্জাকুড়া, রাজগ্রাম, গোপীনাথপুর, কোতলপুর, সোনামুখী, পাত্রসায়র, কৃষ্ণনগর, শ্যামবাজার, বদনগঞ্জ, কয়াপাট, বালী-দেওয়ানগঞ্জ, সেনহাট, রাজহাটী, গৌরহাটী, কাজিম্বা প্রভৃতি কারিকর ও ও ব্যবসায়ী-প্রধান গ্রামগুলিতে পূর্বতন সমৃদ্ধির চিহ্ন মন্দির, পাকাবাড়ি, পুষ্করিণী, বাঁধাঘাট আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম হইতে শিল্প ও বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে

ভাটা পড়িতে শুরু করিয়াছিল। শিল্পজাত দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা ইংরেজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে রপ্তানিকারকের ভূমিকা ছাড়িয়া হইয়া উঠিতেছিল আমদানিকারক। উনিবংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোম্পানি উঠিয়া গেলেও ইংরেজ সরকার বাণিজ্যের ধারা বজায় রাখিল পুরোমাত্রায়। শুধু যে রপ্তানিবাণিজ্য গেল তাহা নয়, দেশের মধ্যেও ইংলন্ড হইতে ইংরেজের আমদানি-করা পণ্য বিক্রয় হইতে লাগিল দেশী পণ্যের তুলনায় কম দামে। একে তো যান্ত্রিক কৌশলে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য হাতে তৈয়ারী জিনিসের চেয়ে কম দামে বিক্রয় করা যাইত, তাহার উপর সরকারী নীতিও ছিল ইংরেজের আমদানি বাণিজ্যের সহায়ক। অসম প্রতিযোগিতায় হারিতে হারিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেশীয় শিল্প প্রায় শেষ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সামান্য কিছু কারিকর তখনও তাঁত বুনিত, রেশম তৈরি করিত বা চিনি জ্বাল দিত বটে, কিন্তু অধিকাংশই তখন বৃত্তিচ্যুত। যাহাদের বৃত্তি গিয়াছে উপায়ান্তর না পাইয়া তাহারা তখন চাষের কাজে নামিতে লাগিল। চাষ ছাড়া করিবার মতো তো আর কিছুই ছিল না। ফলে চাষে লোক বাড়িতেছিল দ্রুতবেগে। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে যখন কংগ্রেসের কাজ আরম্ভ হইল তখন বাঁকুড়া ও আরামবাগে গ্রামের সমস্যা প্রধানত চাষ ও চাষীর সমস্যা। কংগ্রেসের গণ-সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছিল প্রধানত চাষীদের নিয়াই। গণসংগঠনের কথা তাই আরম্ভ করিতে হইবে কৃষকের কথা ও তাহার সমস্যার কথা দিয়া। এসব কথা বলিতে হইলে শুরু করিতে হইবে ভূ-প্রকৃতি, ভূমি, ভূমিব্যবস্থা অর্থাৎ কৃষি ও কৃষকের মৌলিক সমস্যা যেখানে, সেইখান হইতে।

গ. ভূ-প্রকৃতি

বাঁকুড়া জেলার ভূ-প্রকৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। বাঁকুড়ার পশ্চিম ভাগে, শালতোড়া, মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাটি, ছাতনা, ইঁদপুর, খাতড়া, রানীবাঁধ ও রাইপুর থানায় আসিয়া মিলিয়াছে ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্বপ্রত্যন্ত ভাগ। ছোট ছোট পাহাড় আর বিস্তীর্ণ বনসমাকীর্ণ এই এলাকায় ভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুর্বর, নীরস---বিঘার পর বিঘা মুরাম জমি আবহমানকাল ধরিয়া পতিত পড়িয়া আছে। ইহার পূর্বদিকে উচ্চাবচ ভূমি নিয়া গঠিত বাঁকুড়া জেলার মধ্য অংশ, বড়জোড়া থানা, সোনামুখী থানার পশ্চিম অংশ, বাঁকুড়া সদর, ওঁদা, বিষ্ণুপুর, জয়পুর, সিমলাপাল ও তালডাংড়া থানা। তুলনায় উর্বর জমি এখানে কিছুটা বেশি, কিন্তু বালি আর কাঁকরমেশানো ডাঙা জমি ও মুরাম জমিও কিছু কম নয়, বনভূমিও প্রচুর। তবে বিগত শতকের শেষ দিক হইতেই বনহাসিল আরম্ভ হইয়াছে ব্যাপকভাবে। চাষে যত নতুন লোক আসিতে শুরু করিয়াছিল জমি তো আর তত ছিল না। তাই প্রথমেই নজর পড়িল জঙ্গলের উপরে। বিঘার পর বিঘা বন কাটিয়া চাষের পত্তন করা হইল। কিন্তু জমি এমনই নিরেস যে তিন বা চার বৎসরের বেশি ফসল তোলা সম্ভব নয়। তাই আবাদ সম্ভব না হইলে জমি ফেলিয়া অন্যত্র বন হাসিল করা হইত। এইভাবে একদিকে যেমন নষ্ট হইল বন, অন্যদিকে পড়িয়া-থাকা জমি হইতে বালি ও কাঁকর বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাইবার ফলে হইতে লাগিল ভূমিক্ষয়। বৃষ্টির জলের সঙ্গে বালি ও কাঁকর বেশি করিয়া আসার ফলে নদীপ্রবাহের অবস্থা যে কিভাবে শোচনীয় হইয়া উঠিল সে কথা একটু পরেই বলিতেছি।

বাঁকুড়ার মধ্য অংশ পার হইয়া শুরু হইল পূর্ব অংশের সোনামুখী থানার পূর্ব ভাগ, ইঁদাস, পাত্রসায়র ও কোতলপুর থানা। বালি ও কাঁকর জমি এদিকে কমিয়া আসিলেও আছে, তবে সেই সঙ্গে আছে পলিমাটিতে গঠিত সমভূমি। কোথাও বালি-কাঁকর জমির আধিক্য, কোথাও বা পলিমাটির সমভূমিই বেশি। অনুরূপ অবস্থা কোতলপুর থানার পূর্বদিকে আরামবাগ মহকুমার গোঘাট

থানাতেও চোখে পড়িবে। কিন্তু গোঘাটের পরে, আরামবাগ মহকুমার বৃহত্তর অংশে, আরামবাগ সদর, পুড়শুড়া ও খানাকুল থানায় ভূমি সম্পূর্ণরূপে পলিমাটিতে গঠিত এবং সমতল।

পূর্ব বাঁকুড়া ও আরামবাগে বন্যা ও বন্যাজনিত সমস্যা

বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মধ্য অংশের বেশিরভাগ জমিই অনুর্বর। প্রবল ও সুসম বৃষ্টিপাত হইলে এই জমিতে কঠিন পরিশ্রম করিয়া কিছুটা ফসল ফলান সম্ভব। অপেক্ষাকৃত উর্বর জমিতেও প্রবল বৃষ্টিপাত হইলেই শস্য ভাল হয়। আবার বাঁকুড়ার পূর্ব অংশ ও আরামবাগে পলিমাটির সমভূমিতেও সুফলনের জন্য বৃষ্টি বেশি হইলেই ভাল। কিন্তু সুবৃষ্টিই আবার বাঁকুড়ার পূর্ব অংশ ও আরামবাগে আসিত অভিশাপের রূপ নিয়া। বাঁকুড়ার পশ্চিমদিক হইতে ভূমি ক্রমশ নিচু হইয়া নামিতেছে পূর্বদিকে। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে উঁচু জমির জল নিচের দিকে নামিতে থাকে দ্রুতবেগে। তাহার পর বিভিন্ন দিকের জলধারা নদীর খাতে মিলিয়া পূর্বদিকে ছুটিয়া চলে। নদীগুলি চিরকাল ধরিয়া এই জলধারা বহন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ হইতে বাঁকুড়া ও আরামবাগের নদীগুলি, দামোদর মুণ্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী, রত্নাকর ক্রমাগত পলি পড়িয়া বুজিয়া আসিতেছিল। নদীগুলির উৎসক্ষেত্র ও তাহার পরে অনেকটা এলাকা জুড়িয়া এই সময় হইতে জঙ্গল হাসিল হইতেছিল ব্যাপকভাবে। বালি ও কাঁকরমেশানো এই এলাকার জঙ্গল কাটার ফলে ভূমিক্ষয় হইতেছিল দ্রুতবেগে। বৃষ্টিজলে বালি কাঁকর ক্রমাগত আসিয়া পড়িতে-ছিল নদীগর্ভে। অবশেষে বিংশ শতকের প্রথমদিকে আসিয়া অবস্থা এমনই হইয়া উঠিল যে অতিরিক্ত জলবহনের ক্ষমতা নদীগুলির আর ছিলই না। বৃষ্টি বেশি হইলেই অতিরিক্ত জল নদী-খাতের দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত করিয়া দিত। এদিকে উনবিংশ শতকেই স্বাভাবিক যদৃচ্ছ বাঁধ বাঁধা, পথ তৈরি করা প্রভৃতি কারণে স্বাভাবিক জলনিকাশী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। ফলে প্লাবিত অঞ্চলে জল আর বাহির হইবার পথ পাইত না। জল আটকাইয়া সৃষ্টি হইত নদী সিকস্তি হাজা জমি। বন্যার প্রকোপে একদিকে যেমন ভাঙিয়া পড়িত ঘরবাড়ি ও শস্য নাশ হইত, অন্যদিকে তেমনি জলের তোড়ে ভাসিয়া যাইত গবাদি পশু এমন কি মানুষ পর্যন্ত। তাহার পর বন্যার প্রকোপ কমিলে হাজার হাজার বিঘা বোনো জমিতে সৃষ্টি হইত কাশবন। ইহার উপর হানা পড়িলে তো আর কথাই নাই। হানার মুখে ও আশেপাশের জমি বালিচাপা পড়িয়া যাইবে। বালির স্তর না সরাইলে তাহাতে চাষ করিবার আর কোন উপায়ই থাকিবে না। এইভাবে বাঁকুড়ার পূর্ব অংশ এবং বিশেষ করিয়া আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা প্রতি বছরেই চাষের অযোগ্য হইয়া পড়িয়া থাকিত। এদিককার সমতল পলিমাটির উর্বরতা বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মধ্য অংশের তুলনায় বেশি হইলেও ফলন বেশি হইবার উপায় আর ছিল না। ঠিকমত বাঁধ দেওয়া, জল-নিকাশীর ব্যবস্থা, ভূমির উর্বরতা যাহাতে বাড়ে তাহার জন্য ব্যবস্থা,—এ সবই জমিদারের করিবার কথা। কিন্তু জমিদার না করিলে দেখিবার কেহ ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকার রাজস্ব নিয়াই নিশ্চিন্ত। জমিদারও খাজনা আদায় নিয়াই খালাস। দায় নিবার জন্য কোন মাথাব্যথা তাহার ছিল না। আর বন্যার ফলে নদী সিকস্তি বা বালি চাপা এমন ব্যাপকভাবে হইত যে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা সাধারণ কৃষকের সাধ্যাতীত।

পশ্চিম ও মধ্য বাঁকুড়ায় খরা ও দুর্ভিক্ষ

বাঁকুড়ার পূর্ব অংশে এবং আরামবাগে প্রধান সমস্যা বন্যা কিন্তু বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মধ্য অংশে প্রধান সমস্যা খরা। একে তো ঊষর বলিয়া অধিকাংশ জমিতে ভাল ফসল কদাচিৎই হয়। তাহার

উপর তিন বা চার বৎসর অন্তর অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ হইতই। অনাবৃষ্টি কোন কোন বৎসরে হয় স্থানীয়ভাবে —একটি বা দুইটি থানায়। কোন কোন বৎসরে আবার হয় সমগ্র এলাকা জুড়িয়া। অনাবৃষ্টির ফলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ বাঁকুড়াতে হইয়াছে বহুবার। সরকারী স্বীকৃতি অনুসারেই ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে পাঁচবার। বিংশ শতকের এই অবস্থার যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে লোকগণনার প্রতিবেদনে ও সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জেলা গেজেটিয়ারে। আগেকার দিনে স্থানীয় ভূস্বামীরা সেচের জন্য যেসব বাঁধ দিয়াছিলেন সংস্কারের অভাবে সেগুলি ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছিল। সেচের জন্য নদীর জল ব্যবহার করিবার উপায় ছিল না। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে ব্যাপক বন হাসিলের ফলে বাঁকুড়ার নদীগুলিতে যেমন জলপ্রবাহ কমিয়া আসিয়াছে, তেমনি ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীগর্ভে জমিয়াছে পলি। এখন তো অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে নদীপ্রবাহ বলিতে ভরাট খাতের মধ্যে আঁকাবাঁকা ক্ষীণ জলধারা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মধ্য অংশে ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তন

অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ হইলে আত্মরক্ষার মতো সম্বল চাষীর ছিল না। কেন চাষী নিঃসম্বল হইল তাহা বুঝাইতে হইলে একটু আগের কথা বলা প্রয়োজন। পশ্চিম ও মধ্য বাঁকুড়ার ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতে পৃথক ছিল। মুঘল আমলে এখানকার জমিদারেরা অধীনতার প্রমাণস্বরূপ পেসকাস নামে যৎসামান্য রাজস্ব দিতেন। অধীন প্রজাদের নিকট তাঁহাদের নগদ খাজনার দাবিটা বিশেষ ছিল না। প্রজা সাধারণত খাজনা দিত উৎপন্ন দ্রব্যের কিছুটা দিয়া অথবা কোন কাজ করিয়া দিয়া। খাজনা সংগ্রহ জমিদার নিজের লোক দিয়া করিতেন না; গ্রামের মণ্ডলের উপর ছিল খাজনা সংগ্রহ করিবার ভার। বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মধ্য অংশের জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি চাষযোগ্য হইয়াছিল বাগদী, বাউরী প্রভৃতি তপশীলভুক্ত জাত ও সাঁওতাল, ভূমিজ ও খয়রা প্রভৃতি উপজাতির প্রচেষ্টায়। মণ্ডল বা মাঝির নেতৃত্বে ছোট ছোট দল জঙ্গলের খানিকটা বন্দোবস্ত নিয়া, হাসিল করিয়া তাহার পর চাষ আরম্ভ করিত। খাজনার ব্যাপারে জমিদারের কথা হইত মণ্ডলের সঙ্গে। মণ্ডলী গ্রামের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে জমিদারের প্রত্যক্ষ কোন ক্ষমতা ছিল না। খাজনা বাড়াইতে হইলে বৃদ্ধি চাহিতে হইত মণ্ডলের মাধ্যমে। তবে বাড়িবার দৃষ্টান্ত খুব কম। মণ্ডলী ছাড়া ছিল নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে চাকরান ও ঘাটোয়ালি বন্দোবস্ত, সামান্য খাজনার পত্তনী বন্দোবস্ত এবং লাখেরাজ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর।

বিষ্ণুপুর পরগনা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দখলে আসে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। কোম্পানি একদিকে দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পেসকাস প্রদানে অভ্যস্ত জমিদারদের দেয় খাজনার পরিমাণ বাড়াইয়া দিল অত্যধিক। অন্যদিকে চাকরান ও ঘাটোয়ালি জমিতে এবং লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই জমিতে খাজনা বসান হইল উচ্চ হারে। নিয়মিত নগদ খাজনা দিবার জন্য কোম্পানি চাপ দিতে লাগিল। চাপে পড়িয়া জমিদার নগদ খাজনা চাহিতে লাগিলেন প্রজার কাছে। কিন্তু প্রজা দিবে কোথা হইতে? নগদের কারবারই তো দেশে ছিল না। তাহার উপর নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা দিবার অভ্যাসটাও কাহারও হয় নাই। এই অবস্থার মধ্যে অবশ্য নগদ জোগাইবার লোক আসিয়া গেল। বাঙালী ও ওড়িয়া ব্যবসায়ীরা ইহার আগে হইতেই এসব অঞ্চলে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। নগদ যোগাইয়া ইহারাই হইয়া বসিল মহাজন। নগদ খাজনার যোগানদার পাইয়া জমিদারেরা এইসব মহাজনদের হাতে জমি বন্দোবস্ত দিতে লাগিলেন মোকররী স্বত্বে অর্থাৎ নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে অথবা খাজনা আদায়ের মধ্যস্বত্বাধিকার অর্থাৎ পত্তনী দিয়া। বাঙালী ও ওড়িয়ারা তখন একদিকে

মহাজন হইয়া সাধারণ প্রজাকে নগদ টাকা ধার দিতে লাগিল। অন্যদিকে মোকররী রায়ত বা পত্তনী-দার হিসাবে সেই টাকাই ঘরে তুলিতে লাগিল খাজনা বলিয়া। সুবিধা পাইয়া ইহারা আবার এই অঞ্চলের সুপ্রাচীন প্রথা অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিল। মণ্ডলকে এড়াইয়া খাজনা বাড়াইতে লাগিল সরাসরি। খাজনা বাড়িলে তাহার লাভ দুইদিকে। একদিকে মহাজনের সুদ অন্যদিকে তাহার প্রাপ্য খাজনা। আবার খাজনা বাকি পড়িলে প্রথমে বকেয়া খাজনার উপরে সুদ এবং অবশেষে প্রজাকে উচ্ছেদ করিয়া তাহার জমি নিজেই নিয়া নিতে পারিত। খাজনার জন্য নগদ যখন তাহার কাছেই ধার নিতে হইবে তখন কোন প্রজার খাজনা বাকি ফেলার ব্যবস্থা করা তাহার পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। এইভাবে কৃষকের ভাল জমিগুলি ধীরে ধীরে আসিয়া পড়িতে লাগিল মহাজনের গ্রাসে।

বাঁকুড়ার পশ্চিম ও মধ্য অংশে কৃষকের ক্রমবর্ধমান দুর্গতি ও জমি হস্তান্তর

এ অবস্থায় অনাবৃষ্টি হইলে চাষী আত্মরক্ষা করিবে কী দিয়া? বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে শ্বারস্থ হইতে হইবে ওই মহাজনের কাছেই। খাইবার জন্য ধান ও খাজনার জন্য নগদ দুই-ই নিতে হইবে মহাজনের নিকট হইতে। এমনি করিয়া দেনার দায় বাড়িতে থাকে। কোন বছরে যদি শস্য ভাল হয় তবে তাহার একটা বড় অংশ চলিয়া যাইবে ঋণ শোধে। এতটা দিয়াও যে ঋণ শোধ হইবে, তাহা নয়। হয়ত সুদটা দেওয়া হইল। কোন বৎসরে হয়ত তাহাও পুরা দেওয়া গেল না। বাকি সুদ যোগ হইয়া গেল আসলের সঙ্গে। সুদে আসলে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিতে থাকে। অবশেষে অন্তত আংশিক শোধ দিবার জন্যও জমি বিক্রয় করিতেই হয়। ক্রেতা অবশ্য মহাজন নিজেই। সে নিজেই গ্রামের সবচেয়ে বেশি জমির মালিক, হয়ত সে গ্রামের পত্তনিদারও। ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমির যে অংশটুকু ভাল সেটুকু খাসে রাখিয়া বাকি অংশটুকু সে বন্দোবস্ত দিত আগের মালিককেই। নতুন বন্দোবস্তে খাজনা ধার্য হইত ভাগে বা সাজায় এবং অনেক উচ্চহারে। ভাগের হিসাব সাধারণত উৎপন্ন দ্রব্যের আধাআধি, কিন্তু মালিক নয় ভাগের ছয় ভাগ নিত এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যে ধার্য খাজনার নাম সাজা। সাজা ধরা হইত সুবৎসরে যে ফলন হয় তাহার হিসাবে। ভাল জমি মালিক রাখিয়া দিত খাসে, সে জমির চাষ হইবে ভাগে। আর নিরেস জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হইত সাজায়। বাঁকুড়ার মত অনাবৃষ্টির অঞ্চলে নিরেস জমি সাজায় দেওয়া যে লাভজনক তাহাতে আর সন্দেহ কি। স্বভাবতই নিয়মিত সাজা দেওয়া কৃষকের পক্ষে সম্ভব হইত না। ক্রমান্বয়ে বকেয়া বৃদ্ধির দায়ে ঋণের বোঝা বাড়িয়াই চলিত। এইভাবে খাজনা ও বকেয়ার দায়, দুর্ভিক্ষ-অনটন, ঋণ নেওয়া, সুদ বা ঋণ শোধের দায়, তাহার ফলে অভাব, অভাবের দরুন ঋণ, ঋণের দায়ে জমি হস্তান্তর, সেই জমিতে আবার উচ্চ হারের খাজনায় বন্দোবস্ত এবং ভূমিহীন কৃষকের অনিবার্য অভাব ও ঋণ—এই দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়িয়া সাধারণ কৃষক সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইয়া পরিণত হইতেছিল ভূমিদাসে। এই নিঃসম্বল ভূমিদাসের সারা বৎসর যে অন্ন জুটিবে না ইহাই স্বাভাবিক। বনের কন্দ আর অখাদ্য খাইয়া ব্যাধিগ্রস্ত শীর্ণদেহে যে কয়টা দিন বাঁচিবার বাঁচিয়া থাকিবে—ইহাই তাহার নিয়তি!

বাঁকুড়ার পূর্ব অংশে ও আরামবাগে কৃষকের ক্রমবর্ধমান দুর্গতি

বাঁকুড়ার পূর্ব অংশে ও আরামবাগ মহকুমায় সাধারণ কৃষক ভূমিদাসে রূপান্তরিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার নাভিশ্বাস উঠিতেও বিশেষ বাকি ছিল না। অঞ্চলটা ছোট রায়ত-প্রধান। জমিদারেরা, বিশেষ করিয়া আরামবাগ মহকুমায়, সংখ্যায় খুব বেশি নয়, এক-একটা জমিদারির

বিস্তারও যথেষ্ট। বড় জমিদারের শক্তি, সহায়-সম্বল সবই বেশি। শক্তির ব্যবহার তাঁহারা করিতেন খাজনা ও উপরি বাজে আদায় সংগ্রহে। খাজনার হারও বেশ চড়া। মোকররী স্বত্বে খাজনা বিঘায় দেড় হইতে দুই টাকা, রায়ত স্থিতিবানের খাজনার হার আরও বেশি। জমিদারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তুলনায় অনেক বেশি চড়া হারে খাজনা ধার্য করিত রায়ত নিজে। সম্পন্ন রায়ত কোর্ফা বা অধস্তন রায়ত বসাইলে খাজনা ধার্য করিত দ্বিগুণ হারে।

জমিদারের খাজনা তুলনায় কম বটে, কিন্তু সে খাজনা নিয়মিত মিটাইবার মত অবস্থা সাধারণ চাষীর ছিল না। তাহার উপর ছিল জমিদারের ও সেরেস্তায় অধিষ্ঠিত কর্মচারীদের নানা বাজে আদায়ের দাবি: মাপ্পন, মাথট, হিসাবানা, তহুরি, নজরানা, আগমনী ইত্যাদি। প্রতি বৎসর বন্যা, প্রতি বৎসর বন্যায় জমি বালি চাপা পড়ে, জল জমিয়া জমি অব্যবহার্য পতিত হইয়া যায়, প্রতি বৎসর কাশবনের বিস্তার বাড়িতেই থাকে, কিন্তু জমিদারের দাবি তো কমেই না, উপরন্তু খাজনা বৃদ্ধির কথা ওঠে। চাষ হোক বা না হোক, জমি হাজিয়া মজিয়া যাক, খাজনা মিটাইতেই হইবে, বাজে আদায়ও না দিলে চলিবে না। আরামবাগে অধিকাংশ কৃষকের হাতে জমির পরিমাণ পাঁচ বিঘার বেশি নয়। ইহার একটা অংশ যদি বালি চাপা পড়ে বা নদী সিকস্তি হয় তবে তাহার বাঁচিবার উপায় কী। কিন্তু খাজনা বাকি পড়িলে জমিদার ছাড়ে না। বাকি খাজনার দায়ে জোর করিয়া জমি দখল, ফসল আটক, ঘর ভাঙিয়া দরজা-জানলা খুলিয়া নিয়া যাওয়া—এসব নিত্যকার ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর কাছারিতে ধরিয়া আনিয়া আটকাইয়া রাখা, দৈহিক নির্যাতন—এসব তো ছিলই। তাই খাজনার ব্যবস্থা না করিলে নয়, আর সে ব্যবস্থা করিতে হইলে ঋণ ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু ঋণ শোধ করিবার মত উপার্জন তো নাই, ফলে জমি বেচিয়া দেওয়া ছাড়া আর কী উপায়। অপেক্ষাকৃত ভাল জমি কিনিবার লোক হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু নদী সিকস্তি বা কেশো জমি কে কিনিবে? সে ক্ষেত্রে জমি ইস্তাফা দেওয়াই নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র পথ। এইভাবে ভূমিহীন বা প্রায়-ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছিল।

অন্নাভাবের উপর আরম্ভ হইল রোগের আক্রমণ। জল আটকাইয়া নদী সিকস্তি জমির পরিমাণ যেমন বাড়িত, তেমনি বদ্ধজলে বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া চলিত মশা। উনবিংশ শতকের শেষাদিক হইতে দেখিতেছি বাঁকুড়ার পূর্ব অংশে ও আরামবাগে ম্যালেরিয়ার প্রসার ঘটিয়াছে বিপুলভাবে। রোগের প্রকোপে গ্রামের পর গ্রাম একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। যাহাদের উপায় ছিল তাহারা পলাইয়া বাঁচিল। কিন্তু অধিকাংশেরই কোন উপায় ছিল না। সাধারণ কৃষকের তো নয়ই। তাহার উপর অনাহারক্লিষ্ট অপুষ্ট শরীরে রোগাক্রান্ত হইবার পক্ষে কোন বাধাই ছিল না। তাই রোগগ্রস্ত হইয়া জরাজীর্ণ শরীরে মৃত্যুবরণ করাই তাহার নিয়তি। ইহার উপরে আরামবাগ ও পূর্ব বাঁকুড়ায় ছিল দুরন্ত কালাজ্বর আর মধ্য ও পশ্চিম বাঁকুড়ায় কুষ্ঠ। ১৯৩০ সাল নাগাদ বাঁকুড়ায় কুষ্ঠ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল মহামারীর মত। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময় বাঁকুড়ায় কুষ্ঠ-রোগীর সংখ্যা নাকি ৪৫,০০। কুষ্ঠ মৃত্যুরোগ নয়, পঙ্গু করিয়া ফেলে। কিন্তু ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর মৃত্যু ত্বরান্বিত করিয়া দেয়। দশবাৎসরিক লোকগণনায় প্রতিবেদনে আরামবাগ মহকুমা ও পূর্ব বাঁকুড়ার থানাগুলিতে জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির হার দেখিলেই বুঝা যাইবে, ম্যালেরিয়া কালাজ্বর কী বিধ্বংসী রূপ নিয়াই না এখানে দেখা দিয়াছিল।

কৃষকের জীবনে তাই আশা বা ভরসা বলিতে আর কিছু ছিল না। যাহার একটু জমি আছে বা ভাগে বন্দোবস্ত আছে কোনক্রমে চাষ করিয়া কিছুদিনের খাদ্য সে হয়ত পায়, কিন্তু বৎসরের বাকি দিনগুলি চলে কী করিয়া। যাহার তাহাও নাই তাহার তো একেবারেই অকুলান। পরের দুয়ারে

খাটিয়া বা ধান ভানিয়া দিন চালাইবার চেষ্টা কেহ কেহ করিত। কিন্তু কাজ দিতে পারে এমন লোক আর কত, ভানিবার ধানই বা অত পাওয়া যাইবে কোথায়? উপায়ান্তর না দেখিয়া অনেকে হইয়া উঠিল ডাকাত বা ঠ্যাঙাড়ে। সামান্য কয়েক গণ্ডা পয়সা বা দু-এক মুঠো চাল কি এক টুকরা কাপড়ের জন্য নির্মমভাবে রাহী বা গৃহস্থ লোককে মারিয়া ফেলিতে ইহাদের বাধিত না। আরামবাগ ও পূর্ব বাঁকুড়ায় এইসব ডাকাতদের নিদারুণ নরহত্যার কাহিনী আজও লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া আছে। কেবল আরামবাগ ও পূর্ব বাঁকুড়াই নয়, প্রাণের দায়ে যাহারা নির্বিচারে প্রাণ নিত এমন ডাকাত ঠ্যাঙাড়ের কথা বাংলার অনেক জায়গাতেই শোনা যায়। ইহাদের নিয়াই তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প 'নয়ন ছাতি' ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আখড়াইয়ের দীঘি' লেখা।

বাঁকুড়ার পূর্ব অংশ ও আরামবাগে মাঝারি রায়তের অবস্থা

আরামবাগে দশ-পনেরো বিঘার মালিক এমন মাঝারি রায়তের অবস্থাও খুব একটা ভাল ছিল না। তাহার জমিও নদী সিকস্তি হইত, বালি চাপা পড়িত, কিন্তু উদ্বৃত্ত ধান বা পাট ও আলুর মত অর্থকরী ফসল হইতে উপার্জন হইত খুবই কম। স্বাধীনতার আগে গোটা আরামবাগ মহকুমা বহির্জগৎ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্নই ছিল। না ছিল রেলপথ, না ছিল ভাল সড়ক-যোগাযোগ। খাত বুজিয়া নদীগুলির এমন অবস্থা যে বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে নৌপথে গমনাগমন অসম্ভব। অথচ কানানদীর সোঁতা ও অসংখ্য খাল পার হইয়া বৎসরের অন্য সময় যাওয়া-আসা দুষ্কর। এ অবস্থায় ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া কঠিন। বস্তুত আরামবাগে ধান, চাল, পাট, আলু সবকিছুই বাংলার অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশ কম দামেই বিক্রয় হইত। যোগাযোগের অভাবে পাট ও আলুর মত ফসল কম দামে তুলিয়া দিতে হইত পাইকারের হাতে। তাই পনেরো বা কুড়ি বিঘা জমি নিয়াও আরামবাগের রায়ত বিশেষ একটা স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইতে পারিত না। সাধারণভাবে বলিতে গেলে কৃষি হইতে লাভ ও সঞ্চয় একমাত্র বড় কৃষকেরই হইতে পারিত। কিন্তু তেমন রায়তের সংখ্যা আরামবাগে খুব কমই ছিল। এই প্রসঙ্গে অবশ্য মাঝারি কৃষকের একটা অংশের কথা বলিতে হয়। জমির অবস্থাভেদে সুযোগমত পূর্ব বাঁকুড়া ও আরামবাগের কিছু মাঝারি কৃষক প্রায় সারা বৎসরই আনাজ চাষ করিয়া স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিত, অথবা কিছুটা জমিতে আখ চাষ করিয়া গুড় বিক্রয় করিত। ইহাদের অবস্থা কিন্তু সাধারণ মাঝারি চাষীর তুলনায় ভাল। আবার নিরাপদ স্থানে ভাল জমি আছে এমন যে মাঝারি কৃষকও ধান ও ডাল বা তিলের মত রবিশস্য করিয়া স্থানীয় বাজারে উদ্বৃত্ত বিক্রয় করিত তাহার অবস্থাও তুলনায় একটু ভালোই বলিতে হইবে। আরামবাগ ও পূর্ব বাঁকুড়ার সচ্ছল বড় রায়তের পরেই ইহাদের স্থান।

গ্রামীণ সমাজের নেতৃত্ব

পূর্ব বাঁকুড়া ও আরামবাগে যে মাঝারি রায়ত কিছুটা সচ্ছল সেও কিন্তু গ্রামপর্যায়ে প্রাধান্য খুব একটা অর্জন করিতে পারে নাই। বস্তুত প্রাধান্য অর্জন করিবার মত ক্ষমতা ও সচ্ছলতা তাহার ছিল না। অল্পসংখ্যক হইলেও গ্রামের নেতৃত্ব ছিল বড় রায়তের হাতে। নেতৃত্বে তাহাদের অংশীদার হইতে পারিত স্থানীয় পর্যায়ের ছোট জমিদার বা পত্তনিদার। কিন্তু আরামবাগে এমন লোক বিশেষ ছিল না। জমিদাররা সকলেই প্রায় বাহিরের লোক এবং জমিদারির আয়তনও খুব বড়। তবে জমিদারি চালানো হইত স্থানীয় সম্পন্ন লোকেদের কাছারিতে নিযুক্ত করিয়া। স্বভাবতই গ্রামের মধ্যে ক্ষমতা ইহাদের সবচেয়ে বেশি। মধ্য ও পশ্চিম বাঁকুড়ায় অবস্থাটা অন্যরূপ। এখানে বাহিরাগত বড় জমিদার কম। স্থানীয় বাঙালী ও ওড়িয়া মহাজনরাই এখানে জমি গ্রাস করিয়া

জোতদার ও পত্তনি কিনিয়া পত্তনিদার হইয়া বসিয়াছে। মহাজনি, জোতদারি ও পত্তনিদারির মিলনে গ্রামে তাহাদের ক্ষমতা অবিসংবাদী। তাহার উপর যদি চালানী ব্যবসা থাকে বা চালকল বসাইতে পারে—তবে তো কথাই নাই।

প্রাচীন নেতৃত্বের স্বরূপ

নূতন নেতৃত্ব উদ্ভবের আগে হইতেই গ্রামের পুরাতন ও ঐতিহ্যগত নেতৃত্ব ভাঙিয়া পড়িতেছিল। পুরাতন অভিজাতবর্গ ও বৃত্তিজীবীরা অনেকেই দেশ ছাড়িয়া শহরবাসী। পুরাতন অভিজাতদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য গ্রামেই থাকিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া। শিল্পবাণিজ্যে আরামবাগ ও পূর্ব বাঁকুড়া একসময় ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি হইবার ফলে পুরাতন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবস্থাও হীন। আগেকার দিনের সম্পন্ন ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর যেটুকু গ্রামে অবশিষ্ট রহিল তাহার মধ্যে পুরাতন স্মৃতির রেশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঐতিহ্যসূত্রে একটা সম্মান তাঁহারা পাইতেন বটে, কিন্তু নূতন আমলের প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তাঁহাদের সাধ্যাতীত।

আগেকার জমিদার, ইজারাদার, তালুকদার ও ব্যবসায়ীরাও গ্রামসমাজকে শোষণ করিতেন। কিন্তু সে শোষণ সর্বব্যাপী করিয়া তুলিবার অধিকার রাষ্ট্র বা সমাজ কখনই দেয় নাই। উপরন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য অর্জিত ধনের একটা অংশ সমাজকে ফিরাইয়া দিতেও হইত। মন্দির প্রতিষ্ঠা, দেবসেবা, সদাব্রত, ধর্মশালা, পুষ্করিণী, বাঁধ, রাস্তাঘাট—এসব না করিলে সমাজের কাছে প্রাধান্যের স্বীকৃতি পাওয়া যাইত না। ইংরেজ-প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থায় যে জমিদার ও পত্তনিদার গোষ্ঠী সৃষ্টি হইল এবং সেই ব্যবস্থার সূত্র ধরিয়া যে জোতদার ও মহাজনের উদ্ভব হইল তাহাদের নির্বিচার এবং দায়িত্বহীন শোষণ রোধ করিবার কোন ব্যবস্থাই রাষ্ট্রের ছিল না। এদিকে ঐতিহ্যগত সামাজিক অধিকার প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের লোপ পাইয়া গিয়াছে। ফলে সামাজিক ক্ষমতাও কেন্দ্রীভূত হইতেছিল বিত্ত ও প্রভাবশালী লোকেদের হাতে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কথা মনে রাখিয়া নূতন বিত্তশালীদের মধ্যে অনেকে হয়ত প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠান, দেব-সেবার ব্যবস্থা করিত, কিন্তু তাহার আয়োজনও যেমন কম, চরিত্রও তেমনি পালটাইয়া গিয়াছে। প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসাবে ইহারা চিনিয়াছিল পীড়ন, ভূমিগ্রাস ও মহাজনী; ইহাদের প্রাধান্যে শাসন ও শোষণই ছিল আসল, অন্য সবকিছুই তাহার পরে। এ অবস্থায় তাহাদের উৎসবে লোকে হয়ত আসিত, কিন্তু সে হয় বাধ্য হইয়া অথবা একবেলা খাইতে পাইবে বলিয়া। এককালে যাহা ছিল সমাজের অধিকার ও প্রাপ্য, এখন তাহার একটা সামান্য অংশ সমাজের সম্মুখে রাখা হইতেছে দয়ার দান হিসাবে।

গ্রামীণ নেতৃত্বের অন্তর্বিরোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা

পশ্চিম ও মধ্য বাঁকুড়ায় যেমন মহাজন নিজেই মাঝারি ও বড় রায়ত ও পত্তনিদার হইয়া ছোট রায়ত, ভাগচাষী বা কৃষিমজুরকে নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিতেছিল, পূর্ব বাঁকুড়া ও আরামবাগে সে অবস্থাটা ছিল না। এখানে বড় রায়ত মহাজনি করিত না এমন নয়। কিন্তু সাধারণত ঋণ যাহারা দিত তাহারা প্রধানত কুসীদজীবী। ঋণের দায়ে খাতকের জমি নিয়া নিলে ব্যাপারটা যে লাভজনক নাও হইতে পারে এ সম্ভাবনাটা সব সময় ছিল। তাই ঋণদাতা শোধটা নিত নগদে ও ফসলে। আবার জমিদারিগুলো বড় ও প্রতিষ্ঠিত জমিদারদের হাতে ছিল—পত্তনিতে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায় নাই বলিয়া মহাজন বা বড় রায়ত পত্তনিদার হইয়া উঠিতে পারে নাই। বড় রায়ত, মাঝারি রায়ত,

মহাজন প্রত্যেকের স্বার্থ ও কর্মক্ষেত্র বলিতে গেলে স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র যেসব বড় বা মাঝারি রায়ত জমিদারের কাছারিতে নায়েব, গোমস্তা বা কারকুন হইয়া কাজ করিত তাহাদের ক্ষেত্রেই অবস্থাটা কিছু জটিল। এমন লোকের সংখ্যা খুব একটা বেশি না হইলেও স্থানীয় পর্যায়ে ইহাদের ক্ষমতাই সর্বাধিক। স্বভাবতই স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃত্বেও ইহাদেরই অগ্রাধিকার। ইহাদের অগ্রাধিকার প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তুলনায় সচ্ছল মাঝারি কৃষকের ছিল না কিন্তু তাহারা সহজভাবে ইহা মানিয়াও নেয় নাই। যে মাঝারি কৃষক ফসল বেচিয়া দুই পয়সা করিত তাহার মনে এমন কি সাধারণ বড় কৃষকেরও শুধু ক্ষোভই নয় কিছুটা ঈর্ষাও হয়ত ছিল। এ ভাবটা বিশেষভাবে আসিত দুইটি কারণে। স্থানীয় নেতৃত্বে যাহারা প্রতিষ্ঠিত আর যাহারা প্রতিষ্ঠা পাইতে চায় উভয়েই হয় সদ্গোপ বা মাহিষ্য জাতের লোক। জাত হিসাবে সদ্গোপ ও মাহিষ্য উভয়েই তখন চাহিতেছে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা। বৃহত্তর হিন্দু সমাজের মধ্যে ভদ্র জাতি হিসাবে স্বীকৃতি এবং উঁচু জাতের যতটা সম্ভব কাছাকাছি উঠিয়া আসিবার প্রচেষ্টা তখন তাহাদের চলিতেছে। প্রতিষ্ঠাভিলাষীদের মধ্যে একটা অংশ যদি আগাইয়া গিয়া থাকে অন্য অংশের মনে ক্ষোভ তো একটা থাকিবেই। তাহার উপর অগ্রবর্তী অংশ যদি জমিদারি কাছারিতে বসিয়া পশ্চাদ্‌বর্তী অংশের উপর নিপীড়ন চালায়, ক্ষমতার সুযোগ নিয়া অপমান ও দৈহিক নির্যাতন করে, তবে সে ক্ষোভ বিদ্বেষে পরিণত হইতে কতক্ষণ।

আভ্যন্তরিক অবস্থাবৈপরীত্য গ্রামের সম্পন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একটি অংশের মধ্যে বিদ্বেষ-বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে ও সরকারী কর্মচারীদের আচরণে ক্ষোভ ও ক্রোধের সঞ্চার হইত অবস্থানির্বিশেষে সকলেরই মনে। গ্রামের মধ্যে বড় রায়ত, পত্তনিদার, মহাজন বা জমিদারের কর্মচারী যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, থানার জমাদারের কাছেও তাহাদের দাঁড়াইতে হইত হাত জোড় করিয়া, আর সম্বোধন করিতে হইলে 'হুজুর' বলা ছাড়া উপায় ছিল না। তাহার উপর ছোট বড় কোন দারোগাবাবু বা কোন সরকারী কর্মচারী যদি কোন উপলক্ষে একবার আসিয়া উপস্থিত হয় তো মাথা নিচু করিয়া তাহার সেবা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাহাদের অপমানজনক আচরণ, বিদ্রূপ সবই মানিয়া নিতে হইত মাথা পাতিয়া। আবার মামলা-মোকদ্দমা করিতে যাইতে হইত আদালতে, উকিল-মোক্তারের কাছে। অনুগ্রহের জন্য যাইতে হইত সরকারী অফিসে। সর্বত্রই কপালে জুটিত অবমাননা ও অবজ্ঞা। তাহার উপরে এসব লোক বিশেষ ইংরাজী জানিত না বলিয়া শহরে-বাজারে, অফিসে-আদালতে অনেকে আবার ঠকাইয়া নিতেও ছাড়িত না। গ্রামের মধ্যে উচ্চবর্গে যে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা, সামাজিক পরিচয়ের প্রশ্নে তাহাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার সঙ্গে এইসব অবজ্ঞা, অবমাননা ও দীনতা এতই অসংগতিপূর্ণ যে সরকার, সরকারী-ব্যবস্থা ও সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব ইহাদের মনে থাকিবেই। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার ইচ্ছাও তাহার স্বাভাবিক।

গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে শহরবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা ও অবহেলা

সারা দেশ জুড়িয়া কৃষকের দুর্গতি যখন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে তখন শিক্ষিত সচেতন ভদ্রলোকেরা হইয়া উঠিয়াছেন সম্পূর্ণ শহরবাসী। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বৃত্তিজীবী তাঁহাদের জীবন ও জীবিকা শহরেই আবদ্ধ। শহরবাসী মধ্যস্বত্বাধিকারীরা জীবিকার জন্য গ্রামের উপর নির্ভরশীল বটে, কিন্তু সেটুকু অপরকে দিয়া সংগ্রহের একটা ব্যবস্থা করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত। গ্রামের কথা, কৃষকের কথা বুদ্ধিজীবীদের কেহ কেহ বলিয়াছেন বটে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদেশের কৃষক" তো সাধারণ কৃষকের দুর্দশা নিয়াই লেখা। কিন্তু এসব কথা শিক্ষিতসমাজের চেতনায় কখনও প্রবেশ করে নাই। বলিতে গেলে গ্রাম ও কৃষক শহরবাসী শিক্ষিত সচেতন সম্প্রদায়ের দৃষ্টির প্রায়

বাহিরেই চলিয়া গিয়াছিল। শহরের বাহিরে গ্রাম আছে, জ্ঞান এই পর্যন্তই। তাহার পরেই ধানগাছের তক্তা-জাতীয় নির্বোধ রসিকতার মনোভাব। স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৫-৮) রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে গ্রামের কথা উঠিয়াছে। আন্দোলনের কার্যক্রমের মধ্যে গ্রাম পুনরুজ্জীবন ও ব্যাপক গণ-সংগঠনের ইঙ্গিতও ছিল। কিন্তু অশ্বিনীকুমার দত্ত-র মতো অল্প কয়েকজন ছাড়া, গ্রামের প্রকৃত অবস্থা, কৃষকের কথা ও জাতীয় জীবনে সাধারণ কৃষকের ভূমিকার গুরুত্ব বিশেষ কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অশ্বিনী দত্ত বরিশালে গণ-সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন সাধারণ কৃষককে নিয়া। বরিশালে স্বদেশী আন্দোলনের যে সাফল্য আসিয়াছিল তাহার মূলে এই গণ-সংগঠন। সখারাম গণেশ দেউসকর "দেশের কথা" লিখিয়া ইংরেজ শাসনে দেশের কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতি, লোকশিক্ষা ধ্বংস হইয়া গ্রামীণ জীবনে যে সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ভয়াবহ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তবুও কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা গ্রামের কথা ভাবিতে পারেন নাই। জাতীয় জীবনে ও সংগ্রামে কৃষকের স্থান তাঁহাদের চিন্তার অগোচর। স্বদেশী আন্দোলনের প্রধানতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তো কৃষকের উপর শিক্ষিত সমাজের অভিভাবকত্বের দাবি তাঁহার আত্ম-জীবনীতে স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করিয়াছেন। শিক্ষিতসমাজের চিন্তা ও চৈতন্য যখন এতটাই সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ, তখন ১৯২১ সালে শুরু হইল অসহযোগ আন্দোলন। জাতীয় সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গান্ধীজী বলিলেন নির্দিষ্ট ও ব্যাপক পরিকল্পনার ভিত্তিতে গ্রাম পুনরুজ্জীবনের এবং গ্রামীণ জনসাধারণ, কৃষক, কারিকর, মজুর, সকলকে নিয়া গণ-সংগঠন ও গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলার কথা। বাংলার শিক্ষিতসমাজে তাঁহার আহ্বান অবশ্য খুব একটা সাড়া জাগাইতে পারে নাই। সাড়া দিয়া যাঁহারা আগাইয়া আসিলেন সংখ্যায় তাঁহারা সামান্যই।

ঘ বাঁকুড়া ও আরামবাগে অসহযোগ আন্দোলন ও কংগ্রেস সংগঠনের প্রারম্ভ

বাঁকুড়ায় কংগ্রেসের গণ-সংগঠনের কাজ শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে। অসহযোগ আন্দোলন আরামবাগেও আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। বাঁকুড়ায় আন্দোলনের সূত্রপাত হয় পিয়ারী ভাই নামে একজন অজ্ঞাতপরিচয় হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর প্রচেষ্টায়। পিয়ারী ভাই বাঁকুড়া শহরে বিনা পরিচয়েই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আসিয়াই তিনি স্কুল, কলেজ, বার লাইব্রেরি ঘুরিয়া সভা-সমিতির আয়োজন করিলেন এবং বাঁকুড়ার প্রথম অসহযোগীর দলও সৃষ্টি হইল তাঁহারই প্রচেষ্টায়। পিয়ারী ভাই বাঁকুড়ায় ছিলেন খুব অল্প কয়েকটা মাত্র দিন। তাঁহার পর আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলেন অনিলবরণ রায়। স্থানীয় ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজের দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপকের পদ ছাড়িয়া তিনি অসহযোগী হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। অনিলবরণ অসহযোগী ছাত্র ও শিক্ষকদের সংগঠিত করিয়া নামিলেন কংগ্রেসের কাজে। ইহাদের নিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল বাঁকুড়া শহরে জাতীয় বিদ্যালয় ও কংগ্রেস সংগঠন ও প্রচার। এইসব কাজের সঙ্গে সাহায্যকারী হিসাবে যুক্ত হইয়া পড়িলেন বাঁকুড়ার ধনী মাড়োয়ারী ও বাঙালী ব্যবসায়ীরাও। বাঁকুড়ার কংগ্রেসের সঙ্গে ইঁহাদের যোগাযোগ তাহার পর বরাবরই থাকিয়া গিয়াছে।

অনিলবরণ রায় ও তাঁহার সহকর্মীরা প্রথম হইতেই জোর দিতেছিলেন গ্রামাঞ্চলে প্রচার ও সংগঠন গড়িয়া তোলার দিকে। অনিলবরণ সহকর্মীদের নিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দেশাত্মবোধক সংগীত ও কীর্তন গাহিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও প্রচার করিতেন। আর কয়েকজনকে তিনি গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন গড়িয়া তুলিবার জন্য। ইতিমধ্যে বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে

স্থানীয় কর্মীরা কংগ্রেস ও অসহযোগ আন্দোলনের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গাজলঘাটি মিডল স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্থানীয় এক জমিদারের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া স্কুলটিকে পরিণত করিলেন জাতীয় বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করিয়া গোবিন্দপ্রসাদ ও তাঁহার সহকর্মীরা আন্দোলন সংগঠিত করিতে লাগিলেন। বড়জোড়া থানার বৃন্দাবনপুর গ্রামে অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার দুই পুত্র হেমচন্দ্র ও ক্ষেত্রপাল খাদি ও কৃষি-কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। সোনামুখীতে ও পাত্রসায়রে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন স্থানীয় জমিদার রাধিকাপ্রসাদ ঘর এবং প্রকাশচন্দ্র হাজরা। কোতলপুরে কাজ আরম্ভ করিলেন যতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী পরিবারের মন্মথনাথ মল্লিক। জয়পুরে সংগঠন গড়িতেছিলেন সম্পন্ন জোতদার পরিবারের ভীমাচরণ বাগলী। সিমলাপাল রাজপরিবারের জ্ঞাতি রামকৃষ্ণ বড়ঠাকুর গড়িতেছিলেন সিমলাপালের সংগঠন। খাতড়ায় কাজ করিতে লাগিলেন গোবিন্দপ্রসাদ মল্লিক প্রভৃতি। গ্রামাঞ্চলে প্রচারের মাধ্যমে অনিলবরণ-পরিচালিত সংগঠনের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানের সংগঠনগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হইতে আরম্ভ করিল। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় বাঁকুড়া জেলায় কংগ্রেসের প্রসার ঘটিতে লাগিল দ্রুতবেগে। ১৯২১ সালেই বাঁকুড়া জেলায় স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সংখ্যা দাঁড়ায় একশত ছাপান্নটি। পরের বৎসর কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা হয় দশ হাজার।

আরামবাগে কংগ্রেসের গ্রামভিত্তিক কাজ আরম্ভ হয় ১৯২২ সালে। এই বৎসর শরৎকালে দ্বারকেশ্বর নদের বিধ্বংসী বন্যায় আরামবাগ মহকুমার দক্ষিণ দিক প্লাবিত হইয়া যায়। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সাগরচন্দ্র হাজরা প্রভৃতি একদল স্বেচ্ছাসেবক কংগ্রেসের হইয়া ত্রাণকার্য করিতে আসেন। ত্রাণকার্য করিতে গিয়া আরামবাগের প্রকৃত অবস্থাটা ইঁহারা দেখিতে পাইলেন। এই অভিজ্ঞতা হইতেই তাঁহারা স্থির করিলেন আরামবাগে গান্ধীজীর পরিকল্পনামত গ্রাম-উন্নয়ন ও গণ-সংগঠনের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রফুল্লচন্দ্র অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন বি এস-সি পাশ করিয়া চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়িবার জন্য বিলাত যাইবার ঠিক আগে। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিলেন প্রথম মহাযুদ্ধ ফেরত ডাক্তার আশুতোষ দাস ও ভূপেন্দ্রনারায়ণ সেন, অতুল্য চরণ ঘোষ প্রমুখ শিক্ষিত যুবকবৃন্দ। ইঁহারা আসিয়াছিলেন আরামবাগের বাহির হইতে। অনুকূল চক্রবর্তী, প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ও সত্যসাধন দত্ত-র মতো স্থানীয় শিক্ষিত যুবকরাও কংগ্রেসের কাজে যোগ দিলেন। ক্রমে ক্রমে দলের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন হুগলী হইতে উত্তরপাড়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানের এমন কি বর্ধমান জেলার বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক।

৬. কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যকলাপ : প্রচার, গ্রামোন্নয়ন ও জনসেবা প্রচেষ্টা

প্রথমে বাঁকুড়া ও আরামবাগ দুই জায়গাতেই কংগ্রেসের কার্যকলাপ পরিচালিত হইত প্রচার, গ্রামোন্নয়ন ও সেবা এই তিন ভাগে। প্রচার হইত জনসাধারণের দুঃখদৈন্যের কথা বলিয়া। বলা হইত আগে দেশেঘরে মানুষের জীবন ছিল সচ্ছল। মাঠ ছিল সুজলা সুফলা, গোয়ালে ছিল গোরু, পুকুরে ছিল মাছ। তাঁতি কাপড় বুনিত। অন্য কারিগরেরা তৈরি করিত বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্য। গ্রামের লোকের দিন কাটিত সুখে স্বচ্ছন্দে। তারপরে আসিল ইংরেজ। তাহার অত্যাচারে ও শোষণে চাষ গেল, শিল্প গেল। দেশে তাঁতি আছে কিন্তু ইংরাজের এমনই ব্যবস্থা যে বিলাতী কাপড় কিনিয়া পরিতে হইবে আর লাভটা চলিয়া যাইবে বিলাতে। এদিকে তাঁতি যাহাতে আর না বুনিতে পারে তাই ইংরেজ তাহার আঙুল পর্যন্ত কাটিয়া দিয়াছে। দেশে যেখানে যা কিছু ছিল তাহার সারভাগ

ইংরেজ লুটিয়া নিতেছে, আর যেটুকু নিল না তাহাও ইংরাজের দৃষ্টিতে পড়িয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। এককালে বাঁকুড়া ও আরামবাগের রেশমশিল্প বিখ্যাত ছিল। সেই শিল্প ধ্বংস করা হইয়াছে কৃত্রিম রেশম আমদানি করিয়া। আজ রেশমশিল্পীর ঘরে হা-ভাত। বাসনশিল্পের খ্যাতিও কম ছিল না। অ্যালুমিনিয়ামের বাসন আসিয়া অবস্থা হইয়াছে যে পিতল-কাঁসার সব লাল উঠিয়া যাইবার মুখে। ইংরাজ দেশ শুষিয়া সাদা করিয়া দিল, তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া না দাঁড়াইলে আর নয়। ইংরেজকে প্রতিরোধ করিতে হইলে তাহার লাভের পথ বন্ধ করিতে হইবে, তাহার সব ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে হইবে। এদেশে কাপড় বেচিয়াই ইংরেজ কোটি কোটি টাকা তাহার দেশে চালান করিয়া দেয়। আইন-আদালতের এমন ফাঁদই সে পাতিয়াছে যে বিবাদ-বিসংবাদ বাধিলে মামলায় লোকে সর্বস্বান্ত হয়। আর শিক্ষার নামে দুই পাতা ইংরাজী শিখাইয়া দেশের লোককে গোলাম করিয়া তুলিতেছে।

গ্রামোন্নয়নে গঠনমূলক কাজ

স্বভাবতই গঠনমূলক কাজে জোর পড়িল দেশের বস্ত্রশিল্প পুনর্জীবিত করা ও সালিশের মাধ্যমে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা ও জাতীয় শিক্ষা প্রসারের উপর। কংগ্রেস হইতে চরকার সুতা কাটার প্রসার যাহাতে হয় তাহার জন্য প্রচার চালান হইত। চরকায় সুতা কাটা আরম্ভ হইলে কাটুনীদের তুলা দেওয়া হইত কংগ্রেস হইতে। সুতা কাটানো হইত মজুরি দিয়া। তারপর কংগ্রেসের খাদিকেন্দ্র সুতা নিয়া কাপড় বোনার ব্যবস্থা করিত। সেই কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিত কংগ্রেস। বোনার ব্যবস্থা না হইলে কংগ্রেস সুতা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিত। অনেক ক্ষেত্রে কাটুনীরা তুলা কিনিয়া সুতা কাটিয়া তাহার পর কাপড় বোনার ব্যবস্থা করিত নিজেরাই। কংগ্রেসের খাদিকেন্দ্র-গুলির মধ্যে বাঁকুড়ায় খাতড়া, বাঁকুড়া শহর, ওঁদা, গঙ্গাজলঘাটি, পাত্রসায়র, অভয় আশ্রমের বেতুড় শাখা, ইঁদাস, বিষ্ণুপুর ও কোতুলপুর কেন্দ্র ও আরামবাগে বড় ডোঙ্গাল ও দুয়ারদন্ড কেন্দ্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সালিশের কাজটাও বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কংগ্রেস-কর্মীরা গ্রামের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে বিবাদ মিটাইতে তাঁহারা গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বাঁকুড়ার কয়েকটি এলাকায়, গঙ্গাজলঘাটি, খাতড়া ও সিমলাপালে, সালিশের প্রসার হইয়াছিল বিশেষভাবে। সিমলাপালের রামকৃষ্ণ বড়ঠাকুর তো সালিশ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

জাতীয় বিদ্যালয় কংগ্রেস-কর্মীরা বেশ কয়েকটিই স্থাপন করিয়াছিলেন। সাধারণ শিক্ষা ছাড়া জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে শেখানো হইত কারিগরীবিদ্যা, সুতাকাটা, তাঁতবোনা, কাঠের কাজ, প্রভৃতি। বিদ্যালয়ে পড়ানো হইত কিন্তু একই সঙ্গে চলিত কংগ্রেসের অন্য সব কাজ। জাতীয়তা-বাদী ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের মিলনকেন্দ্র হিসাবে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি হইয়া উঠিয়াছিল কংগ্রেস সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র।

বস্ত্রশিল্প ছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা কংগ্রেস অনেকভাবেই করিয়াছে। বাঁকুড়ার ধ্বংসোন্মুখ রেশম, বাসন ও শঙ্খশিল্পীরা পড়িয়া গিয়াছিল মহাজনদের হাতে। মহাজনের কবল হইতে কারিগরদের বাঁচাইবার জন্য কংগ্রেস সমবায় প্রতিষ্ঠা করিয়া রেশমশিল্পীদের কাঁচামাল দিত অপেক্ষাকৃত কম দামে, আবার কাপড় তৈরি হইয়া গেলে বিক্রির ব্যবস্থাও কংগ্রেসই করিত। সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া তাঁতি, কামার ও কুমারদের মধ্যে ঋণ দিবার ব্যবস্থাও বাঁকুড়ার কোন কোন জায়গায় কংগ্রেস করিয়াছিল। রং কারখানা ও তেলের ঘানির মতো কুটীরশিল্প বেতুড় অভয়

আশ্রমের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছিল। আবার স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থাও অভয় আশ্রম করিয়াছিল।

কৃষির উন্নতি যাহাতে হয় তাহার জন্য আরামবাগের কংগ্রেস-কর্মীরাও চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঁধ দিয়া বা খাল সংস্কার করিয়া সেচের ব্যবস্থা, এবং সহজ শর্তে কৃষিঋণ, সার ও উন্নত বীজ চাষীকে সংগ্রহ করিয়া দিবার ব্যবস্থা আরামবাগের কংগ্রেস-কর্মীরা প্রায়ই করিতেন।

সেবামূলক কাজ

পাশাপাশি চলিয়াছে সেবামূলক কাজ। বন্যায়, অগ্নিকাণ্ডে, দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্য, জলকষ্ট হইলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, কংগ্রেস অফিসের সঙ্গে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা, বিনা-মূল্যে কুইনিন প্রভৃতি ঔষধ বিতরণ করা—এসবই ছিল কংগ্রেসের কার্যকলাপের অঙ্গ। ইহা ছাড়া রোগীর সেবা, শবদাহ, এমন কি দরিদ্র পরীক্ষার্থীর ফিস যোগাড় করিয়া দেওয়া—এসব কাজও কংগ্রেস-কর্মীরা করিয়া বেড়াইতেন।

কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যকলাপের প্রভাব

সরকার, জমিদার, জোতদার, মহাজন সকলে মিলিয়া দরিদ্র কৃষককে শোষণ করিয়া দরিদ্রতর করিয়া দিতেছিল। কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইবার কেহ ছিল না। যে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া এই ব্যাপক শোষণ সেই কৃষিব্যবস্থার অবনতি রোধের ব্যাপারেও সকলেই সমান উদাসীন। এমন একটা অবস্থায় কংগ্রেস বাঁকুড়া ও আরামবাগে গণ-সংগঠনের মাধ্যমে কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। হতাশ্বাস কৃষকের কাছে গিয়া কংগ্রেস-কর্মীরাই প্রথম তাহার দুর্দশার কারণ এবং প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে বলিতে থাকেন। শুধু বলা নয়, যতটা সম্ভব সাহায্য করা যায় তাহার ব্যবস্থাও কংগ্রেস করিয়াছে। সুতা কাটা, তাঁত বোনা হইতে আরম্ভ করিয়া যতরকম গঠনমূলক ও সেবামূলক কাজ কংগ্রেস আরম্ভ করিয়াছিল তাহাতে অপারসমস্যাজর্জরিত কৃষকের খুব সামান্য অংশই হয়ত প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইয়াছিল। কিন্তু নিরন্ন অসহায় কৃষকের কাছে আসিয়া কংগ্রেস যে আশার বাণী শুনাইয়াছিল, প্রতিকারের কথা বলিয়াছিল, সাধারণ মানুষের সেবা ও সাহায্য করিয়াছিল জন-মানসে ইহাই হইল তাহার প্রধান পরিচয়। আর এই পরিচয়ের উপরেই গড়িয়া উঠিতেছিল কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ও গণসমর্থন।

কৃষক আন্দোলনের প্রারম্ভ

কংগ্রেস অত্যাচার, অবিচার, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য প্রতিরোধ করিবার জন্য ডাক দিয়াছিল, কৃষকের দৈন্যপীড়িত জীবনে একটু স্বস্তি আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে, ইংরেজ শোষক এবং অত্যাচারী—এই কথাটাই বলা হইয়াছিল বারবার খুব জোর দিয়া। কিন্তু বাঁকুড়া বা আরামবাগের মতো জায়গায় সাধারণ লোকের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল জমিদার, পত্তনিদার, জোতদার, মহাজনের অত্যাচার। এসব জায়গায় অত্যাচারের কথা বলিলে ইহাদের অত্যাচার শোষণের কথা আসিয়া পড়ে স্বাভাবিকভাবেই, আর অত্যাচার প্রতিরোধের কথা বলিলে ইহদের প্রতিরোধ করিবার দায়ও আসিয়া পড়ে অনিবার্যভাবে। আরামবাগে কংগ্রেস প্রথম হইতেই এ দায় স্বীকার করিয়া নিয়াছিল। গণ-সংগঠন আরম্ভ করিবার দুই বৎসরের মধ্যেই আরামবাগ কংগ্রেস জমিদারের বাজে আদায় অর্থাৎ আবওয়াব দেওয়ার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সংগঠিত করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। বাকি খাজনার দায়ে জমিদার শস্য আটক

করিত, জোর করিয়া ক্ষেতের ফসল কাটিয়া আনিত, প্রজাকে ধরিয়া আনিয়া কাছারিতে আটক করিয়া অত্যাচার করিত। প্রতিরোধ আরম্ভ হইল এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধেও। পাশাপাশি প্রতিরোধ আরম্ভ হইল মহাজনের বিরুদ্ধে। সব ক্ষেত্রেই কংগ্রেস প্রথমে শুরু করিত আবেদন নিবেদন করিয়া, অনুরোধ-উপরোধের মাধ্যমে কতটা কী করা যায় তাহার চেষ্টাও করিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হইত না। তখন কংগ্রেস জমিদারের কাছারি বা মহাজনের বাড়িতে শুরু করিত সত্যাগ্রহ। এ উপায় ব্যর্থ হইলে আরম্ভ হইত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট। এইভাবে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ উপলক্ষে আরামবাগে কৃষকরা হইয়া উঠিয়াছিল জাতীয় সংগ্রামের অংশীদার এবং কৃষক আন্দোলন হইয়া উঠিয়াছিল জাতীয় সংগ্রামের অঙ্গ। হইয়াছিল বলিয়াই আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে আরামবাগ কংগ্রেস খাজনা বন্ধের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল এবং ঘোষণা করিয়াছিল যে কংগ্রেস যে জমিদারি প্রথার ফলে চাষীর অবস্থা দিনের পর দিন মরণাপন্ন হইতেছে, সেই জমিদারি প্রথাকে উঠাইয়া দিতে চান, যে ঋণের বোঝা চাষীর ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া আছে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে চান। চাষীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আনন্দের ব্যবস্থা করিতে চান, তাহাকে সাধারণ মানুষের মতো স্বাধীন করিয়া তুলিতে চান। যাহাতে চাষীর কৃষি-কার্যের কোন অসুবিধা না হয়, যাহাতে তাহার ফসলের দাম কমিয়া না যায়, যাহাতে তাহার জীবন নিঃস্ব হইয়া না যায় তাহার জন্য কৃষিব্যবস্থা, প্রজাব্যবস্থা আমূল বদলাইয়া দিতে চান।' ("পথ", ৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৪০)।

আরামবাগে কংগ্রেস কৃষকদের সংগঠিত করিতেছিল জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে। আরামবাগে যাহাদের জমিদারি ছিল তাহাদের সকলেই প্রায় বাহিরের লোক এবং জমিদারির আয়তনও তাহাদের বেশ বড়। ইহারা কেহই কংগ্রেসে যোগ দেয় নাই। জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত ও রুষ্ট হইতে পারিত কাছারির আমলাবৃন্দ। ইহাদের অনেকেই স্থানীয় সম্পন্ন লোক। তবে ইহাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। উপরন্তু জমিদারের মতো আমলাদের অধিকাংশেরই কংগ্রেসের প্রতি কোন অনুরাগও ছিল না। মহাজনরা সকলেই স্থানীয় লোক বটে, কিন্তু মহাজন এখানে সাধারণত জোতদার নয়। তাই মহাজনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইলে বড় রায়ত জোতদারের কোন অসুবিধা নাই। বরং জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন বড় রায়তের অভিপ্রেত ছিল, ইহাই বলা যাইতে পারে। আন্দোলন আংশিকভাবে জমিদারি আমলার বিরুদ্ধেও। সাধারণ বড় রায়তের সঙ্গে আমলাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। এ তো একটা দিক আছেই। তাহার উপর আন্দোলনের ফলে জমিদারের শক্তি যদি ক্ষুণ্ণ হয় তবে গ্রামের মধ্যে বড় রায়তের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িবে। আরামবাগে তাই কৃষক আন্দোলনের প্রথম দিকে কংগ্রেস গ্রামীণ সমাজের আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে খুব একটা জড়াইয়া পড়ে নাই।

বাঁকুড়ায় কিন্তু অবস্থা অন্যরকম, খানিকটা জটিলও। সামাজিক প্রতিপত্তিপ্রত্যাশী যেসব স্থানীয় বিত্ত ও প্রভাবশালী লোক নানা কারণে সরকার ও সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে তাহারা যেন প্রতিকারের না হইলেও প্রতিবাদের উপায় খুঁজিয়া পাইল। উপরন্তু কংগ্রেসের নামে যে গণ-সংগঠন গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি দৃঢ়তর করিবার একটা সম্ভাবনা আছে, ইহাও তাহাদের অগোচরে থাকিবার কথা নয়। প্রথমাবধিই তাই দেখিতেছি বাঁকুড়ায় কংগ্রেসের মধ্যে একদিকে যেমন রহিয়াছে নিঃস্ব নিরন্ন কৃষক, অন্যদিকে পত্তনিদার জোতদার মহাজনেরাও সংগঠনের অংশ। স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্বও স্বাভাবিক কারণেই চলিয়া গিয়াছে ইহাদের হাতে। ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগিতা এবং গঠন ও সেবামূলক কাজের প্রথমদিকে কংগ্রেসের মধ্যে ভোক্তা ও ভোজ্যের এই সহাবস্থানে সংকট দেখা দেয়

নাই। কিন্তু যখন ওইসব কাজের মধ্য দিয়া সর্বপ্রকার শোষণ ও অবিচার প্রতিরোধের প্রশ্ন উঠিতে আরম্ভ করিল তখন হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করিল সংকট।

আগেই বলিয়াছি কংগ্রেসের উদ্যোগে সালিশের কাজ যেসব এলাকায় প্রসার লাভ করিয়াছিল খাতড়া তাহার অন্যতম। আদিবাসী ও তপশীলী জাত অধ্যুষিত খাতড়ায় মহাজন-জোতদার-পত্তনি-দারদের ক্ষমতা ও অত্যাচার ছিল অপরিমিত। স্বভাবতই এখানে বিবাদ-বিসংবাদের বেশির ভাগটাই হইত জমি নিয়া। দরিদ্র কৃষকের জমি একের পর এক চলিয়া যাইতেছিল মহাজন-জোতদারের গ্রাসে। কংগ্রেসের হইয়া সালিশ যাঁহারা করিতেন তাঁহারাও ওই একই গোষ্ঠীর লোক। সালিশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সবটা জমি যাহাতে মহাজন-জোতদারের গ্রাসে পড়িয়া কৃষক যাহাতে সর্বস্বান্ত না হয় সেইটুকু দেখা, ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া কৃষক যাহাতে মহাজন-জোতদারের হাতে গিয়া না পড়ে বা ভূমিগ্রাস হইতে মহাজন-জোতদারকে নিবৃত্ত করা এসব নয়। সালিশের এই সীমিত উদ্দেশ্যও যে মহাজন-জোতদারের মনঃপূত হইবে না ইহাই স্বাভাবিক। কংগ্রেস সংগঠনের চাপে তাহারা হয়ত সালিশে রাজি হইত, উপস্থিতমত সালিশ হয়ত মানিয়াও নিত। কিন্তু সুবিধামত সালিশের শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া আদালতে যাইত এবং ঋণে আবদ্ধ কৃষকের বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি করিয়া তাহার জমি দখল করিয়া নিত। ইহার ফলে সাধারণ কৃষকের মনে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রবল হইয়া উঠিল খাতড়ায় অনিলবরণ রায়-প্রেরিত যেসব স্বেচ্ছাসেবকগণ ছিলেন তাঁহাদের প্রচার ও উত্তেজনায়। অবস্থাটা চূড়ান্তে উঠিল ১৯২৭ সালে। ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত কৃষকের হাতে দুইজন জোতদার-মহাজনের মৃত্যু ঘটিল। কংগ্রেস সংগঠন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল না, কিন্তু অত্যাচার প্রতিরোধ করা ও অত্যাচারীকে দমন করার ডাক দিয়া কংগ্রেস যে বাণী প্রচার করিয়াছিল এবং বহিরাগত স্বেচ্ছাসেবক-দের প্রচারে যে উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল হত্যাকাণ্ডগুলি তাহারই ফল।

দুইজন নিহত হওয়াতে জোতদার-মহাজনদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হয় এবং নির্বিচার ভূমিগ্রাস বন্ধ না হইলেও কিছুদিনের মতো কমিয়া আসে। আন্দোলনের এই গতি-প্রকৃতি কংগ্রেসের অহিংস প্রতিরোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবুও জেলার উর্ধ্বতন কংগ্রেস নেতৃত্ব হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা বা নিন্দা কিছুই করেন নাই। কিন্তু স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে এই ঘটনার ফলে যে অস্বস্তি ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। উদ্বেগ যে শুধু অহিংসার নীতি হইতে বিচ্যুতি বা অন্তর্বিরোধ প্রসারের আশঙ্কা হইতেই, এমন না-ও হইতে পারে। সাধারণ কৃষক স্ব-উদ্যোগে এতটা আগাইয়া যাইতে পারে, ইহা মানিয়া নেওয়া তাঁহাদের পক্ষে যেন কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। বস্তুত তাঁহাদের বিরোধিতার জন্যই জেলা কংগ্রেসকে শেষ পর্যন্ত খাতড়া হইতে স্বেচ্ছাসেবকদের সরাইয়া নিতে হয়। সংগঠন গড়িয়া তুলিবার জন্য এবং গণ-সমর্থন বজায় রাখিবার জন্য স্থানীয় নেতারা কৃষকদের অভাব-অভিযোগের কিছুটা প্রতিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিকারের প্রশ্ন নিয়া বেশিদূর অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁহারা চাহিতে-ছিলেন দুই দিক বজায় রাখিতে। এই নীতির উপরে রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা যে কঠিন সে তো সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সম্ভাবনার প্রশ্নে ব্যাপারটা হইয়া উঠিয়াছিল এমনই যে কংগ্রেস যে দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ুক না কেন সংকট একটা আসিবেই। ১৯২৮-২৯ সালে বাঁকুড়া কংগ্রেসের প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইল ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ উপলক্ষে। এই আন্দোলনে দরিদ্র সম্পন্ন সকলেই অংশগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের পর গণ-আন্দোলন যখন নিজস্ব গতিবেগ অর্জন করিল তখন কৃষকের দাবি নিয়া কংগ্রেসের মধ্যে আবার সংকট দেখা দিল।

গ্রন্থনির্দেশ

ডি জি ক্রফোর্ড : "হুগলী মেডিক্যাল গেজেটিয়ার," (কলিকাতা, ১৯০৩)।
এল এস এস ও'ম্যালী : "বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স : বাঁকুড়া," (কলিকাতা, ১৯০৮)।
এল এস এস ও'ম্যালী ও মনোমোহন চক্রবর্তী : "বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স : হুগলী," (কলিকাতা, ১৯১২)।
এল এস ও'ম্যালী : "সেন্সাস অব ইন্ডিয়া, ১৯১১," ভল্যুম ৫, পার্ট ১, (কলিকাতা, ১৯১৩)।
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : "ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স : বাঁকুড়া," (কলিকাতা, ১৯৬৮)।
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : "ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স : হুগলী," (কলিকাতা, ১৯৭২)।
এফ ডব্লিউ রবার্টসন : "ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যান্ড সেটলমেন্ট অপারেশনস ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব বাঁকুড়া ১৯১৭-২৪," (কলিকাতা, ১৯২৬)।
এস এন রায় : "ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যান্ড সেটলমেন্ট অপারেশনস ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব হুগলী ১৯৩০-৩৭," (কলিকাতা, ১৯৪৭)।
এইচ এম এস ইসাক : "এগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিসটিক্স বাই প্লট টু প্লট এনিউমারেশন ইন বেঙ্গল ১৯৪৪ টু ১৯৪৫", পার্ট ১ (কলিকাতা, ১৯৪৬) ও পার্ট ২ (কলিকাতা, ১৯৪৭)।
রত্নমণি চট্টোপাধ্যায় : "গ্রামে ও পথে," (কলিকাতা, ১৩৬৭)।
নৃপেন আকুলি : "কবিকল্প গোবিন্দপ্রসাদ," (অমরকানন, বাঁকুড়া, ১৩৭৫)।
সুকুমার দত্ত (সম্পাঃ) : "প্রফুল্লচন্দ্র সেন," (কলিকাতা, ১৯৬৩)।
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : "কেন্তমজুরের দেবতা," (আরামবাগ, ১৩)।
রত্নমণি চট্টোপাধ্যায় : "স্বাধীনতা সংগ্রাম", "স্মরণী" হুগলী জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন, ১৯৬১।
অনামা : "অসহযোগ আন্দোলনে বাঁকুড়া", "পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ রাজনৈতিক সম্মেলন স্মারকগ্রন্থ", ১৩৭১।
শিবুরাম মণ্ডল : "গোড়ার কথা", "অমরকানন দেশবন্ধু বিদ্যালয় রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ", ১৯৬৬।
দুর্গাচরণ চক্রবর্তী : "স্বাধীনতা সংগ্রামে আরামবাগ", "স্মরণিকা", হুগলী জেলা কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন ও যুব কংগ্রেস সম্মেলন, ১৯৭৫।
কমলাকৃষ্ণ রায় : "স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঁকুড়ার অবদান," (অপ্রকাশিত), শ্রীমনোরঞ্জন রায় (বাঁকুড়া) মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
বেণীমাধব রায় : "ডায়েরী," (অপ্রকাশিত), লেখকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
উপর্যুক্ত সূত্রগুলি ছাড়া হুগলী জেলা কংগ্রেসের মুখপত্র "পল্লী" ও সমসাময়িক সংবাদপত্রসমূহ দ্রষ্টব্য।

তথ্যসংগ্রহে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি বাঁকুড়া জেলা স্বাধীনতা-সংগ্রামী সমিতি ও আরামবাগ মহকুমা স্বাধীনতা-সংগ্রামী সমিতির নিকট হইতে। তবে আন্দোলন-সংক্রান্ত বিবরণের জন্য আমি প্রধানত নির্ভর করিয়াছি স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিবৃতির উপর। যাঁহাদের অকুণ্ঠ এবং সাগ্রহ সহায়তা ও আতিথ্যের জন্য তথ্যসংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে তাঁহাদের নাম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি : রামলোচন মুখোপাধ্যায় ও শিবুরাম মণ্ডল, অমরকানন; প্রদ্যুম্নচন্দ্র ঘোষ ও প্রেমিকতোষ রায়, জাঁতিঠা, গোবিন্দ রক্ষক ও রামগতি সেন, খয়রাশলী; সুশীলচন্দ্র পালিত ও জগদীশ পালিত, বেতুড়; ভূদেব মণ্ডল, সুনীতি চক্রবর্তী, ষষ্ঠীদাস সরকার, গোপালচন্দ্র গোস্বামী, কালীকমল বসু, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, ভবতারণ চক্রবর্তী ও প্যারিকচন্দ্র জোহার, বিষ্ণুপুর; রামকৃষ্ণ দাস, কানাইলাল দে, শৈলবালা দে ও গোরাচাঁদ সেন, বাঁকুড়া শহর; মন্মথনাথ মল্লিক, শিরোমণিপুর; বীরেন্দ্রনাথ দে কর্মকার ও সাবিত্রী দেবী, গঙ্গাজলঘাটি; রাধারমণ মণ্ডল, জয়পুর; কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ, তারকচন্দ্র দত্ত, মদনমোহন দত্ত ও সত্যরানী হালদার, সোনামুখী; মতিলাল রায়, মালিয়াড়া, কার্তিকচন্দ্র কুণ্ডু, খাতড়া, অতুলচন্দ্র দালাল, মদনমোহনপুর; দেবাদিদেব সিংহবাবু, মুকুন্দপুর; মহেন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ প্রতিহার ও হরিপদ রায়, মল্লিনাথপুর; মদন সিংহ ও ফকির সিংহ, জনবহাল; দুর্গাচরণ চক্রবর্তী, আরামবাগ, শঙ্করীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর; অতুলচরণ ঘোষ কলিকাতা, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, মায়াপুর; বেণীমাধব রায়, কৃষ্ণপুর; বিজয়কুমার মল্লিক, হরিহরপুর; তারকচন্দ্র নন্দী, ষষ্ঠীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল ও জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পাণ্ডুয়া, তুলসীচরণ কুণ্ডু ও সুকুমার সামন্ত, গোঘাট; মতিলাল সিংহ, নতিবপুর; কৃষ্ণমোহন দত্ত, কুমারহাট; বঙ্কিমচন্দ্র মাঝি, কত্তুর; শম্ভুনাথ রায়, রাধানগর; নরেন্দ্রনাথ হাজরা, ললিতমোহন চক্রবর্তী, দুর্গাপদ মিত্র ও চণ্ডীচরণ মিত্র, বড় ডোঙ্গল; দীর্ঘপদ ঘোষ ও শরৎচন্দ্র ঘোষ, জন্মাদিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপীকান্ত কুণ্ডু, কুমড়েস; বিধুভূষণ তপস্বী, কামড়ে; ধরণীধর বিশ্বাস, আজানপুর।

স মা লো চ না

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র— নারায়ণ চৌধুরী। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ৭৩। মূল্য পনেরো টাকা।

পঞ্চাশোর্ধ্ব সময় কোনো সাহিত্যের মূল্যায়নের পক্ষে প্রশস্ত কাল সন্দেহ নেই, আর শতবার্ষিকী উপলক্ষে শরৎ-সাহিত্যের নতুন করে যে-মূল্যায়ন হয়ে গেল তাতে শিল্পসচেতন শ্রোতা ও পাঠক এটুকু অনুভব করলেন যে বাঙালি জীবনের স্থায়ী কথাকার হিসেবে শরৎচন্দ্র টিকে রইলেন। এ মন্তব্যের কারণ দেখাতে গেলে শতাব্দীর উত্তর-চল্লিশ সামাজিক ও সাহিত্যিক পুরুষপর্বে পরিবর্তন-পরম্পরার দিকে ইঙ্গিত করতে হয়। সাম্যবাদী আন্দোলন ও গণচেতনা; মন্বন্তর; স্বায়ত্তরাষ্ট্র; শিল্পায়ন ও বিমিশ্র অর্থনীতি; পুঁজিপতি ও একচেটিয়া কারবারীর দৌরাত্ম্য; যৌথ-পরিবার বিলোপ; জমিদারির অবসানে ব্যাপক জোতদারির বিস্তার, কার্যকর সমাজপরিবর্তনের অভাবে জনমানসের বিমূঢ়তা; সাহিত্যের একদিকে পুরাতন মূল্যমান ধরে রাখার প্রয়াস, অন্যদিকে নবজীবনের স্বপ্নচারণা; একদিকে নিষ্কিঞ্চন ও মেহনতী মানুষের স্বাধিকার, অন্যদিকে আত্মমুখী পাশ্চাত্য মানসিকতা এইসব আবর্তে জনজীবন ও সাহিত্যপাঠক গত চল্লিশ বৎসর ধরে আলোড়িত হয়েই এসেছে। এর ফলে অন্তত শহর অঞ্চলে মানুষের দৃষ্টিকোণ বেশ বদলে গেছে, আর গ্রামেও এসবের প্রভাব পড়েছে। কে জানে, আমরা যুগান্তরের দিকেই পদক্ষেপ করছি এবং রাষ্ট্র জনবিমুখ না হলে নতুন শতাব্দীর আরম্ভেই আমরা নতুন মানুষ হয়ে যেতে পারব। এহেন পরিস্থিতিতে পুরাতনের মূল্যমান যখন প্রায় যাব-যাব করছে, এমন সময় অনাচিন্তে সেকালকার সাহিত্যিকের সমাদর অর্থহীন নয়। এতে প্রমাণিত হচ্ছে, শরৎ সাহিত্যে স্থির সাহিত্যবস্তুর সঙ্গে আমাদের প্রগতি-ভাবুক মানসিকতার উপাদান এমন কিছু রয়েছে যাতে ঔপন্যাসিক অপরাজেয় হোন বা না হোন, তাঁর আকর্ষণ অব্যাহত।

অনেকখানি এরকম মুগ্ধতার বশে, আবার অনেক পরিমাণে এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের দিকে চোখ ফিরিয়ে শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন স্বপ্রতিষ্ঠ বিদগ্ধ সমালোচক নারায়ণ চৌধুরী। শরৎ-সমালোচনার সেকাল-একাল মিলিয়ে তাঁর "কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র" অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হয়েছে। এ গ্রন্থে তাঁর লক্ষ্য পরিসর হল বিচার, পরিমাপ, তৌল-তরীখা, সাহিত্যকৃতির বিস্তৃত বিশ্লেষণ নয়। এবং কুড়ি একুশটি অধ্যায়ে ঔপন্যাসিকের শিল্পকৃতি, সমাজচেতনা, নারীচরিত্র, পাণ্ডিত্য, স্টাইল, মনস্তাত্ত্বিক দ্বিধা প্রভৃতিকে গুণদোষ বিচারের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'তাঁর মত জনপ্রিয় শিল্পী আজ পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে দ্বিতীয় আবির্ভূত হয়নি।' লেখকের এ সিদ্ধান্ত যে যথাযথ তা শরৎচন্দ্রের গল্পকথার পাঠকসংখ্যা বিনির্ণীত হলে ঠিক ধরা পড়বে। আর তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে সমীক্ষক-অনুভূত প্রধান তিনটি গুণই যে শক্তিরূপে কাজ করেছে তাতেও সন্দেহ নেই। সে তিনটি গুণ হল—সীমিত পরিসরে গল্প জমিয়ে তোলার ক্ষমতা, বিদ্রোহী মানবিকতা আর অননুকরণীয় স্টাইল। এগুলির সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে সমুপস্থিত ছিল তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নিপীড়িতের উপর অপার সহানুভূতি। এসব বিষয় সমালোচক প্রতিপন্ন করেছেন, কোনো প্রান্তীয় মতবাদের দ্বারা চালিত হয়ে নয়, তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি দিয়ে। বস্তুত, বাংলা সমালোচনায় এরকম তোলন-শক্তির পরিচয় খুব কমই

দেখা গেছে। তা ছাড়া, তাঁর সিদ্ধান্তগুলিতে কোথাও সংশয়িত মনোভাব দেখা যায় না—অন্তত বোধ হয়, অনুমান—এরকম ধরি মাছ না ছুঁই পানী-গোছের এক ধরনের বাংলা সমালোচনা আজকাল খুবই প্রচলিত হয়েছে, তার ধারাবাহী তিনি নন। তাঁর প্রত্যয় দৃঢ় ও সুনিশ্চিত, তার উপর মৌলিকতার দীপ্তি।

"কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রে"র এইসব গুণের নিঃসংশয় অধিকার থাকা সত্ত্বেও লেখকের দু-একটি অভিমতে বিতর্কের উদয় ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে। সমালোচক দেখেছেন, শরৎচন্দ্র একদিকে বিদ্রোহী স্বভাবের, অন্যদিকে রক্ষণশীল। উপন্যাসকার তাঁর পল্লীভিত্তিক গল্পগুলিতে প্রথাবদ্ধ সংস্কারলালিত জীবনের তথা অন্ধ পাতিব্রত্যের মহিমা কীর্তন করেছেন। এগুলির ভিতর প্রগতিশীল ভাবনা-ধারণার কোনো ছাপ নেই। অন্নদাদিদি, শুভদা, সরযূ, বিরাজ, কুসুম, ষোড়শী, মৃণাল প্রভৃতি পাতিব্রত্যের যূপমূলে উৎসর্গিত প্রতিবাদহীন বলিমাত্র। অপরপক্ষে কিরণময়ী, অভয়া, কমল প্রভৃতি শহর-ঘেঁষা চরিত্রগুলিকে পুরাতন ও স্থির আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে ঔপন্যাসিক প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ নির্দেশ করে সমালোচক বলছেন, শরৎচন্দ্রের এরকম দোদুল্য স্বভাব তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে এসেছে। মধ্যবিত্ত সমাজে উদ্ভূত মানুষই এরকম কখনো রক্ষণশীল কখনো বা প্রগতিবাদী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়েছে যে সমালোচক একটু সহজ সমাধানের আশ্রয় নিয়েছেন। দোলাচল মনোভাবের পরিচয় রবীন্দ্রনাথেই কি কম? আবার বঙ্কিমে তা প্রায় নেই বললেই হয়। কিন্তু ব্যাপারটিকে এইভাবে দেখলে কেমন হয়? শরৎচন্দ্র উদারতম মানবিকতার বশবর্তী হয়ে সমাজের বঞ্চিত ও নিগৃহীতা নারীদের দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। এরকম অর্থারম্ভকে সাধারণ সূত্র ধরে নিয়ে মাতৃত্বে বঞ্চিতা নারায়ণী, বিন্দু, পতিপ্রেমবঞ্চিতা শুভদা, সরযূ, কুসুম, কিরণময়ী, অভয়া, সমাজনিগৃহীতা পার্বতী, জ্ঞানদা, কমল এবং উভয় দিক থেকে বঞ্চিতা অন্নদাদিদি, ষোড়শী প্রভৃতি একই মানসিকতার বিচিত্র ও উত্তরোত্তর প্রবল প্রকাশ ধরলে ক্ষতি কোথায়? আমার তো মনে হয়, শরৎচন্দ্র বিশুদ্ধ প্রেমকেই মর্যাদা দিয়েছেন, সতীত্ব সাধ্বীত্ব পাতিব্রত্য এরকম কোনো প্রত্যয় ধরে নিয়ে অগ্রসর হননি। তিনি সত্যিই রক্ষণশীল মেজাজের মানুষ ছিলেন না। ঐসব অবস্থায় আমাদের সমাজে ও পরিবারে যা একান্ত স্বাভাবিক তারই বাস্তব চিত্রকর ছিলেন তিনি। যেমন সামাজিক, তেমনি পারিবারিক বেদনাকরুণ পরিস্থিতি উল্লিখিত সাধারণ সূত্রের বৈচিত্র্য মাত্র। সর্বত্র তাঁর লক্ষ্য হল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যবর্তী অসহায় মানুষের অন্তরতম সত্তাটিকে উদ্ধার করে দেখানো। একথা বিদগ্ধ সমালোচকও নানান স্থানে বলেছেন, অথচ বিশুদ্ধ প্রেমকে (স্থানবিশেষে হোক তা দাম্পত্য-আশ্রিত) পাতিব্রত্য, সাধ্বীত্ব বিশেষণে চিহ্নিত করে যেন একটু জোর করেই শরৎচন্দ্রকে রক্ষণশীল ধরে নিয়েছেন এমন আমাদের মনে হয়েছে।

এ বিষয়ে আর-একটা কথারও উত্থাপন করা যেতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার জাতীয় জীবনে আমাদের পশ্চাৎপদতার সব থেকে বড় কারণ—এ নিঃসন্দেহে সত্য; কিন্তু যেভাবেই হোক, বহুদিন এই সংস্কারে কাটানোর ফলে আমাদের পারিবারিক জীবনে কতকগুলি মূল্যবান গুণের অতিশয়িত সমাবেশ ঘটেছে, যা পশ্চিমে তেমন দেখা যায় না। যেমন, একান্নবর্তী পরিবার, সৌভ্রাত্র, বাৎসল্য, দুঃখজয়ী বিঘ্নজয়ী দাম্পত্য। এগুলি সামন্ততান্ত্রিক বিষবৃক্ষের অমৃতফল বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এর থেকে বিচ্যুতিকেই কি প্রগতিশীলতা বলব? মন্দ যা তা মন্দই, কিন্তু বিবাহিত অথচ যথার্থ প্রেমকে সাধ্বীত্ব পাতিব্রত্য প্রভৃতি পুরানো দুর্বাক্যে বিশেষিত করা কি সমীচীন হবে? ঐ দুটো জরাজীর্ণ শব্দকে শরৎচন্দ্রও কোথাও সম্মান দেখাননি। প্রেমহীন লোকদেখানো সাধ্বীত্বের কী মূল্য, তা লেখক তাঁর 'সতী'-গল্পেই তো দেখিয়েছেন। দাম্পত্যে পুরুষের যা-খুশি

আচরণের একচ্ছত্র অধিকারই সামন্ততান্ত্রিকতার কলঙ্কিত বিষয়। এর প্রতি শরৎচন্দ্রের কোনো সমর্থন নেই। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি বাস্তবে যা দেখেছেন তারই প্রতিচ্ছবি তুলতে চেয়েছেন বলে পাঠকচিত্তে রক্ষণশীল মনোভাবের বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। শরৎচন্দ্রকে যদি ভুল না বুঝে থাকি তাহলে বলব, তাঁর অনুভবে প্রেমহীন দাম্পত্যে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাই উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর। এর সত্যতা কে অস্বীকার করবে?

উল্লিখিত রক্ষণশীলতার সংলগ্ন আরও দুটি বিষয় সমালোচক ঔপন্যাসিকের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন, তা হল- (ক) বিধবাদের বিবাহ-সমাধানে তাঁর দ্বিধা এবং (খ) নিজ জীবনে ব্রাহ্মণত্ব ও পূজো-অর্চনা রক্ষা। এই দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত বাস্তব আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই মেলানো যায় না এবং সে প্রসঙ্গ না তোলাই বোধ হয় ভালো। প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, বিধবাপক্ষে প্রণয়-সম্ভাবনা খুবই বাস্তব অথচ বিবাহ-পরিণাম আমাদের সমাজে নিতান্ত অবাস্তব বলেই তিনি জোর করে ঐ পরিণামে বিধবাদের পেঁৗছে দেননি। ব্যাপারটির উল্লেখ করা হলে শরৎচন্দ্রও যেন ঐরকম কিছু বলেছিলেন বলে মনে হচ্ছে। আর প্রেমিকা বিধবাদের দুঃখজনক পরিণাম চিত্রিত করায় সমাজের রক্ষণশীলতা ও মানুষ-বিদ্বেষই তো বেশি প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে।

পরিশেষে শরৎচন্দ্রের স্টাইলের কথা। সমীক্ষকের উপলব্ধিতে শরৎচন্দ্র মোটেই অনায়াস সহজ স্টাইলের লেখক নন, তিনি খুব উচ্চস্তরের বাক্‌শিল্পী, তাঁর প্রতিটি শব্দ মেপে-জুখে বসানো, তা দরবারী নিপুণতার পরিচায়ক। এই অধ্যয়ন যেন একটু অতিশয়িত হয়ে পড়েছে, তাঁর স্টাইলে একটু কৃত্রিমতা-দোষ আরোপিত হচ্ছে যেন। নিঃসন্দেহে শরৎচন্দ্র যা মনে আসে এমন মৌখিক ভাষায় লেখেননি এবং তাঁর একটি বিশিষ্ট ও উন্নত সাহিত্যিক স্টাইল রয়েছে যা দিয়ে তাঁকে সর্বত্র চেনা যায়, যার অনুকরণে আমরা স্কুলজীবন থেকে প্রয়াসই করেছি, আয়ত্ত করতে পারিনি, কিন্তু তাঁর শব্দ বাক্য সুনির্বাচিত ও অভিজাত এমন বললে তাঁর অনায়াস অধিকার ও নিবিড় লোক-সংস্পর্শকে একটু খাটো করা হয়। তাঁর চাতুর্য অনায়াস-চাতুর্য, গ্রামবাংলার মৌখিক কথা, ভঙ্গি, ইডিয়ম নিয়েই সে চাতুর্য ফুটে উঠেছে। সংলাপরচনার ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে অপরাজেয়, কারণ তাঁর সংলাপ গ্রামীণ নারী-পুরুষগুলিকে একেবারে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে। তাঁর স্টাইল তাঁর স্বভাব, রচনার বিষয়, রচিত চরিত্র এসকলের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তাঁর লেখনীতে স্ফুরিত হয়েছে।

সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত সমালোচক নারায়ণবাবুর সঙ্গে আমাদের ধারণার যে পার্থক্যই থাকুক (বস্তুত পার্থক্যের থেকে মিলই বেশি), তাঁর সমালোচনার স্টাইল, তাঁর তুলাদণ্ডে বিচারের শক্তি, তাঁর অধ্যয়ন ও মননশীলতা উচ্ছ্বসিতভাবেই সমাদরের যোগ্য। তাঁর গ্রন্থ শরৎ-সমালোচনার ক্ষেত্রে নবারীতির উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত এবং মূল্যবান সংযোজন। কেবল একটি সামান্য ত্রুটির প্রসঙ্গ পরিশেষে তুলব, তা হল অধ্যায়গুলির মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে একই কথার পুনরাবৃত্তি। এ ত্রুটি সম্বন্ধে গ্রন্থকার যদ্যপি নিজেও সচেতন (প্রারম্ভিক 'নিবেদন' অংশ দ্রষ্টব্য), তবু এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি আমরা সম্যক গ্রহণ করতে পারছি না। আমরা মনে করি, বিভিন্ন পত্রিকা থেকে বিভিন্ন সময়ের লেখা সংকলিত করাতেই এ ধরনের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। গ্রন্থবদ্ধ করতে গিয়ে প্রবন্ধগুলির সংস্কারে যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, তা থেকে নতুন করে বই লেখা অপেক্ষাকৃত অল্পশ্রমসাপেক্ষ হয়ে ওঠে। যাই হোক, এই স্বল্প পুনরাবৃত্তির ফলে বইটির অন্তর্নিহিত মূল্যের কোনো লাঘব ঘটেনি, এই আশ্বাস পাঠকদের দিতে পারি।

ক্ষুদিরাম দাশ

হরবোলা— মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। হরবোলা। কলিকাতা, ১৯। মূল্য চোদ্দ টাকা।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, সংকলনটি এগারো ও ততোধিক (সোজা কথায়, ১১ +) বছরের বয়স্কদের জন্য। রীতিমতো বয়স্ক যাঁরা, তাঁরাও সমানই পড়তে পারেন।

সংকলনটিকে অভিনন্দন জানানোর নানা কারণ আছে। প্রথমত, যাঁরা নাকি আমাদের জাতভাই, সেই তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলির অধুনাতন সাহিত্য-প্রচেষ্টার সঙ্গে এ-বই আমাদের পরিচিত হতে সাহায্য করে, এবং সেটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো কথা নয়। কারণ এই সাহিত্য কখনো-কখনো বেশ উচ্চ মানের, তা অন্তর্নিহিত বলিষ্ঠতার গুণে ও বাহ্যিক শৈলীতে পাল্লা দিচ্ছে অন্যত্রের অনেক ভালো লেখার সঙ্গে। আসলে, আমাদের অজ্ঞতা ও এক ধরনের বিরাগ সত্ত্বেও, এই সাহিত্য সম্বন্ধে তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতেও জ্ঞান-স্পৃহা ও উৎসাহ আজ ক্রমবর্ধমান। তাই, 'পশ্চিম ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার কোনো-কোনো ধ্যানধারণা' ব্যতীত আমাদের অবধান বা কৌতূহল এ-দিকটায় এখনো পর্যন্ত বেশি এগোয়নি, বর্তমান সংকলনের ভূমিকার এই অন্যতম ও অভিযোগপূর্ণ বক্তব্যটির সঙ্গে আমরা খুব দ্বিমত হব না।

অভিনন্দন জানানোর দ্বিতীয় কারণ, সংকলনটির মুখ্য লক্ষ্য অল্পবয়স্ক পাঠকপাঠিকা। ঠিক যে-বয়সটায় স্ব-পরিবেশ ছাড়িয়ে বৃহত্তর বহির্বিশ্ব ও সমাজ সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা জন্মাতে থাকে, আরো জানার আগ্রহ জাগে, সেই বয়সের উপযোগী বই বাংলায় বেশি নেই। এ-বয়স থেকেই শুরু হওয়া উচিত মনকে যথার্থভাবে মেলে ধরার, তাকে জাগ্রত ও শিক্ষিত করার প্রক্রিয়া, এবং এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। পাঠ্য-পুস্তক অবশ্য আছে, তবে তাতে চাহিদার সামান্য অংশই মেটে।

একটি তৃতীয় কারণও আছে অভিনন্দন জানানোর। যে-লেখাগুলি এখানে সংগৃহীত, তা আজগুবি অ্যাডভেঞ্চার নয়, তথাকথিত সায়েন্স ফিকশন-ও নয়, তাতে বিধৃত আজকের দুরন্ত দিনের সংগ্রামী মানুষের সত্য পরিচয়। এই সংগ্রামের রূপ চিত্রিত নানা তুলি-তে, দেশবিদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। জীবন হতে তোলা ঘটনা, যা প্রায়ই ক্রূর, তবু যা সাধারণ মানুষের কখনো মমতায় কখনো বীরত্বপূর্ণ এক আশ্চর্য সততায় চিহ্নিত। চরিত্র সংগঠিত করার পক্ষে ও শিক্ষার বিষয় হিসেবে যা উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা প্রশংসনীয় উপকরণে সমৃদ্ধ।

কবিতা ও কাহিনী ধরে অন্তর্ভুক্ত লেখার সংখ্যা সত্তরের বেশি। মোটা অংশটা কাহিনীই, যার মধ্যে ছোট কাহিনী যেমন আছে (যাদের সংখ্যাই বেশি), তেমনি দুয়েকটি মোটামুটি বড় কাহিনীও আছে। কখনো সম্পাদক মহাশয় 'সংগ্রহ' নাম দিয়ে স্ব-অনুবাদে একত্র করেছেন দেশ-বিদেশ হতে আহরিত ছোট-ছোট রচনা, কিছু আফ্রিকা হতে, কিছু জাপান হতে, কিছু বা আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের গল্প, ইত্যাদি ইত্যাদি। লেখকদের মধ্যে আছেন হো চি মিন (লেখকদের নামের বানান যেমনটি দেওয়া হয়েছে, তেমনটিই এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে) ও মাও সে তুং হতে শুরু করে দেশবিদেশের বহু প্রখ্যাতব্যক্তি, যথা চিনুয়া আচিবি, নিকোলাস গিয়েন, নেরুদা বা বেরটোল্ট ব্রেখ্‌ট। এঁদের রচনার মূল ভাষা যাই হোক-না কেন, অনুমেয় কারণে সকলেই অনূদিত হয়েছেন ইংরেজী হতে। অনুবাদ সাধারণত সর্বত্র সুখপাঠ্য। অনুবাদক-গোষ্ঠীতে আছেন ইন্দ্রাণী রায়, গায়ত্রী গুহরায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচার্য, শঙ্খ ঘোষ, সমর সেন, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, স্বপন মজুমদার ইত্যাদি।

কৃষ্ণ আফ্রিকা হতে সংগৃহীত কাহিনীগুলি স্বভাবতই মানুষের সাদা ও কালো চামড়ার

তারতম্য নিয়ে, ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই তারতম্য-ঘটিত বিচিত্র ক্রূরতা ও নোংরামি নিয়ে। এইসব কাহিনীতে প্রায়ই এক ভয়ংকর ক্রোধ ঝলকে-ঝলকে ওঠে। তবে অসাধারণ হাতে, যেমন মার্তিনিকের প্রখ্যাত কবি-নাট্যকার এমে সেজেয়ার-এর নিচের রচনাংশটিতে, সেই একই ক্রোধ রূপ নেয় মন্ত্রের দ্যোতনা :

'আবার আমি আবিষ্কার করতে চাই মহৎ বাণী আর মহৎ জ্বালার রহস্য। আমি বলতে চাই ঝড়। আমি বলতে চাই নদী। আমি বলতে চাই ঘূর্ণিতুফান।...

ওঠো, জাগো ছায়া, রাসায়নিক-নীল, জাগো শিকার-হতে-থাকা প্রাণীদের অরণ্যে, জাগো তালগোল-পাকানো যন্ত্রের মাঝখানে, জাগো জুবজুবগাছে পোকায় কাটা মাংসে ঝিনুকের চুবড়িতে নকশা-কাটা চোখের মতো মানুষের চামড়া কেটে-বসে-যাওয়া চাবুকের আঘাতে। আমার থাকলে শব্দ বাণী কথা—এত বিশাল যে তোমাদের সবাইকেই যেন তাতে আঁটানো যায়, আর তুমি -তোমাকেও যেন তাতে আঁটানো যায়।

জাগো বাণী।'

আবার একই সঙ্গে, সকল ক্রোধ ও হিংসা হতে সম্পূর্ণ দূরের জিনিসও আছে--যেমন রুশ লেখক নুরমুরাত সারিখানভ-এর 'পুঁথি' নামক অনবদ্য গল্পটি। লিখিত শব্দের মাহাত্ম্য নিয়ে রচিত এই কাহিনী বলবার ভঙ্গীতে যেন কোন্ পুরাণের মহিমা পেয়েছে। 'সোভিয়েত শক্তির সুদিন' আসার ফলে সেই পুঁথি সর্বজনের গোচরীভূত হতে পারল, গল্পের শেষের দিকে লেখকের হেন মন্তব্যে কেউ-কেউ হয়তো প্রচারের গন্ধ পাবেন এবং সে-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁদের দোষও দেওয়া যাবে না। তবু আগাগোড়া গল্পটিকে ঘিরে রয়েছে এমন এক মধুর আবহাওয়ার ভাব যে সে-প্রচারের ইঙ্গিতে একটু অস্বস্তিকর চমক যদি লাগেও, তা নিমেষে মিলিয়ে যায়।

পশ্চিম ইওরোপের বাইরের রচনা সম্বন্ধেও আমাদের ওয়াকিবহাল হতে হবে, প্রস্তাব হিসেবে এটা ভালো, সন্দেহ নেই। তবে এর সঙ্গে এটাও আমাদের মেনে নেওয়া দরকার যে তথা-কথিত উন্নয়নশীল দেশের অনেকগুলিতে (আসলে এ-জাতীয় একটা-দুটো দেশের ব্যতিক্রম বাদ দিলে অনত্র সর্বত্রই) সেখানকার লেখকদের সাহিত্য-কীর্তি রচিত হয় পশ্চিম ইওরোপের ভাবাতেই। এঁরা প্রায়ই আগাগোড়া শিক্ষা পেয়ে থাকেন শুধু পশ্চিম ইওরোপীয় পন্থায় নয়, পশ্চিম ইওরোপেই এবং এঁরা প্রায়ই ঘন-ঘন বাস করতে আসেন পশ্চিম ইওরোপেই, বা কখনো-কখনো আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। এমন যখন ব্যাপার, তখন কিছুই সম্পূর্ণভাবে একটা-কিছু নয়, সর্বত্রই আলোআঁধারি নাম ও নামহীনতা প্রচণ্ড।

অনেকটা মনে হয় সেই কারণেই পশ্চিম ইওরোপ ও তজ্জাতীয় এক-আধটি দেশের এক-আধ-জন লেখককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, হয়তো উত্তর দিতে চেয়ে ভূমিকায় উত্থিত এই প্রশ্নের : 'কিন্তু সত্যি-সত্যি কেন বিশ্বেরই খবর আমরা জানব না?' তাই অন্যদের চাপে খানিকটা পিষ্ট হলেও রয়েছেন জাক প্রেভের বা ফেদেরিকো গারথিয়া লর্কা বা এমন-কি গীইওম আপলিনেয়র পর্যন্ত। লেখা বা লেখকের নির্বাচন কোথাও-কোথাও খামখেয়ালি ঠেকতে পারে, তবে মূলে ভাবগত একটা ঐক্য রাখার চেষ্টা নজরে পড়ে।

বইয়ের শেষে দেওয়া সংক্ষিপ্ত লেখক-পরিচিতি পাঠককে কোনো বিশেষ লেখা বুঝতে সাহায্য করবে। কিন্তু সেখানে শুধু বাংলা অক্ষরে না লিখে নামগুলি যদি সঙ্গে-সঙ্গে রোমান হরফেও দেওয়া হত, তাহলে আরও সুবিধা হত। বাংলায় অনেক নাম ঠিকমতো ধরা পড়ে না, সব ভাষার সব নামের উচ্চারণ সকলের পক্ষে জানাও সম্ভব নয়-- ভুল অনেক সময় হয়। যেমন, 'আইমে সেজেয়ার' উচ্চারণটা যদিও ঠিক নয়, তবু অজ্ঞতার ফলে নামটা যদি বাংলায় ঐভাবেই লেখা হয় তো হোক,

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে Aime Cesaire-ও লিখে দেওয়া উচিত। আমাদের মনে হয়, সকল নামের ব্যবহারের ক্ষেত্রেই এই রীতি গ্রহণ করা উচিত, তা কোনো বিশেষ নাম বাংলায় ঠিকভাবে লিখিত হয়ে থাকুক বা না-থাকুক।

প্রসঙ্গত, সমজাতীয় আরো একটি কথা। বইএর প্রকাশ-কাল হিসেবে শুধু 'বসন্ত ১৩৮৩' বলা কেন? এর সঙ্গে খৃষ্টাব্দ ও গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডারের মাসটি উল্লেখ করলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না। বৃহৎ বিশ্বে ক্রমশ সবাই এবং এখানে আমরাও আজ উঠছি-বসছি খৃষ্টাব্দ ধরেই, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি ধরেই।

সর্বশেষে, কাহিনীগুলির এখানে-ওখানে উদাহরণ হিসেবে বহু রেখাচিত্র সংযোজিত হয়েছে। মূলত চিত্রগুলি সেই-সেই কাহিনীর মূল ভাষার সংস্করণে নিশ্চয় ব্যবহৃত হয়—কিন্তু সেগুলি সম্বন্ধে কোনো পরিচয় দেওয়া হয়নি এখানকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে। কেন?

অবশ্য এসব সত্ত্বেও বইটির সামগ্রিক আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ হয় না। ভূমিকার শেষে বলা হয়েছে, প্রয়োজন আছে মনে হলে এরকম "হয়বোলা" নব-নব কলেবরে মাঝে-মাঝে প্রকাশিত হবে। আমরা চাই, তা হোক।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বঙ্গদর্শন : নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ। সম্পাদক ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত। চারুপ্রকাশ। কলিকাতা, ৯। মূল্য কুড়ি টাকা।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর রবীন্দ্র গুপ্ত সুলেখক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রমাণ বোঝা যায় তাঁর অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নির্বাচনের প্রকৃতি থেকে। কয়েক বৎসর আগে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বঙ্গদর্শন ও বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের এত বিষয় থাকতে বিশেষ করে বঙ্গদর্শন-এর প্রতি তাঁর পক্ষপাত ন্যস্ত হওয়া থেকেই বুঝতে পারা যায় তাঁর মনের ধাত কোন্‌দিকে। কেন তিনি বঙ্গদর্শন-এর প্রতি আকৃষ্ট বোধ করেছেন? তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত ও প্রথম দফায় সম্পাদিত উনিশ শতকের সত্তর দশকের এই পত্রিকাটি প্রবন্ধ-সাহিত্যের একটি খনি। শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই নয়, এই পত্রিকাটিকে ঘিরে বঙ্কিম-নেতৃত্বচালিত এক শক্তিশালী গদ্যলেখকসম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল যার মধ্যে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, লালমোহন বিদ্যানিধি, পূর্ণচন্দ্র বসু, রামদাস সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ প্রখ্যাত প্রবন্ধকারের দল। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে, বিষয় নির্বাচনে ও রচনারীতিতে পারস্পরিক বেশ কিছু পার্থক্য থাকলেও এঁদের একটা 'সামান্য' লক্ষণ ছিল এই যে, এঁদের সকলেরই মনোভাব কমবেশি যুক্তিবাদ দ্বারা কর্ষিত ছিল এবং সকলেই ছিলেন পণ্ডিত। বলাই বাহুল্য যে, তাঁদের গুরু ও অভিভাবক বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই তাঁরা এই মনস্বিতা ও যুক্তিজ্ঞানের সংস্কার আহরণ করেছিলেন। সেই আহরণ-ক্রিয়া যে কী পরিমাণ সুফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল তা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ক নিবন্ধগুলির দিকে এক-নজর চোখ বোলালেই বোঝা যায়।

বর্তমান গ্রন্থ একটি সংকলন। এই সংকলনে ডক্টর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্র সমেত পূর্বোক্ত লেখক-

দের অধিকাংশেরই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অনেকগুলি প্রবন্ধ একত্র সংকলন করে প্রকাশ করেছেন। এর দ্বারা এক আধারে বঙ্গদর্শন-এরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ যেন এখানে আমরা পাচ্ছি। ব্যতিক্রম শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের বেলায় ঘটেছে। কেননা, মনে রাখতে হবে, বঙ্কিম শুধুই প্রাবন্ধিক ছিলেন না, সবার উপরে ও তাঁর অন্য সব-কিছু পরিচয়কে ছাপিয়ে তিনি ছিলেন একজন অসামান্য সৌন্দর্য-সচেতন সৃষ্টিকুশল লেখক। বঙ্গদর্শনে তাঁর একাধিক উপন্যাস (ইন্দিরা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, রাজসিংহ ইত্যাদি) প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিকক্রমে—দুই দফায়, অর্থাৎ তাঁর নিজের সম্পাদনাকালে ও তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনাকালে। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক যে, প্রবন্ধাদির পাশে পাশে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু উপন্যাসের নমুনাও এই গ্রন্থে পরিবেশিত হবে, আর সেটা পরিবেশিত হয়েছেও প্রত্যাশিতভাবে। "ইন্দিরা" আর "রাজসিংহ" উপন্যাসের পাঠ বঙ্গদর্শন এ প্রকাশকালে প্রথম খসড়ায় কী রকম ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। তার থেকে পাঠক দেখতে পারেন, এই দুটি উপন্যাসের পরবর্তী মুদ্রিত পাঠে কত অদলবদল হয়েছিল। অদলবদল শিল্পীমনের মজ্জাগত সম্পূর্ণতাবিধানপ্রয়াসের পরিচায়ক। বঙ্কিমের এমনতর খুঁতখুঁতে বাই বিলক্ষণ মাত্রাতেই ছিল।

বঙ্কিমের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন এর স্থিতিকাল চার বছর (১৮৭২-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) তারপর এক বছর কাগজ বন্ধ থাকে। পুনরপি সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় এটির আত্মপ্রকাশ ১৮৭৭ সালে এবং এই দফায় কাগজটি পাঁচ বছর জীবিত থাকে। তারপর এটি হাতবদল হয়ে বঙ্কিমেরই ইচ্ছানুসারে রবীন্দ্র-বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পরিচালনাধীনে আসে। কিন্তু এই পর্যায়ে চারটি সংখ্যার বেশি প্রকাশ সম্ভব হয় না। চন্দ্রনাথ বসুর একটি প্রবন্ধকে (পশুপতিসম্বাদ) কেন্দ্র করে মতবিরোধের সূচনা হয় এবং বঙ্কিম পত্রিকা বন্ধ করে দেন (১৮৮৩)। তারপর দীর্ঘ আঠারো বছর বঙ্গদর্শন অপ্রকাশিত থাকে। পুনরায় এই শতকের গোড়ায় (১৯০১) শ্রীশচন্দ্রের অনুজ শৈলেশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এবং রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই নবপর্যায় বঙ্গদর্শন একটি স্বতন্ত্র ইতিহাসের বিষয়, সুতরাং সংগত কারণেই সংকলক-সম্পাদক এই পর্যায়ের প্রসঙ্গ কিংবা রচনাবলীকে তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেননি। যে-বঙ্গদর্শনকে আমরা হাতের কাছে পাচ্ছি তা একান্তভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের আলোক-ছটায় আচ্ছাদিত।

সংকলনের একেবারে গোড়ায় পত্রিকা প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকীয় পত্রসূচনা, সম্পাদকত্ব থেকে অবসরগ্রহণকালে বঙ্কিমের বিদায়-লিপি, সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় পুনঃপ্রকাশকালে বঙ্কিমের নিবেদন এবং নবপর্যায় বঙ্গদর্শন-এর আবির্ভাব-কালে (১৯০১) নূতন প্রকাশক ও নূতন সম্পাদকের বিবৃতি মুদ্রিত হয়েছে। পত্রিকার সম্পাদনাকার্যে সেই কালে কী পরিমাণ অভিনিবেশ, আন্তরিকতা, জনহিতেচ্ছা নিয়োজিত হত তার আন্দাজ পাবার পক্ষে এই সম্পাদকীয় বিবৃতিগুলি দিগদর্শকের কাজ করবে। প্রতিতুলনায় এখনকার অধিকাংশ সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনাকার্যকে যদি অর্ধমনস্ক কিংবা হেলাফেলার মনোভাবপ্রসূত বলা যায় তাহলে বোধ করি অহেতুক অতীতপ্রীতির দায়ে সোপর্দ হতে হবে না। প্রতিতুলনাটা ছিদ্রান্বেষণ-সঞ্জাত নয়, চক্ষু-রুন্মীলন-সঞ্জাত।

বঙ্গদর্শন-এর পত্রসূচনার একটি অংশ এইরূপ : "এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।" আজকাল কয়টি পত্রিকা এরকম উচ্চাশা নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করেন জানতে বাসনা হয়।

তৎকালপ্রচলিত-রীতি অনুযায়ী বঙ্গদর্শন-এর অধিকাংশ রচনাই রচয়িতার নামস্বাক্ষরবিহীন অবস্থায় মুদ্রিত হত। কোনটা কার লেখা বোঝা যেত না। সুযোগ্য সম্পাদক আভ্যন্তর প্রমাণের সাহায্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই রহস্যের উদ্ভেদে সমর্থ হয়েছেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র তাঁকে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'রস', 'অশ্লীলতা', 'রসিকতা' ও 'কোমৎদর্শন' প্রবন্ধগুলি যে স্বয়ং বঙ্কিমেরই রচিত, এ বিষয়ে সম্পাদক নিঃসন্দেহ হয়েছেন। বঙ্কিমের 'সাংখ্যদর্শন-এর উপর প্রবন্ধ প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেটি সংকলিত না করে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'চার্বাকদর্শন' প্রবন্ধটিকে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে বিষয়বৈচিত্র্যের তাগিদেও বটে, লেখকবৈচিত্র্যের খাতিরেও কিছু পরিমাণে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'সতীদাহ' নামক প্রবন্ধটি সতীদাহের সমর্থনে রচিত। তন্নিম্নে সম্পাদকের নোট : 'স্বাধীন সমালোচনা ভিন্ন উন্নতি নাই। সেজন্যও বটে এবং লেখকের লিপিচাতুর্যে মুগ্ধ হইয়াও বটে আমরা এ প্রবন্ধ পত্রস্থ করিলাম।' অবশ্য এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ হয়েছিল কিন্তু খুব সম্ভব স্থানাভাববশতঃই সেই প্রতিবাদ-প্রবন্ধটিকে এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া থেকে সম্পাদক মহাশয়কে নিবৃত্ত থাকতে হয়েছে।

বঙ্গদর্শন-এর প্রবন্ধসমূহের মান বিচার করে একথা বলতেই হয় যে, তখনকার প্রবন্ধরচয়িতারা এখনকার প্রবন্ধ-লেখকদের তুলনায় অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ ও লিপিকুশল ছিলেন। লিপিকুশলতার প্রমাণরূপে আমরা খোদ বঙ্কিম, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের নামোল্লেখ করতে পারি। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'তুলনায় সমালোচনা' ও চন্দ্রনাথ বসুর 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' লিপিকুশলতার দুটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অবশ্য আজকের দিনের রচনায় বিষয়ের বৈচিত্র্য রয়েছে, বেড়েছে কালের ব্যাপ্তি ও কৌতূহলের পরিধি, সর্বোপরি এখনকার রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে তখনকার রাজনৈতিক বুদ্ধির কোন তুলনাই হয় না। একাল রাজনীতিভাবনায় ও বিশ্ববীক্ষায় অনেক এগিয়ে আছে, তাহলেও বিশুদ্ধ লিখনশৈলীর তৌলদণ্ডে পরিমাপ করে না বলে পারা যায় না যে, পূর্বতন লেখকেরা, বিশেষত বঙ্গদর্শন-এর লেখকেরা, তাঁদের বিচরিত বিষয়ের সীমার মধ্যে, অনেক বেশি তন্নিষ্ঠ ও সদভিপ্রায়যুক্ত ছিলেন। যুক্তিজ্ঞান তাঁদের অনেকেরই কবচকুণ্ডলের মতো ছিল।

বইয়ের পরিশিষ্টে লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও প্রথম নয় বৎসরের বঙ্গদর্শন-এর পূর্ণাঙ্গ বিষয়সূচী বইটির মূল্য আরও বাড়িয়েছে। সংকলক-সম্পাদককে ধন্যবাদ যে, তিনি একালীন পাঠকদের সুবিধার্থে বঙ্গদর্শন-এর পৃষ্ঠা থেকে অনেকগুলি বিষয়গৌরবী ও লিপিচতুর রচনা নির্বাচন করে এখানে একত্রে উপহার দিলেন। বঙ্গদর্শন-এর সেট আজকাল দুষ্প্রাপ্য। অনেক বৎসর আগে ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানির পক্ষে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু বঙ্গদর্শন পুনর্মুদ্রণ করে পরিবেশনার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তার কপিও আজকাল পাওয়া যায় না। ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন রচনাবলীর সংগ্রহই অধুনা এই খাতে একমাত্র সুপ্রাপ্য বস্তু।

নারায়ণ চৌধুরী

সুধীন্দ্রনাথ— সম্পাদক : নিরঞ্জন হালদার। রামায়নী প্রকাশভবন। কলকাতা, ৯। মূল্য কুড়ি টাকা।

পরিমাণে অজস্রপ্রসূ নয় কিন্তু পরিণামে অবিস্মরণীয়। কাব্যসংগ্রহ এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা বাদ দিলে বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ সাতটি, প্রবন্ধগ্রন্থ দুটি। অনুবাদ-কবিতা বাদ দিলে প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা একশো তিরিশ, প্রবন্ধের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ। এ ছাড়া পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত অথচ

অগ্রন্থিত সামান্য কিছু কবিতা-প্রবন্ধ থাকতে পারে। এই পুঁজি নিয়েই সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ।

বাঙলা কবিতার ঐতিহ্য ধরেই সুধীন্দ্রনাথের আগমন। স্বভাবত সে-আগমনে থাকে না কোনো চমক, থাকে না সহযোগী কবিবন্ধুদের মত বিদ্রোহের ভান। প্রথম কাব্যগ্রন্থটি নির্দ্বিধায় উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকে। ঋণ শোধ করার জন্যে নয়, ঋণ স্বীকারস্বরূপ।

'তন্বী'-র সারা গায়ে যদিও রবিরশ্মি তবু তার মধ্যেই যোগ্য উত্তরসূরীকে চিনে নেন জহুরী। তাঁকে যেমন প্রথম স্বীকৃতির মালা পরিয়েছিলেন বঙ্কিম তেমনি রবীন্দ্রনাথও বরণ করে নেন সুধীন্দ্রনাথকে। কৌতূহলকর, নবীন প্রতিভার আবিষ্কারে যিনি অক্লান্ত সেই বুদ্ধদেবেরও 'তন্বী'-কে চিনতে আরো এক দশকের মত সময় লেগেছিল।

'তন্বী'-র স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে যদিও সুধীন্দ্রনাথ সন্দিহান তবু তলিয়ে দেখলে ঐ প্রথম গ্রন্থেই তিনি ব্যক্তিস্বরূপে প্রস্তুত। ভারী তৎসম শব্দের সঙ্গে হালকা দেশজ শব্দের গুরু-চণ্ডালী মিলন যা পরবর্তীকালে তাঁর গদ্য-পদ্যের বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত, তারও উন্মেষ গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'নবীন লেখনী'-র প্রথম স্তবকেই। সেখানে তিনি 'খতম্'-এর সঙ্গে 'প্রথম'-এর চমকপ্রদ অন্ত্যানুপ্রাস ঘটান। বহিরঙ্গের কারুকর্ম যদিও 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-কে মনে করিয়ে দেয় তবু বিষয়-ভাবনায় 'নবীন লেখনী' সত্যিই নতুন - সামান্য একটা ঝরনা কলম। ফলত এ-কবিতার চিত্রকল্পও 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর মতো আবহমানের নয়, সমকালের এবং খুবই ব্যক্তিগত আর গদ্যধর্মী। পরবর্তীকালে যাঁকে 'নিরাশাকরোজ্জ্বল চেতনা' বলে জেনেছিলেন জীবনানন্দ সেই সুধীন্দ্রনাথও 'অন্ধকার'-এ উঁকি মারেন : কণ্ঠ হতে থেমে যাক গান; হউক আমার গতি অন্তর্দগ্ধা উল্কার সমান, ভাস্বর আলোক হতে চির-অন্ধ পাতালের কোলে, বিস্মৃতির পঙ্কগর্ভে অব্যাপ্তির অখ্যাত অতলে।

কবি-চেতনার এই নিখিল নিবিড় নৈরাশ্য একান্তই সুধীন্দ্রীয়। 'অর্কেস্ট্রা' মূলত প্রেমের কাব্যসংগ্রহ হলেও সেখানেও নৈরাশ্যই কিন্তু শাসক-চেতনা। স্মর্তব্য, সুধীন্দ্রনাথের কবিতা-রচনার শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবক্ষয়ে। বিশ্বযুদ্ধে মানুষের যা-কিছু মহৎ কল্পনা এবং আদর্শ বিনষ্ট, সত্য শুধু দৈহিক অস্তিত্ব। 'অর্কেস্ট্রা' দেহ-বন্দনারই গান। কবি-চেতনায় অমেরু ব্যবধান সত্ত্বেও সমকালীন আরেকজন কবিকে মনে পড়ে—তিনি জীবনানন্দ। বিশ্বযুদ্ধ তাঁকেও প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করেছিল এবং কবিতা-রচনায় তিনিও সুধীন্দ্রনাথের মতই নাস্তিপ্রজ্ঞ, তবু দেহবাদী নন। মিস্টিক। তাঁর নায়িকারা দেহকে উষ্ণ করেন না বরং উষ্ণ হৃদয়কে করেন শীতল। সুধীন্দ্রনাথের নায়িকারা বড় বেশি রক্ত-মাংসের মানুষ - এ-যুগের মানুষ, বহুপ্রণয়ে অভিজ্ঞ। জীবনানন্দের নায়িকারা যে-দেশের হন, যে-কালের হন—একই জায়গায় স্থির। সুধীন্দ্রনাথের নায়িকারা কেউ কাছের কেউ দূরের—কালের পরিবর্তনে দ্রুত পাল্টে যান। সুধীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতা এবং শেষের দিকের কবিতায় যে বিপুল ভাবগত ব্যবধান নিঃসন্দেহে সেখানে তাঁর নায়িকাদের মুখ্য ভূমিকা। গোড়াকার কবিতায় নায়িকাই মঞ্চের প্রায় সবটুকু জুড়ে থাকেন, শেষের দিকে তাঁর স্মৃতিও যায় মুছে—জগতের অর্থহীনতাই তখন কবিতার একমাত্র বিষয় হয়ে ওঠে। গোড়াকার কবিতায় নির্মাণ-কৌশল স্বাভাবিকভাবেই অপরিণত, ভাবনাও অভিনব নয়। শেষের দিকের কবিতাগুলির রচনানৈপুণ্য চোখে-পড়ার মত, ভাবনাও গভীর। গোড়াকার রচনা ঘন ও মধুর, শেষের দিকের রচনা কঠিন ও নির্মম। এই দুই বিপরীত বোধের মধ্যবিন্দু ছুঁয়ে থাকে 'সংবর্ত'। 'তন্বী', 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' এবং 'উত্তরফাল্গুনী' পার হয়ে 'সংবর্ত' সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবনের একটি মোড়।

'উত্তরফাল্গুনী'-ও প্রেমের কাব্যসংগ্রহ, কিন্তু তাতে নেই 'অর্কেস্ট্রা'-র প্রগল্ভ বিলাপ। স্বপ্নভঙ্গের বিহ্বলতা কাটিয়ে এখানে কবি বাস্তব-সত্যে স্থিত, স্থিরচিত্তে মেনে নেন প্রকৃত পরি-

স্থিতিকে। যে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা তাঁকে 'অর্কেস্ট্রা'-পর্যায়ে দগ্ধ করে তারই কল্যাণে 'উত্তরফাল্গুনী' বিদগ্ধ। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আরও কিছু তাঁর বকেয়া পাওনা ছিল। তিনি তখনো ভাবছিলেন বুঝি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গ্লানিময় পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করবে। সে-স্বপ্নও অচিরে খোয়াবে পরিণত হয়। রিক্ত হৃদয়ের নিপট বেদনা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ পায় 'সংবর্ত'-এর '১৯৪৫'-এ:

দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে;
কোটি-কোটি শব পচে অগভীর গোরে,
মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে!
নির্বাণ নভে গৃধ্নু রাহুর গ্রাস;
তুমি অনিকেত নির্বাক নাস্তিতে:
কে জবাব দেবে, নিখিল সর্বনাশ
কোন্ অবরোহী পাতকের শাস্তিতে?

স্বঘোষিত 'অনিকেত' কবি 'সংবর্ত'-এই কবিতার ভীর খুঁজে পান। এখানে ভাব-ভাষা-ছন্দ সবকিছুই তাঁর অনুগত। 'সংবর্ত'-এর স্ব-ভূমিতে আসতে কবির প্রায় তিন দশক সময় লেগে যায়।

অনুবাদকর্ম 'প্রতিধ্বনি'-কে টপকে 'দশমী'-তে আসি। ব্যতিক্রম হিসেবে দু-একটি কবিতার কিছু অংশ বাদ দিলে 'দশমী'-ই বোধ হয় একমাত্র কাব্যগ্রন্থ যেখানে কবি প্রকৃতির প্রতি মনোযোগী। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে 'দশমী' প্রকৃতিমূলক কাব্য। এখানে তিনি সেইসব প্রাকৃতিক চিত্রকল্প-গুলিই নির্বাচন করে নেন যেগুলি তাঁর নৈরাশ্যপীড়িত মনের অনুগামী। 'হেমন্তের বেলা পড়ে আসে' (অগ্রহায়ণ); 'একা সে এখন, বাঁধা অধুনার তালে; ত্রিসীমায় নেই আদ্যন্তের দিশা' (ভ্রষ্ট-তরী); 'কিন্তু বেলা পড়ে আসে: দ্রুত উবে যায় মহাশূন্যে মাঠের হরিৎ' (নৌকাডুবি) ইত্যাদি নিছক নিসর্গবর্ণনা নয়—তদতিরিক্ত কিছু, যা সুধীন্দ্রনাথের কবি-চেতনার সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ (অনিবার্যভাবে আবারো মনে পড়ে জীবনানন্দকে। সুধীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও প্রিয় ঋতু হেমন্ত। দুজনের কাছেই হেমন্ত রিক্ততার চিত্রকল্প।)। 'দশমী'-তে নির্বিচারে নিসর্গ আসে না, যেটুকু আসে তা সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্যেই।

ব্যক্তিস্বরূপ উদ্ভাসিত তাঁর অনুবাদ-কবিতাগুলিতেও। অনুবাদ তাঁর কবিতায় শেষ অবধি আর অনুবাদ থাকে না, হয়ে ওঠে মৌলিক কবিতা। শেক্সপীয়র-তর্জমায় তিনি এতদূর দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন যে মূল কবিতার পুংলিঙ্গবাচক Love বা বঁধুকে অনায়াসে 'দুহিতা', 'প্রিয়া', 'রূপসী' ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করেন। 'Gold candles fix'd in heaven's air'-এর বঙ্গীকরণ সুধীন্দ্র-নাথের কলমে 'অমরার হৈম দীপান্বিতা'। দীপান্বিতার অনুষঙ্গ কি Candles-এ আসে? এই ধরনের অভাবিত রূপান্তরণ অনুবাদকর্ম হিসেবে কতদূর সার্থক সে-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু কোনোই সন্দেহ নেই এইসব তাৎপর্যময় পরিবর্তন সুধীন্দ্রনাথের মতো মহৎ স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব।

গদ্যকর্মেও সুধীন্দ্রনাথ স্ব-মহিমায় উপস্থিত। 'স্বগত' এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ' এই দুটি মাত্র তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। এই দুটি গ্রন্থের যে কোনো প্রবন্ধের যে কোনো অংশেই সুধীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ব্যক্তিস্বরূপে উপস্থিত। আমার বিবেচনায় কবিতায় যত না, প্রবন্ধেই সুধীন্দ্রনাথ সম্যক স্ফূর্তি পান। মননের বাহনরূপে কবিতা একটা সীমা পর্যন্ত যেতে পারে, কেননা, তার পায়ে ছন্দের নিগড়। 'সংবর্ত'-এর ভূমিকায় কবির প্রাসঙ্গিক স্বীকৃতি স্মরণীয়: বিশ বছর যাবৎ আমি যদিও গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই তবু এখনো আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাদ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর

বাহুল্য, বিভক্তি-বিপর্যয় ইত্যাদি বাংলা কাব্যের অনেক অভ্যাসদোষ একাধিক কবিতায় রয়ে গেল।

এ-আক্ষেপ যে কোনো সৎ স্রষ্টার—বিশেষত যিনি ভাবের প্রসাদে নয়, মননের দৌত্যে সাহিত্য-ব্রতী। এবং সুধীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে একজন মননশীল স্রষ্টা।

বাঙলা পরিভাষাকে সুধীন্দ্রনাথ অনেক নতুন শব্দ উপহার দিয়েছেন। এখুনি যেগুলি মনে পড়ছে : Individual—প্রাতিস্বিক, Sympathy—অনুকম্পা, Personality—ব্যক্তিস্বরূপ, Classical—ধ্রুপদী ইত্যাদি। শব্দ-সম্পদে সুধীন্দ্রনাথ সত্যিই কুবেরতুল্য। ছন্দের কানও তাঁর প্রখর। মননের ঋদ্ধি ঈর্ষণীয়। তবু কোথায় যেন কী একটা নেই। তিনি ফরাসী কবি মালার্মেকে গুরু মেনেছিলেন, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন দুস্তর ভাষার বাধা। ফরাসী ভাষা যে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক রূপ পেয়েছে বাঙলা ভাষায় কি সেই বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়? রোমান সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের ওপর ফরাসী জাতটা গড়ে ওঠার সময় সরাসরি ল্যাটিন থেকে ফরাসী ভাষার উদ্ভব এবং তারপর সে-ভাষার রূপ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাবড় তাবড় কবি-সাহিত্যিক। আর বাঙলা ভাষার দুগ্ধ-জনক সংস্কৃত এবং প্রাকৃত, তাঁর আগে প্রধান কবি-সাহিত্যিক মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথ। সন্দেহ হয় সুধীন্দ্রনাথ বোধ হয় বাঙলা গদ্যের প্রকৃত ছাঁদটাই ধরতে পারেননি। ফলত যা হবার তা-ই হয়েছে। তাঁর কিম্বতোমুখ জিজ্ঞাসা এবং সংশয় ঠিকই ধরা পড়েছে তাঁর নিজস্ব গদ্যে ('এবং', 'তথাপি', 'যদিচ' ইত্যাদি অব্যয়ের ব্যবহার তাঁর গদ্যে প্রায় মুদ্রাদোষে পরিণত কিন্তু তা সংশয়াচ্ছন্ন মনোভঙ্গির দ্যোতক বলেই সামঞ্জস্যপূর্ণ) কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবনের মতো সেই গদ্যও নিঃসন্তান। তাঁর পথ একমাত্র তাঁরই—পরে কেউ আর সেই পথে পদচারণা করেননি। করলেও তাঁদের পদস্খলন ঘটত নির্ঘাৎ।

যাবতীয় কর্মে, এমনকি সম্পাদিত 'পরিচয়'পত্রেও তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ উজ্জ্বল। 'পরিচয়'-এ বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া লেখাকেই তিনি শুধু একত্র করতেন না, আসলে তিনিই ছিলেন মূল স্থপতি যাঁর হাতে মালমশলা জোগাচ্ছেন অপর লেখকেরা। সমকালীন আরেক সাহিত্যপত্র 'কল্লোল'-এর সঙ্গে তফাৎ দেখাতে গিয়ে বুদ্ধদেব বোধ হয় বলেছিলেন : কল্লোলের সম্পাদক ছিলেন এমন এক সিঁড়ি যাকে পৃষ্ট না-করে ওপরে ওঠা যায় না—হয়তো অপরিহার্য কিন্তু নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। অন্যদিকে পরিচয়ের সম্পাদক ছিলেন শ্রেষ্ঠ অহংবাদী, এবং তিনি সাহিত্যসেবীই শুধু নন, তিনি সাহিত্যিক, তিনি স্রষ্টা।

নিরঞ্জন হালদার-সম্পাদিত 'সুধীন্দ্রনাথ' সেই স্রষ্টা-সাহিত্যিকের ওপর লেখা একটি সংকলন-গ্রন্থ। এ-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে কবির জীবনের নানা দিক নিয়ে লেখা বাইশটি আলোচনা। তাছাড়াও আছে : রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, মানবেন্দ্রনাথ এবং এলেন রায়কে লেখা রাজেশ্বরী দত্ত-এর চিঠি—আছে শুভ মুখোপাধ্যায়-কৃত সুধীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনাপঞ্জি। সন্দেহ নেই, সুধীন্দ্রনাথকে জানতে ও বুঝতে এ-সংকলন-গ্রন্থটি খুব সাহায্য করবে।

বিশেষভাবে ভালো লাগে বুদ্ধদেব বসু, অরুণকুমার সরকার, জগন্নাথ চক্রবর্তী, নবনীতা দেব সেন, কবিরুল ইসলাম এবং অশ্রুকুমার সিকদারের রচনা। আসলে আমি এ-সংকলনের সেইসব লেখাই পছন্দ করেছি যার বিষয়-পরিসর খুব স্পষ্ট। বিস্তৃত পটপ্রেক্ষায় অধিকাংশ লেখাই সচরাচর যেমন হয়—কাজের কথা কম, আগড়োম-বাগড়োম। তাতে না ফুটে উঠেছেন সুধীন্দ্রনাথ, না উৎরেছে লেখা। চিঠি-পত্র প্রসঙ্গে স্বভাবতই কবি-বন্ধু বিষ্ণু দে-র কথা মনে আসে। সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র মধ্যে একসময় বেশ কিছু পত্র-বিনিময় হয় কবিতা-বিষয়ক। তার থেকে কিছু কি করা যেত না? সুধীন্দ্রনাথ যে অসম্পূর্ণ আত্মজীবনীটি ইংরেজিতে লিখেছিলেন তার আংশিক তর্জমাও তাঁকে বুঝতে বোধ হয় সাহায্য করত।

মননশীল সাহিত্যিকের প্রতি বাঙালীর বিমুখতা মজ্জাগত। তদুপরি তিনি যদি কবি ও প্রাবন্ধিক হন তবে তো কথাই নেই। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্যই মননশীল কবি ও প্রাবন্ধিক। সুতরাং সাধারণ পাঠকের বিমুখতা তাঁর প্রাপ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'সুধীন্দ্রনাথ' সংকলন-গ্রন্থটি নিশ্চয় আশ্চর্যকর। এবং প্রয়োজনীয় সময়ের নিরাপদ ব্যবধানে সুধীন্দ্র-সৃষ্টির নির্লিপ্ত মূল্যায়নের এই তো প্রকৃষ্ট সময়। দুঃখের বিষয়, এ-সংকলনের স্বয়ং সম্পাদকই সেই নির্লিপ্ততা সময়-সময় হারিয়ে ফেলেন। স্পষ্ট করেই বলা ভাল, সুধীন্দ্রনাথ সাম্যবাদ-বিরোধী ছিলেন কিনা একজন সাহিত্য-রসিকের কাছে সে-প্রশ্ন আদৌ জরুরি নয়—হয়তো অনাবশ্যকও। জরুরি হল, তিনি তাঁর প্রজ্ঞা-দৃষ্টিসম্পাতে ভাবপ্রতিভাকে শুদ্ধ করে তেমন কোনো জীবনদর্শন সৃষ্টি করতে পেরেছেন কিনা। '১৯৪৫'-এর রাজনৈতিক-প্রসঙ্গ এখন তামাদি হয়ে গেলেও কবিতা হিসেবে তা উপভোগ করতে কি কোনো অসুবিধা হয়?

রমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির
প্রতিষ্ঠিত
ত্রৈমাসিক
পত্রিকা

শ্রাবণ-পৌষ
১৩৮৪

New Gujrat Cotton Mills Limited

18-A, Brabourne Road,
Calcutta-700 001

Telephones : 22-1024, 22-0734, 23-7906   Telex : 021-2196

While purchasing cotton cloth, yarn, hessian, sacking, carpet backing and other Jute & Cotton products please insist on quality production.

We are always ready to meet the exact type of your requirement

Cotton Mills :

Unit No. 1, Naroda Road, Ahmedabad.

Unit No. 2, Outside Darlapur Gate, Ahmedabad.

Jute Mills :

Kanoria Jute Mills,
Sijberia, P.O. Uluberia,
Dist. Howrah, West Bengal

Spinning Mills :

Shree Hanuman Cotton Mills,
Fuleshwar, P.O. Uluberia,
Dist. Howrah (W.B.)

কৃষি সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-বিষয়ক পত্রিকা

বসুন্ধরা

নতুন আঙ্গিকে, নতুন বিষয়বৈচিত্র্যে ১লা মাঘ, ১৩৮৪ প্রকাশিত

(পৌষ-মাঘ, ১৩৮৪ সংখ্যা)

নবরূপে নবান্ন সংখ্যা

নবান্ন সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ : শান্তি মিত্র, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, আবদুল জব্বার, হলধর পটল, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে—

প্রতি কপির মূল্য : ২৫ পয়সা মাত্র

ফাল্গুন (১৩৮৪) মাস থেকে বসুন্ধরা প্রতি মাসে প্রকাশিত হবে
যে কোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যাবে।

চাঁদার হার

ষাণ্মাসিক ১·৫০ বার্ষিক ৩·০০

২০ শতাংশ কমিশনে এজেন্সি নিয়োগ করা হবে।

গ্রাহক হতে, কমিশনে এজেন্সি নিতে ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে

যোগাযোগ করুন :

সম্পাদিকা (বসুন্ধরা), অফসেট প্রেস

(পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার)

৪২, গ্রাহাম্‌স রোড, কলিকাতা-৪০

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

চেয়ার কার-এ ঝাড়া হাত-পা-য় চলুন

১০১ আপ রাজধানী এক্সপ্রেস—সোমবার এবং শুক্রবার
হাওড়া থেকে ছাড়ে—বিকেল ৫টা ১০ মিঃ

১০৩ আপ এয়ার-কন্ডিসন্ড ডিলাক্স এক্সপ্রেস
রবিবার এবং বৃহস্পতিবার পাটনা হয়ে
হাওড়া থেকে ছাড়ে—সকাল ১০টায়

৮১ আপ এয়ার-কন্ডিসন্ড ডিলাক্স এক্সপ্রেস
মঙ্গল, বুধ ও শনিবার গয়া ও বারাণসী হয়ে
হাওড়া থেকে ছাড়ে—সকাল ১০টায়
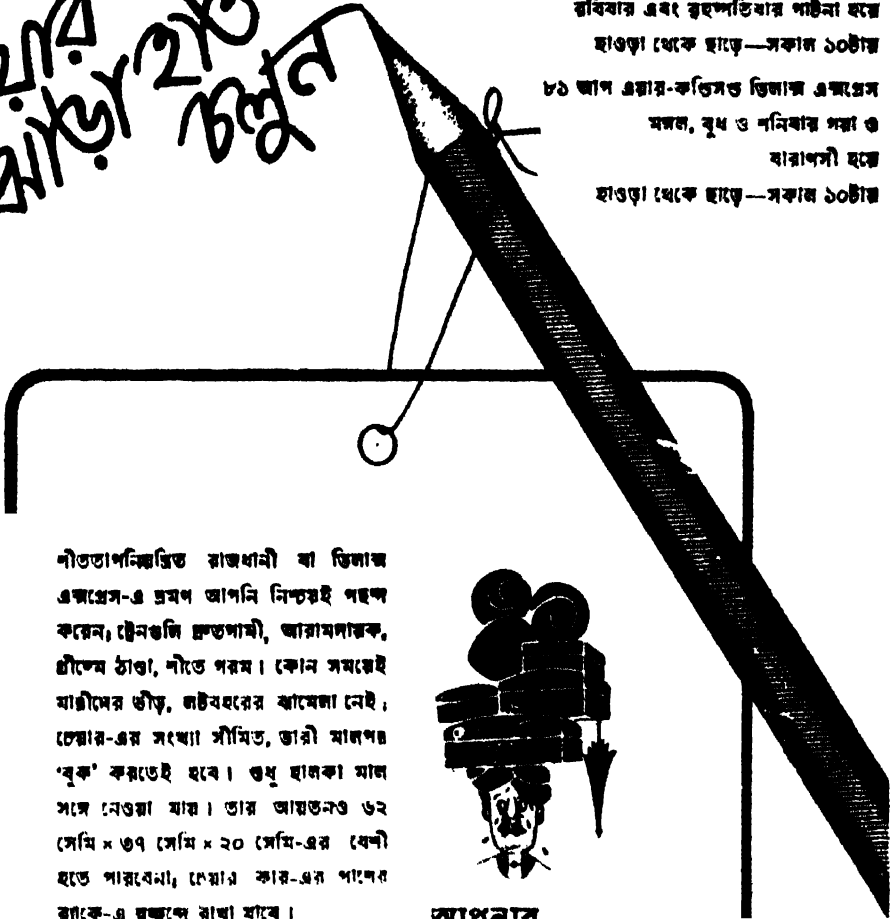
শীততাপনিয়ন্ত্রিত রাজধানী বা ডিলাক্স এক্সপ্রেস-এ ভ্রমণ আপনি নিশ্চয়ই পছন্দ করেন, ট্রেনগুলি দ্রুতগামী, আরামদায়ক, গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা, শীতে গরম। কোন সময়েই যাত্রীদের ভীড়, লটবহরের ঝামেলা নেই; চেয়ার-এর সংখ্যা সীমিত, তাই মালপত্র 'বুক' করতেই হবে। শুধু হালকা মাল সঙ্গে নেওয়া যায়। তার আয়তনও ৬২ সেমি × ৩৭ সেমি × ২০ সেমি-এর বেশী হতে পারবেনা, চেয়ার কার-এর পাশের র‍্যাকে-এ স্বচ্ছন্দে রাখা যাবে।

আপনার মালপত্র ওজন করে লেবেল এঁটে গাড়িতে রাখতে সময় নেয়। সুতরাং কাউণ্টার-এ ভীড় এড়াবার জন্য আগেই মাল পাঠিয়ে দিন। প্লাটফর্ম-এর দু'দিকে চলমান লাগেজ-কেন্দ্র থাকে। সেখানেও সরাসরি আপনি মাল বুক করতে পারেন।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—মাল আপনার সঙ্গে একই গাড়িতে যাবে। স্থানে পৌঁছেই নিয়ে নেবেন।

আপনার ভারী মাল ব্রেকভ্যান-এ দিন

medium

আতাউর রহমানের সঙ্গে

সি এম ডি এ-র সম্পর্ক কি? আগেই বলে নি, আতাউর রহমান কে ছিলেন। কারণ এক নামের অনেক লোক আছেন। কিন্তু কলকাতায় আতাউর রহমানকে যাঁরা চেনেন, তাঁরা হলেন সাহিত্যসেবী, সমাজসেবী, বুদ্ধিজীবী এবং আড্ডাধারীরা। অর্থাৎ কলকাতার সঙ্গে যাঁদের আত্মার যোগ রয়েছে।

কলকাতার উন্নয়নে যাঁরা বিপুল আগ্রহী, আতাউর রহমান তাঁদের একজন। সি এম ডি এ অফিসে বা অন্যত্র তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই, একমুখ হাসি আর একটাই প্রশ্ন : "কি মশাই, কলকাতাকে বাঁচাতে পারবেন তো?"

পার্বলিসিটির বুলি ঝাড়তে গিয়ে তাঁর কাছে 'ঝাড়' খেয়েছি,—"লোকগুলো খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না, সেদিকে নজর দিন তো মশাই.........।"

শহর উন্নয়নের গোড়ার কথাই হল শহরের লোকের কল্যাণ। জল সরবরাহ বাড়লে আর বস্তীতে জল গেলে, ট্রাম-বাসের সংখ্যা বাড়লে, রাস্তাঘাট ঠিকমত তৈরি হলে, নানান লোকের থাকবার জায়গা হলে কলকাতার কিছু উপকার হবে বৈকি। আরও দরকার সাধারণ লোকের রুজি-রোজগার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে 'কিছু' করা।

নতুন দিনের ইতিহাস তৈরি হচ্ছে কলকাতার ভূগোল জুড়ে। কলকাতার মানচিত্র দেখলে দেখতে পাবেন ছোট ছোট অসংখ্য বাঁকা ট্যারা গণ্ডী। ওগুলোকে বলে 'মৌজা' বা অঞ্চল। বৃহত্তর কলকাতার সবচেয়ে ছোট, সর্বকনিষ্ঠ "ইউনিট"। এ ছাড়া আছে নগরপালিকা ও ইউনিয়ন বোর্ড-শাসিত এলাকা। ঐসব ছোট ছোট অংশের ভেতর থেকেই উন্নয়নের কাজের সূত্রপাত হওয়া প্রয়োজন। এবং তা হবেও।

কলকাতার কাজ সি এম ডি এ-রই কাজ। সি এম ডি এ-র কাজে এবার সেই ছাপ পড়বে। নতুন নির্দেশে এবার যেসব কাজ হবে তার প্রধান লক্ষ্য হবে কলকাতার দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কিছু করা। অর্থাৎ বস্তীতে বস্তীতে যাবে পানীয় জল, পাকা পায়খানা, রাস্তা, আলো। আর এমন ব্যবস্থা হবে যাতে এগুলি ভালভাবে তৈরি হয় এবং এগুলির ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয়। জল সরবরাহ, রাস্তা, এমন কি নতুন উপ-নগরী স্থাপনের ব্যাপারেও দেখা হবে যাতে ক্লিষ্ট এলাকা এবং লোক কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য পায়। এবং সকলেই যাতে উন্নয়নের কাজে সামিল হয়। এইভাবে কলকাতা বাঁচবে। আতাউর রহমানের প্রশ্নের জবাবও মিলবে।

You fit it.
You forget it.

Exide Service will keep on adding more life to it.

Whatever your battery, just leave the bother of getting the maximum life out of it to Exide Service. We have the finest expertise to service your battery. And the widest network throughout the country to keep you covered.

Just remember to drive up to your nearest Exide Dealer once a month. We'll do the rest.
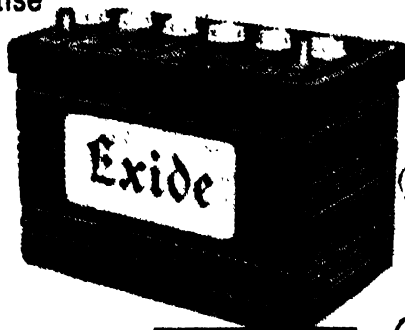
Your 'long life' partner

CLICAS-2

Ship Repair
Nuclear Plant Equipment
Pressure Vessels & Heat Exchangers
Equipment for Steel Plant
Deck Machinery-Cargo Winch
Generating Sets
Diesel Road Rollers
Ship Building
Marine Diesel Engines
Mining Equipment
Cranes of All Types
Submersible/Turbine Pumps
FRP Speed Boats
Conveyor Systems
Every Product of GRSE Contributes To India's National Growth and Self Reliance
We have the capacity to design and
Ocean Going ships upto 30000 DWT and specialized vessels like Dredgers, Tugs and Research Vessels. We also provide a variety of shipboard equipment thus making every vessel 80-85% indigenous
We are participating in the building of steel, fertilizer and chemical plants.
We build a variety of diesel
marine propulsion and for power generation—the largest in the country.
We specialize in manufacturing tailor-made material handling equipment like Conveyor systems, Cranes and Fork lifts.
We pamper the agriculturists by providing submersible/turbine pumps
The list of our products is endless and our pursuit of quality is matchless.
GARDEN REACH SHIPBUILDERS & ENGINEERS LTD.
(A Government of India Undertaking)
43/46, Garden Reach Road, Calcutta 24
Phone . 45-1721 (7 lines)
Gram · Combine • Telex : 021-7
Marine Diesel Engine Plant
Dhurwa—RANCHI (Bihar)
Mechanical Unit
—NAGPUR (Maharashtra)
GR-32
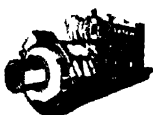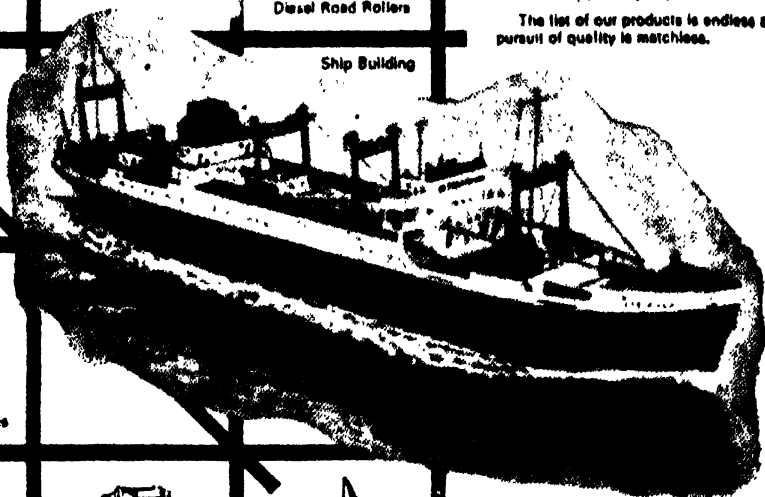
'...তব রথচক্রে মুখরিত
পথ দিনরাত্রি'
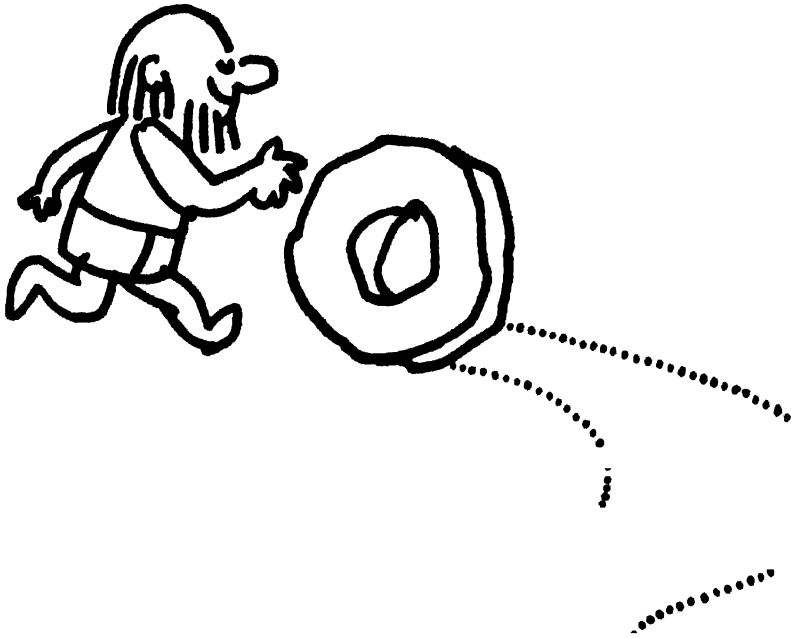
সেই কবে ইতিহাসের উষালোকে আদিম
যুগের মানুষ আবিষ্কার করলো চক্রের রহস্য—
সুরু হলো সভ্যতার জয়যাত্রা। হাজার-হাজার বছর
অতিক্রান্ত হলো। তারপর একদিন জন বয়েড
ডানলপ আবিষ্কার করলেন হাওয়া-ভরা নিউম্যাটিক
টায়ার—চক্রের জয়যাত্রা এবার দ্রুততর হলো।
বিজ্ঞানের এই বিচিত্র আশীর্বাদকে ভারতবর্ষে প্রথম
নিয়ে এল ডানলপ। তারপর থেকেই
প্রগতির মিছিলের পুরোধায় রয়েছে ডানলপ ইণ্ডিয়া।

প্রগতির পথিকৃৎ
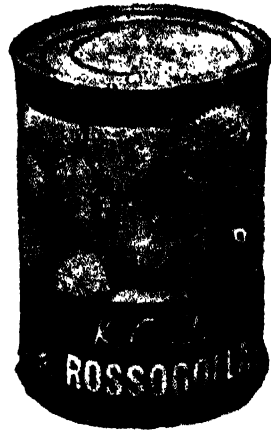
বাংলার মিষ্টান্ন-শিল্পে অবিস্মরণীয় অবদান

রসগোল্লা

বিংশ শতাব্দীর উন্নত বিজ্ঞানের মাধ্যমে কে সি দাশ প্রাইভেট লিমিটেড
বায়ুশূন্য আধারে রসগোল্লা সংরক্ষণে সাফল্য লাভ করেছেন। এই অভূতপূর্ব প্রবর্তনায়
আজ রসগোল্লা দেশে বিদেশে সুবহ ও সমাদৃত।

কে. সি. দাশ. প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা-ব্যাঙালোর

কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে

খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কী ভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাই ভালো।

কী ভাবে মোকাবিলা করবেন ঃ

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের খরচ কমান। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জলের পাম্প, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আইন মেনে চলুন ঃ

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দয়া করে মনে রাখবেন। সকাল ৯-৩০ থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকণ্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ন, মার্কারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বাতি জ্বালানোও নিষেধ।

'বিদ্যুৎ' ঘাটতি কমিয়ে আনতে
আমাদের সাহায্য করুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

রবীন্দ্রকাব্য কেবল কবিতার সম্ভারে পূর্ণ নয়—তার বহুলাংশ গানে রূপান্তরিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যভুক্ত এই গানের বিরাট অংশ তাঁর সংগীতরচনার কৃতিকে এক বিশিষ্ট প্রকাশে উজ্জ্বল করে তুলেছে। কোন্ কোন্ কাব্যগ্রন্থের কবিতা সাংগীতিক রূপ নিয়েছে, রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকদের তথা রবীন্দ্রসংগীত-রসপিপাসুদের অবগতির জন্য তার একটি তালিকা নিম্নে উল্লিখিত হল :

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	৬·০০	**গীতিমাল্য**	যন্ত্রস্থ
কড়ি ও কোমল	যন্ত্রস্থ	**গীতালি**	৩·০০
মানসী	৭·০০	**বলাকা**	৪·০০
সোনার তরী	৬·০০	**পূরবী**	৮·০০
চিত্রা	৬·০০	**মহুয়া**	৭·৫০
চৈতালী	৪·০০	**বনবাণী**	৭·০০
কল্পনা	২·৫০	**পরিশেষ**	৪·০০
ক্ষণিকা	৬·৫০	**বীথিকা**	যন্ত্রস্থ
নৈবেদ্য	৪·০০	**প্রহাসিনী**	২·০০
শিশু	৪·৫০	**নবজাতক**	৫·৫০
খেয়া	৫·০০	**সানাই**	৪·৫০
গীতাঞ্জলি	৫·০০, ৯·০০	**রোগশয্যায়**	২·৫০
উৎসর্গ	২·৫০	**শেষলেখা**	৫·০০
	বৈকালী	১৪·০০, ১৮·০০	

এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত **ছবি ও গান**, **শৈশব-সংগীত**
ও **বিচিত্রিতা** কাব্যগ্রন্থ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ

সেরা মানুষ

দাদাঠাকুর

নির্মলরঞ্জন মিত্র

[সচিত্র। দাম : ১২·০০]

'...ইনি বেশ মিষ্ট করিয়া হক্‌-কথা শুনাইয়া দেন।... ...বেচারার জাঁক-জমক নাই, সদানন্দ পুরুষ।'

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

'...যে-সব মনীষী ও চরিত্রবান ব্যক্তি আমাদের জীবনে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ আসিয়া দেখা দেন, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ।'...

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

'হে হাসির অবতার' লহ গো চরণে ভক্তি-প্রণত কবির নমস্কার।'

কাজী নজরুল ইসলাম

'বাংলাদেশের অর্ঘ্যথালে তিনি যে খাঁটী নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে হয়ত আধুনিকতার পালিশ নাই, কিন্তু নির্ভেজাল-রসে পরম উপভোগ্য।'.....

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'...দাদাঠাকুরের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা, সরল জীবন, চারিত্রিক দৃঢ়তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই রচনায়। লেখক দাদাঠাকুরের অপূর্ব ছবিটি জীবন্ত করে তুলেছেন।'......

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা ৭৩

Recent Publications

B. B. Misra
The Indian Political Parties
An Historical Analysis of Political Behaviour up to 1947
Rs. 100.00

K. M. Panikkar
An Autobiography
Takes its place beside those classics of selfrevelation by Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Nirad C. Choudhuri.
Rs. 70.00

Barun De
Perspectives in Social Sciences
Vol. I Historical Dimensions
In this volume the Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, brings together a number of papers produced by scholars associated with the Centre.
Rs. 40.00

B B Misra
The Bureaucracy in India
An Historical Analysis of Development up to 1947
Rs. 75.00

B. R. Nanda
Gokhale—The Indian Moderates and the British Raj
The first full-scale biography
Rs. 80.00

A K. Dasgupta
A Theory of Wage Policy
Rs. 16.00

A. K Dixit
The Theory of Equilibrium Growth
Rs. 30.00

A K. Dixit
Optimization in Economic Theory
Rs. 40.00

Oxford University Press

"অবসর জীবনেও আপনি আনন্দ আর সুখের স্বাদ পেতে পারেন"

আজই আমাদের

পেনসন ওরিয়েণ্টেড ডিপোজিট স্কিম

-এ অন্তর্ভুক্ত হ'ন।

প্রথমে দশ বা তার গুণিতক টাকা ৮৪ মাস পর্যন্ত জমা দিন। পরবর্তী মাস থেকে আপনি আজীবন প্রতি মাসে সমমূল্যের টাকা ফেরৎ পাবেন। উপরন্তু সুদসমেত আপনার আসল টাকা অটুট থাকবে।

আপনার সুবিধামত এই স্কিমে বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে

আজই আপনার নিকটবর্তী আমাদের
যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্ক
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

So you gave India 28 years of indigenous engineering consultancy?

Yes, we at DCPL

Well, how did DCPL start?

1950—that was the year. There they were—a group of enterprising young Indian engineers, full of pluck and raring to put talents and training to use for meaningful industrial development in free India. Opportunity arrived when the Kuljian Corporation of Philadelphia, USA, offered them its international goodwill to set up in Calcutta, Kuljian's Indian counterpart. And with this as their asset, our founder engineers formed India's first engineering consultancy organisation.

Fine...but what exactly did you do?

Our maiden assignment was the design and engineering of India's first major thermal power plant at Bokaro for the DVC—followed up by a chain of power stations all over the country. For the first time engineering designs, no less in standard than that of advanced countries, were being worked out in India—and by us Indians.

By 1960 our ownership was mostly Indianised. Meanwhile, with our proven prowess in power engineering, we had moved from strength to strength, developing a growing range of multidisciplinary skills and industry-oriented capabilities. Nuclear Power, Cement, Steel, Aluminium, Mining, Bulk Material Handling, Pulp & Paper and Utilities for a variety of industries—we took all in our stride.

Yes, we had emerged as thoroughbred professionals—the pace-setters among engineering consultants in India.

By 1970 our ownership was also fully

And then?

Over the years our performance in the country won us international business and global recognition. Thus to cater to our growing world-wide clientele we set up in 1974 an international subsidiary in Hong Kong under the name Development Consultants International Limited, DCIL in short. By 1976 our American subsidiary AMDC Inc. had also been registered in New York. Today while DCPL continue to meet national commitments, the DC group with its two overseas subsidiaries caters exclusively to international clients through its offices in Manila, Damascus, Cairo, Baghdad, Tanzania, Nairobi, Puerto Ordaz and London.

Mr. A. K. Basu
Chief of Construction Management

Where lies your strength?

In the quality of our engineering experience in India for giant projects such as the nuclear power plants at Tarapur, Madras, Narora, thermal power stations at Dhuvaran, Ennore, Harduaganj and Korba, newsprint project at Kerala, Fertilizer plant at Phulpur, steelmill for Mahindra Ugine, aluminium project at Korba and a cement project at Kashmir. All fortified by our rich store of project proven expertise and goodwill, a third generation computer system and our task force of over 750 top-notch engineers and back-up service staff. That's DCPL for you.

What does the future hold?

The promise of greater capabilities and a sharpening of skills as we keep acquiring new technologies the world over and adapt them to suit the typical conditions that prevail in India and wherever we are at work.

engineering development with total involvement

DEVELOPMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED 24 B Park Street, Calcutta 700 016

সংবেদন

শেষ পর্যন্ত চতুরঙ্গ পত্রিকার কর্ণধার আতাউর রহমানও মারা গেলেন। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির আগেই গত হয়েছিলেন। কবির সাহেবের পর সম্পাদক হয়েছিলেন দিলীপকুমার গুপ্ত। ডি কে-ও অসুস্থ হয়ে পড়লেন, চলে গেলেন অকালে। তারপর এই বিপর্যয়।

আতাউর রহমান নামে অবশ্য কোনোদিন চতুরঙ্গের সম্পাদক ছিলেন না। নামে মাত্র মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন। অথচ আমরা সবাই জানি চতুরঙ্গের অপর নাম আতাউর রহমান, চতুরঙ্গ মনে করলেই আতাউর, আতাউর ভাবলেই চতুরঙ্গ।

সেই আতাউর নেই অথচ চতুরঙ্গ চলছে—এ অবস্থা আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও চতুরঙ্গ নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। 'আপনি নিজে প্রেসে যান, না হলে হবে না'—একথা আমায় তিনি তখনই বলেছেন যখন কোনোমতেই তাঁর পক্ষে ছাপাখানায় ছোটা সম্ভব ছিল না।

রহমান ইদানীং মাঝে মাঝে বলতেন, চল্লিশ বছর হতে চলল আর চতুরঙ্গ চালিয়ে কী হবে, বন্ধ করে দেওয়া যায়, আপনি কী বলেন? মনোমত লেখা না পেয়ে এলিয়টের 'দি ক্রাইটেরিয়ান' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল; পরে আবার সেই লুপ্ত পত্রিকার পুরোনো সংখ্যাগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়ে বহুল প্রচার লাভ করল—এমন আলোচনাও এ প্রসঙ্গে হয়েছিল, মনে পড়ছে। বাংলা ভাষায় বঙ্গদর্শন ও সবুজপত্রও তো সেই পর্যায়েই পড়ে।

চতুরঙ্গের বর্তমান সংখ্যাটি যখন যন্ত্রস্থ সেই অবস্থায় আতাউর মারা যান। সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যেত যদি না শ্রীমতী নীরা রহমান উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসতেন প্রকাশনার কাজে সহায়তা করতে। চতুরঙ্গ যেন বন্ধ না হয় ও নিয়মিত প্রকাশিত হয়, এ পরামর্শও যেমন অনেকে দিয়েছেন আবার তর্জনী-সংকেতে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন কেউ কেউ, ঐতিহ্যবাহী এই পত্রিকাটি যদি আপনার হাতে সম্ভ্রম হারায় তো জানবেন আতাউরের দ্বিতীয়বার মৃত্যু ঘটল।

অনতিক্রম্য বাধা-বিপত্তির জন্য চতুরঙ্গ প্রকাশে যে নিরতিশয় বিলম্ব ঘটল তার জন্য শুভানুধ্যায়ী ও গ্রাহক-অনুগ্রাহকরা অবস্থা বিবেচনায় মার্জনা করবেন, আশা করি। এই অনিবার্য কারণেই শ্রাবণ-আশ্বিন ও কার্তিক-পৌষ সংখ্যা দুটি একত্রে যুগ্মসংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হল।

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
সম্পাদক, চতুরঙ্গ

বর্ষ ৩৯ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮৪

সূচিপত্র

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রে অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১ [illegible] লেন, কলকাতা-১৪
থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
দাড়ি আপনাকে কামাতেই হবে
তা আপনি যতই ক্লান্ত বিরক্ত আর আলস্য বোধ করুননা কেন। কাজটা সহজ সুন্দর এবং মোলায়েম হয়ে যায় যদি রাত্তিরে শোবার সময় বোরোলীন মেখে শুতে যান। দাড়ি কামাবার পর আবার মুখে মেখে নিন বোরোলীন— সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম।
চে ত্বককে করে তোলে নরম ও শান্ত। তাছাড়া হঠাৎ কেটে গেলে বা ছড়ে গেলেও ভয় নেই। বোরোলীন নিরাময়ী। বোরোলীন জীবাণু নাশক। এমন কি ফুসকুড়ি, ব্রণ—ইত্যাদির উৎপাতও কম তার কাছে। সুতরাং দাড়ি কামাবার অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলুন আগে পরে নিয়মিত ভাবে বোরোলীন ব্যবহারের অভ্যাস।
জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
বোরোলীন হাউস, ১ গিরীশ এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৩

বর্ষ ৩৯ শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮৪

জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান'

কার্তিক লাহিড়ী

কবিতা লেখার আবেগ আর উপকরণের সঙ্গে উপন্যাস লেখার আবেগ আর উপকরণের নিশ্চয় তফাত আছে, না হলে একজন আদ্যন্ত কবির উপন্যাস দেখে আমরা চমৎকৃত হই কেন, বা একজন নিছক ঔপন্যাসিকের কবিতায়। উপরন্তু সেই কবি যদি এমন উপন্যাস লেখেন, যা শিরপ্রাহরিক নিদ্রাকর্ষক না হয়ে পাঠকের মনে এক অনুত্তাল অথচ অমোঘ উদ্বেগ সৃষ্টি করে, তবে মর্মে মর্মে টের পাই তিনি কবি হলেও জাত ঔপন্যাসিক নিশ্চিতভাবে। জীবনানন্দ দাশের 'মাল্যবান' পড়ে তেমন সিদ্ধান্ত টানা প্রায় দুর্নিবার। "ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তো ঘোচেনি," (পত্রাংশ, জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, ময়ূখ, পৃ ২২৮)- মনের কোনো গহন কন্দরে সামান্য ইচ্ছাটুকু 'মাল্যবান'-এর মতো উপন্যাস রচনায় যথেষ্ট অপ্রতিরোধ্য কারণ হতে পারে কিনা, তা মনোবিজ্ঞানী বা অন্য কোনো যোগ্য লোকের আলোচ্য বিষয়, আমরা শুধু এই ভেবে আলোড়িত যে, বাংলা উপন্যাসের ঊষর ভূমিতে "মাল্যবান" মহার্ঘ শস্যবিশেষ।

অথচ 'মাল্যবান'-এর পটভূমি বিপুল নয়, সময়সীমাও সংক্ষিপ্ত, এমনকি অগণন মানুষের ভিড় যে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আনে, তার শোচনীয় অনটন ও তৎসহ দার্শনিক প্রস্থানের অভাব প্রথম নজরেই চোখে পড়ে। মাত্র একটি পুরুষ আর মহিলার, বস্তুত একজন পুরুষের অন্তর্বিলোড়নের কাহিনী হচ্ছে উপন্যাসটির উপজীব্য, যদিও নায়ক মাল্যবান সমাজের কেউকেটা নয়, বটমালি বিগল্যান্ড ব্রাদার্সের সামান্য চাকরের যার "পনেরো বছর চাকরির পর গত মাসে আড়াইশো টাকা মাইনে হয়েছে," তবু তাকে নিছক কেরানী বা অফিসবাবু ভাবা মুশকিল, কারণ "একটা কথা ঠিক : মাটির নীচে গেঁড় আর কন্দ খাওয়া শুয়োরের মতো (আপার গ্রেডের) অফিসগিরিই তার সব নয়; এক জোড়া রেশমী স্টকিং, বার্নিশকরা নিউকাট, তসরের কোট, পরিপাটি টেরি, সিগারেটকেস ও ফুটবল গ্রাউন্ডের বেঞ্চ দিয়ে নিজেকে চোখঠার দিতে সে ভালবাসে না। এইসবের চেয়ে সে আলাদা।" অবশ্য "মাল্যবান বুঝতে পেরেছে যে-কাজ সে করেছে এর চেয়ে খুব বেশী ভালো-কিছু কোনোদিনই সে করতে পারে না;" কিন্তু তা বুঝেও মনের আকাঙ্ক্ষা দমিত হয়নি তার মুহূর্তের জন্য, ছাই-চাপা আগুনের মতো তা নিরীহভাবে থেকে গেছে এইমাত্র -

"অনেক জিনিস চেয়েছিল সে : বিদ্যা সবচেয়ে আগে : অনেক দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করবার

সাধ ছিল, অনেক জিনিস শিখতে ইচ্ছা, বুঝতে ইচ্ছা; নিজের মনটা যে নেহাৎ কেরানীর ডেস্কে-আঁটা নিরেট, নিরেস কিছু নয়, মানুষকে সেটা বোঝাবার ইচ্ছা।" হয়তো ঐসব চাওয়া আর ইচ্ছা—ইংরেজী শিক্ষিত, মধ্যবিত্তের একান্ত আপনার, এরই ফলে অর্থাৎ সাধ আর সাধ্যের দ্বন্দ্বে কিংবা নিজের বাস্তব অবস্থা আর চাওয়া-পাওয়ার নিরন্তর টানাপোড়েনে শতধা দীর্ণ হওয়াই মধ্যবিত্তের ভবিতব্য, মাল্যবান তেমন মধ্যবিত্তের প্রতিভূস্থানীয় সংগতভাবে।

কিন্তু মাল্যবান দুঃখীও বটে, একই সংসারে থেকেও সে স্ত্রী-পরিত্যক্ত এবং তার প্রতি উৎপলার ব্যবহার যে-কোনো মানদণ্ডে অভদ্রোচিতই শুধু নয়, সময় সময় নিষ্কারুণ্যের সীমা ছাড়ায়; তবু এই নিষ্ফলা সম্পর্ক আমৃত্যু টেনে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই মাল্যবানের। আর যতই সে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়, উৎপলার অপ্রেম ততই দারুণভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ উগ্র হয়ে ধ্বস্ত করে তার অস্তিত্ব, মাল্যবানের জীবনের নিঃশব্দতার অর্থ যে তার বেঁচে থাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেই মূল বিষয়টিও নস্যাৎ করতে উৎপলার বিন্দুমাত্র বুক কাঁপে না, সে অবলীলায় বলে—(ক) "লোচন ডোমেরও জামাইষষ্ঠী হয়—সেইরকম আর কি। বেয়াল্লিশটা বছর বসে এত বড়ো পৃথিবীর ভেতরে থেকে মানুষ সমাজে মানুষটা কানা 'একেবারে ছুঁচো চামচিকের পারা—' ... 'কোথাও কোনো ডাক নেই, কেউ পোঁছে না, হৈ হল্লা নেই, ঘরে আড্ডা মজলিশ নেই—খোল করতাল কেত্তন মুক্তরোর বালাই নেই—কোনো মানুষই আসে না—ডাকলেও আসে না। কিন্তু বয়ড়াকে কানে শোনাবে কে? ড্যাবড়াকে ডান হাত দেখিয়ে দিলে লাভ আছে'।" (খ) "সেই বিয়ের পর থেকে দেখছি কেরানীবাবুর নিচের তলার ঘরটিতে দুটো চেয়ার; একটাতে তিনি নিজে বসেন আর একটাতেও তিনি নিজে বসেন।" ইত্যাদি আরও অসংখ্য সংলাপে উৎপলার অমানুষী নিপ্প্রেম প্রকট হয়ে ওঠে, যেন পলা স্ত্রী নয়, মাল্যবানের অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগের পাশে নিরেট অপ্রেম। এমন বৈপরীত্যে স্থাপিত চরিত্র দুটি অনায়াসে লোমহর্ষক কাহিনীর কিংবা ভাবালুতার বেনোজল বইয়ে দিতে পারত, 'মাল্যবান'-এ লেখক কিছু অ-মনস্ক হলে সে সম্ভাবনা রোধ করা শিবেরও অসাধ্য ছিল, কারণ আপন স্ত্রী অবহেলিত নায়কের পক্ষে নিরতিশয় অভিমানাহত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, সেই অভিমানে যুক্তিবুদ্ধি প্রায়ই নিষ্ক্রিয় থাকে বলে নায়কের কিছু অতিনাটকীয় আচরণ বা কাজে গোটা সমস্যার সংহতি ও ঘনতা তরল হতে নিমেষমাত্রেরই দরকার হত, কিন্তু জীবনানন্দ দাশের প্রখর সচেতনতা আর সংযম উপন্যাসটিকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে, যার জন্য 'মাল্যবান' পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দাবি করে।

২

"অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন, পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিংবা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা serenity জিনিসটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে সেখানে কাব্য অক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের Divine Comedy-র ভেতর কিংবা শেলীর ভেতর serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে বলে মনে হয় না।" (রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দর চিঠি, ঐ, পৃ ২১৬-১৭)

রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দর চিঠিতে তবু তাঁর সৃষ্টিকৃতি অনেকখানি আঁচ করা যায়, যদিও স্বীকার্য ঐ চিঠিতে প্রসারিত ভাবনাচিন্তা তাঁর রচনা-বিচারের একমাত্র নিরিখ হতে পারে না, কারণ জীবনানন্দর ভাবনাচিন্তা নিশ্চিতভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে, এক সময়ের ধারণা অন্য সময়ে স্থির থাকেনি—হয়তো তা আমূল বদলেছে, নয়ত ঐ ধারণাই গভীরে শিকড় চারিয়েছে, তাই উপরি-উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে তাঁর শিল্পকর্মের বিচার খণ্ডিত হতে বাধ্য। কিন্তু মানুষের চরিত্রে আশ্চর্য এক সংগতি দেখা যায়, যে-কোনো ব্যক্তির চরিত্র (সৎ বা অসৎ যে কোনো ব্যক্তি) তার সামগ্রিক জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে, তা তিনি যতই পরিবর্তিত হোন না কেন, যদিও মতটি সরলভাবে মেনে নিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, বরং একজনের সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করেই তবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে, সেক্ষেত্রে আমাদের বর্ণিত বিষয়টি অসত্য বলে প্রমাণিত নাও হতে পারে।

জীবনানন্দ দাশের রচনাবলীতে আনন্দের চেয়ে অশান্তির তাড়না রয়েছে নিঃসন্দিগ্ধভাবে, কারণ তিনি সমকালীন সমাজ, সংসার বা জগৎকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে চাননি বা এড়াতে পারেননি, আর সেই সমসাময়িক জীবনের গ্লানি তাঁকে সুস্থির থাকতে দেয়নি। হয়ত কবি-জীবনের প্রথম দিকে তাঁর প্রেরণা অনেকখানি নিয়োজিত ছিল নিসর্গের অনুধ্যানে, কিংবা কেবলি স্বপ্নময় জগতে সাযুজ্য স্থাপনের লীন হবার প্রয়াসে, তবু তখুনি সমসাময়িক ঘটনা বা বিষয়ে রচিত অনুকারী কবিতায় বা ধূসর জগতে প্রস্থানের বাসনায় তাঁর বস্তুচেতনা মোটেই অনুপস্থিত নেই, এবং তা ক্রমে অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর শিল্পকর্মের অগ্রগতির ধারায় স্পষ্ট সাবয়ব হয়ে ওঠে। আর যতই দিন যায়, সমসাময়িক জীবনের জটিল আবিলতা এই সংবেদী কবিকে অস্থির করে তোলে, "ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি" জেনেও ইতিহাস এড়িয়ে যাওয়া সৎ লেখকের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, কান টানলে মাথা আসার মতোই ইতিহাস পরখ করতে গেলে সমাজ, সমসাময়িক কাল বা জীবন হাজির হয় বিনা নোটিশে।

"বাস্তবের রক্ততট" তাঁরই ব্যবহৃত শব্দ (নীলিমা, ঝরা পালক); বাস্তবের তটে রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া যেন গত্যন্তর নেই; বাস্তবের অসহ চাপে কবি কেবল বিষজর্জর অন্ধকার দেখতে পেয়েছেন, তাই সাময়িকভাবে হলেও তিনি জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন, এবং তা গোপন করেননি এইসব পঙ্‌ক্তিগুলিতে: আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়-বেদনায়-আক্রোশে ভরে গিয়েছে;/সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে/উৎসব শুরু করেছে/ হায় উৎসব!' (অন্ধকার)। এই তিক্ততার অন্তঃস্থলে অবশ্যই কাজ করে চলে অতি সংগোপনে তিমিরহননের গান, জীবন-আস্বাদনের গভীর প্রত্যয়, কিন্তু সেই সুর বোধ করি আরও কিছু পরে স্পষ্ট হয় তাঁর কবিতায়, ততদিনে তিনি প্রাক্‌বিশ্বযুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মূল্যবোধের অবনয়নে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা আর অমানুষী প্রতিবেশ লক্ষ্য ক'রে মনে মনে বিরক্ত আর ধ্বস্ত হয়ে অবশেষে যে বেদনা বোধ করেন, সেখানে রাবীন্দ্রিক প্রশান্তি আশা করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি তার কিছু আগের লেখা হলেও জীবনানন্দ তখনও অশান্তিকে, আগুনেকে সর্বৈব না ভাবলেও তা যে তুচ্ছ নয় এমন অনুভাবিত ছিলেন। 'মাল্যবান' সেই অশান্তি আর আগুনের শীর্ষে রচিত কাহিনী নিঃসন্দেহে, যদিও তার মর্মে রয়েছে সংগুপ্তভাবে প্রশান্তির জন্য ব্যাকুলতা।

মাল্যবান আর উৎপলার, বিশেষত মাল্যবানের অন্তর্লোক উন্মোচনে ঘটনার ঘনঘটা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় এই কারণে যে বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে বহির্ঘটনার স্থান তার নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় বরং তার থোড়-বড়ি-খাড়া জীবনের তুলনায় নেহাত তুচ্ছ, একেবারে শূন্যের কোঠায়; এর মধ্যে যেটুকু ঘটনার চাপ থাকে, তাতে নাটকীয়তার চেয়ে অতিনাটকীয়তা রঞ্জিত হয়ে থাকে বেশি। বহি-

দুর্ঘটনার চাপ আলোচ্য উপন্যাসে কম, মাল্যবানের মতো লোক নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তাই তার উপর বাইরের ভারও যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে পারে না; উপরন্তু মাল্যবান "শান্তি ভালবাসে : নিজের সুখ সুবিধে অনেকখানি ছেড়ে দিয়েও।" এবং সে নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব; তার জীবনের নিঃশব্দতার যে সূক্ষ্ম মানে আছে সেই সূক্ষ্মতার আভাস তবু পাওয়া যায় ছড়ি হাতে পার্কে ঘোরার সময় স্বপ্ন দেখায়, ততক্ষণে সে কেরানীর ডেস্ক আর উৎপলার স্বামিত্ব থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে নেয় কিছু সময়ের জন্য, কিন্তু "তারপর অবসন্ন হয়ে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে, একটা চুরুট জ্বালায়; খিদে পায়; বাড়িতে ফিরে আসে।" অর্থাৎ একজন নিরীহ নির্বিরোধ বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-ভঙ্গের আলেখ্য তার চেতন-অবচেতন জাগর-সুষুপ্তির বা জাগর স্বপ্নের চলচ্চিত্র বিম্বিত হয় অ-নাটকীয় খুব সহজ ভঙ্গিমায়। মধ্যে মধ্যে নাটকীয়তার যে অবকাশ নেই এমন নয়, বিশেষত মাল্যবানের শীতের রাতে নীচতলার ঘর থেকে দোতলায় পলার ঘরে উঠে আসার পর তার সঙ্গে পলার কথোপকথনে ক্ষণিক হলেও সে আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে; তবু তা প্রকৃত নাটকীয় হয় না এজন্য যে তার আগেই পাঠক প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং জানে যে নায়কের এভাবে স্ত্রীর ঘরে উঠে আসার পরিণাম কী। তাই সংঘাত আর চমক নাটকের যে প্রাণ, সেই প্রাণময় কৌশলটির রহস্য আগেই উন্মোচিত করে দিয়ে নাটকীয়তা পরিহার করা হয় সহজভাবে, অথচ এই নিষ্ঠুর স্বাভাবিকতার মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের বিষয় বা সমাজ জিজ্ঞাসা তুমুল হৈ চৈ তোলে না। অবশ্য তবু অপ্রেমের নিষ্ফলতার বা চরম নির্মমতার মর্মে মর্মে দুটি ভিন্ন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে যায় আপন মনে, তা অবশ্য নিবিষ্ট পাঠে বুঝতে হয়।

উপন্যাসে উৎপলার অপ্রেম অ-ব্যাখ্যাত থেকেছে, মাল্যবানও অপ্রেমের উৎস সন্ধান করেনি; সে অপ্রেম-কে মেনে নিয়েছে- "কোথায় পেলো সে এ-ধারণা? কে শিক্ষা দিয়েছে তাকে? অপ্রেম হয়ত অপ্রেমই শিখিয়েছে উৎপলাকে।" কিংবা "উৎপলার উদাসীনতা ঠিক নয়, খুব সম্ভব অপ্রেম- দিনের পর দিন স্বচ্ছ হয়ে আসছে যেন", অথচ উৎপলা দাম্পত্য জীবনের শুরুতে মনপ্রাণ ঢেলে দেয় স্বামীর জন্য, মাল্যবানের ভাবনাচিন্তায় সে কথা একসময় বেরিয়েও পড়ে। যতদূর মনে হয় উৎপলা প্রথম থেকেই মাল্যবানের সুপ্ত অধিকারী-মনোবৃত্তি সম্পর্কে সংশয়িত ছিল, সেই সংশয় ক্রমে তিক্ত বিরক্ত হয়ে শেষে অপ্রেমে রূপ নেয়। আসলে উৎপলা স্বামীর সুপ্ত অথচ দৃঢ়প্রোথিত সামন্ততান্ত্রিক মনোভঙ্গি সহ্য করতে পারে না, যদিও তার মনেও দ্বিধা আছে হিন্দুর মেয়ে বলে, তবু "এ বিয়ে আমার হতো" বিশ্বাসটি যে সত্য নয়, তা সংস্কার,- তা কবুল করে অকপটে। মাল্যবান পলার আচার-ব্যবহারে নিয়ত আহত হয়েও সে উৎপলার মনোভাব বোঝে না বলে বার বার সন্ধির উদ্দেশ্যে ফিরে ফিরে আসে, এবং সে চেষ্টা বিফল হওয়ার জন্যই সে স্পর্শকাতর ভাবালু হয়ে ওঠে।

মাল্যবান পাড়াগাঁয়ে জন্মেছিল, তার স্মৃতি তাকে প্রায়ই উত্তেজিত সম্মোহিত করে, এর সঙ্গে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে যে ফাঁক থাকে, তা কিছুতেই পূরিত হয় না, আর এই ফাঁক ভরাট করার জন্য যে জায়গাটুকুর দরকার ছিল তা একসময় তার চোখের সামনে কিন্তু তার অচেতনে সরে গেছে, তাই সে বিরাট শূন্যতার মুখোমুখি হয়। এই রকম ভয়ংকর শূন্যের মুখো-মুখি এসেই হয়তো সে চিন্তা করে- "একটি সাধারণ স্নেহশীল ধর্মভীরু ভীরু বৌ যদি সে পেত, তাহলে এ-দুটি সাদাসিধে জীবন পৃথিবীতে বিশেষ কোনো সফলতা বা নিষ্ফলতার দাগ না রেখে শান্তভাবে শেষ হয়ে যেতে পারত একদিন। কিন্তু তা তো হল না, নম্রবন্য ঘরজোড়া স্নিগ্ধতা হল না, খড়খড়ে আগুন খড়ের চমৎকার অগ্নি-ডাইনীর মতো হল মাল্যবানের বিয়ে আর বৌ আর বিবাহিত জীবন।" মাল্যবানের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে যে বিরাট ফাঁক রয়েছে তা তার অন্যান্য চিন্তাভাবনাতেও প্রকট, সেইসব চিন্তা নির্ভেজাল মধ্যবিত্তীয় তা বলা বাহুল্য। নিবিষ্টভাবে

উপন্যাসটি পাঠ করলে নায়কের যে দুঃখবোধ আমাদের আলোড়িত করে তা প্রায় প্রতিটি অ-সুখী মধ্যবিত্ত পরিবারের আলেখ্য, যদিও তার প্রকাশ একরকম নয়, এবং দুঃখবোধ লালনেরও বোধহয় কোনও সুখকর দিক আছে। যে-সব বৈশিষ্ট্য একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে পাওয়া যায় তার সবকটি মাল্যবানে বর্তমান :

"গোলদীঘিতে ঘুরে ঘুরে বারো চৌদ্দ বছর সে অনেক হাওয়াই ফসল ফলিয়ে গেছে : সমাজ-সেবা, দেশ স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা, বিপ্লবের তাড়না—তেজ, নির্বৈপ্লবিক মনের চারণা, উনিশ শতকের নিশ্বায়মান সমুদ্রতীর : সাহিত্যের ধর্মের মননের; বিশ শতকের উপচীয়মান আবহমান রক্তরৌদ্র ছায়া, জ্বালা সমুদ্র সঙ্গীত—নানারকম অপর রকম জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে ঈর্ষা করেছে—নিজের জীবনটাকে অনেক সময় অসার ও নিষ্ফল মনে হয়েছে তার। কিন্তু তবুও এই পাকা চাকরিটুকু, স্ত্রী ও মেয়ে, কলেজ স্ট্রীটের ঘর তিনখানা : এর চেয়ে অন্য কোনো সাফল্যের উত্তমর্ণতা তার জীবনে কোনোদিন ঘটে উঠত কি?"

স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী বোধকরি নিরেট মধ্যবিত্তের ইতিহাস, মাল্যবান তার ব্যতিক্রম নয়, আর আমাদের মধ্যবিত্ত-র ধরন-ধারন বিশুদ্ধ নাগরিক নয়, তা বলা বাহুল্য—একই সঙ্গে প্রগতি আর প্রত্যাগতির মিলন তৎসহ ভাবালুতা স্মৃতিকাতরতা। না হলে পলাকে অপ্রেমে নিরঙ্কুশ জেনেও সম্পর্কশূন্য হওয়ার সীমা পেরিয়ে গিয়েও সে বোঝে "উৎপলাকে নিয়ে তার চলবে না কিছুতেই, তবু চলতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত—" এই অসহায়তা মধ্যবিত্তের ট্র্যাজিডি-ও বটে। বন্ধন ছিন্ন করার যে শক্তি, উদ্যম বা বোধ দরকার মধ্যবিত্ত জীবনে তার অনটন এইজন্য যে সে তার অতীতকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে না, চেষ্টা করেও হয়তো পারে না। তাই মাল্যবানের মতো আমাদের আশা-ভঙ্গের কাহিনীতে দুঃখবোধের লালন এত প্রকট হয় ওঠে, এবং মনস্ক ঔপন্যাসিক না হলে এমন কাহিনী যে ভাবালুতার আবর্জনা সৃষ্টি করে, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে বাংলা সাহিত্যে।

'মাল্যবান' যে আবর্জনার স্তূপ বাড়ায়নি, তার প্রধান কারণ নিশ্চয়ই ঔপন্যাসিকের প্রখর সচেতনতা, যে চেতনা জীবনকে হেলাফেলাভাবে দেখে না, যে চেতনায় নিহিত থাকে "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন,/মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।" কিংবা "কবিতা মানুষের জীবনের কল্যাণ মানসকে অপরোক্ষভাবে চরিতার্থ করবার সুযোগ না দিয়ে বরং জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা—সকলেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকট পরিস্ফুট করে, আমাদের হৃদয়, ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সৎ কি অসৎ পরিণতির পথে কৃষ্ণপক্ষের সূর্যের মতো (ভেবে নেওয়া যাক) উপস্থিত হয়; আমাদের জ্ঞানপিপাসু স্বভাবকে সর্বতোভাবে সব কথা জানিয়ে দেবার চেষ্টা করে; আমাদের ভাবনাকে সর্বমানবীয় পরিসর দেয়, অভিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদের ভিতর আত্মনাশ ও সকলের সর্বনাশ রয়েছে জানিয়ে দিয়ে তাকে মহত্তরভাবে গ্লানিহীন করে দিতে চায়; হৃদয়কে ক্রমশই বিশুদ্ধ করে।"—[লেখা, লেখকের দায়িত্ব, কেন লিখি পুস্তিকা (ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সংঘ প্রকাশিত, দ্র গোপালচন্দ্র রায় প্রণীত জীবনানন্দ, পরিশিষ্ট, পৃ ৫৫)]। কবিতার ক্ষেত্রে দেখি তাঁর অন্তর্গূঢ় বস্তুচেতনা ক্রমশ বাইরের জগতের আঘাতে আর সংস্পর্শে উজ্জ্বল, গভীর ও মূর্ত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা প্রভৃতি অ-মানবিক কাণ্ডগুলি জীবনানন্দকে সমাজনিরপেক্ষ হতে দেয়নি—প্রকৃতিজগৎ থেকে মানবিক জগতে পদার্পণ আর পরে সেই জগৎ সম্পর্কে আমূচেতন হয়েছিল বলেই 'সাতটি তারার তিমির'-এর অনবদ্য কবিতাগুলি আমাদের কেমন নাড়া দেয়। তার মানে এই নয় যে এর আগে অনবদ্য কবিতা রচিত হয়নি। বলা উদ্দেশ্য এই যে, কবি ধীরে ধীরে তাঁর প্রত্যয় বিশ্বাস-কে আয়ত্তে আনতে পারছিলেন, তাই কবিতাগুলি ক্রমে ভিন্ন স্বাদের অথচ গভীর জীবনবোধে উদ্ভাসিত হতে থাকে। 'মাল্যবান' (রচনাকাল জুন ১৯৪৮ যুগে

উল্লিখিত) সেইসব সময় রচিত, বস্তুত কবিতার সোদর না হয়ে নির্মম অকাব্যিক হয়ে ওঠে।

অথচ 'মাল্যবান'-এ কাব্যিক আমেজ মোটেই উপেক্ষিত নয়, ঐ আমেজ অনেক সময় প্রসারিত নিবিড়ভাবে, তবু উপন্যাসটিকে জীবনানন্দীয় কাব্যের সম্পূরক এবং দোসর বলা চলে না। কবি তাঁর কাব্যপ্রত্যয় বিসর্জন দেননি এখানে, কিন্তু উপন্যাসের দায় যে আরও প্রত্যক্ষ এবং বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক কাব্যের চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ আর ওতপ্রোত, সেকথা বইটি পাঠ করলে বোঝা যায়। এই নিষ্করুণ নাট্যে তাই স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ মনোহর হয়ে ওঠে না বা কথায় মারপ্যাঁচে সম্পর্কের জটিলতা হারিয়ে যায় না। অন্যদিকে নায়কের অন্তর্লীন চিন্তাভাবনা মুখ্য হয়ে উঠলেও সচরাচর অন্যান্য অন্তর্মুখী উপন্যাসে যেমন নায়কের বাগ্‌বিদগ্ধ জ্ঞানসমৃদ্ধ চিন্তন মনন প্রকট হয়ে ওঠে, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, এবং এখানে লেখককে আমরা শিরোপা দিতে বাধ্য। নায়কের স্বপ্ন জাগর কল্পনা অভিমান বাস্তব সম্পর্কে কখনো কখনো অলৌকিক মনোভাব—এককথায় পরা-বাস্তবতার স্বরূপ সম্যক স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও ভাষার ব্যবহার এমন সঠিক হয় যে, আমরা মাল্যবানকে তার আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মনাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিপন্ন মনে করি; যার স্বরূপ বোধহয় এই : "অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয় /আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে;"/আর বিপন্নতার সঙ্গে মিশে থাকে উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা নির্বান্ধবতা অসহায়তার দুঃসহ ভার, তাই এমন নায়কের আত্মরোমন্থনের ভাষায় পরাবাস্তবতার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক, এবং প্রসঙ্গ অনুযায়ী সেই ভাষার সুষ্ঠু আর সীমিত প্রয়োগ উপন্যাসটির সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি—সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরায়, যদিও তারই পাশাপাশি প্রাত্যহিক জগতে ব্যবহৃত ভাষাও নিজের আসন পাকা করে নেয়। অর্থাৎ জীবনানন্দ উপন্যাস রচনা করতে নিছক কাব্যিক তাড়নার বশবর্তী হননি, অবশ্য কিছু কিছু বাক্‌প্রতিমা নিশ্চিতভাবে কাব্যিক এবং কখনো কখনো বর্ণনার ভাষাও; তবু ঐ কাব্যিক আবহাওয়ার মধ্যে সহজ ঘরোয়া ভাষা দেশজ শব্দ শ্লীল অশ্লীল তাবৎ বাকভঙ্গি ঠাঁই করে নেয়; সংলাপে তো বটেই, এমনকি মনোবিশ্লেষণে তা সমানভাবে মেলে, অথচ উপন্যাসের গোটা ছক লেখকের আয়ত্তে থাকে বলে 'মাল্যবান' সীমিত পরিসরে বিরাট জীবনদর্শন বহন না করেও অসামান্য উপন্যাস হয়ে ওঠে।

৩

"সমস্ত সুখী পরিবার মোটামুটি এক রকমের, প্রতিটি অসুখী পরিবার তার বিশেষ ধরনে অসুখী"—'আনা কারেনিনা' উপন্যাসের প্রারম্ভিক বাক্যটি 'মাল্যবান' রচনার সময় লেখকের স্মরণে এসেছিল কিনা বলা দুষ্কর, এবং এসে থাকলে বা না থাকলে আমাদের বিচার তার দ্বারা প্রভাবিত হবে না, কিন্তু বাক্যটি যে অসম্ভব রকমের খাঁটি তা প্রায় প্রত্যেকেরই বাস্তব অভিজ্ঞতায় জানা আছে। অ-সুখী পরিবার বিশেষ ধরনে অসুখী বলেই মাল্যবান মধ্যবিত্তের প্রতিভূস্থানীয় হয়েও তার পারিবারিক কাহিনী অন্যরকম হয়ে যায়, যেমন 'চোখের বালি' বা 'যোগাযোগ' অসুখী পরিবারের কাহিনী হয়েও দুটি দুরকম ভাবে অনবদ্য। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের 'গ্রাম ও শহরের গল্প'-এর কথা মনে পড়ে, যদিও স্বীকার্য গল্পটিতে অশান্তির আগুন কেমন এক ভাববিহ্বল আবেগে অনেকখানি স্নিগ্ধ হয়ে গেছে।

'মাল্যবান'-এ উৎপলা অনুপমকে বিয়ে করতে পারত অথচ বিয়ে হয়েছে মাল্যবানের সঙ্গে, তেমনিভাবে দেখি 'গ্রাম ও শহরের গল্প'-এ সোমেন শচীকে ভালোবাসলেও শচীর বিয়ে হয়েছে তার বন্ধু প্রকাশের সঙ্গে, আর বহুদিন বাদে অতর্কিতে দেখার সামান্য ঘটনা দিয়ে গল্পের শুরু। ঐ

গল্পের পরিসর বিস্তৃত হলে হয়তো 'মাল্যবান'-এর সমপর্যায়ের না হলেও প্রায় ঐ-রকম আগুনের সাক্ষাৎ পেতাম সন্দেহ নেই। হয়তো গল্প বলেই সেখানে কাব্যিক সংহতি খানিকটা রোমান্টিকতার স্পর্শে গল্পটিকে উপন্যাসের মতো ভয়ংকর করে তোলেনি, করে তুললেও দুটি যে দু-রকম হত তা উভয় রচনা পাঠ করলে বোঝা যায়, যেমন নিষ্ঠুরতা 'বিলাস' গল্পের উপসংহারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'মাল্যবান' উপন্যাসের বিশেষত্ব এইখানে যে উপন্যাসটি একই সঙ্গে বিশেষ ও নির্বিশেষ হয়ে ওঠে; বিশেষ, কারণ তা বিশেষ অসুখী পরিবারের কাহিনী, যার পাত্র-পাত্রীর আচরণ ঠিক সেই ন্যায় মেনে চলেছে যে ন্যায়ে চ'লে উপন্যাসটি সমাজ আর আত্মানুসন্ধানের নিরিখ হয়ে ওঠে। তবু 'বিলাস' গল্পে যে নিহিত শ্লেষ থাকে তার অভাব উপন্যাসটিতে কিছুটা বর্তমান, বিলাস কথাটির যে দুটি অর্থ (এক : "কাছে এনে রেখেছিলে? কিন্তু পড়লে না? কেমন উম্বায়ী তোমার আত্মা।" ..."না, তা নয়—' মাস্টারমশাই নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন, 'তবে বিলাসী।" দুই : "তিনি আমাকে বলতেন, তুমি সারাদিন ফুলবাবুর মতো সেজে বেড়ালে হবে কি, তোমার মনে কোন বিলাস নেই, সর্বেন।' ...'জেঠামশাইয়ের মতে বিলাস মানে খুব সম্ভব বিষয়-আশয়ের মায়া কাটিয়ে ন্যালা ভোলা জিনিস নিয়ে ভোম হয়ে থাকা।") জীবন সম্পর্কে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধারণা আর দৃষ্টিভঙ্গি-সঞ্জাত তা বিচারের চেষ্টা ঐ গল্পে দেখা যায়, তেমন চেষ্টা 'মাল্যবান'-এ অনুপস্থিত, কিন্তু ঐ গল্পের অনেক অভাবই উপন্যাসে উপস্থিত থাকে বলে 'মাল্যবান' এত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

মাল্যবানের জীবন নানা বৈপরীত্যের সমাহার হলেও, তার পিছুটান থাকলেও স্ত্রীর অপমান, নিষ্ঠুর ব্যবহার, স্ত্রীর কাছে আগন্তুদের প্রতি অসহ ঘৃণা বা ঈর্ষা, নিঃসঙ্গতা, নিজের আশাভঙ্গ ইত্যাদির অশান্তির আগুন ছাড়িয়ে যে প্রশান্তির জন্য আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে তার স্বপ্নের মধ্যে, তেমন প্রত্যাশা গল্পগুলিতে নেই, এমনকি সেই প্রত্যাশা বাংলা সাহিত্যের ক'টি উপন্যাসে পাওয়া যায়, তা বিবেচক পাঠকমাত্রই জানেন, এবং এইখানেই 'মাল্যবান' অসাধারণ উপন্যাস হয়ে ওঠে; কারণ সে প্রত্যাশা মামুলি নয়, জীবনবোধের গভীরে শিকড় চারায় বলে 'মাল্যবান' সেই তাৎপর্যে তুলনা চলে শিল্পসাহিত্যের অন্য এক বিভাগে অ-সুখী পরিবারের কাহিনী নিয়ে রচিত চলচ্চিত্র সত্যজিৎ রায়ের অসামান্য ছবি 'চারুলতা'-র সঙ্গে। 'চারুলতা'-র অবশ্য অশান্তি বা আগুনের আঁচ দাউ দাউ নয় পরিচালকের পরিমিতবোধের নিদারুণ গুণে, যদিও তা টের পাওয়া যায়, কিন্তু 'মাল্যবান'-এ আগুনের আঁচ বেশ বোধ করা যায়। বোধহয় মাধ্যমের ভিন্নতা এবং সুবিধা-অসুবিধার তারতম্যে 'চারুলতা'-র যতদূর নৈর্ব্যক্তিক হওয়া গিয়েছে ততখানি 'মাল্যবান'-এ সম্ভব হয়নি, তাই উভয়ের হুবহু তুলনা করা সমীচীন নয়, আমরা শুধু উভয় স্রষ্টার কাজের মধ্যে মিল খুঁজে পাই ব'লে এই তুলনার অবতারণা। 'চারুলতা'-য় যেমন দুটি প্রসারিত হাত মিলনের মুহূর্তে এসে শিলীভূত হয়ে যায় বিরাট ব্যঞ্জনার আভাস দিয়ে, মাল্যবানের প্রশান্তি তেমনি স্বপ্নের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে চূর্ণ হয় ঘুম ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে, অথচ 'চারুলতা' বা 'মাল্যবান' উভয় রচনাই অশান্তি পেরিয়ে প্রশান্তির জনাই ব্যাকুল। যদি এই দুটি সৃষ্টি প্রশান্তির দরজায় করাঘাত করেও ফিরে এসে থাকে, তবু টিকে থাকার পথে কোনো বাধা আছে ব'লে আমরা মনে করি না।

'বীঠোফেনের কোনো কোনো Symphony বা Sonata-র ভেতর অশান্তি রয়েছে। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু আজো তো টিকে আছে- চিরকালই থাকবে টিকে তাতে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিল বলে।' (রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দ-র চিঠির অংশবিশেষ)

বাতিঘর

কৃষ্ণ ধর

[সামনে অবারিত সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে বালুবেলায়। দিগন্ত ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে জাহাজ। সমুদ্রসৈকতে মুখ-উপুড় কয়েকটা জেলে-নৌকো। পিছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাতিঘর। সমুদ্রের ধারে বাতিঘরের কাছে একটা ছোট্ট বাড়ির বারান্দায় বসে আছে নীলাদ্রি। তার সামনে বালির পাহাড় তৈরি করে খেলা করছে দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে শান্তা]

শান্তা। (পাহাড় সাজাতে সাজাতে)। এটা আমার পাহাড়।
নীলাদ্রি। এটা পাহাড়, না ইগলু?
শান্তা। ইগলু আবার কী?
নীলাদ্রি। ইগলু হল এস্কিমোদের বাড়ি
    বরফের বাড়ি।
শান্তা। না এটা পাহাড়, আমার পাহাড়
    সমুদ্র ওকে ছুঁতে পারবে না।
নীলাদ্রি। সমুদ্রের বুকে কত পাহাড় ঘুমিয়ে আছে
    তার জলের অতলে।
শান্তা। (আরও বালি চাপিয়ে) আমি আরও উঁচু করে দেব
    পাহাড়কে সমুদ্রের নাগালের বাইরে।
    এই দ্যাখো কাঁকড়া।
নীলাদ্রি। ওরা লুকোচুরি খেলতে ভালোবাসে
    বালিতে লুকোয় ওরা আপন খুশিতে।
শান্তা। একটা...দুটো...তিনটে কাঁকড়া
    এগুলো খুব ভালো, আমার পোষা।
নীলাদ্রি। কী করে চিনবে তাদের?
    সব কাঁকড়াই তো দেখতে অবিকল এক
    একই রকম তাদের ঘোরাফেরা, ব্যবহার।
শান্তা। মোটেই না, এদের সব্বাইকে চিনি আমি
    চিনি আমি আলাদা করে
    এগুলো আমার পোষা।
নীলাদ্রি। জান তো উঁচু থেকে, দূর থেকে
    মানুষকেও অবিকল এক মনে হয়
    যদি চড় বাতিঘরে, দেখবে নিচের দৃশ্য
    মানুষের চলাফেরা, সবই ভারি মজাদার ছবি।
শান্তা। (বাতিঘরের দিকে তাকিয়ে) আকাশের সমান উঁচু?
নীলাদ্রি। ওখান থেকে নিচের দিকে তাকালে

দেখা যায় লাল নীল হলদে বেগনি,
পোশাকের মুখোশ পরা যেন সব কাঁকড়ারই দল
ঘুরছে, ফিরছে, কেউ বা শুয়ে আছে সমুদ্রের তটে।
শান্তা। সমুদ্রের সঙ্গে কি ডাঙার
চিরকালের আড়ি?
নীলাদ্রি। আড়ি নয়, খুব তাদের ভাব।
শান্তা। তাহলে সমুদ্র কেন তার ঢেউয়ের আঘাতে
আমার বালির পাহাড় নেবে ভাসিয়ে?
কেন সে পর পর ছুঁতে আসে তাকে?
নীলাদ্রি। খুব বেশি ভাব বলে
বালিকে না ছুঁয়ে সে থাকতেই পারে না।
শান্তা। সমুদ্রের শেষ কোথায়?
নীলাদ্রি। তার শেষ নেই।
শান্তা। (অবাক হয়ে) যত দূর যাই শেষ নেই তার?
নীলাদ্রি। তার শুরু নেই শেষও নেই
মানুষের মনের মতো, আদি অন্ত নেই
সে শুধু পৃথিবীকে আদরে জড়িয়ে রাখে
মায়ের মতো
তার প্রাণকে, তার সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।
শান্তা। কী করে জানলে তুমি?
নীলাদ্রি। কী করে জানলুম? আমি যে জাহাজে
চড়ে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি
দেশ থেকে দেশান্তরে, বন্দরে শহরে
নতুন মানুষজন, ঘরবাড়ি, সভ্যতা সমাজ
কত কিছু দেখেছি যে আমি!
শান্তা। এই বাতিঘর?
নীলাদ্রি। এ হল নাবিকের আকাশপ্রদীপ।
সমুদ্রের বুকে যারা ভাসে
তাদের পথ দেখায় সারারাত জেগে
পথহারাদের পথের নিশানা।
শান্তা। (হাততালি দিয়ে) এই দ্যাখো আমার কাঁকড়াগুলো
কী হুটোপাটি লাগিয়েছে
একটা...দুটো...তিনটে...চারটে
কাঁকড়াদের সভা বসে গেছে।
নীলাদ্রি। ঠিক মানুষেরই মতো
যদি চড় বাতিঘরে দেখবে নিচের দৃশ্য
মানুষের ঘরবাড়ি দেখতে যেন পুতুলের ঘর
সব যেন তোমার ওই কাঁকড়াদের বালির পাহাড়।

শান্তা। বাতিঘর কখন ঘুমোয়?

নীলাদ্রি। সূর্য জাগলে তার ছুটি।

বাতিঘর তো সমুদ্রের রাত্রির পাহারা

সমুদ্র ঘুমোয় না, বাতিঘরও না

সারারাত সে জেগে থাকে একা একা।

শান্তা। কার সঙ্গে সে কথা বলে?

নীলাদ্রি। যারা সমুদ্রে পথ খোঁজে

যারা শুধু নক্ষত্রের ভাষা বুঝে চলে

বাতিঘর তাদের সঙ্গেই আলোর সংকেতে

কথা বলে।

শান্তা। যখন ঝড় ওঠে?

নীলাদ্রি। ঝড়ের ডানা চেপে ধরি আমরা

নিকষ কালো মেঘের বুক চিরে

পেশীছে দিই আলোর ঠিকানা।

শান্তা। (বালির পাহাড়ে হাত দিয়ে) ওই দ্যাখো আবার পালাল

একটা . দুটো. .তিনটে...চারটে

আয়রে আয় আমার কাঁকড়াসোনা আয়

[হাততালি দিয়ে হাসে]

নীলাদ্রি। (শান্তার সুরে সুর মিলিয়ে) আয়রে আয়

শান্তার কাঁকড়াসোনা আয়।

শান্তা। (হঠাৎ খেলা ফেলে) মা...আমার মা কখন আসবে?

নীলাদ্রি। (ঘড়ি দেখে) এই সময় হল।

শান্তা। (সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে) ওই দ্যাখো

কত বড় ঢেউ।

[ছুটে যায়]

নীলাদ্রি। বেশি দূরে যেও না শান্তা।

শান্তা। আমি ঢেউয়ের সঙ্গে ছুটব।

[বলতে বলতে সে ছুটে চলে যায়। শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ। শোনা যায় ঝাউগাছের ভিতর দিয়ে আসা বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। সন্ধ্যে হয়ে আসে। জ্বলে ওঠে বাতিঘরের আলো। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল শবরী—শান্তার মা।]

শবরী। খেলাঘর বানাচ্ছ নীলাদ্রি?

নীলাদ্রি। আমি নয় শবরী, তোমার মেয়ে শান্তার

হাতে গড়া কাঁকড়াদের বাড়ি।

শবরী। শান্তা, শান্তা কোথায়?

নীলাদ্রি। শান্তা দৌড়ুচ্ছে ঢেউয়ের সঙ্গে।

শবরী। এককালে আমি দৌড়ে ফার্স্ট হতুম

তুমি ভাবতে পার?

নীলাদ্রি। সবই ভাবতে পারি শবরী

থামা মানেই পিছিয়ে পড়া।
তাই শুধু চলো, এগিয়ে চলো
পিছনে তাকাবার দরকার কী?

শবরী। কথায় বলে দৌড়ুতে পারলে দাঁড়াবে না।

নীলাদ্রি। (হাত ধরে টেনে) আর দাঁড়াতে পারলে বসবে না
এখন তো বসো।

শবরী। (হেসে) তোমার বাতিঘর সাক্ষী।

নীলাদ্রি। কীসের?

শবরী। তুমি আমায় হাত ধরে বসালে।

নীলাদ্রি। সে সবই দেখে কিন্তু বলে না কিছুই।

শবরী। (আরও ঘন হয়ে) আমার রক্তাক্ত হৃদয়।

নীলাদ্রি। (আদর করে) সমুদ্র সব শান্ত করে দেবে
সে তার নীল জলে ধুয়ে মুছে দেবে সব।

শবরী। আমার হৃদয় পর্যন্ত সে পৌঁছুতে
পারবে কি নীলাদ্রি?
সে তো ছুঁতে না ছুঁতেই ফিরে যায়
নিজেরই গভীরে।

নীলাদ্রি। ওটা ওর ভারসাম্য
নইলে যে সব অতলে হারিয়ে যেত।

শবরী। আমিও ব্যালান্স রেসে প্রাইজ পেতুম
কিন্তু কী হল?

নীলাদ্রি। কে উত্তর দেবে শবরী?
সমুদ্র তো একা-একাই কথা বলে।

শবরী। উত্তর না পেলে আমি বাঁচব না
জীবনের জটিলতার পাকে বন্দী হয়ে
বিবর্ণ হয়ে গেছে সব।

নীলাদ্রি। সুন্দরের মৃত্যু নেই
নিজেরই ভস্ম থেকে সে আবার বেঁচে ওঠে
তুমি নিরাশ হয়ো না
তোমাকে নতুন করে বাঁচতে হবে
বাঁচাতে হবে জীবনের যা কিছু সুন্দর।

শবরী। চারদিকে কাঁটাবন
চলতে গেলেই পায়ে লাগে।

নীলাদ্রি। তাতেই তো বাঁচার আনন্দ।
লতার মতো বাঁচা নয়
পুষ্পিত তরুর মতো, সূর্যের মদের মতো
লাল রক্ত রোজ পান করে।

শবরী। জীবন কবিতার উপমা নয়।

নীলাদ্রি। কবিতাই জীবনের উপমায় রূপে
নিজেকে নির্মাণ করে।
শবরী। আমাদের বিবর্ণ জীবনে
কবিতা কোথায়?
সে তো গদ্যময়, সংগীতবিহীন।
নীলাদ্রি। গদ্য কিন্তু হেলাফেলা নয়
কবিতারই উৎস থেকে গদ্যের নির্মিতি
সচল, সুন্দর।
সমুদ্রের ঢেউ যদি কবিতার লাবণ্যে চঞ্চল
বালিভরা শক্ত তট গদ্যের বসতি।
শবরী। সমুদ্র কি আমার সব সন্তাপ
জুড়োতে পারে?
নীলাদ্রি। সমুদ্রের রহস্য জানে ওই নীল আকাশ,
তেজস্বী দুরন্ত সূর্য আর সিক্ত, তপ্ত বালুবেলা।
শবরী। শান্তাকে নিয়েই যত ভাবনা আমার।
নীলাদ্রি। (দূরে তাকিয়ে) ওই দ্যাখো হরিণশিশুর মতো
শান্তা দৌড়ুচ্ছে খেলাচ্ছলে।
শবরী। শান্তা এক অদ্ভুত মেয়ে
এমনিতে মা মা করবে সারাক্ষণ
কিন্তু বাবা-অন্ত প্রাণ
যাকে আমি ছেড়ে এসেছি তার জন্য
তার আকুলতা।
নীলাদ্রি। আমরা ওকে ভুলিয়ে রাখব শবরী
ওকে ভরিয়ে রাখব ভালোবাসায়।
শবরী। এত বড় দাবি, আমাদের দুজনের দাবি
তুমি পারবে পূরণ করতে?
নীলাদ্রি। এখন নয়, সময় এলে প্রমাণ দেব।
আমি ছিলুম ঘর-পালানো, বাপে-তাড়ানো
মা-মরা দস্যি ছেলে
সারা জীবন ঘুরে বেড়িয়েছি একটু মমতা,
একটু সান্ত্বনা, একটু আশ্রয়ের আকুলতায়।
শান্তার মনটা আমি বুঝি।
শবরী। জানি না, আমি কিছু জানি না
একবার আগুনে হাত পুড়িয়েছি আমি।
নীলাদ্রি। আমি তাতে প্রলেপ দিতে চাই
তুমি বিশ্বাস করো।
শবরী। আমার সব ইতিহাস জেনেও?
নীলাদ্রি। তোমার জন্মের জন্য তুমি দায়ী নও।

তোমার মায়ের ভুল কেন সারা জীবন
বইতে হবে তোমাকে?
কী তোমার দোষ?

[নীরবতা]

শবরী। বিশ্বাস করো নীলাদ্রি, আমি কিছু জানতুম না
মা আমাকে চিরকাল রেখেছেন দূরে দূরে
হস্টেলে, কনভেন্টে।
বাবাকে কোনোদিন দেখিনি,
শুনতুম তিনি বহুদিন নিরুদ্দেশ।
সবারই বাবা আসত হস্টেলে দেখা করতে
আমার কোনো ভিজিটর ছিল না।
কার্সিয়ঙে সেই ক'টা বছর কী ভীষণ নিরুত্তাপ,
নির্জন বিষাদ!
কী ভীষণ নিঃসঙ্গ করুণ!
আমি আর সেরকম জীবন চাই না শান্তার।

নীলাদ্রি। মানুষ মানুষকে দুঃখ দিয়েই বুঝি সুখ পায়,
তার কোনো পাপবোধ নেই।

শবরী। আমার মেয়ে?
তুমি তাকে সইতে পারবে?
যদি তোমার আমার মাঝখানে তার ছায়া পড়ে?

নীলাদ্রি। আমারও অতীত আছে তা তো জান
স্বাতী আমাকে ছলনা করেছিল।

শবরী। আমার বয়স!

[খানিকক্ষণ নীরবতা]

আমার বয়স? তুমি আমার শরীরটা
ভালো করে দ্যাখো নীলাদ্রি,
তুমি স্বপ্নের চোখে তাকিও না।
আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না,
যাকে সব উজাড় করে দিয়েছিলুম
সে হেলাফেলায় সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল
এখন আমার আর কী আছে দেবার?
কী আছে?

নীলাদ্রি। দোহাই তোমার, ও কথা বোলো না
আমাকে ভালোবাসতে দাও।

শবরী। (অন্য মনে) ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে

[নীরবতা]

এরকম সুজয়ও বলত,
দিনরাত কানের কাছে মৌমাছির মতো

সেই অলৌকিক গুঞ্জরন :
আমাকে ভালোবাসতে দাও...ভালোবাসা শর্তহীন
সে সব-কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে।
আহ্, সেই অসামান্য দিনগুলি থেকে খসে-পড়া
স্বপ্নের পালক পড়ে আছে পাহাড়ী ঝরনার পাশে
পড়ে আছে ডানাভাঙা পাখি।
পাহাড়ের রুপোলী নৈঃশব্দ্য জানে,
জানে তিস্তার দুরন্ত জল
সেই সব স্মৃতি আমি দুহাতে ঝেড়ে ফেলে এসেছি।
নীলাদ্রি। তাই এসো নতুন স্বপ্নের নীড়ে।
শবরী। আমার ভয় করছে,
আমি নতুন করে কিছুই ভাবতে পারছি না।
নীলাদ্রি। আমার তাড়া নেই শবরী,
তোমার যখন সময় হবে তখুনি
আমারও সময়।
শবরী। জন্মাবধি মুখোশ-পরা ভয়
আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।
যতবার তার কাছ থেকে পালাতে চাই
সে হিংস্র ছায়ার মতো আমাকে তাড়া করে।
নীলাদ্রি। তুমি অধীর হোয়ো না।
শবরী। আমি যতবার দূরে চলে আসি
ততবার সেই স্মৃতি হানা দেয়
আমাকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দিয়ে যায়।
কেন স্মৃতি? কেন দুঃখ? কেন এই নির্লিপ্ত বিষাদ?
কেন? কেন? কেন?
[হাত দিয়ে মুখ ঢাকে]
নীলাদ্রি। তুমি নিজেকে বুঝতে শেখো।
শবরী। কী বুঝব? কেমন করে বুঝব?
নীলাদ্রি। সমুদ্র যেমন বুঝতে পারে তার গভীরকে
আকাশ যেমন জানে তার অসীম অনন্তকে।
শবরী। সে কি বোঝা? না বোঝার রূপক?
[নীরবতা]
আমি জানিনে, কিছু জানিনে।
তুমি ঠিক জান? ভুল করে ভুল পথে
পা দাওনি তো?
নীলাদ্রি। কীসের ভুল?
শবরী। এই ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা?
ঘর সে তো মরীচিকা...তৃষ্ণার্তকে নিয়ে যায়

লোভ দেখিয়ে
তারপর শূন্যে মিলিয়ে যায়।
পড়ে থাকে তপ্ত মরু, নির্মম সূর্যের তাপ
আর তৃষাতুর দিগন্ত জুড়ে
মৃত্যুর হাতছানি।
নীলাদ্রি। আজ এ কথা কেন?
শবরী। শান্তা, কী ভাববে শান্তা?
নীলাদ্রি। ও হবে আমাদের দুজনের মাঝখানে
স্বপ্নের সেতু।
শবরী। যে মানুষ আমাকে বঞ্চিত করেছে
তারই রক্ত ওর গায়ে।
নীলাদ্রি। তুমি ওকে বুঝতে দাও
ভালোবাসাহীন জীবন কী করুণ অভিশাপ!
তুমি ওকে সে কথা বোঝাও।
শবরী। সে কি অতশত বুঝতে পারে?
নীলাদ্রি। সে তো জানে তুমি সব ছেড়ে
চলে এসেছ।
সে তো জানে তুমি নিঃসঙ্গ একাকী।
সে তো জানে কীভাবে বঞ্চিত তুমি!
শবরী। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না
জীবনের স্বপ্ন দেখা যাকে দিয়ে শুরু
সে দস্যুর মতো আমার স্বর্ণচাঁপা দিনগুলো
লুঠ করে নিয়ে গেছে।
এখন সে কেড়ে নিতে চায় আমার শেষ সম্বল
আমার শান্তাকে
নিষ্ঠুর, নির্মম।
নীলাদ্রি। এখনও তারই ছায়া।
শবরী। দুঃস্বপ্নের ছায়া
মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি
কে যেন শান্তাকে চুরি করে নিয়ে যায়
পাহাড়ের বাঁকে পথ হারিয়ে আমি ডাকি,
শান্তা, শান্তা, কোথায় আমার শান্তা?
আমি ছুটে যাই তাকে খুঁজতে।
প্রতিধ্বনি ফেটে পড়ে অট্টহাসিতে
সে হাসি আমার চেনা, অবিকল সুজয়ের কণ্ঠস্বর।
নীলাদ্রি। তার মুখ?
শবরী। মুখটাই তার মুখোশ
আমিই শুধু চিনতে ভুল করেছিলুম।

[নীলাদ্রি উঠে পায়চারি করে। সমুদ্রের দিকে তাকায়। দূরে বাতিঘরের ঘূর্ণমান আলো দিগন্ত থেকে দিগন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে। বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। শান্তা ছুটতে ছুটতে ঢোকে]

শান্তা। (মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে) মা দ্যাখো,
কত ঝিনুক কুড়িয়েছি।
[বালির পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে]
ওমা, আমার কাঁকড়াসোনা কোথায়?
এই যে, একটা...দুটো...তিনটে...চারটে
আয় এদিকে আয় বলছি।

নীলাদ্রি। (শবরীকে) তোমার রোহিণী আছে তো?
একটু তৃষ্ণা মেটাবার আয়োজন করতে বলি।
[ভিতরে চলে যায়]

শান্তা। মা, তুমি অমন করে বসে আছ কেন?
শবরী। একটু গল্প করছিলুম।
শান্তা। কী গল্প?
শবরী। এক রাজকন্যার, যার ভারি দুঃখ।
শান্তা। ও গল্প আমি শুনব না।
আজ কি বাবা আসবে?
শবরী। তোমার বাবা তো আমার কাছে
আসবে না।
শান্তা। আমি বাবার কাছে যাব।
শবরী। আমাকে ছেড়ে যাবি তুই?
শান্তা। তুমি বাবাকে ভালোবাসো না?
শবরী। শান্তা!
শান্তা। আমি জানি, আমি জানি মা
তোমরা কেউ কাউকে ভালোবাসো না।
শবরী। ও কথা বলছিস কেন?
আমি তো তোকে ভালোবাসি,
তুই তো আমাকে ভালোবাসিস।
শান্তা। আমি সব্বাইকে ভালোবাসি
তুমি আমার মা...আমার সোনা মা।
[মাকে আদর করে]

শবরী। রোহিণী, রোহিণী
[পরিচারিকা রোহিণী চায়ের ট্রে নিয়ে ঢোকে। সঙ্গে নীলাদ্রি।]
শান্তা, তুমি এখন রোহিণীর সঙ্গে যাও
রোহিণী। এসো দিদিমণি, আমরা যাই
দুজনে খেলা করিগে।

[শান্তাকে নিয়ে রোহিণী চলে যায়। নীলাদ্রি চা খেতে খেতে টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে শিরোনামগুলো জোরে জোরে পড়তে থাকে।]

নীলাদ্রি। যা করেছি তার জন্য অনুতপ্ত নই :
কবীরা মৃত্যুর সময়েও তৃষ্ণার জল পায়নি ;
ময়দানের একশো গাছ বিদায় নিতে চলেছে ;
পাখিরা আসছে চিড়িয়াখানার লেকে।
শবরী। কোথাকার পাখি ?
নীলাদ্রি। সুদূর সাইবেরিয়ার।
শবরী। কী করে ওরা পথ খুঁজে পায় ?
কে ওদের নিশানা বলে দেয় ?
নীলাদ্রি। ঝরনা যেমন জানে তার নদীকে
ভ্রমর যেমন জানে ফুটন্ত পদ্মদল
এইসব পাখিরাও আকাশের গন্ধ চিনে চিনে
দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দেয় নির্ভুল ডানায়।
শবরী। শীতের অন্তিমে ওরা ফিরে যায়
একই পথে ?
নীলাদ্রি। আকাশের উষ্ণতা ওদের ডেকে নিয়ে আসে
ওদের আছে ডানা, আছে মাটির আকর্ষণ
ওরা রৌদ্রের করতলে ছায়া ফেলে মুখে।
শবরী। শুধু আমরাই পথ ভুল করি।
নীলাদ্রি। সে ভুল তো তোমার নয় শবরী,
তুমি পিছনের দিকে তাকিও না।
অফুরন্ত রোদের ভিতর তুমি দ্যাখোনি
পাখিরা যেমন সহজেই ডানা মেলে ওড়ে।
শবরী। শান্তা আমাকে ভুল বুঝবে
এ আমি সইতে পারব না।
আমারই রক্ত দিয়ে গড়া যার অস্তিত্ব
তার ভুল বোঝা নির্মম অভিশাপ।
[রোহিণীর প্রবেশ]
বাতিঘর থেকে লোক ডাকছে বাবুকে।
নীলাদ্রি। আমি আসছি শবরী,
এসে আমরা বেড়াতে যাব।
[নীলাদ্রি চলে যায়। প্রকাণ্ড বেলুন হাতে নিয়ে শান্তা ঢোকে। রোহিণী বেরিয়ে যায়।]
শান্তা। মা
শবরী। (হঠাৎ চমক ভেঙে) বেলা হয়ে গেল ?
শান্তা। আমি এখন তোমার কাছে থাকব।
শবরী। আমি একটু বেরব নীলাদ্রির সঙ্গে।
শান্তা। আমিও যাব।
শবরী। এখন তুমি যাবে না,
আমরা এক্ষুনি আসব।

শান্তা। না, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

[মায়ের আঁচল ধরে মাথা নিচু করে থাকে। তারপর মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে।]

শবরী। (আদর করে) বুড়ো মেয়ে আবার কাঁদে।

শান্তা। না, তুমি যাবে না,
আমি তোমার কাছে থাকব।

শবরী। রোহিণী, রোহিণী!

শান্তা। না না আমি রোহিণীর কাছে থাকব না
তুমি আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো
আমি এখানে থাকব না
আমি এখানে কাউকে ভালোবাসি না।

শবরী। শান্তা, অমন অবুঝ হোসনে শান্তা।

শান্তা। তুমি যাবে না, যাবে না, কোথাও যাবে না
তুমি ওই বাতিঘরের দিকে আর যাবে না।
তুমি গেলে আমি ও-সমুদ্রে হারিয়ে যাব
ঠিক দেখো।

শবরী। (আর্তকণ্ঠে) শান্তা, তুই চুপ কর শান্তা,
চুপ কর।

[শান্তাকে জড়িয়ে ধরে শবরী কাঁদতে থাকে। বাতিঘরের ঘূর্ণ্যমান আলোর রেখা অন্ধকার আকাশের বুকে পথের নিশানা দেখায়। রাত্রির বুকে শোনা যায় ভাঙাভাঙা ঢেউয়ের নিরবচ্ছিন্ন ছলাৎছল শব্দ। সেও ওদের দুজনের কান্নারই মতো।]

সুরসাধক ভীষ্মদেব

নারায়ণ চৌধুরী

কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি লোকান্তরিত হলে প্রচলিত বিয়োগাত্মক ভাষা একটা অভ্যাসমসৃণ বুলির মতো অনুসরণ করে বলা হয় যে, যিনি চলে গেলেন তাঁর শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও সুরকার ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কেও একথা বলা হয়েছে এবং বলা হতে থাকবে। কিন্তু তাঁর শূন্যস্থান পূরণ না হওয়ার কথাটা নিছকই একটি শূন্যগর্ভ বাচালঙ্কার নয়; তা যথার্থই একটি অর্থবোধক আন্তরিক উক্তি। সত্যই ভীষ্মদেবের শূন্যস্থান সহসা কিংবা সহজে পূরণ হবার নয়। তিনি যে-শূন্যতার সৃষ্টি করে গেলেন তার একটা আলাদা মাত্রা বা আয়তন আছে, আর যেহেতু তার একটা আলাদা মাত্রা বা আয়তন আছে সেই কারণে তার একটা আলাদা তাৎপর্যও আছে। সেই আলাদা তাৎপর্য কী, বর্তমান প্রবন্ধে সেইটাই পাঠকদের কাছে তুলে ধরবার জন্য খানিকটা চিন্তা-চর্চা করা যেতে পারে।

ওস্তাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রথম বয়সে নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কাছে সংগীত শিক্ষা করেছিলেন, পরে তিনি দীর্ঘকাল ওস্তাদ খলিফা বাদল খাঁ সাহেবের কাছে একনিষ্ঠ তালিম নিয়েছিলেন, কিংবা জীবনের একটা পর্বে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছ থেকেও তাঁর কিছু কিছু গান বা সংগীতাংশ আহরণ করবার সুযোগ হয়েছিল এসব তথ্য ভীষ্মদেবের মরণোত্তর স্মরণ-লিপিগুলিতে কম-বেশি বিশদভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আর সেগুলির পুনরাবৃত্তির সার্থকতা দেখি না। সুবিদিত তথ্যগুলির উপর নতুন করে আর একপ্রস্থ দাগা বুলিয়ে লোকান্তরিত শিল্পীর জীবনের একটা পূর্ণাবয়ব ছক হয়তো তুলে ধরা যায়, কিন্তু জীবনপঞ্জী রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়নি। পরন্তু, ভীষ্মদেবের সংগীতের বৈশিষ্ট্যবিচারই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। ভীষ্মদেব কেন ভীষ্মদেব হয়েছিলেন, কেন আর কারোর দ্বারা তাঁর শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়, কোথায় অন্যান্য কৃতী বঙ্গীয় সংগীতসাধকদের সঙ্গে তাঁর সুরসাধনার পার্থক্য আর প্রস্থান-রেখা, তার নিরূপণই এই প্রসঙ্গের মূল অন্বিষ্ট।

ভীষ্মদেবের সংগীতজীবনকে তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১৯২২ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো কি চোদ্দ, তিনি হিজ মাস্টার্স ভয়েসে নিধুবাবুর দুটি টপ্পা ('এত কি চাতুরী সহে প্রাণ' ও 'সখী কি করে লোকেরই কথায়') রেকর্ড করেছিলেন। সেই কাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ন্যূনাধিক ১৮ বৎসর কাল তাঁর সংগীতজীবনের প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে নিস্ক্রমণ এবং অবস্থিতি। এবং তৃতীয় কিংবা সর্বশেষ অধ্যায় অরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় (১৯৪৮) থেকে শুরু করে ১৯৭৭-এ মৃত্যু পর্যন্ত কমবেশি ২৯ বছর কালের বিস্তৃত পর্ব। এই তিন অধ্যায়ের মধ্যে প্রাথমিক পর্বটিই সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং সবচেয়ে গৌরবজনক। কেননা এই পর্বে ভীষ্মদেবের প্রতিভা ব্যাপ্তিতে আর গভীরতায় তার তুঙ্গসীমা স্পর্শ করেছিল। তারও মধ্যে আবার ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০—এই এক দশক সময়কে সর্বোত্তম কাল বলা যায়। ভীষ্মদেবের সৃষ্টিশীলতা আর জন-প্রিয়তা যেন এই কালে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে নেচে চলেছিল এবং যত তাঁর ব্যক্তিত্বমধ্যে সৃষ্টিশীলতার বিচ্ছুরণ হয়েছে ততই যেন তাঁর জনপ্রিয়তাও একটির পর একটি পাপড়ি উন্মোচন করে তার পূর্ণ-প্রস্ফুটিত রূপে প্রকট হয়ে উঠেছে।

ভীষ্মদেবের জনপ্রিয়তা লোকপ্রচলিত সস্তা জনপ্রিয়তা ছিল না। তা ছিল তাঁর স্বীকৃত সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার সহিত সংগীতপূর্ণ, সমানুপাতিক, এবং তা থেকে প্রসূত। জনপ্রিয়তাকে হালকা লোকরঞ্জন-ক্ষমতার সঙ্গে সমীকৃত করে দেখা সংগীতের ক্ষেত্রে অন্তত সব সময় গ্রাহ্য নয়। তার কারণ, সংগীতের সর্বজনীন আবেদনের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা মানুষের গভীরতম সত্তাকে পর্যন্ত আলোড়িত করতে পারে, করেও থাকে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুরোৎকর্ষের মধ্যে বিদ্যমান কিছু কিছু উপকরণ আপামর জনসাধারণকে বিমোহিত করবার ক্ষমতা রাখে। কাজেই তিনি জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন, অতএব তাঁর সুরসৃষ্টি কিঞ্চিৎ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা উচিত, এ-জাতীয় মনোভাব এক্ষেত্রে মান্যতা না পাওয়াই ভাল। তিনি লোকপ্রিয় গায়ক ছিলেন, সুতরাং তাঁকে সর্বভারতীয় স্তরের ওস্তাদ বলা যায় না—এরকম ইঙ্গিত দু-একটি পত্র-পত্রিকার বিয়োগ-পঞ্জীতে আভাসিত হতে দেখেছি। বলা বাহুল্য যে, এই ইঙ্গিত ভীষ্মদেবের সর্বজনস্বীকৃত প্রতিভার অবমাননার সমতুল্য। জনপ্রিয়তা ভীষ্মদেবের প্রতিষ্ঠার অন্যতর আয়তন মাত্র, সেইটাই সব নয়।

ভীষ্মদেবের পণ্ডিচেরী অবস্থিতির কাল সংগীতসৃষ্টির দিক থেকে কমবেশি বন্ধ্যা বলা যায়। এ পর্বে তিনি সংগীতচর্চা মুলতুবি রেখে অধ্যাত্মসাধনার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবনের কমবেশি দীপ্তিহীন বিমর্ষ অবস্থানের আলোকে এই পশ্চাদ্ধাবনকে আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভীষ্মদেব চিরকালই একটু ধর্মপ্রবণ ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু এবং ধর্মের গূঢ় রহস্য জানবার জন্য অস্থিরচিত্ত। বাল্য আর কৈশোরের বেশ কিছুকাল তিনি ধর্মাচরণের বহিরঙ্গাবেশ গেরুয়া নিজ অঙ্গে ধারণ করে-ছিলেন এবং ব্রহ্মচারীর মতো থাকতেন। তাই বলে খ্যাতির তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করবার পর হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, পরিবার-পরিজনের মায়া ত্যাগ করে, সংসারধর্ম পিছনে ফেলে, পণ্ডিচেরী আশ্রমে প্রস্থিত হবার মতো কী ঘটেছিল আজও আমরা তার সঠিক হদিশ খুঁজে পাইনি। হতে পারে, সংসারের মায়া তাঁর ধর্মসাধনার প্রতিবন্ধকতা করছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় ধর্মসাধনার উপায় ও উপকরণ কি সেই অবস্থাতেই তাঁর করায়ত্ত ছিল না? আমরা তাঁর সংগীতচর্চার কথা বলছি। তবে কেন তিনি সংসার ছেড়ে পণ্ডিচেরী যাওয়ার আকুলতা বোধ করলেন? সংগীত যাঁর হস্তা-মলকবৎ এক সহজায়ত্ত শিল্প, তাঁর কি আর অন্য ধর্মসাধনার প্রয়োজন আছে? আর কেনই বা এই প্রয়োজন? সংগীত নিজেই তো শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধনার এক অঙ্গ, অথবা সেইটেই ধর্মসাধনা।

সংগীতবিদ্যা নাদবিদ্যা। তার অর্থ, বিশ্বজগৎ-চরাচরে যে-অনাহত নাদ জ্যোতিস্তরঙ্গের আকারে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাকে স্বরের মাধ্যমে আন্দোলিত করে তোলার শিল্পের অপর নামই সংগীত। অনাহত নাদের আহত রূপকেই বলা হয় সংগীত। এই অনাহত-নাদ আর কিছু নয়, বিশ্বচরাচরপরিব্যাপ্ত সর্বত্রবিদ্যমান পরম চৈতন্যের প্রতীক। তাই যদি হয়, তাহলে ভীষ্মদেব কোন্ চতুর্বর্গ ফললাভের আশায় সংগীতসাধনা ছেড়ে অন্য সাধনায় মনপ্রাণ ঢেলে দেবার জন্য যোগাশ্রমে ধাওয়া করেছিলেন? এ কি ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবের নিষেবণ নয়? হাতের একটি পাখিকে ছেড়ে বনের দুটি পাখির জন্য এই আকুলিবিকুলি কি স্বীয় স্বভাবকে খণ্ডন করারই নামান্তর বোঝায় না?

আমি আজও ভেবে পাইনে কোন্ দুর্নিরীক্ষ্য কারণে ভীষ্মদেব তাঁর হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে স্বেচ্ছানির্বাসনে নিজেকে পাঠিয়েছিলেন? এরকম ভুল যে তাঁর কেন হল, কে বলতে পারে তার ভিতরের রহস্যের কথা? সংগীত যাঁকে মুক্তি দিতে পারত, তিনি গেলেন কিনা অন্যপ্রকার মুক্তির সন্ধানে ভিন্নতর সিদ্ধির হাতছানিতে প্রলুব্ধ হয়ে বিপথের অভিমুখে! আমার মনে হয়, ভীষ্মদেবের এই স্বধর্মত্যাগ ও পরধর্মগ্রহণের পেছনে তাঁর মস্ত বড় বিচারভ্রান্তি হয়েছিল। একজন

অপরিসীম প্রতিভাধর সংগীতসাধকের সমস্ত সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁকে তাঁর পূর্বতন অস্তিত্বের ছায়ামাত্রে পর্যবসিত করাটা যে কত বড় ভুল হয়েছে তার বুঝি পরিমাপ হয় না।

পণ্ডিচেরী গিয়ে তিনি সংগীতসাধনায় নিষ্ঠা হারিয়ে ফেলেছিলেন। অন্য কোন্ সাধনায় নিষ্ঠায় তিনি অতন্দ্র হয়েছিলেন তার খবর জানা যায় না। নিশ্চিতকে ছেড়ে অনিশ্চিতের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে তাঁর একূল-ওকূল দুকূলই খোয়া গিয়েছিল। তিনি 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে উঠেছিলেন। আট বৎসর আশ্রমবাসের ফলে তাঁর ধর্মসাধনার পথ কতকটা প্রশস্ত হয়েছিল কেউ জানে না। কিন্তু যেটা সকলে চোখের উপর দেখতে পেল, সুস্পষ্ট অনুভব করল, তা হল সংগীতসাধনার ক্ষুরধার পথ থেকে তাঁর দৃষ্টিগ্রাহ্য বিচ্যুতি আর স্খলন। তাঁর সেই আগের দিনগুলির কণ্ঠের ঔজ্জ্বল্য, ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, প্রাণশক্তি আর আনন্দের কলহাস্যমুখরতা কিছুরই আর কণামাত্র অবশিষ্ট ছিল না যখন ১৯৪৮ সালের মাথায় মোহভঙ্গ হয়ে আশ্রম থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন। এবারে আমরা কলকাতার জীবনে যে ভীষ্মদেবকে পেলাম তা আমাদের আগেকার দেখা আর চেনা ভীষ্মদেবের কঙ্কাল বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। এ নূতন ভীষ্মদেব পুরাতন ভীষ্মদেবের স্মৃতিমাত্রবহনকারী এক বিষণ্ণ সত্তা তাতে প্রাণ আছে কি নেই ঠিক ঠাহর হয় না। একটা জীবন্ত, অপরিসীম প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ, সৃষ্টির আবেগে ভরপুর, স্ফূর্তিমন্ত মানুষ নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ডবৎ হয়ে ওঠাটা যে কত বড় শোকাবহ ঘটনা তা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব।

পণ্ডিচেরী অবস্থানকালে ভীষ্মদেবের অন্তর্জীবনের কি কোনোরূপ উন্নতি হয়েছিল? আমরা ঠিক বলতে পারব না। আমাদের বন্ধুবান্ধব-পরিচিত জনদের মধ্যে যাঁরা ধর্ম সম্বন্ধে অত্যুৎসাহী, ধর্মের প্রসঙ্গ ওঠামাত্রই ভাবোন্মাদনায় যাঁদের চোখের তারা উল্টোবার উপক্রম হয়, তাঁরা বলতে চান যে, ভীষ্মদেব আট বৎসর কালস্থায়ী পণ্ডিচেরী বাসের ফলে অধ্যাত্মমার্গের অনেক উচ্চস্তরে অধিরোহণ করেছিলেন, তাঁর সিদ্ধি বাইরে থেকে প্রত্যক্ষগোচর হওয়ার মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন বস্তু নয়, তা ভিতরে ভিতরে অনুধাবন এবং অনুভব করবার জিনিস। কিন্তু এই অনুভবগম্যতা বুঝি আমাদের আয়ত্তের বাইরেকার ব্যাপার। আমরা যাঁরা সাধারণ স্তরের মানুষ, চর্মচক্ষে যা দেখি তার বাইরে আর কিছু দেখতে পাই না, তাদের চোখে ভীষ্মদেব একেবারেই হারিয়ে গিয়েছিলেন। পণ্ডিচেরী থেকে ফিরে আসার পর তিনি প্রায় তিন দশক কাল কলকাতায় বাস করেছেন, কিন্তু সেই বাসকে প্রায় অজ্ঞাতবাসের কোঠায় ফেলা যায়। এই কি সেই ভীষ্মদেব, যাঁকে আমরা জানতুম চিনতুম ভালবাসতুম, যাঁর প্রতিটি সুরের লহরীলীলায় শ্রোতার প্রীতির স্রোতে ভেসে উঠত আনন্দের অগণিত পান্নাচুনীমোতি ও মরকত-খণ্ড, যাঁর সুরের সম্মোহনে চারিদিককার পরিমণ্ডল এক লহমায় সুরময় হয়ে উঠত এবং তার প্রভাবে তাবৎ সুর একটিমাত্র সুরে সংহত হয়ে আবহের ভিতর গমগম করত? যে সুরকে প্রাচীন ঋষিরা 'ওঙ্কার' নামে অভিহিত করেছেন, যা সর্বত্র ব্যাপ্ত, সর্বচরাচরময় যে ধ্বনিতরঙ্গের বিস্তৃতি, সেই মন্দ্র নাদধ্বনিকে ভীষ্মদেব চকিতে আবাহন করতে পারতেন তাঁর সংগীতের জাদুতে। কী অসাধারণ প্রাণের দীপ্তি ছিল এই মানুষটির! যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদুতে মুগ্ধ হয়েছিলেন, চিত্তের স্ফূর্তিতে সংক্রামিত হয়েছিলেন। কোথায় গেল সেই প্রাণের দীপ্তি, অন্তরের উল্লাস, কোথায় গেল নিত্য নবনব সুরসৃষ্টির দৈবী ক্ষমতা?

ভীষ্মদেব তো শুধুই গায়ক বা সুরকার ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুরস্রষ্টা আর সুরসাধক। তাঁর সুরসাধনাই ছিল ধর্মসাধনা, এ ভিন্ন আর কোন ধর্মসাধনায় তাঁর প্রয়োজন ছিল না। সেই মানুষটি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে কীরকম বদলে এলেন সে তো আমরা চোখের উপর দেখতে পেলুম। এরপরেও যাঁরা বলেন ভীষ্মদেবের আশ্রমবাস তাঁর অধ্যাত্মজীবনের সমুন্নতির কারক হয়েছিল তাঁরা

নিজেদের প্রবঞ্চনা করেন, অপরকেও প্রবঞ্চনা করেন। আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি এই যে, পণ্ডিচেরী গমনের ফলে ভীষ্মদেবের এবং দেশের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। এতদ্দ্বারা দেশ তার একজন শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টাকে হারিয়েছে। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, যোগমার্গের শরণ নেওয়ার ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার উত্তরে বলব যে, ধর্মের ক্ষেত্রে এটা যদি উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় তাহলে সংগীতের ক্ষেত্রে এটা অবনতির প্রমাণ। ধর্মের পক্ষে যা লাভ, তা সংগীতের পক্ষে ক্ষতি। ভীষ্মদেব কলকাতায় ফিরে আসার পর পুরানো দিনের ভীষ্মদেবকে আর আমরা কখনো ফিরে পাইনি। এক নিষ্প্রভ, নিরুত্তাপ, নিরুজ্জ্বল গায়ক-সত্তা আমাদের মধ্যে বাস করে গেছেন গত ত্রিরিশ বৎসর কাল, যাঁর ভৌতিক দেহ এই সেদিন ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রমের মুখে পঞ্চভূতে অবসিত হয়ে গেল।

ভেবেছিলাম ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথাটা উহ্য রাখব কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম ভীষ্মদেবের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটনের জন্যেই ব্যক্তি-প্রসঙ্গের কিছু পরিমাণ অবতারণা করা দরকার, নয়তো তাঁর সাংগীতিক পরিচয়টাই কেবলমাত্র দেওয়া হবে। তাঁর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তেমনভাবে আভাসিত হবে না লেখায়। অথচ মানুষটা ভীষ্মদেব কেমন ছিলেন সেটা জানতে চাওয়াও পাঠকের পক্ষে একান্তরূপে স্বাভাবিক।

বছর তিন-চার আমি ভীষ্মদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেটা তাঁর পণ্ডিচেরী নিষ্ক্রমণের আগের অধ্যায়ের কথা। সেই সময়ে তিনি ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের কাছে নিয়মিত সংগীতাভ্যাস করছেন এবং জোলিয়াটোলাস্থিত বলরাম দে স্ট্রীটের নিজগৃহে বহু-সংখ্যক শিষ্য-অনুশিষ্যকে গানের তালিম দিচ্ছেন। আমি সাধারণত সকালের দিকেই তাঁর বাড়ি যেতাম। প্রায় প্রত্যহ নটা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা একটা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত সংগীতের চর্চা চলত, শিষ্যেরা গাইতেন, নিজেও প্রায়শ তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ যোগ করতেন। যেদিন গানের 'মেজাজ' আসত, সেদিন নিজেই অবিরলধারে গেয়ে যেতেন সুরাবিষ্ট এক সম্মোহিত জনের মতো। পড়ে থাকত তালিম, পড়ে থাকত আর সবকিছু। ওইসব প্রাতঃকালীন একান্ত আসরেই ভীষ্মদেবের সংগীত-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি এত কাছে থেকে সন্দর্শন করার বিরল সুযোগ আমাদের জীবনে ঘটেছিল। ভীষ্মদেবের সেই তন্ময় সাধকের রূপ কখনও ভুলতে পারব না। এই হয়তো বন্ধু-সখা-শিষ্যপরিবৃত হয়ে হাস্যপরিহাস করছেন কি জাগতিক স্তরের কথাবার্তা বলছেন, কিন্তু কণ্ঠে সুরের ছোঁয়া লাগতেই একেবারে অন্য মানুষ। ধ্যানসমাহিত তাঁর সে রূপ একমাত্র আত্মস্থ যোগীর রূপের সঙ্গেই তুলনীয়। যেদিন বাদল খাঁ সাহেব আসতেন, সেদিন আসর এগোত না, শিক্ষার্থী-দের গান শেখার পালা চুকিয়ে ওস্তাদজীকে নিয়ে উপরের ঘরে চলে যেতেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবীণ-নবীন খ্যাতমান-অখ্যাত সব স্তরের মানুষই ছিলেন। শিষ্য বা সংগীত-কুতূহলী-রূপে যাঁদের ওই সময়ে ভীষ্মদেবের গৃহে প্রায় নিয়মিত আনাগোনা করতে দেখেছি তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করছি—শচীন দেববর্মণ, যূথিকা রায়, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, নরেন মুখোপাধ্যায়, জীবন উপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী (সংগীতশাস্ত্রী সুরেশ চক্রবর্তী নন, ইনি ভিন্ন ব্যক্তি), ভোলা সেন, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

দেখতাম ভীষ্মদেব বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে জমাটভাবে আসর সরগরম করে রাখতে ভালবাসলেও অন্তরে কোথায় যেন তিনি একচারী ছিলন। এই মুহূর্তে হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণোচ্ছলভাবে গল্পগুজব করছেন, পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে যেতেন এবং নিজের অন্তরে তলিয়ে যেতেন। বেশ বুঝতে পারা যেত, বাইরের সামাজিক জীবনের সমান্তরালে তাঁর একটি নিঃসঙ্গ নিভৃত জীবন ছিল, যেখানে তিনি একক ও জিজ্ঞাসু। খুব সম্ভব এই একাকিত্ব ও জিজ্ঞাসাপ্রবণতার সূত্র ধরেই

পণ্ডিচেরীর আশ্রমিকরা তাঁর হৃদয়মধ্যে প্রবেশের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সেই পথে তাঁকে সংগীত-জগৎ তথা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন।

ভীষ্মদেবের সঙ্গে আমার গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক ছিল, আবার একপ্রকার সৌখ্যও ছিল। সৌখ্যের বশে—যখন ধারেকাছে অন্য কেউ ছিল না তখন তিনি একদিন আমাকে পণ্ডিচেরী আশ্রম সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি সাধ্যমত সেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কারণ, পণ্ডিচেরীর দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু আমি কি তখন জানি যে দিলীপকুমারের উৎসাহে তিনি ভিতরে ভিতরে পণ্ডিচেরী যাওয়ার জন্যে ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছেন? জানলে নিশ্চয়ই আমি তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতাম এবং সর্বসাধ্য উপায়ে তাঁর যাওয়া আটকাতাম। এক ছুটিতে দেশের বাড়ি কুমিল্লায় যাই, সেখানে বসেই খবর পাই ভীষ্মদেব বাংলাদেশ ও কলকাতার মায়া কাটিয়ে, পরিবার-পরিজনদের মোহপাশ ছিন্ন করে, পণ্ডিচেরী প্রস্থান করেছেন। বাংলার সংগীতজগতের পক্ষে এ যে কত বড় বিপর্যয় তার ধারণা তখন মনে সম্যকরূপে প্রতিভাত না হলেও পরবর্তী ঘটনার ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিধিমতেই তা উপলব্ধি হয়েছিল এক সময়ে। কিন্তু হায়, তখন আর প্রতিকারের উপায় ছিল না।

ভীষ্মদেবের কয়েকটি চরিত্রবৈশিষ্ট্য কাছে থেকে লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছিল। তিনি আপন প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ঠিকই, কিন্তু অন্য কারও শক্তিমত্তাকে খাট করে দেখার অভ্যাস তাঁর ছিল না। তাঁর মুখে অপরের নিন্দা-মন্দ কখনও শুনিনি। যেখানে প্রাণ খুলে প্রশংসা করতে পারতেন না, চুপ করে যেতেন। রবীন্দ্রসংগীতের তিনি অনুরাগী ছিলেন এমন বলা যায় না, (সত্যিকারের রাগশিল্পীর পক্ষে অনুরাগী হওয়া সম্ভবও নয়), কিন্তু চেষ্টা করেও তাঁকে রবীন্দ্র-সংগীতের সমালোচনায় আকর্ষণ করতে পারিনি। তিনি ওই প্রসঙ্গে নীরব থাকতেন। তিনি ভোজন-প্রিয় ছিলেন, মাংস খেতে খুব ভালবাসতেন, কিন্তু পেটুক তাঁকে কোনমতেই বলা যায় না। কারণ দিনের পর দিন স্রেফ তাঁর অতিপ্রিয় পানদোক্তা আর চা খেয়ে কাটিয়েছেন তার নজির আছে। ভোজন-রসিকতার অন্তরালে তাঁর অন্তরের এক নিবিড় বৈরাগ্য ছিল, যার সন্ধান শুধু তাঁর অতি নিকট জনেরাই রাখতেন ও পেতেন। ইংরিজি সিনেমা দেখার বেজায় শখ ছিল (চতুর্থ দশকের কথা বলছি), কিন্তু কী আশ্চর্য, দল বেঁধে দেখতেন না, একা-একা দেখতেন আর তাও নাইট-শোয়ে। আমার মনে হয়, বিদেশী ছবির মিউজিকের আকর্ষণে তাঁর ওই একক নৈশ অভিযান। বিলিতি বা হলিউডের ছবি যত রদ্দিই হোক, সেগুলির অধিকাংশেরই মিউজিক রীতিমত তারিফ করবার মতো। অন্তত আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে। ভীষ্মদেব একাধিক চলচ্চিত্রের সংগীত-পরিচালক ছিলেন। হয়তো বিদেশী ছবি থেকে সুরের 'ক্লেজ' আহরণ করে দেশী ছবির সংগীতাংশ সমৃদ্ধ করবার তাগিদে তাঁর এই নিশীথ সিনেমা পরিক্রমায় তিনি বের হতেন, ঠিক বলতে পারব না।

•

ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বর যে খুব উচ্চাঙ্গের ছিল তা বলা যায় না। এর চাইতে উৎকৃষ্টতর কণ্ঠ-স্বরের অধিকারী শিল্পী আমাদের জীবৎকালেই আমরা দেখেছি, যেমন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীদের কণ্ঠ। আমি আপাতত বাংলার রাগ-সংগীত-গায়কদের কথাই বলছি, অন্যান্য রাজ্যের শিল্পীদের সঙ্গে প্রতিতুলনার মধ্যে যাচ্ছি না। সাধারণত বেশ একটু চড়া সুরে তিনি গাইতেন। ঠুংরীর স্কেলের যেটা ষড়্জ কিংবা ঋষভ সেটাই ছিল তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক 'সা' সুর। অর্থাৎ তিনি হারমোনিয়মের স্কেলের 'ই' কিংবা 'এফ শার্প'-এ সচরাচর সুর বেঁধে গান গাইতেন। যার ফলে মেয়েদের কণ্ঠস্বরের মতো প্রায়ই একটা ধাতব সুর ফুটে উঠত তাঁর গলায়। পুরুষের কণ্ঠে এই ধাতব ঝঙ্কারধ্বনি, বলাই বাহুল্য, খুব সুমধুর স্বরাভাস বয়ে আনত না, বরং

সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, এই ধাতব ধ্বনির মধ্যে একটা কার্কশ্যের দ্যোতনা ছিল। কিন্তু এই সহজাত ত্রুটিপূর্ণ কণ্ঠস্বর নিয়ে তিনি কী অপূর্ব সুরসৃষ্টিই না করতে পারতেন। তাঁকে সুরের জাদুকর বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুর যেন তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে ফুলঝুরির মতো ঝরে ঝরে পড়ত। তাঁর রাগপ্রধান বাংলা গানগুলো যাঁরা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমার এ কথায় সঙ্গে সায় দেবেন যে, তাঁর সুরসৃষ্টির ক্ষমতার কোন পারাপার ছিল না। কী কথার সুললিত উচ্চারণে, কী সুরবিস্তারের মাদকতায়, কী সরগম সংযোজনার লাবণ্যে, কী সুরের আরোহাবরোহের চড়াই-উৎরাই সিঁড়ি-ভাঙার অবলীলায়িত দ্রুত গতিময়তায় তাঁর এই গানগুলি মৌলিক সুরসর্জনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে রইল। 'ফুলের দিন হল যে অবসান' (জয়জয়ন্তী), 'নবারুণরাগে তুমি সাথী গো' (ভৈরবী), 'শেষের গানটি' (ঠুংরি), 'আলোকলগনে' (রামকেলি), 'যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা' (ভৈরবী ঠুংরি), 'তব লাগি ব্যথা ওঠে গো কুসুমি' (দেশী টোড়ি) প্রভৃতি গান একবার যাঁরা শুনেছেন তাঁরা তা জীবনেও কখনও ভুলতে পারবেন না—এমনি সেসব গানের মনোরঞ্জিনী শক্তি। 'আলোকলগনে' রামকেলির গানটিতে সরগম আর বোলতানের বিস্তার যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন গায়ক হিসাবে ভীষ্মদেবের কৃতিত্বমহিমা কোন্ পর্যায়ের ছিল। অথবা, 'নবারুণরাগে' গানটিতে তিনি যেভাবে আস্থায়ীর মুখে আসবার সময় ভৈরবীর সঙ্গে বিলাসখানি টোড়ির সুরভঙ্গি এনে মিলিয়ে পুনরায় মুখপাত ধরেছেন ভৈরবীতে, তার মাধুর্যের কি কোন সীমা-পরিসীমা আছে?

ভীষ্মদেব বাংলাদেশে একজনই হয়েছেন, তাঁর আর কখনও দোসর মিলবে না। অন্য কোন গায়কের সঙ্গে তাঁর তুলনাও করা চলবে না। হয়তো আমার এ কথায় কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন হয়ে গেল, কিন্তু অতিরঞ্জন ছাড়া কি কখনও গানের অনুরাগকে উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করা যায়? শিল্পকলা-গুলির মধ্যে সংগীত সর্বোৎকৃষ্ট এই কারণে যে, তার ভাল লাগাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত শব্দ-সম্ভার প্রচলিত ভাষারীতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাষার অতিরঞ্জন কিংবা শব্দের অতিরেক ছাড়া বুঝি গানের প্রীতিকে লোকসমক্ষে জানান দেওয়া যায় না।

অথচ ভীষ্মদেবের কণ্ঠের এই স্ফূর্তি, দ্যুতিময়তা বা পূর্ণতা একদিনে সংসাধিত হয়নি। ধীরে ধীরে, বিবর্তনের স্তর বেয়ে তাঁর কণ্ঠের সুরসৃষ্টির ক্ষমতা ক্রমোন্নতি লাভ করেছে ও পরিণতিতে একটি সর্বতোভদ্র উৎকর্ষের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তাঁর কণ্ঠস্বরের জন্মগত ত্রুটির কথা আগেই বলেছি, এবং এই সঙ্গে ছিল তাঁর প্রথম যৌবনের কণ্ঠচাঞ্চল্য। তিনি গোড়ার দিকে গ্রামোফোন রেকর্ডে যে-সমস্ত গান করেছেন (যথা, মুখ মোড় মোড় মুসকাত জাত—মালকোষ; আজ আওরী সখী আনন্দ আশাবরী; আই বাহার–বাহার ত্রিতাল; ফুলবনকো গেঁদান মায়কো —দেশী টোড়ি; এরি ফিরত সজন—জৌনপুরী; পিউ পিউ রটত পাপইহরা বোলে—ললিত; অবহো লালন ম্যায়কো বেহাগ; এরি মেরে কী—সুঘরাই ইত্যাদি)—সেগুলির মধ্যে মধ্যলয়ের গতি এত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দ্রুতলয়ে পর্যবসিত হয়েছে অথবা তান-কর্তবের শিল্পক্রিয়া এতটাই ঝড়ের বেগে অগ্রসর হয়েছে যে, সুরের স্থিতি ও ধীরতার মধ্যে যে সুরের মাধুর্য সচরাচর নিহিত থাকে তা অনুভব করবার অবকাশও যেন পাওয়া যায় না সেইসব গানে। যেন বড্ড বেশি চপল-চঞ্চল তাঁর অশ্রান্ত কণ্ঠের লীলা। কোথাও যেন তা স্থিতু হয়ে বসবার সুযোগ পাচ্ছে না, কেবলই লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে উদ্দাম আর উচ্ছল গতিতে। হয়তো গ্রামোফোন রেকর্ডের সংক্ষেপ-পরিধির জন্যই গানের মধ্যে এই চপলতা বা তারল্যের বেগ এসেছিল। কিন্তু স্বভাবের চাঞ্চল্য যে এর সঙ্গে কিছু পরিমাণে মিশেছিল সেকথাও বুঝি অস্বীকার করা যায় না। অথচ পরবর্তী কালে আসরে বসে কিংবা কলকাতা ও বাইরে (যথা, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, ফৈজাবাদ, করাচী প্রভৃতি শহরে) মিউজিক কনফারেন্সগুলিতে তিনি যে-সকল গান করেছেন তার সঙ্গে রেকর্ডের এই গানগুলির

কতই না তফাত—মেজাজে, বন্দিশে ও লয়ের ধীরতায়। যেমন, পিনি পিনি দেখো (আলাহিয়া বিলাবল); পাঁয়ে না জান (মালকোষ); সুকুরামে আর (পুরিয়া); ফাগুয়া ব্রিজ দেখনো কো চলরী (বসন্ত); পিয়া পরদেশী (পটদীপ); বরষণ লাগি বাদরিয়া (মিঞা-কি-মল্লার); ঢোলনে মাড়ে ঘরেআ (ভীমপলশ্রী); তাড়ে সে লামানে জা (তিলং); এ ছাড়া নটমল্লার, চর্যুকীমল্লার, জলধর-কেদারা, ধানী, পিলুবারোয়াঁ, বিলাসখানি টোড়ি, আড়ানা, রাগেশ্রী, খাম্বাবতী, সুহা, সুঘরাই, পরজ, সোহিনী, মুলতানী, দেশী টোড়ি—কত রাগ-রাগিণীর হিন্দুস্তানী খেয়ালই যে তিনি গাইতেন তার আর ইয়ত্তা নেই। তাঁর তানের সাবলীল স্বচ্ছগতি একটা বিস্ময়ের বস্তু ছিল। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর সরগম সৃষ্টির অপূর্ব লীলালাবণ্য। বোধহয় সরগম সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি শিল্পী সারা ভারতে দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। তেমনি ছিল তাঁর হারমোনিয়ম বাদনের নৈপুণ্য। এ এক আশ্চর্য কৃতিত্ব যে, গলায় তিনি 'সাপট'-জাতীয় যে-সমস্ত ক্ষিপ্র তান করতেন তার প্রত্যেকটি দানা তিনি তাঁর হারমোনিয়মের স্বরক্ষেপের মধ্যে অবিকল ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। এ যে কত বড় দক্ষতা তা যাঁরা হারমোনিয়ম নিয়ে নাড়াচাড়া করে থাকেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন।

ভীষ্মদেব আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি স্বর্লোক অর্থাৎ স্বরলোক বা সুরলোকে চলে গেলেন। সুরের মানুষ সুরে লীন হলেন। আমরা যাঁরা পিছনে পড়ে আছি, তাঁরা তাঁর তিরোধানে বিষাদময় আক্ষেপই শুধু করতে পারি, আর কিছু করতে পারি না।

অবারিত

সুধাংশু ঘোষ

আকারে ছোট হলেও খেলার মাঠের মতন খানিকটা খোলা জায়গা। কোথাও অবশ্য ঘাস নেই, উদোম ধুলোমাটি। চারপাশে বাড়ি। তার মধ্যে আমাদের তিনতলা বাড়িটা সব থেকে উঁচু। উত্তর দিকের একতলা বাড়িগুলোর টিনের চাল। সেই দিকেই মাঠের পাশে একটা টিউবওয়েল। তার জল বেয়ে বেয়ে চলে এসেছে প্রায় মাঠের মাঝখানে। সেই জলকাদা মেখে বেশ ভারী হয়েছে বাতিল টেনিস-বলটা।

তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে শীতের বেলা। তাই হয়তো আমাদের খেলায় এমন তীব্র গতি এসেছে। ক্রমে আলো ফুরিয়ে যাবে, সন্ধ্যের ছায়া ঘনিয়ে আসবে চারদিক থেকে, তখনো আমাদের খেলা চলবে। অবশেষে সত্যি অন্ধকার নামলে খেলা বন্ধ। সময় কম, শীতের বিকেল ফুরিয়ে যাবে এখনই, তার আগেই বোঝাপড়া করে নিতে হবে। পৌষের বিকেলে ঠান্ডা বাতাস। তবু আমাদের জুলপি থেকে গাল বেয়ে ঘামের ঝুরি নেমেছে। শুধু নাক যথেষ্ট অক্সিজেন টানতে পারছে না, খ্যাপা ঘোড়ার মতন হাঁ করে ছুটছে সবাই, মুখ দিয়েও নিঃশ্বাস নিচ্ছে। জলকাদা-মাখা বাতিল টেনিসবলটা ওদের গোল থেকে নিমেষে আমাদের গোলের দিকে চলে আসছে।

আমরা এখনো হারছি দু গোলে।

আমি আমাদের দলের গোলকীপার। তাই চারপাশ একটু দেখাটেখার অবকাশ পাচ্ছি। অন্যরা বিশ্বচরাচর ভুলেছে। শীতের বেলা, হাতে বেশী সময় নেই, শেষ বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

বাতিল টেনিসবল নিয়ে আমরা ফুটবল খেলছি, অথচ আমরা অনেকেই আর ছেলেমানুষ নই, অন্তত দশ বছর পেছনে রেখে এসেছি এই ধরনের খেলার বয়েস। দু দলেই এমন কয়েকজন অবশ্য আছে যাদের বয়েস পনেরর এদিক-ওদিক। তবে আমরা অনেকেই আর ওদের মতন ছেলে-মানুষ নই, আমরা পুরোপুরি যুবক। মাসখানেক হল ছোটদের সঙ্গে আমরা যুবকরা মেতেছি এই খেলায়, রোজ বিকেলে। ভোলাদার চায়ের দোকান থেকে পুলিসের তাড়া খেয়ে আমরা এদিকে একটু গুটিয়ে এসেছি।

আমাদের দলের সব থেকে তেজী ঘোড়া আমার ছোট ভাই সুবীর। আমাদের ক্ষিপ্রতম স্ট্রাইকার। দু গোলে পিছিয়ে আছি আমরা। আমাদের তিনতলা বাড়ির ছাদের রেলিং থেকে, উত্তর দিকের বাড়িগুলোর টিনের চাল থেকে পিছলে যাচ্ছে শেষ বিকেলের আলো। খানিক পরে জলকাদা-মাখা বলটা আর ভালো করে দেখা যাবে না। আমরা জানি, তার আগেই সুবীর গোল দুটো শোধ করে দেবে, আরো বাড়তি গোল দিয়ে জিতিয়ে দেবে আমাদের।

সুবীর তিন বছর আগে কলেজ ছেড়ে মিলিটারিতে চলে গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। সেখানে কী সব কান্ড করে আবার ফিরে এসে কলেজে ঢুকেছে। আমি বি-এ পাস করে চাকরি না পেয়ে আইন পড়ছি। সামনে শেষ পরীক্ষা। পাস করলে কোনোদিন কালো কোট পরে আদালতে যাব ভাবলে অবিশ্বাস্য মনে হয়, হাসি পায়। আমার আর-এক ভাই বি-এসসি পাস করে নতুন ব্যবসা করছে। আমরা এই তিন ভাই খেলায় নেমেছি। দাদা শুধু খেলছে না। ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়ার পর আমাদের সঙ্গে মেশে না তেমন। তার বিয়ের কথা চলছে। বাবার চাকরি বিদেশী সওদাগরি অফিসে। আমরা চার ভাই পাড়ার চারটি রত্ন। মা'র আদরের ভাষায় চারটি দৈত্য। পাড়ার কারো বিপদটিপদ

হলে সবার আগে আমদের ডাক পড়ে, যে-কোনো উৎসবে আমরাই অগ্রণী, অন্য ছেলেরা আমাদের ছায়া।

বেলা যে পড়ে এল, এখনো গোল শোধ হল না। এবাড়ি-ওবাড়ির ছাদে-বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা যুবকদের ছেলেমানুষি খেলা দেখছে। আমি পুব দিকের গোলে। বেশ খানিকক্ষণ শুধু দেখছি, বল আটকাতে ব্যস্ত নই, আমাদের দিকে চাপ কমে গেছে। মাঠের পশ্চিমে ওদের গোলে নাড়ু। আমাদের স্ট্রাইকারদের হামলায় পাগলা হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে নাড়ু কয়েকটা অবধারিত গোল বাঁচিয়েছে। তারিফ না করে পারি না।

আমাদের স্ট্রাইকার সুবীরের গোল করার একটা মোক্ষম কায়দা আছে। সব বাধা ডিঙিয়ে গোলকীপারের মুখোমুখি হতে পারলে বলটা আঙুলের খোঁচায় একটু শূন্যে ভাসিয়ে নেয়, তারপর মারে। ব্যাপারটা নিমেষে ঘটে যায়। বুলেটের গতি পায় বলটা। গোলকীপার ভয়ে সরে যায়। লাগলে দাঁত নাক চোখ সত্যি জখম হতে পারে। সুবীরের বিরোধী দলের গোলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে আমার; কানের পাশে বুলেটের শিস আমি শুনেছি।

কোমরে হাত রেখে তেমন একটা মুহূর্তের অপেক্ষা করছিলাম। আমার ঘাম শুকিয়ে এসেছে। হাওয়ার একটা ঝাপটা এল। বুঝতে পারলাম, শীতের বিকেলের ঠাণ্ডা বাতাস। নাড়ুর পক্ষে কেমন অশুভ মনে হল সেই এলোমেলো হাওয়া। আমাদের সব থেকে তেজী ঘোড়াটা দেখলাম নাড়ুর দিকে উড়ে যাচ্ছে। বলটা মাথায় বুকে পায়ে সেঁটে নিয়ে সুবীর ডাইনে-বাঁয়ে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে সব বাধা পেরিয়ে একা নাড়ুর মুখোমুখি হল। আঙুলের খোঁচায় বলটাকে হাতখানেক ওপরে ভাসিয়ে নিল, তারপর মারল। গোল ছেড়ে সরে গেল আতঙ্কিত নাড়ু।

পশ্চিমের গোলপোস্টের পেছনে একটা আকাশ-ছোঁয়া নারকেলগাছ, ধনুকের মতন বাঁকা। সেই গাছে ঠেসান দিয়ে একা ঝুটকি আমাদের খেলা দেখছিল। অন্য মেয়েরা চারদিকের বাড়ির ছাদে অথবা বারান্দায়। ঝুটকি একা মাঠের মধ্যে নারকেলগাছে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে এত কাছ থেকে আমাদের খেলা দেখছিল। নাড়ু সরে যেতে বলটা বুলেটের বেগে ঝুটকির বুকের মাঝখানে গিয়ে লাগল। পুব দিকের গোলে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট দেখলাম, ঝুটকির বুকের ঠিক মাঝখানে জলকাদার গোল দাগ।

সুবীরের চিৎকার শুনলাম, "অ্যাই ঝুটকি, এখান থেকে সরে যা!" তার গলা খ্যাপা ঘোড়ার হ্রেষার মতন মনে হল।

ঝুটকি নড়ল না। নারকেলগাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। বুকে আঘাতের প্রদর্শনী, কিন্তু মুখে কষ্টের ছায়া নেই। বরং সানন্দ স্বীকৃতির ভঙ্গি।

বাতিল টেনিসবল এমনিতে তেমন ভারী নয়। তবে আমাদের বলটা রোজ জলকাদা শুষে ওজন বাড়িয়ে নিয়েছে। মোটা চামড়াও জোরে লাগলে জ্বালা ধরে যায়। আমি গোলকীপার, আমি জানি।

ঝুটকি ছেলেমানুষ নয়। টিউবওয়েলটার লাগোয়া টিনের বাড়ির পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে, বয়েস কুড়ি পেরিয়ে গেছে। দারুণ ফরসা, শরীরে স্বাস্থ্যের ঢল নেমেছে, তবে পুরু ঠোঁট, ভোঁতা নাক, বোকা-বোকা মুখ। শৈশবে চুলের কোনো বিচিত্র বিন্যাসের জন্য পাড়ায় ডাকনাম হয়েছিল ঝুটকি।

ছোটদের সঙ্গে আমরা যুবকরা সম্প্রতি এই খেলায় মেতেছি। ফুটবল খেলার পোশাক নেই আমাদের কারো। কেউ আণ্ডারওয়্যার, কেউ পাজামা, কেউ ট্রাউজার্স হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গুটিয়ে আমরা মাঠে নেমে যাই। কারো গেঞ্জি কারো হাওয়াই-শার্ট পরা, কারো শীতের বিকেলেও খালি গা।

কারো ধার-করা হাফ প্যান্ট সেলাই বরাবর ফেঁসে যায়। লোমশ বুকে ঘাম জমে, ঊরুদেশ বেয়ে ঘামের স্রোত নামে, পেশী ফুলে ওঠে। লিকলিকে পেন্সিলের মতন খেলোয়াড় অবশ্যই আছে, যেমন আমাদের একতলার ভাড়াটেদের ছেলেটা, তবে আমরাও আছি, দস্যুরা। এত কাছে একা দাঁড়িয়ে কী খেলা দেখতে আসে কার্তিক? কী দ্যাখে?

উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শেখানো কার্তিকর বাবা পার্বতীচরণের পেশা। এখন চোখে মোটেই দেখতে পান না, কোথাও যেতে পারেন না। দুচারজন ছাত্রছাত্রী আসে, রাগপ্রধান গান শেখে। কার্তিকর ভাই মোহন কিছু কাজটাজ করে না। দিদির মতন ফরসা, লম্বা, ভালো স্বাস্থ্য, কিন্তু মাঝেমাঝেই হন্যে হয়ে যায়। দেয়ালে মাথা ঠুকে নিজের কপাল ফাটায়, নিজের রক্ত দেখার পর অন্যদের রক্ত দেখতে চায়। বালতি, দরজার হুড়কো ইত্যাদি দিয়ে বাড়ির লোকদের মারে। তখন অমানুষিক শক্তি আসে তার গায়ে। মা'র আদরের দৈত্যদের ডাক পড়ে। আমরা বাড়ি থাকলে দৌড়ে যাই, মোহনকে চেপে ধরি, একজন পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনে। ইঞ্জেকশন খেয়ে মোহন ঘুমোয়। পড়ে থাকে কয়েক ঘণ্টা, যেন জ্যান্ত নয়, একটা লাশ।

অন্য সময়ে যখন ভালো থাকে, মোহনের খুব অহঙ্কার। তবলায় ঠেকা দিতে পারে, নিজেকে বলে বেতারশিল্পীর ছেলে। তিরিশ বছর আগে পার্বতীচরণ নাকি একবার রেডিওর গান করে-ছিলেন। সেই থেকে তাঁর নামের সঙ্গে বেতারশিল্পী কথাটা সেঁটে গেছে।

মোহন আমাদের মাঠে দৈবাৎ খেলতে নামে। আজ নামেনি। আমাদের সঙ্গে মেলামেশাও করে না তেমন।

কার্তিককে আমাদের বাড়িতে দেখা যায় যখন-তখন। নিতান্ত অসময়ে ও মা'র পেছনে ঘুরছে, কী সব আর্জি রাখছে ফিসফিস করে। আঁচলের তলায় কিছু লুকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নেমে যেতে দেখেছি। তখন সামনে পড়ে গেলে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নেয়, চোখের দিকে তাকায় না, কথা বলে না। তখন কার্তিককে দুঃখী মনে হয় বলেই হয়তো ততটা আর বোকাবোকা লাগে না।

আজ সুবীর একটা গোল শোধ দেবার পরও আরো পনের-কুড়ি মিনিট খেলা হল। কিন্তু অন্য দিনের মতন সুবীরের শেষ সময়ের তেজ আজ দেখলাম না। গোলের কাছে গিয়েই কেমন ঢিলে হয়ে পড়ছে, বল কেড়ে নিচ্ছে ওদের খেলোয়াড়রা। আমরা এক গোলে হেরে গেলাম।

তখনো নারকেলগাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে কার্তিক দাঁড়িয়ে। পুব দিকের গোল থেকে দেখলাম, পশ্চিমের গোলপোস্টের পেছনে কার্তিকর শরীরের তীক্ষ্ন প্রান্তরেখা আবছায়ায় ভাসছে।

কয়েক দিন খেলা তেমন জমল না। বড়দের ছেলেমানুষি নেশা কেটে যাচ্ছিল। তার মূল কারণ সুবীরের উৎসাহে কমতি। সুবীরই আমাদের এই খেলায় মাতিয়েছিল। সে-ই পিছিয়ে গেল। তাছাড়া ভোলাদা আবার আমাদের ডাকছিল, আদর করে ডাকছিল তার চায়ের দোকানে। সুতরাং উদম ধুলোমাটির ছোট মাঠে শুধু ছোটরাই রয়ে গেল বাতিল টেনিসবল পেটাতে।

ভোলাদার চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে আমরাই রাজা। মাঝে আমরা একটু সরে গিয়েছিলাম। এর জন্য দায়ী ডিগডিগে গৌতম ছেলেটা। ছেলেটা বললে মানায় না, গৌতমের প্রায় আমার বয়েস। দেবাশিস সরখেল নামে একটা লোক আছে, খুব চালু। ঠিক আমাদের পাড়ার লোক নয়। আমাদের গলির বাইরে বড় রাস্তায় ফ্ল্যাটবাড়িতে ভাড়া থাকে। বছর পাঁচেক হল এদিকে এসেছে। তার বোনটা কলেজে পড়ত। বোনটার বিয়ে ঠিক হলে গৌতম গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নেড়ে সরাসরি সরখেলকে বলে এসেছিল, অন্য কোথাও বোনের বিয়ে দিলে বিয়ের রাত্তিরেই বোন বিধবা হবে। এই কাণ্ড করার আগে গৌতম আমাদের কাউকে কিছু বলেনি, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেনি। গৌতম নিশ্চয়ই জানে, এসব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে আমরা থাকতে চাই না। পাড়ায় আর যা-ই হোক,

আমাদের সুনাম আছে। তাই হয়তো গৌতম একা গিয়ে ওই নাটক করে এসেছিল। আমাদের সমর্থন পাবে না বুঝেই একা গিয়েছিল।

পরদিন থেকে পুলিসের দুতিনটে সাব-ইন্সপেক্টর ভোলাদার দোকানে জমিয়ে বসল। এদিকের থানার কে নাকি সরখেলের দোস্ত। পুলিস আমাদের ওপর নজর রাখবার জন্য এসেছে বুঝেও পুলিস দেখেই আমরা সরে আসিনি। দুটো সাব-ইন্সপেক্টর আমাদের ভয় দেখাতে পারেনি, বলাই বাহুল্য। গৌতমের ওপর আমরা বিরক্ত হয়েছিলাম সত্যি, তাকে একটু কড়কেও দিয়েছিলাম, তবে আমাদের আসল রাগ অথবা ক্ষোভ অথবা অভিমান ভোলাদার ওপর। পুলিস পেয়ে গিয়ে ভোলাদা আমাদের যেন ভুলেই গেল। সব সময় পুলিসের দিকে লক্ষ্য। আমাদের কোনো পাত্তা নেই। আমরা যেন উটকো লোক। বিকেলে ভোলাদার দোকানে একটা ফিশ রোল তৈরি হয়। ভেজাপিরাফিয়া দিয়ে বানায় হয়তো। কিন্তু খেতে ভালো, আর খুব সস্তা। বাইরের লোক ভোলাদার দোকানে বিশেষ আসে না। ফিশ রোল আমরাই খাই। একদিন বিকেলে আমরা একটাও ফিশ রোল পেলাম না। ভোলাদা আহ্লাদে গলে গিয়ে জানাল, পুলিস সেদিনের সব ফিশ রোল নিয়ে নিয়েছে। থানার মধ্যে কোয়ার্টার আছে তো।

ঘেন্নায় আমরা ভোলাদার দোকান বয়কট করেছিলাম, খেলায় মেতেছিলাম ছোটদের সঙ্গে।

সরখেলের বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। আমাদের নেমন্তন্ন হয়নি। আমরা নেমন্তন্ন চাই-ওনি। মেয়েটা ড্যাং ড্যাং করে শ্বশুরবাড়ি জব্বলপুরে চলে গেছে। গৌতম নিজের পকেট ফাঁক করে অন্যদের কাছ থেকে ভিক্ষে নিয়ে অবিরাম চারমিনার ফুকছে।

পুলিস সরে গেলে ভোলাদা আমাদের আদর করে ডাকল। বলল, 'তোরা আমার চিরকালের। তোরা না এলে দোকান তুলে দেব।' বেহায়া গৌতমটা ছাড়ল না, ফিরে এসে বেঞ্চিতে পা গুটিয়ে বসে ভোলাদাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলল, 'এদিকের থানার পুলিসদের পাগুলো হঠাৎ ফরসা হয়ে গেছে দেখলাম। পুলিসের পা চাটল কে রে?'

ভোলাদা বুঝতে না পারার ভান করল।

ইতিমধ্যে সরস্বতী পুজোটা এসে গেল। সব দায়িত্ব আমাদের। চাঁদা তোলা, মাঠের আধখানা জুড়ে প্যান্ডেল বাঁধা। নাওয়া-খাওয়ার সময় রইল না। আমরা জানি, এইসব অনুষ্ঠান এলে শেষের সপ্তাহটা যেন উড়ে চলে যায়, ঝড়ো হাওয়ায় কাটা ঘুড়ির মতন। শেষ সপ্তাহটায় ভোলাদা বেশী করে ফিশ রোল ভাজছিল।

পুজোর দিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে খিচুড়ি হয়েছে। কার্তিকদের আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন। বাবার সঙ্গে দাদা আগে খেয়ে নিয়েছে। একটু বেশী বেলায় কার্তিক, মোহন, কার্তিকর ছোট দুই বোন আর আমরা তিন ভাই খেতে বসেছি আমাদের দোতলার রান্নাঘরের সামনের চওড়া বারান্দায়। কার্তিকর মা-বাবার খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানে নেমন্তন্ন বলে ওদের বাড়িতে আজ রান্না হয়নি। কার্তিক সকাল থেকে আমার মাকে নানা কাজে সাহায্য করেছে।

পুজো শেষ। সবার মেজাজ ভালো। খেতে বসে গল্পটল্প হচ্ছিল। কার্তিক হঠাৎ একটা কথা বলে দারুণ চমক দিল। বোকা-বোকা গলায় কার্তিক বলল, 'মাসিমা, সেদিন খেলতে-খেলতে সুবীর সবার সামনে আমাকে কার্তিক বলল কেন? আমাকে অরুণিমা বলতে পারত না?'

ডেকচিতে হাতা ডুবিয়ে মা চুপ। সুবীর হাঁ করে আছে, মুখের দু ইঞ্চির মধ্যে গ্রাস।

মনে পড়ে গেল, কার্তিকর এমন একটা পোশাকী নাম আছে। বেতারশিল্পী পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে অরুণিমা।

একটা ঘটনাও মনে পড়ল। সুবীর বাতিল টেনিসবল মেরেছিল বুর্টাকর বুকের মাঝখানে। সে তো দেড় মাস আগের ব্যাপার। আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। জলকাদা-মাখা টেনিসবলের সেই দাগ নিশ্চয়ই এতোদিন নেই, ধুয়ে মুছে গেছে। তাকিয়ে দেখলাম, বুর্টাক নিষেধের জন্য তার বুকের কপাট খুলে দিয়েছে। ওপরের দাগ মুছে গেলেও ভেতরে দগদগে গোল দাগটা তখনো স্পষ্ট।

মনে পড়ে আলফান্সো

অসীম রায়

মনে পড়ে আলফান্সো কি সূর্যাস্তের রঙে রাঙা আরব্য মাস্তুলে
তুমি আর আমি
সামনে দোলে আসমুদ্র আফ্রিকা এশিয়ার সূর্যোদয়
অজস্র বন্দরে
রুয়ান্ডা কি নাগাসাকি
মোজাম্বিক গোয়া থেকে মালাবার মালাক্কা ম্যাকাও
আমাদের ছুটন্ত ব্যারাকে
মৌসুমী হাওয়ার আর্তনাদ
মনে পড়ে ?

আলফান্সো নিশ্চয় তুমি ভোলনি সে আফ্রিকার প্রজ্বলিত গ্রাম
সঙ্গে সঙ্গে লেলিহান আমাদের লালসার শিখা
ফিনকি-ছোটা হাহাকার মিলাতে না মিলাতেই
স্বর্ণপেটি আসে কাঁধে জাহাজের খোলে।
কে পারে সে আমাদের দুর্বার অভিযান
রুখে দিতে
নিগ্রো দলপতি থেকে মিং সম্রাট
কেউ না কেউ না
শৌর্যে বীর্যে আমরা প্রত্যেকেই দৃপ্ত আলবুকার্ক
সে কাহিনী আজ নেই কেপ-অব-গুডহোপে
ভারতসাগরে।

আলফান্সো আমাদের ছুটন্ত ব্যারাকে
আরবী ঘোড়ার হ্রেষা
মালাবারী গোলমরিচে গন্ধে ভরপুর বর্ষাকাল
সমস্ত হেমন্ত আনে দারুচিনি দ্বীপের গন্ধ
রূপো আনে নাগাসাকি শীতে।

আলফান্সো ভেবেছি আমরা স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে
থাকব নিশ্চয়
তুমি আর আমি
চেয়ে আছি জলে ভেজা কয়েকটা পাথর
আফ্রিকার উপকূলে গোয়া মালাক্কায়

কেউ যদি জন্বালে মোমবাতি,
বোধ হয় আলফান্সো ওরা আজকাল অন্য কিছ্ চায়
অন্য কিছ্ পরিস্থিতি যেমন এ পৃথিবী
যদি আরও বাসযোগ্য হয়॥

আবহমান

রত্নেশ্বর হাজরা

সমস্ত স্বাধীন ভেবে নিতে পারি এতো স্বাধীনতা   আমাদের নেই
আছি বিপরীত কার্যকারণে এবং সন্তর্পণে
আছি প্রতিদিন রুক্ষ   দিন অবসানে
প্রত্যহ জানাতে হয়—ভালো আছি   আর
পেয়েছি সমস্ত শস্য ইন্দ্রের কৃপায়।—কিন্তু
কোন্ ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা!
কোন্ শস্য সত্যি আমাদের!

আছি চতুর্দিকে বহু দুর্গন্ধ হাওয়ার মধ্যে   বড়ো বিরক্তির
ধুলোয় আচ্ছন্ন বাতাবরণে এবং রুচিহীন
শব্দে প্রতিদিন ক্লান্ত   দিন অবসানে—
অথচ জানাতে হয়—এই ঠিক   এই কাম্য ছিল   আর
পেয়েছি সমস্ত যজ্ঞ অগ্নির কৃপায়।—কিন্তু
কোন্ যজ্ঞ সত্যি আমাদের!

চলেছি মন্থর পায়ে উটের গতিতে (ভারি বোঝার ক্লান্তিতে)
হঠাৎ চাবুকে নগ্ন   অশ্ববেগে   কখনো বা
গাধার প্রচণ্ড ধৈর্যে—সহিষ্ণু শিক্ষায়—বোকা
লুকোনো আক্রোশে   হাহাকারে.........
অথচ জানাতে হয়   এই ঠিক   আরো ভার দাও প্রভু, দাও
পেয়েছি সমস্ত মুক্তি তোমার কৃপায়।—কিন্তু
কোন্ তুমি মুক্তির দেবতা!
কোন্ মুক্তি সত্যি আমাদের!

যে পাত্রে বিষ

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যে পাত্রে বিষ এনে দিলে
মিনে-করা নকশা, চুমকি-বসানো,
চুনী-পান্নার দ্যুতি, হীরের ঝলক।
সে হীরের হৃদয়ের কাচ খান খান
রক্ত ঝরে, চুমুকে চুনীর ফেনা
বিষের নেশায় বিচ্যুত চৈতন্য।

আহা, কী সুন্দর পাত্র,
মণি-মাণিক্যের দুই জ্যোতি আবর্তিত,
দ্বিখণ্ড বৈদূর্যমণির খাঁজে লুব্ধ হাসি,
নীলকমলের দুটি ভরাট ফুটন্ত কুঁড়ি,
পদ্মনাভ তৃষ্ণায় রক্তিম,
ত্রিকূট আধার দুটি শাখা ঈষৎ বিস্তৃত,
পুরন্ত পাত্রটি জুড়ে দুরন্ত আবেগ,
বিলোল, বিচিত্র, —লাস্যে যেন প্রেমপূর্ণ
পূর্ণিমার অমর্ত্য সম্পদ।

আহা, কী সুন্দর পাত্র, বিষের মদিরা
তুলে নিই, পান করি, কাঁপি।—
অকম্পিত পাত্র অনাহত
অটুট নকশায় দেখি দংশন জনান্তিকে।

সুখের সময়

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন আমার সুখের সময়,
দুহাতে আমার পেরেক গাঁথা।
এখন আমার সুখের সময়,
হাওয়ায় ওড়ে চিঠির পাতা।
এখন আমার সুখের সময়
কোন কাজেই মন লাগে না।
এখন আমার সুখের সময়,
এমন সময় আর আসবে না।
এখন আমার সুখের সময়,
তুমিই আমার অসহ্য সুখ।
এখন আমার সুখের সময়,
সুখের মধ্যে রেখেছি মুখ।
এখন আমার সুখের সময়
ইচ্ছে করছে, মরাই ভালো।
এমন আমার সুখের সময়
তোমার কথা মনে করালো।
এমন আমার সুখের সময়,
এ সুখ আমার অসহ্য সুখ।
এ সুখ আমার সইবার নয়,
এ সুখ আমার হত্যা করুক।
এখন আমার সুখের সময়
এমন সুখ তো আসবে না আর।
এখন আমার সুখের সময়,
সুখেই কাটুক সময় আমার।

পতঙ্গ পিঞ্জর

শওকত ওসমান

নামে কিছু আসে যায় না, যারা বলে, তাদের বস্তু-মাহাত্ম্য সম্পর্কে সাধারণ অজ্ঞতা বহুত। এখানে অবিশ্যি মোহাম্মদ আলী, মসজিদের ইমাম, সুরত মণ্ডল প্রত্যেকের নিজস্ব রীতি ছিল কোন অজ্ঞাত জীবের নামকরণে, বিশেষত তা যদি দৈবাৎ এসে পড়ে। এক-এক জনের লম্বা ফিরিস্তি দিতে গেলে অনেক সময়ের অপব্যয় এবং তারপরও ব্যক্তির সীমানা ডিঙানো যাবে কিনা, তার নিশ্চিন্ত আশ্বাস কোথায়? তাই সকল প্রশ্নের একমাত্র জবাব দেওয়ার রীতি অনুসারে বলা যাক, ওই জীবের নাম পঙ্গপাল এবং তা মানুষের মতো দলবদ্ধ জীবন যাপন করে।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ঝরনার লাফিয়ে-লাফিয়ে চলাকালে জলের ফেনবিন্দুর বিস্তার-লীলার সঙ্গে হাজার হাজার উড্ডীন মরালের সন্ধান পেয়েছিলেন। পঙ্গপাল এমন কায়দায় ওড়ে না। একথা যেমন সত্য, তার দলবদ্ধতার হদিসও তেমন সত্য। জীববিশেষজ্ঞদের মতামত পরে দেওয়া যাবে। তা পূর্বে থেকে বলে রাখা শুধু প্রতিশ্রুতি নয় -তাছাড়া অন্যান্য বিকল্প অসম্ভব। একটা জিনিস আমরা যে-যার-মতো ধারণা করে নিতে পারলেই তো আর বৈশিষ্ট্যের অদলবদল হয় না। এমন ঘটলে স্বর্গ-রচনা এত সহজ হয়ে পড়ত যে তখন নিষ্ক্রিয় মনের লাগাম খুলে দিলে কাম ফতে, যদিও বা কী ঘটল তা বোঝার মতো তোমার শক্তি পায়ে হতে পারে। ফলাফলের এমনতর উৎপাত বিধায় তুমি আমি সকলে এক ঘাটে এসে পৌঁছাই এবং একে-অপরকে চিনতে পারি। নচেৎ ভাসতেই থাকতাম যেমন আবেগ ভেসে যায় নিজের টানে যখন হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো বুদ্ধির আহ্বান পেছনে খামখা গর্জায়।

ক্রমে ক্রমে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল হাতের চেটোর মতো, যেখানে আর সূর্যের আলোয় বাধা পড়ে না। এতদিনে সকলে যা মনে করেছিল ছায়া-শীতলতা, তা আকাশের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে সূর্যকে ঠেলে দিতে লাগল ক্রমশ উত্তাপের পথে। এসব নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এবং সেজন্য কারো কোনও উদ্বেগ ওৎপাতা বাঘের মতো কম্প দিয়ে উঠবে, তেমন কিছু হতে পারে না। বিপদের মাত্রা পরিষ্কার হয়ে উঠল যখন দৈনন্দিনতার পথে পা বাড়াতে গিয়ে দেখা গেল, চতুর্দিকে লিকলিকে সাপ কিলবিল-মস্ত।

তাদের গ্রামের বাইরে মানুষ আছে, গফুর সব সময় শুধু প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করত না, বরং আরো মনে করত যে আক্কেল বুদ্ধির ব্যাপারে দশজনকে জিজ্ঞেস করাই ভাল এবং তা কেবল গৌড়গ্রামে আটক রাখা অন্যায় ও ডাহা মূর্খতা। অনেক সমস্যা, অনেক প্রশ্ন উঠেছে, অনেক অসুবিধা ঘটেছে, অনেক বচসা শুরু হয়েছিল ঘরের মধ্যে পাড়ার মধ্যে, দুই দলের মধ্যে—এমন-কি একই দলের শাখা-উপশাখার ভেতর। গফুর তার গাড়ি জুতেছিল। সফরের উদ্দেশ্য পেছনে যতখানি ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল আরো দশজনের কাছে সে জানবে : তার মতো মূর্খ মানুষেরা যখন কিছুই বোঝে না তখন তাদের বুঝিয়ে দিতে পারে—এমন মানুষের নাগাল কোথা পাওয়া যায়? বউ সখিনা মনে করত বাড়ির আঙিনার সীমানাই দুনিয়ার সীমানা হওয়া উচিত এবং একান্ত যদি তা না ঘটে, খুব-জোর পাড়া পর্যন্ত যথেষ্ট, না হলে গ্রামের চৌহদ্দিই চৌদ্দ ভুবন, দশদিগন্ত। তাই নারী-বিবর্জনের গুরুবাক্য স্মরণ রেখে গফুর এক অপরাহ্ণে বেরিয়ে পড়েছিল পীর-পয়গম্বরদের নাম মুখে এবং দরুদ (মন্ত্র) জপে-জপে। ফৌত্‌ পিতার আত্মা তার সঙ্গী ছিল কিনা, জানা না গেলেও,

এই অনুমান মিথ্যা নয় যে সে জনকের অসহায় অপমৃত্যু আজও ভোলেনি এবং সেইহেতু বলদের পাচন বাড়ি কষাতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল অবোলা জন্তুর প্রতি অনুকম্পাবশত, যা পিতার জন্যে প্রথমে উৎসারিত এবং প্রাণীর উপর অর্পিত। কিন্তু গ্রামসীমানার শেষে গোরুগুলো হাঁপিয়ে উঠতে লাগল এবং অনিচ্ছাকৃত একটা চাবুকেও আর এগোতে নারাজ, সোজা মুখ থুবড়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ল। পতঙ্গ উড়ছিল চতুর্দিকে শত, হাজার এবং পর্যায়ে পর্যায়ে যতই এগোও সংখ্যার পরিধি বর্ধমান। পাতলা কুয়াশা ক্রমশ ঘন হওয়ার কালে প্রথমে চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও আবছা কিছু দৃষ্টিগোচর অন্তত জানান দিয়ে যায়। তারপর আর নিজেকেও দেখা তো যায়ই না, বরং ভীতির ধাক্কা বাড়িয়ে দেয় যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্থান-সম্পর্কে সচেতন হও, কিন্তু তা আর চোখের প্রতিবেশী নয়। হাত আছে নাড়ছ। অথচ নেই। এই চেতনায় নিজেকে প্রেতাত্মা বানাতে হয় স্রেফ বায়বীয় আকারে নয়, বরং বাস্তব কাঠিন্যে—যা মৃত্যু সন্নিকটে করে। গফুরের বুকের পাটা সুমেরু-কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত কিনা, তা নিয়ে ফায়সা তর্ক একটা না তুলেও সিদ্ধান্তে আসা যায়, সে দম থাকতে কম করেনি। হাজার হাজার পোকা যখন এপাশ-ওপাশ-রত ঠোক্কর খাচ্ছিল তার গায়ে বুকে মুখে, সে নতমুখ গোরুর গলার দড়ি ঠিক রাখছিল। হে-হে-শব্দ যথাসম্ভব অব্যাহত। কিন্তু অবলা জীবের উপর যতই নিষ্ঠুরতা দেখাক সে, তাদের 'জান্' জিভে এসে ঠেকছিল। গফুর ভাবে, যদি মাঠের ঠিক মধ্যিখানে তার বাহন আর এগোতে না পারে এবং গোরু দুটো মরে যায়, তখন কুরুক্ষেত্রে কর্ণের রথের চাকার (সুরত মন্ডলের কাছে শোনা) দশা হবে। তখনও সময় বাগে, আয়ত্তের ভেতর এবং হুঁশিয়ারি হেঁকে যাচ্ছিল, 'তফাত যাও, পালাও, দুঃসাহস দেখিও না।' বলদ দুটো ঈষৎ আস্কারার প্রত্যাশায় ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, দড়ি একটু শ্লথ করা মাত্র। দুই প্রাণী একদৌড়ে একদম গাঁয়ের সীমানার মধ্যে যেখানে নিরাপত্তা শতে শত না হলেও ত্রিশ। গফুর একবার ভেবেছিল, সবাই মিলে, পোকাগুলোকে পিটোলে কেমন হয়? কিন্তু তখনই মনে পড়ে গিয়েছিল মোহাম্মদ আলী এবং মসজিদের ইমামের কথা : কিসে কী হয় তা মানুষ অত সহজে বুঝতে পারে না। সবুর করে যাও। এগুলো যে ছদ্মবেশী আশীর্বাদ নয়, তার জবাব কে দেবে? তাই গফুর হাঁফ ছেড়েছিল মাদবরের উঠানের ঠিক সামনাসামনি, যেখানে ছেলেপুলেরা খেলছিল—দুনিয়ায় কোন সমস্যা নেই, এমনই নির্ভাবনায়। একটা জিনিস গাড়োয়ানের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল আর বাইরের কারো সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটবে এমন সম্ভাবনা কম নয়, অতি দূরূহ।

তখনও গাছপালার সবুজে বিস্তারিত আকারে পতঙ্গের হামলা শুরু হয়নি জেনে পূর্বাভাস-স্বরূপ প্রশ্নটা উত্থাপন করেছিল গফুর মাদবরের সঙ্গে। অলক্ষুনে কথা মুখে আনতে নেই—প্রবাদটি পরদিন থেকেই গোড়গ্রামে আবার চালু হয়েছিল যেন এতদিন কোনও আপ্তবাক্যের প্রয়োজন ছিল না কারো। মাদবর গ্রামের প্রধান হলেও লেখাপড়াজানা মানুষের কাছে স্বভাবজ বিনয়ে এমন নুয়ে পড়ত যে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ধ্বংস করে দিতেও দ্বিধাহীন। এই নিয়ে একটা চাপা ক্ষোভ ছিল গফুরের মনে এবং তা প্রকাশে ভীরুতা দেখালেও শেষ পর্যন্ত মাদবরের স্নেহাতিশয্যে সে কোন খুঁত পায়নি। অবিশ্যি সে নিজে ভাবতে শুরু করেছিল ধীর-ক্রমিকতায়। যেহেতু গ্রামের বাইরে যেতে না পারলে রুজিরোজগার শুধু বন্ধ হয়ে যাবে না, মৃত্যু সত্বর না হোক ঈষৎ বিলম্বেও তাদের অর্থাৎ গ্রামের তার মতো বহু মানুষের গলা টিপে ধরবে। টিকে থাকার মতো যে-দুচার জন আছে তাদের ধর্তব্যের মধ্যে না-ফেলাই মঙ্গল। ছোটখাট উৎপাত বিরাট অমঙ্গলের বেশে দেখা দিতে কী অনেক-অনেক সময়ের অপচয় লাগে, না তেমন আশঙ্কা অমূলক। যেমন মাদবর তেমনই আরো বর্ষীয়ানদের গফুর ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে দেখেছিল বা শুনেছিল। হেন কর্ম গফুরকে বড় উত্তেজিত করে তুলত এবং সে সমবয়সীদের সহজ ভাষায় যা বলত, সাধু ভাষায় তার প্রকাশ, 'মরণ-

কালেই ঘন ঘন শ্বাস দীর্ঘ হয়, যার অর্থ পরবর্তী মুহূর্তে চরম সুখ আসন্ন'। কিন্তু বৃদ্ধের দল কেন শ্বাসপ্রশ্বাসের অমন অমর্যাদা করে, বোঝা দায়। সঙ্গীরা হেসেছিল প্রাণদ হাসি নয়, বরং চেষ্টাকৃত—যা একটা ছুতোর মতো মিথ্যের সঙ্গে অর্থবান বা শোভামণ্ডিত হয়। অবিশ্যি একা গফুর নয়, অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিল এই অমঙ্গলের ভবিষ্যৎ গতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্যে। দিন বসেও থাকে না, শুয়েও থাকে না, যেহেতু চলে। তাই ভবিষ্যৎ শুধু অন্ধকার নয়, গতিশীল যন্ত্রের মতো তার সহজ পরিবহণ-ক্ষমতা স্বতঃসিদ্ধ, আবার ঠোকর খেয়ে আধার-আধেয় সবই চূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। মাদবর যে এসব ভাবত না, তা নয়ই, বরং সে তার পিতৃমাতৃহীন নাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে সব দিন ক্ষণকাল মিলিয়ে দেখত। বর্তমান মাতামহের সম্মুখে এই ছেলের মাও তার বড় ন্যাওটা ছিল। কন্যার স্মৃতি পুষে আছে বৃদ্ধ সেই কবে থেকে, ছেলেটা যখন কোনরকমে হামা টানত। বর্তমানে আট-ন বছরের ফুটফুটে বালকের আকাশস্পর্শী আবদার মাতামহ রক্ষা করত বিনা বিরক্তি। নতুন ঘটনা নয় এসব এদেশে। তারই জের টেনে চলছিল মাদবর শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। জীবনের সব আগ্রহ নিভে গেলে ছোট গণ্ডীর উপর মন ঝাঁপিয়ে পড়ে। গফুর এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে অমঙ্গলের প্রসঙ্গে দৌহিত্রকে অনুপস্থিত রাখত না। একটা কথা যেখান থেকে উৎসারিত হোক, হোঁচট খেয়ে ঠেকে গিয়েছিল একটি মাত্র সিদ্ধান্তের গর্তে : আর কেউ গ্রামের বাইরে যেতে পারবে না।

মোহাম্মদ আলীর নিকট বার্তা পৌঁছলে সে প্রথমে তা হাসির হাওয়ালার সঙ্গে আরো তন্নিবেশ কাব্যচর্চায় মন দিয়েছিল। যা ঘটে তা সত্য নয়। এই আপ্তবাক্য এবং কৌতূহলের আবেগে অন্যমনস্ক কবি অবহেলায় থুতনির উপর আরো তিনগাছা দাড়ি পর্যন্ত গজিয়ে ফেলেছিল। যেহেতু তিনের বাইরে যেতে চাইলে ওই মাকুন্দ-মুখে ঝোপের সম্ভাবনা স্বপ্নমাত্র।

সাত

সশব্দ কান্নার মধ্যে কতো রকম ফারাক থাকতে পারে, তার হদিস অনেকে ওলটপালট করে দেখতে অনভ্যস্ত। এখানে স্বতঃসিদ্ধ এবং চিরাচরিত সিদ্ধান্ত সব একাকার করে দেওয়ার মূলে সেই ইচ্ছাই বলবৎ থাকে যে সর্পাঘাত যদি শিরেই হয়ে থাকে, তখন গণ্ডদেশ না গর্দানের পাশে, তা নিয়ে আর কূটকচাল তর্ক তুলে মুনাফা কী? কিন্তু উন্মাদকুল যদি মনঃসমীক্ষণবিশারদ হত, তাহলে পাগলামি সেরে যেত, এমন কথা কেউ হলফ-সহ বলতে পারে না। তবে সম্ভাবনা যখন বর্তমান, আশা পোষণ বা বিশ্লেষণ করতে কারো অনীহা থাকা অনুচিত। অন্যপক্ষে, নীরব কান্না যা কেউ শোনে না বা যার লক্ষণ অশ্রুবর্ষণকারীর অবয়বে পর্যন্ত অনুপস্থিত, তখন সমস্যা জটিল। অথচ রাস্তার মোড় বা মোচড় ইত্যাদির মতো সব কান্নার জল শেষ পর্যন্ত এক গন্তব্যে পৌঁছলেও, তাদের গতিপথ জানান দেবেই সূত্রপাতের ধারাটা কেমন। গোড়গ্রামের দুঃখী মানুষরা চিরদিন ঊর্ধ্বপানে মুখ তুলে ফরিয়াদে অভ্যস্ত বিধায় দেখা গেল, যখন আকাশ থেকে গজব (অভিশাপ) নাজেল (অবতীর্ণ) হয়েছে তখন তার মধ্যে অস্বাভাবিক কেউ কিছু দেখেনি। কাঁদতে হয়, কান্নায় কান্নায় চোখের মণি গলা সীসার মতো বুকপথে দরদর নামিয়ে দাও। কেবল চক্ষু উপরের দিকে সোজা রাখো। অপিচ তুমি দৃষ্টিহীন। কিছু আসে যায় না।

অবিশ্যি বুলানের মতো অল্পবয়সী যাদের কাছে অজ্ঞাত, গজব এবং আশীর্বাদ একই স্থান থেকে উৎসারিত কিনা, তারা সীমাবদ্ধ করে নেয় নিজেদের কান্নার ফিরিস্তি। তাদের চোখ আকাশ-পানে যাওয়া দূরের কথা মাটি ছেড়ে যেতেই শেখেনি। অভীষ্ট গন্তব্য সেখানে সংকীর্ণ হওয়ায়

ফলে, তার মধ্যে সেই বীজ লুকিয়ে থাকে যা মাটিতে বৃক্ষের মতো সবল শিকড় চালিয়ে দিতে পারলেই খুশী এবং সেই টানেই বৃক্ষের মতো তা আকাশ-রঞ্জনায় অভীপ্সা লাভ করে। বৃড়োদের কেন, যাদের বয়স আরো কম হাঁটি-হাঁটি-পা তারা নিজেরা অঙ্কুর বিধায় মাটির সঙ্গে লেপ্টে থাকতেই বেশি আগ্রহশীল। প্রকৃতির নিয়ম যেমন লতায় পাতায় তেমনই মনুষ্যক্ষেত্রে প্রয়োগক্ষমতা জাহির করে, পণ্ডিতেরা বলেন।

অভাবের সংজ্ঞা দিতে গেলে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়, এমন মারপ্যাঁচ তারাই ফলাতে পারে, অনটন যাদের স্পর্শ করেনি। শিশু-কিশোররা কিন্তু সহজেই হদিস বুঝার তার বাইরে থেকে পায়, এমন ঘটে না। বরং তাদের ভেতরেই স্বপনবুড়ো ঠিক উল্টোমূর্তি ধারণ করে, সবক দিতে থাকে এবং পড়ুয়াদের বুঝিয়ে দিতে তার বেশি বিলম্ব হয় না।

শ্বেতশুভ্র দুগ্ধ।
অমল ধবল পাল।
শ্বেত রাজহংস।
মেরু-তুষার।

গোড়গ্রামে কিন্তু কচি ছেলেদের চেহারা সাদা হতে থাকে। চোখের কোণে আর রক্তকণিকা উত্তাল হয় না বা নিচে হাতেই দ্যাখো নখ পর্যন্ত লালিমা হারিয়ে ফেলেছে তলার চামড়ার সমর্থন-অভাবে। এই সময় কল্পনার পাল ফুটো হয়ে যায় এইজন্যে যে মেরু-তুষারের শৈত্য মজ্জা ধরে টান দিচ্ছে, রাজহংস অন্যান্য বন্যহংসের ডানায় হেথা-নয়-হেথা-নয়-জাতীয় প্রচরণশীলতার মন্ত্র কানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সতর্কতা হিসেবে নয়, বরং বাঁচার ঐশী বাণী-রূপে। কিন্তু বিহঙ্গ যতো দ্রুত নভো-সোপর্দ হতে পারে নিবাস-সন্ধানে, মনুষ্যসন্তান তত সত্বর ডেরা পরিত্যাগে যেমন অসমর্থ, বাঁধতেও তেমন অপারগ। মাটির সঙ্গে বোঝাবুঝি যেখানে নিত্যকর্ম সেখানে ঊর্ধ্বমুখী মেঘ দেখা চলে, তার চত্বরে পা রাখা যায় না। এই জায়গায় কল্পনা দরকার হয়, তা-ও কিন্তু মাটির উপর দাঁড়িয়ে।

ছেলেগুলো সব হাড়-জিরজিরে, ঘোড়া হলে, কেউ পক্ষীরাজ সম্বোধন দ্বারা রসিকতা করত। খড়ের গাদার নিচে পড়ে-থাকা ধানের যে চারা গজায়, তা যেমন বিনা সূর্যকিরণে ফ্যাকাশে, বাচ্চাদের মুখের আদলে সেই রঙ। অথচ সাদা দুধ পেলে সব ধুয়ে ফেলা যেত এত সচ্ছন্দ এবং সহজভাবে যে আর কিছুরই প্রয়োজন হত না। বিষে বিষক্ষয়ের মতো সাদা দিয়ে সাদা তাড়ানোর কৌশল গোড়গ্রামে এত অপরিজ্ঞাত যে মগজ খুঁড়লেও কোন চিহ্ন মেলা দুষ্কর। তাই বালকেরা, বালিকারা কাঁদতে লাগল—লাগল—যখন উপায়ান্তর না দেখে তাদের বুকে কিছু লাগল না কেবল, পেটও জ্বলতে লাগল। অবিশ্যি আবার শক্ত ডাঙায় ফিরে গেলে দেখা যেত, ঘাসের অভাবই আপাতত এই এক জায়গায় নানা সমস্যা গেঁজিয়ে তুলেছিল। শস্যশ্যামলা, চিরসবুজ এলাকাগুলো রাতারাতি কখন পতঙ্গ-আক্রমণে ন্যাড়া আচোট জমিতে পরিণত হবে, তা কেউ বলতে পারে না। গোচারণ মাঠ আর মাঠ নয় যে ধুলো শুঁকেই হিল্লোল-কোকুদ জীবজন্তুর দল নৃত্য শুরু করবে বা আধের-ভর্তি স্তনাধার, গলকম্বল নেড়ে-নেড়ে বাড়ির দিকে ছুটবে গৃহপালিত প্রাণীর যা অভ্যেস। রোমান্টিক ঘণ্টার আওয়াজ চাও সন্ধ্যাগমের অগ্রভাগে, এতদিন যাতে অভ্যস্ত ছিলে স-ঢেকুর, তাহলে তুমি ভুল করবে না—মূর্খতার পরিচয় দেবে। কারণ, আর গোধূলি নেই এবং নেই হওয়ার হেতু : গো-পাল স্ব-স্বভাব হারিয়ে ফেলেছিল যেমন খুইয়েছিল মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার এইরূপ রোমান্টিকরা বুঝত ওই ঢেকুরের কাবাব সংযোজন হিসেবে, ভরা পেট থেকে যার উৎসারণ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার।

বৃড়োনরা আর মাঠে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে না, প্রায় সদা-বিয়োনো চার-পাঁচ দিনের গোরুর

বাহাদুরের সঙ্গে পান্না-দানের ভাগিদতেই এতদিন যার তুলনা বিধিবন্ধ ছিল। এবার বিধি আছেন বটে, তবে বন্ধ করে দিয়েছেন তাবৎ উপাদান যেখানে স্বতঃস্ফূর্ততা নিজেই স্বতঃস্ফূর্ত। সবুজ-সবুজ ঘাস, সবুজ-সবুজ দেশ, সবুজ-সবুজ প্রাণ—সব বুজে গেছে অল্পদিনের মধ্যে, যদিও এমন ক্ষেত্রে শতাব্দী মন্বন্তর দশক প্রভৃতি টেনে আনেন ঐতিহাসিকরা। মোহাম্মদ আলী অন্তত ইতিবৃত্তের এই জের তখনও বজায় রেখেছিল, যে মনে করত, সময়ের পরিমাপ অনন্তের মাপকাঠিতেই হওয়া বিধেয়। কিন্তু বুলানরা যে-সবুর কাঁদত অকারণে নয়—জ্ঞাত হেতুর আশ্রয়ে অসহায় এবং অবুঝ।

কবি মোহাম্মদ আলী বলেছিল তার আত্মীয়দের কোন একজনকে যে আবার কথাটা চালিয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয় কানে এবং এই ধারায় শত-কান হওয়ামাত্র রব উঠল : কামধেনু, কামধেনু। একটা কামধেনু পাওয়া গেলে, শিশু কিশোর অসুস্থ রোগী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—তাবৎ সকলের সমস্যা মিটে যেত। মুনি-ঋষিদের কথা কৃষিযুগেই অচল হয়ে যাওয়ার ফলে প্রকৃত ঘটনা আর প্রাকৃত থাকে না, বরং কিংবদন্তীতে পরিণত হয় যা মাদবর অগ্রয়রহ এমন-কি গফুর বা সুরত মণ্ডল বুঝতে পারবে—তা দুরাশা। চোখ-ঠারা যায় যেমন বিবেককে বা সং প্রত্যয়-জাত ইচ্ছাকে—তেমন স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিপদে আটক পড়লে অমন ভেদরেখা মুছে যায়। ঈশ্বর-স্মরণে কম্পিত-কলেবর বন্যার সময় একই বৃক্ষে সাপ ব্যাঙ ইঁদুর বেজী এবং দ্রষ্টা মানুষ, যিনি হয়তো নাস্তিক। গেরস্থর ধেনু কামধেনু হয় কিনা, তা বিচার করে দেখার জন্যে প্রচুর অবকাশ প্রয়োজন। অকালে ফুল ধরলে বৃক্ষের নাম হয় বারোমেসে। গোড়গ্রামের মানসপটে এমনতর ভাবনার আগ্রাসন। মরীচিকা সাহারার মধ্যে বিভ্রান্ত পথিকের মৃত্যু সন্নিকট করে তোলে যে-মোহ-বিস্তার মারফত, তা আশীর্বাদ বৈকি—যখন দগ্ধানির ভুরপুন আর দীর্ঘ বা বেধ-গভীর হয় না।

—মা!

—কী বুলান!

—আমার মাথা ঘুরছে।

—শুয়ে থাক।

—শুয়ে থাকব?

—হ্যাঁ।

—মরার সময় মানুষ শুয়ে থাকে কেন?

—বালাই ষাট, কী অলক্ষুনে কথা।

—মা, মা। সত্যি শুয়ে থাকে কেন?

—মরা লোক কি খাড়া থাকতে পারে বাবা।

—তবে আমাকে শুতে বলছ কেন?

—দৌড়াদৌড়ি করলে আরো ক্ষিধে পাবে। তুই আবার দুধ-দুধ চীৎকার করিস।

—পোকগুলো—।

—ছিঃ ছিঃ, পোক বলতে নেই।

—তবে লোক বলব নাকি?

—কে জানে, ওগুলো কী। চুপ থাকাই মঙ্গল।

—জানো মা, পাট-চাষ বন্ধ করার হুকুম।

—কেন?

—পোক বাড়ে।

—আবার পোক?

—খামখা ধমক দিও না। জমিন খেয়ে যাচ্ছে, চাল আর বাইরে থেকে আসবে না। তাই পাট-চাষ বন্ধ। মাদবর বললেন।

—ভাল কথা।

—কিন্তু আমাদের তো পাটের জমিনই বেশি। ধান হয় না।

—সকলের কপালে যা আছে আমাদেরও তা-ই হবে।

—কপাল না হাতি।

—তুই খেলতে যা।

—কেউ খেলতে আসে না।

—তবে শুয়ে থাক।

—তুমি মাঠে গেলে দেখতে কতো ন্যাড়া। আর চাষ করে লাভ কী? কখন খেয়ে যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

—আমি কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি, আমি পোকগুলোর সঙ্গে লড়াই করব। মাদবর-পাড়ায় আমার কাকা আছে গফুর। সে-ও তা-ই বলে।

—পোক—ছিঃ ছিঃ, বলতে নেই।

—আর কোন শব্দ বেরোয় না তোমার মুখ থেকে। খালি ছিঃ আর ছিঃ।

—তোর গফুর কাকা কী বলে?

—সে যা বলে তুমি কানে আঙুল দেবে।

—ছিঃ ছিঃ।

—আমিও তা-ই বলি। পোকের চেয়ে লোকের দাম কম। এ হয় নাকি?

—কী সব যে শিখেছিস—?

—আমি দুধ খেতে চাই, মাঠে দৌড়াদৌড়ি করতে চাই। আমি—।

—খাবে বৈকি বাবা। মসিবত আর কদিন থাকে।

—কদিন কদিন করে ক' সাল কাটিয়ে দিলে।

মা আর জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে যখন কাঁদতে লাগল, পুত্র চুপ করে গেলেও তার নাকের ডগা ফুলে-ফুলে উঠছিল। প্রতীয়মান হয়, সেও কাঁদছিল, যদিও নীরবে, এবং তা নিছক কান্না নয়, গুমরে-ওঠার এক নিঃশব্দ পর্যায়।

আট

বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হলে কী প্রতিক্রিয়া ঘটে, সে সম্পর্কে গৌড়গ্রামের কেউই তেমন ওয়াকিবহাল না-থাকা বিধায় চাপবাঁধা অসুবিধা তখনও অপ্রকট ছিল। যে-যার গণ্ডীর মধ্যে ধানাইপানাই করছে তো করছেই এবং তেমন সহানুভূতির প্রত্যাশায় ছুটো দৌড় মারছিল না। অর্থাৎ অসুবিধা একসারিতে তখনও তেমন দাঁড়ায়নি যে একটা সেনাবাহিনীর মতো কুচকাওয়াজ-কালে জানান দিয়ে যাবে : এই আমরা চলছি সঙ্গীন, কিরীচ হাতে, যদি বাধা দাও, মঙ্গল নেই তোমাদের। বহু দীর্ঘশ্বাস একত্রে মিললে তপ্ত বাষ্পে পরিণত হয় না শুধু, তার একটা এমন গুণগত পরিবর্তন ঘটে যে কেউ আঁচও করতে পারে না, এই বায়ুর উৎসভূমি কোন বক্ষ-পঞ্জর। ধাপে ধাপে এগোনোর রেওয়াজ প্রকৃতি বেঁধে দিয়েছে বলে বোধ হয়, এখানে সবকিছু বেশ বিলম্বে ঘটছিল। এমন-কি যে-পক্ষপাল রাতারাতি গ্রামকে-গ্রাম উজাড় করে চলে যায়, তা এই ক্ষেত্রে ঘটতে দিচ্ছিল না। একথা

খুব সহজে বোঝা যায়, যদি লোকগুলোর দিকে তাকাও। অসোয়াস্তি আছে, কিন্তু মনের সেই অবস্থা নেই, যা দিয়ে মানুষ এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে গমনের বাসনা পোষণ করে। অথবা এমনও হতে পারে, পঙ্গপালগুলো বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল, বেশি চোটপাট চালালে প্রতিপক্ষ মরীয়া হয়ে ওঠে—যা আদৌ মঙ্গলজনক নয় এবং অন্যদিকে রসদ তাড়াতাড়ি শেষ হওয়ার কথা। তার চেয়ে ধীরে ধীরে বহুদিনের নিরাপত্তা বজায়ের জন্যে বরং কিছু শ্লথগতি হওয়া উচিত। এসব নিতান্ত অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত হওয়ার দরুন সোজাসুজি স্পষ্ট কিছু বলার দাবি নিতান্তই বুদ্ধি-অগ্রাহ্য। তবে লক্ষণ দেখে কবিরাজ যেমন চিকিৎসা চালায় রোগ সঠিক ধরতে না পেরেও, এখানে তেমন পন্থা বুঝবার জন্যে কিছু মদত দিতে সক্ষম। এসব প্রসঙ্গ উত্থাপনের হেতু এই যে কোটি কোটি প্রাণী যেখানে সংশ্লিষ্ট সেখানে সোজা রেখায় মাত্র দু-একটির হাড়হদ্দ দেখে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তো নয়ই বরং চেষ্টা পাওয়া উচিত যেন খণ্ড খণ্ড হলেও আসল হদিসের রূপ যতটুকু ধরা পড়ে ততটুকুই মঙ্গল। একদম সর্ববিশারদদের পাঁজি খুলতে গেলে, হয় নিষ্ক্রিয় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা অথবা অন্ধের মতো হস্তী দেখেই গাঁয়ে গল্প ফাঁদার জন্যে বাড়ি ফিরতে হবে।

গফুরের বউ সখিনা নসীবের কথা হামেহাল উত্থাপন করে বলে এবারও সে ধরে নিয়েছিল, দুনিয়ার তাবৎ মসিবতের সে-ই হচ্ছে প্রথম শিকার। বাড়ির সীমানায় মাচাঙের উপর কিছু শিমের লতা তুলেছিল সখিনা একটা মানত মেনে। যদি গাছে ভাল ফল ধরে সে মসজিদে দুথালা মিষ্টি ক্ষীর দেবে এবং ইমামের জন্যে আধ সের মোটা মোটা অথচ কচি-দানা শিম সওগাত-স্বরূপ পাঠাবে। গোটা মাচা ভরে লতা উঠেছিল যদৃচ্ছা এদিক-ওদিক প্যাঁচের নানা কসরতসহ, গৃহকর্ত্রীর সাজিয়ে-সাজিয়ে দেওয়া কঞ্চি বা বাখারির উপর নির্ভর, যেন প্রেমিকের ইচ্ছার শত পাক। সখিনার মন সায় দিত না যে এইসব অবলা লতাগুলোর উপর কোনদিকে এতটুকু চোট আসবে যা তাদের নরম-নরম অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কিঞ্চিৎমাত্র বাধা দেবে বা বর্ধনের ক্ষতি করবে। কিন্তু সে নিজেই এই প্রত্যাশা নিরুপায় ভঙ্গ করত, এক-চিলতে ভিটের মালিক তো তারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—যেখানে রোদ্দুর লাগে এমন জায়গার শত টানাটানি, একটা ভিজে কাপড় শুকোতে দিতে। রীতিমত মনের সঙ্গে লড়াই চালাতে হত সখিনাকে, যখনই এমন-ধারা কাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাঁয়তারা কষত। কিন্তু উপায়হীনতার চোটে যখন সব যুক্তির হাড়গোড় চুরমার তখন খুব জোর একটু কালক্ষেপ করা চলে, অবশ্যম্ভাবিতার চাকার তলায় না শুয়ে চারা থাকে না। সখিনা তার রাত-বাসি ভিজে কাপড় মাচাঙের উপর মেলে দিতে গিয়ে ভেবেছিল, একটা পর্দা অন্তত টানানো হল যা তার প্রিয় শিম-লতার ডগাগুলোকে বদনজর এবং পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করবে না শুধু, চড়া রোদ্দুর থেকেও রেহাই দেবে। কিন্তু রান্নাঘরে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে ব্যস্ততার দরুন উঠানের দিকে নজর দিতে সে ভুলে যায়নি কেবল, বরং বেমালুম মানত—তার কাপড় যেন ঘরে সিন্দুকে বাঁধা আছে এবং সে প্রচ্ছন্ন আনন্দের এমন রেশ আবার ভোগ করবে, যেহেতু কাপড় ধোওয়ার কাজটা তো অনুপস্থিত। গৃহপালিত গোরু ছাগল হাঁস মুরগী এবং তাবৎ গেরস্থালির খবরদারি সখিনা সেদিন নতুন করছিল না যে আলস্য-জাত খোঁয়াড়ির উপর সে দিন-গুজরানের ভিত্তি পাতবে এবং পায়ে-পা-দিয়ে-বসে থাকার প্রত্যাশায় গাফিলতি চালাবে। কিন্তু মাচাঙের দিকে তার চোখ কেন যে সারা দুপুর, সারা বিকেলও গেল না, তার হদিস-খোঁজে সে বিফল হয়েছে পরে। অথচ সেদিকে দৃষ্টি যেতেই তার বুক থরথরিয়ে উঠেছিল এত দ্রুত, যখন হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না। তারপর ঈষৎ আচ্ছন্ন চোখ কচলেছিল সে একবার, দুবার নয়, বহু শতবার, না আরো অনেক গুণ, কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একান্তে অবস্থিত এক চিলতে সবুজ দেখার জন্যে—যার

আয়তন-মোহ কবির নিকট শস্যশ্যামল জন্মভূমি-রূপে প্রতিভাত হয়েছিল একদা। মাচাঙ-উজাড় শূন্যতায় নিজেকে সখিনা সোপর্দ করে এক নিঃশ্বাস ছাড়া অবয়বের অনান্য চাঞ্চল্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গড়খাই কেটেছিল যেন অশ্রুসহ সকল বেদনা নিঃসাড় পাথরে পরিণত হয়। লতার জায়গায় খণ্ড খণ্ড ন্যাকড়া ঝুলছিল—আততায়ীদের নিশান যার মধ্যে ঘোষণা করে গেছে সর্বগ্রাসী সতর্কবাণী : কেবল সবুজের সীমানাই আমাদের সীমানা নয়। মাচাঙের বাঁশ, কঞ্চি, বাবলা বা অন্য গাছের সরু ডালপালা হঠাৎ গতিবন্ত সংগীন বা কোঁচের মতো সখিনাকে খুঁচতে লাগল আষ্টেপৃষ্ঠে মুরগী-রোস্ট করার প্রক্রিয়ায় যেমন প্রয়োজন। শাড়িটার ঐতিহাসিক আবেদন ছিল। পিতৃস্মৃতির স্পর্শ সুতার পাকে পাকে সখিনা বহুদিন করত এবং আনন্দ-ডগমগ এই বসন সে লেপ্টে নিত সারা শরীরে। বস্তুধ্বংস শুধু কেবল অনড় পদার্থের বিলয় নয়, বরং মনুষ্যধ্বংসের মতোই তার তলায় তলায় বইতে থাকে নানা জীবন্ত প্রবাহ, যদিও বাইরে ধকধকানি এতটুকু কারো চোখে পড়ার কথা নয়। গফুরের বউ তখন নিজেই পদার্থে পরিণত হয়েছিল এমনই পাষাণ-পর্যায় যে সারা সাঁঝ সে গেরস্থালির সব শৃঙ্খলাপনা ধান-সারা-কালীন কুলোর বাতাসে তুষের মতো উড়িয়ে দিলে, তাকিয়েও দেখলে না কোন দিকে কী থাইল। গফুর নিজের কাজ ছাড়াও সেই সময় উদ্বিগ্ন, নানা আশঙ্কায় তাগিদে এপাড়া-সেপাড়া ছুটে বেড়াত নিজের চালচুলো রক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, যেন ভূতে পেয়েছে এমনই। জমিনের ধারে, যা সামান্যই আছে, আর সে যেতে পারে না। তা নিয়ে মনের সঞ্চিত ক্ষোভ সে চেপে রেখেছিল এই ভেবে যে সে তো আসলে গাড়োয়ান, সুতরাং একদিকে না একদিকে পুষিয়ে যাবে। কিন্তু গ্রামের সীমানা বন্ধ হওয়ার ফলে, রোজগার চুলোয় যাক, আরো সমস্যা দেখা দিয়েছিল যেখানে তার একার চিন্তা আর পাহাড় প্রমাণ নয়। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় মুর্গীছানা গুলোর চ্যাকচ্যাকানি শুনে মেজাজ চড়ে গিয়েছিল, হঠাৎই বলতে হয়। গফুর সম্পর্কে গ্রামে কেউ অযথা দোষারোপ করার লোক আছে, এমন সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সখিনা তখনও বাঁশ সংলগ্ন আর এক থাম বা থাস বিশেষ যেন নতুন ঠেস দরকার মাচাঙের ফল ভার বেশি বিধায়।

—খাড়ায়া কী করেন, নবাবজাদী?

নবাবপুত্রী বাগদণ্ডের মধ্যে তখন গভীর অনুপ্রবিষ্ট, অন্ততঃ তা-ই ধারণা করা উচিত, যখন কোন জবাব বা প্রতিক্রিয়া এল না অন্য পক্ষ থেকে।

করতাছ কী?

!!!

করতাছ কী?

মুখে ফুটো নাই, রাও নাই?

!!!

—দু' ঘা দেওন পড়িবো?

তখন সখিনা এমন স-চিৎকার কান্না জুড়েছিল যে গফুরের মতো দু'দিশার যুবকের পর্যন্ত ধারণা, পাগলামির প্রাথমিক স্তরের এই বুঝি প্রারম্ভ। সে আর মেজাজ চড়ায়নি বা মেজাজে জল ঢালতেও এগোয়নি। তবে সত্বর সে বুঝে নিয়েছিল, একটা ভীষণ কিছু ঘটে গেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, যার লক্ষণ-রূপে ওই চিক্কর-কান্না তখনও কানের পর্দায় মোচড়াচ্ছে।

—কী অইল, কইবা না?

—কিছু না।

—কিছু না তো কাঁদোসেন।

—নবাবজাদীও কাইন্দে।

—গোস্বার কথা না, অইল কী?

সখিনা তখন একবার মাচাঙের দিকে আঙুল বাড়িয়েছিল বটে, কিন্তু সন্ধ্যাপ্রহরের তো চোখ সম্পর্কে এমনই উদাসীন যে দৃশ্যপট সাজিয়ে রাখার কথা ভাবেনি। সুতরাং গফুর কিছুই দেখলে না, কিছুই বুঝলে না এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ব-কৃত জালে জড়িয়ে পড়ছিল, যখন অপর পক্ষ, আর তার উদ্ধারে আসবে না, সে জানত।

—কী হৈল কও।

—আমার কান নাই, তোমার চক্ষু নাই।

সখিনার তীক্ষ্ণস্বর অন্ধকার কমতে তো দিলেই না, বরং দুজনের মধ্যেকার ফাঁকের আরো বিস্তার ঘটল।

সেদিন ডিপা জ্বালিয়ে আনার সময় গফুরের মনে হয়নি কেন, সেই জানে এবং জানা উচিত ছিল এমন ক্ষেত্রে যখন কান সজাগ থাকলেও কান নিষ্কর্মা।

—গোস্বা করছ?

—না।

—তবে কী অইছে কও না ক্যান?

নবাবজাদার মেজাজ আমি ক্যামনে সামাল দিতাম।

—হে তো গত বছরের কথা।

—না, অহনের।

—আরে যাইতা দাও।

—হব গ্যাছেগা।

—হব?

—যায় নাই, যাইবো।

—কী যাইব?

—আমি যামু।

—কুথা?

—কবরে।

কী আর কইছি, অ্যাতো গোস্বা?

একটু না।

সখিনা বিনা বাক্যব্যয়ে লজ্জাশীলা রমণীর মতো কয়েকটা মুর্গীছানা আঁচলে তুলে অনু-পদী ধাড়ীটাকে আয় আয় শব্দে আশ্বাস দিয়েছিল, যখন গফুর আসন্ন বিপদের মুখ থেকে পরিত্রাণের আশায় মুখ খুলেছিল,—যাও কুথা, কইয়া যাও।

—আহি।

সখিনা এবার একা না এসে সঙ্গে বয়ে এনেছিল এতদিন উঠান উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে যার সাহায্য নিয়েছে প্রতিদিন সন্ধ্যাগমে। প্রদীপ নয় ডিপা। হাতে প্রদীপ কালিদাসের ইন্দুমতীর মতো সখিনা এগিয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে মাচাঙ-অভিমুখে, চোখে অঝোর জল এবং এক রকমের চাউনি —যার ব্যাখ্যা দুই চোখ দিতে অসমর্থ।

গফুর চিৎকার দিয়ে উঠেছিল—আঁ—কাবড়ও খাইছে?

সখিনা মাথা নাড়লে না জবাব দিতে, বরং আরো অনড় হতে লাগল দীর্ঘশ্বাসে শরীরের স্ফীতি বাড়িয়ে বাড়িয়ে। গফুর এই ক্ষেত্রে কী করবে, তার স্থির-নির্দেশ পেতে এদিক-ওদিক

ভাবলে : বাতাস নিরেট থেকে পাতলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। হাসি ছিটিয়ে সে উচ্চারণ করেছিল, যখন অপর পক্ষ কতকটা শান্ত অথবা চুপ হওয়ার পথে দ্বিধান্বিত,—হু হালা পোক্ বসন ধইরা টানতাছে। পোক রসিক আছে।

সখিনা কোন কথা না-শোনার ভান করে নিজের মনেই স্পষ্টত চিৎকার দিয়ে উঠে,—মশ্‌কেরা থুইয়া রাখো।

কিন্তু গফুর তো বৌর সঙ্গে পয়লা দিন ঘর করছে না যে আসল হদিস পেতে অশেষ আয়াস প্রয়োজন। পায়তারা সফল দেখে সে নিজের চরকায় আরো তৈল-সংযোগের পর জোরে জোরে সহাস্য উচ্চারণ করেছিল,—হালা কেষ্ট ঠাকুর সাজছে। এইবার দাখব হালারে।

কান্নার বেগ দ্বিতীয় দফা চেপে এলেও সেদিন পত্নী আর নিজের সড়কে স্থির থাকতে পারেনি। বরং আরো শান্ত গেরস্থালির কাজে মন সংযোগ করেছিল।

নয়

সমস্যা বুদ্বুদের মতো এক, দুই· তারপর ক্রমশ জনতার আকার, এবং জনতা যেমন হুড়মুড় উত্তাল হতে থাকে মুহূর্তে মুহূর্তে, তেমনই তাগদ যুক্ত জটিলতায় জুটতে লাগল। তখন তা আর শুধু হাহাশ্বাস বা চক্ষু-বন্ধ মারফত উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না এইজন্যে যে, তুমি যেমন ব্যক্তি এবং তোমার অভিঘাত আছে বস্তু-রূপে, তেমন বস্তুরও ব্যক্তিত্ব আছে। বহুকালের ঐতিহ্যে গোড়গ্রাম বর্ধিষ্ণু-রূপে খ্যাত ছিল বলে প্রথম প্রথম অভাবজাত চোটপাটে কেউ তেমন গা করেনি অথবা তার আঘাত এমন সুড়সুড়ি-পর্যায়ে ছিল, একটা বিরক্তি জাগাতে পারত মাত্র। অর্থাৎ তুমি মশা-তাড়ানোর কায়দায় কামড়ের জায়গায় হাত বুলাতে, নিজের আসন পরিত্যাগ বা কামান-দাগার আয়োজন করতে না। এবার যে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে গেল কয়েক মাসের মধ্যে এবং জের যখন ছুটল তখন তা বেগবান উন্মত্ত অশ্ব। এক, খাদ্যসমস্যার কথাই ধরা যেতে পারে অপিচ অন্যান্য সমস্যা স্ব-বৈশিষ্ট্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জঠরের স্বাভাবিক চাহিদা যখন দুরূহ হয়, ক্ষুন্নিবৃত্তির নানারকম উপায় কলম্বসেরা আবিষ্কার করে। অবিশ্যি এখানে আবিষ্কার-কর্তার অবয়ব নানা পর্যায়ে বিচরণশীল এবং উপায়ও ঠিক সেই অনুযায়ী আবর্তিত, বিবর্তিত বা অনুবর্তিত হয়। আদিম কাল থেকেই তা ঘটেছে বলে কেউ যেন মনে না করে, তা ঠেকে-শেখা-গোছের কোন অভিজ্ঞতায় মানুষ বিত্তবান। এমন হলে তো গোড়গ্রামে একদা যা ঘটেছিল তা আর যে কোথাও ঘটত কি, তার সম্ভাবনার রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেত। কানামাছি খেলার মতো শুধু আন্দাজে অনুমানে, তুমি চোর, আর কাউকে স্পর্শ করে তবে খালাস পাবে, তেমন পর্যায়েই গ্রহণীয় এবং চলছিলও তা-ই। গোড়গ্রামে একে একে যা ঘটতে লাগল, তার পূর্ণ ফিরিস্তি আর কোন দেশে বিধৃত হয়েছে বলে কেউ কোনদিন বলেনি। এক স্বাতন্ত্র্যের মহিমা এই দিক থেকে উক্ত এলাকার কপালে বসে ছিল· -রাজাধিরাজ, অথবা সর্প-দংশন করলে যেমন ক্ষত-জায়গায় সাপুড়ে বিষহর পাথর লাগিয়ে দেয়, এ-ও তেমনি। প্রাথমিক লক্ষণগুলো যেভাবে প্রকট হল তা দেখেই পরবর্তী ধাপ অনুমান করা যেত। ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল, বর্ষাকালে নর্দমায় মাছির ডিমের মতো অসংখ্য। পুণ্যসঞ্চয়ের অন্যতম পথ হচ্ছে করুণা। হ্যাঁ, তোমার বুক কাতরালে বা চোখের কোণ ভিজে উঠলেই তা থেকে রেহাইয়ের পথ বের করতে হয়। ওই রাস্তা তোমার আত্মা-পরিশোধনের উপায়, যেমন বালু-যোগে পানী ফিল্টার। তাই একটা সান্ত্বনা পাওয়া গেল যে জীবনে কিছুই হারানো যায় না বা হারা হয় না। পৌষ মাস বা সর্ব-নাশের আকার বিভিন্ন, একথা শুধু নাস্তিকেরা বলতে পারে, যারা সর্বদা পুণ্য-অর্জনে অনাগ্রহী।

কিন্তু যারা ভিক্ষারত্তের প্রতি দুরন্ত ঘৃণায় চোখ লাল করে, তারা চোর ঠগ দস্যু বাটপাড় পকেটমার বা আর কিছু হয়। এইভাবেই হিসেব নিলে শেষ পর্যন্ত কিসে কিসের আবির্ভাব ঘটে তা ধার্মিকও বলতে পারবেন না। অর্থাৎ প্যাঁচ, প্যাঁচ কষে যাও, ঘটনার পর ঘটনা এলোপাতাড়ি সাজিয়ে দেখবে দুনিয়ার জটিলতা নিয়ে বাড়াবাড়ি নাদানের কর্ম। এই চিন্তা বিজ্ঞাপনদাতাদের কায়দায় হাজার হাজার হ্যান্ডবিল বা প্রচারক-মারফত বিস্তার করে দিলে তখন খাদ্য বাতাসে পরিণত হয় এবং যদিও সভ্য শহরে বায়ু খরিদ ছাড়া উপায় থাকে না, তবু বলা যায়, বাতাস-ভক্ষণ দ্বারা মানুষ বাঁচে বৈকি। কিন্তু তখন সবকিছু ওই অদৃশ্য অথচ স্পর্শদ রাসায়নিক দ্রব্যের আকারে মনুষ্যদেহে সঞ্চারিত হয়। জীর্ণ শরীর তারই পরিণতি, যেমন স্বপ্নও তার হাত ধরে আসে, হয়তো সুখদ নাও হতে পারে। আঁতুড়ীর ভেতরে পর্যন্ত বাতাস ঢোকে এবং সবই ক্রমশ অদৃশ্য করে তুলতে চায়। বার্নার্ড শ' যে মানুষের নিছক চিন্তায় পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার সহজ এ-ই এক উপায়। দুর্ভিক্ষ-কালের মড়ার খুলিগুলো শাঁসশূন্য নারিকেল-মালার মতো পথে ঘাটে যা কবরে পড়ে থাকার দরুন কেউ খুঁটিয়ে দেখে না। একটু মনোযোগসহকারে তাকালে চোখে পড়ত, হাড় পর্যন্ত কুঁচকে গেছে, যেহেতু মজ্জা পূর্বে শুষ্ক। গোড়গ্রামে এসব নিদান কাউকে বাতলাতে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তা এসে জোটে এইজন্যে যে এলাকায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য শুধু মোহাম্মদ আলী এবং আর যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই পাঁড় নয় সব তিলে- ঘুঘুর শ্রেণীভেদে যা বলা হয়। বাতাসের চাহিদা সেবার এত বেড়ে গিয়েছিল যে আকাশ যোগান দিতে অসমর্থ -যে স্থল থেকে একদা কতো ছায়ার বর্ষণ না ঘটেছিল। বায়ু এবং ছায়া একত্রিত হলে শরীর নির্বিবাদ জুড়িয়ে যায়, এমন কথা যুগ যুগ চালু আছে। শরীরের মতো সম্পদ শুকাতে থাকলে, ছোট ডোবায় গ্রীষ্মের দিনে অনেক ছেলের দাপাদাপি-স্নানে যে ঘোলাটে অবস্থা হয় এবং মাছের চোখ কাদানির চোটে খাপসি খায়, এ তেমনই ব্যাপার ঘটছিল গোড়গ্রামে। মনুষ্যে মৎস্যে একটা সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল বহু শতাব্দী পরে, সেই আদিম সৃষ্টির কালে যার সূত্রপাত। অথবা বলা যায়, ইতিহাসের চাকা পেছন দিকে গড়াতে লাগল, গলিপথে অপ্রশস্ততার জন্যে মোটর-ড্রাইভারকে যে-পন্থা অবলম্বন করতে হয় কোন কোন সময়।

মোহাম্মদ আলী যখন সত্য হৃদয়ঙ্গম করে যে, তার পক্ষে এই স্থান-পরিত্যাগ সম্ভব নয়, যদিও কাব্যসাধনার পাদপীঠ-রূপে সে এমনই জায়গার খোয়াব দেখেছিল, তখন সে মনে মনে প্রথম খুব বিচলিত হয়নি বটে, কিন্তু ইদানীং সে আস্থা হারাতে বসেছিল। বাইরে অবিশ্যি তেমন প্রকাশ নেই, যদ্যপি লোকজন তার কাছে আসে এবং উপদেশ প্রার্থনা করে। তাছাড়া কোনক্রমে তার রসদের অভাব ঘটবে, এমন কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং থাকলেও হয়তো দূর ভবিষ্যতে। তবে অভিজ্ঞতা থেকে মোহাম্মদ আলী শিখেছিল, বাতাস কবিতার বিচরণভূমি হলেও মানুষগুলো বায়ুসেবী নয়। সে আরো আঁচ পেয়েছিল, লোকগুলো তার নিকটে সমাসীন হলেও আর পূর্বের মতো সমীহা-জাত ব্যবধান-রক্ষায় পরাঙ্মুখ। তার করস্থিত হুঁকা থেকে কল্কে তুলে নিতে ক' মাস পূর্বেও দশ দফা ইতস্তত করত বা হাত বাড়িয়ে মুখের দিকে তাকাত অনুমতির জন্যে। এসব ব্যাঘাত, তদুপরি নিজের মণ্ডল-থেকে-নির্বাসিত এবং আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহতা মোহাম্মদ আলীকে এমন ভাবিয়ে তুলেছিল যে সে কবিতা মনে মনে আউড়াত আর খাতায় তুলত না। এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তার হাতে বন্দী সে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল বাইরে বলিষ্ঠতার খোলস চাপিয়ে এবং হেন কর্মে তার মেজাজ হচ্ছিল ক্রমশ হন্যে গোঁড়া ব্যক্তি নিজের আদর্শের স্ববিরোধী ঘটনা দেখলে যেমন হয়। গফুরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটলে মোহাম্মদ আলী পরিত্রাণের একটা আশ্বাস খুঁজে পেত এবং অন্বেষণের (সে তাকে একদিন গ্রাম থেকে বাইরে পৌঁছে দেবে বলে কতো আশা-পোষণ) তাগিদে ডাক দিত -

বড় সস্নেহ সম্বোধন। কিন্তু যদিও পাশ কাটিয়ে যেতে অক্ষম, তবু অভিবাদন দ্রুত সেরে পলায়নের মধ্যেই গাড়োয়ান গফুরের পরিত্রাণ।

—কেমন আছো মিয়া?

—আল্লার যা মর্জি।

—গফুর, তুমি বড় ভাল ছেলে।

—হুজুর, আমাদের তো মরার দশা।

—না—না। সবুর করো। ধৈর্য ধরো।

—আপনি কইলে তা পারি। কিন্তু—।

—কোন কিন্তু নেই। ধৈর্য ধরো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সেই আশায় আছি।

—তুমি ইমানদার মানুষ।

সেদিন মোহাম্মদ আলী গফুরকে যে জোঁকের মতো লেপ্টে ধরেছিল, তা কেবল ভেতরের ভার নামাতে ছাড়া আর কী। কিন্তু গাড়োয়ানের তখন মনে পড়ছিল, আশায় মরে চাষা, প্রবাদটি—যা দাদু সুরত মণ্ডল প্রায়ই উচ্চারণ করেন। গফুরের আর-একটা বড় সাধ জেগেছিল, কেন সে নিজেও জানে না যদিও। দুই কবির সাক্ষাৎ। কিন্তু তখন যে-সমস্যা গফুরকে ঘিরে থাকত, বোধ হয় চাপের সেই খোঁচানি তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, গ্রাম আর শহরের দুই কবি মিলে যদি উদ্ধারের একটা পথ বাতলাতে পারে। কিন্তু সুরত মণ্ডল আর চোখে দেখেন না বিধায় তার পক্ষে কোথাও যাতায়াত বয়সও আশির কাছাকাছি, অতি দুর্বল অসম্ভব। মজকুর ক্ষেত্রে মান-অপমানের প্রশ্ন আছে, ছোট-বড়র প্রশ্ন আছে, রুচিভেদের কথা আছে—এমন কতো না ঝগড়া। গফুর তাই মুখ ফুটে বলতে গিয়ে থেমেছিল এইজন্যে যে শেষ পর্যন্ত দাদুর না কোন মানহানি ঘটে যায়। তা ছাড়া, কবিয়াল সুরত মণ্ডলের এত প্রশংসা মোহাম্মদ আলী শুনেছিল লোকমুখে, কৌতূহল থাকলে তো নিজেই হাজিরা দিতে পারত। গ্রামের প্রতি মোহাম্মদ আলীর প্রেম এমন স্পষ্ট যে শহর ছেড়ে, নানা আরাম-আয়েস মুলতুবী রেখে নচেৎ কেন সে এখানে পড়ে মরতে এসেছিল গফুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন এসব বাদ-বিচার করছিল, তখন রাস্তায় একদল ভিক্ষুক এসে পড়ে। সাত-আটজন, বোধ হয় গোটা পরিবার। মোহাম্মদ আলীর কাছে হাত পাতলে সে কী করত। (যদি দেয় কিছু, শত শত ভিক্ষুককে ওর পেছনে লেলিয়ে দেব রোজ পরিতারা কষছিল গফুর) খোদাকে মালুম। ভিক্ষুকদের গন্তব্য সম্ভবত আর কোথাও। তাই কবির দিকে চাইলে মাত্র, মুখ খুললে না কেউ।

—মানুষগুলো লাল হয়ে গেছে, গফুর।

জী।

—আমি লালের উপর একটা কবিতা লিখব।

—তাহলে লাল হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

—তা হবে বৈকি। সচেতন মানুষ।

—লাল কে বানায়, কবি সাহেব?

—আল্লা, তার যা মর্জি।

—আমার হাতে কাজ আছে।

—এখনই যাবে?

—হ্যাঁ।

মামবরের সঙ্গে মোহাম্মদ আলী কবির কথোপকথনের প্রাচীন প্রসঙ্গ গফুরের সেদিন মনে

হয়েছিল না শুধু, একটা রুদ্ধ চাপা আক্রোশ পেয়ে বসেছিল পর্যন্ত। ভিক্ষুকের কাতার ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছিল মাঠের বিস্তারের সঙ্গে, তার চোখে পড়তে দেরি হয়নি। তখনই আশঙ্কিত গফুর আরো আতঙ্কিত এই ভেবে যে ওরা বোধ হয় গ্রামত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। যাযাবর জীব একদা-মানুষ খাদ্যান্বেষণে বনজঙ্গল-গিরিদরী পার হয়ে কতো ক্রোশ-ক্রোশ পথ পায়ে রগড়ে যেত, যেন সকল অদৃশ্য আহ্বান তাদের জঠরের মধ্যে অর্থাৎ দেহে সীমাবদ্ধ এবং সেই আকর্ষণ তাদের দিগ্বিদিক উগরে দিত। গফুর দাদু সুব্রত মণ্ডলের কথাগুলো একবার চানুকে নিতে গিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল বুকের তোলপাড়-সহ : ওরা বোধ হয়, গ্রামবাসীদের বিশ্বাস করেনি অথবা খোঁজ রাখেনি। পোকা, পোকা, পোকা, পোকা। হাজার লক্ষ কোটি অর্বুদ। সুতো (যেন মানুষের মূল্যে) বাড়িয়ে-বাড়িয়ে উড়বে, ছো-মারা কায়দায় নামবে, বসবে, কুচকাওয়াজ করবে। তখনই আর নিঃশ্বাস ফেলাতে অসমর্থ, তুমি নির্ঘাত মরবে। বাতাস খেয়ে বাঁচতে, এখন সেই বাতাসেরও অনটন ঘটবেই এবং তুমি আর কিছুই দেখবে না চোখে, শুধু হাঁসফাঁস করবে বুকের ভেতর পাঁজরের আছড়ানি নিয়ে। হে প্রভু, হে এলাহি মাবুদ, ও ঈশ্বর-- উচ্চারণ করতে না পারার সহজ হেতু, বাতাসই আর নেই, যা দিয়ে শব্দের ঘর তৈরি হয়। গফুর সেদিন দ্রুত হাঁটছিল বাড়ির দিকে এবং পিছু ফিরে বার বার তাকাচ্ছিল এক তপ্ত অনুতাপে। কবির জন্য সে মুখ তুলে সকল মুখ দেখতে পারেনি--কে গেল, কারা গেল? ওরা তখনও হাঁটছিল দিগন্তের কিনারায় ছায়ামূর্তি--গোধূলি-বেলায় দূর থেকে চাষীদের কুঁড়ে বা বৃক্ষ যে-দশা হয়। পেছন থেকে গফুরের টান-টান মূর্তি শবরীর প্রতীক্ষার সঙ্গে তখন তুলনা অনর্থক। যেহেতু সে জানে না, কোন অভীপ্সায় কোন অভীষ্টের জন্য তার ওই আন্তরিক আথালি-পাথালি। উদ্বাস্তু এবং ভিক্ষুককে এক তৌলদণ্ডে ওজনের নানা অসুবিধার নিমিত্ত এমনই যে যুগলের স্থান-বিনিময় এখন পলকে-পলকে ঘটে, তখন বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। গফুর চেয়েছিল, একবার সে দৌড়ে যাবেই যদ্দুর পারে হাঁক দিতে দিতে --কে তোমরা, কোথা যাও, একটু দাঁড়াও। আমার পড়শী হও বা না হও, কিছু আসে যায় না। আমরা যে একই এলাকার রৌদ্রবৃষ্টিস্নাত তরু, ছোট-বড় বা বিভিন্ন জাতের---কিন্তু একই মৃত্তিকাসংলগ্ন ছিলাম এই দুর্বিপাকের পূর্ব পর্যন্ত। যেও না, যেও না। এসো, ফিরে এসো। অন্ধকারের গড়খাই তোমাদের সম্মুখে, জানা নেই তোমাদের। এসো, একসঙ্গে সকল দুঃখের বোঝার শরিক হই কাঁধে-কাঁধ। সেদিন মোহাম্মদ আলীকে অভিসম্পাত-রত গফুর গ্রাম-পথে জোরে জোরে পা ফেলছিল, যদিও দিগন্তের দৃশ্য তাকে বার বার টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, আরব্য উপন্যাসের কাহিনী হাতেম বাদশার সেই আজগবি পাহাড়ের ডাকের মতো। প্রচণ্ড মনের ভার মোছার অনর্থক চেষ্টার মধ্যে সে সুব্রত মণ্ডলের কাছে এসে কেঁদে ফেলেছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বৃদ্ধের প্রশ্নে নিরুত্তর এবং সেই ধন্দের অবস্থায় দাদুকে ছেড়ে আবার মাঠের দিকে ছুট মেরেছিল উন্মাদের মতো বিড়বিড় আত্মসম্বোধনে,
- তোমাদের মুখ দেখতে পেলাম না। চেনার প্রয়োজন কী? এই গাঁয়ের মানুষ এবং তোমরা মানুষ--- আমার ভাল-মত জানা মৃত্যুসড়ক ধরে দল বেঁধে চলে গেলে, আমি রুখতে পারলাম না। আমি কিছু বলতে পারলাম না, আরো আফশোস। পেশায় গাড়োয়ান আমার পিতা এলাকায় এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন নানা দিকে নানা যোগ -পুত্র-রূপে আমি তার পেশা তুলে নিয়েছি বলে আমারও যোগ দূর-দূর অবধি। আমার সতর্কতা পর্যন্ত মনে রাখলে না। এই সেদিন মাত্র আমি ফিরে এসেছি দুষ্ট নিঃশ্বাস কোনরকমে বাঁচিয়ে যেন একদম চেপ্টে না যাও চিরদিনের মতো...........।

অতঃপর শবরী একদিন অহল্যার মতো পাষাণ হয়ে গেল যখন আকুলতা শিল্পীর আদর্শ-স্বরূপ ভাস্কর্যের অঙ্গ লেপ্টে রইল, কিন্তু হৃৎপিণ্ড-ধুকধুক মানুষটা রইল না।

সুব্রত মণ্ডল সেদিন তার চতুর্দিকে হাতড়াতে লেগেছিল গফুরের খোঁজে, যে একটু আগে

আবার রাস্তায় নেমেছিল নিরুদ্দেশ দৌড় দিতে, কম্পানির জের বার বার পশ্চাতে রেখে।

দশ

এক অভাবনীয় কান্ড দেখা দিতে লাগল। আরো কিছু দিন, কয়েক হপ্তার মধ্যে, যার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল বা প্রস্তুত ছিল না—এমন ধারণা খামখা না। রাস্তার পাশে যেখানে ঝোপঝাপ বা গাছ-পালার বেড় অর্থাৎ যেখানে ওত পাতা যায়, এমন জায়গায় দু-চারটে পঙ্গপাল মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মোহাম্মদ আলী, মসজিদের ইমাম এবং গ্রামের বেশ কিছু বর্ষীয়ান আগে থেকেই বলে দিয়েছিল : কী থেকে কী হয় বা হবে, তা তো কারো জানা নেই। সুতরাং খামখা ওই পতঙ্গের গায়ে হাত দিয়ে কেউ কিছু যেন না করে বসে· হিতে বিপরীত হবে। তা ছাড়া, এইসব পতঙ্গ যে কোন মানুষের ছদ্মবেশ নয়, যার কাহিনী শাস্ত্রে বহু জায়গায় উল্লেখ আছে, তা নিশ্চয় করে বলা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। এমনও হতে পারে, যেমন এক-কালের আকাশের ছায়া আবহাওয়ার তপ্ত কড়া থেকে সকলকে রক্ষা করেছিল, আবার তেমনই কিছু আসছে যদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ সকলের ভবিষ্যৎ জোয়াদার রোশনাইয়ে পূর্ণিত হবে। সুতরাং, ভাবিয়া-করিও-কাজ, করিয়া-ভাবিও-না গোছের প্রবাদ ভেবেই হাত দেওয়া উচিত যেন আখেরে কাউকে পস্তাতে না হয়। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যেত, যদি না মরা পতঙ্গের লাশ প্রায় তৎপরতা-যোগ্য জায়গার আশেপাশে ক্রমশ চোখে পড়ত। এবং সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়তে লাগল, তা প্রমাণের জন্যে একবার অকুস্থলে গিয়ে দাঁড়ালেই যথেষ্ট, গণনার প্রয়োজন ছিল না। গাদা দেখলেই বোঝা যেত। এক দুই গনা যায়, যদিও বস্তু শত হাজারের মোকাবিলা। সুতরাং ঘনত্ব দেখেই আন্দাজ করে নিতে হত, আর সকলে তা-ই করছিল। অন্যদিকে, পতঙ্গ গোনার মধ্যে এমন কী মহৎ রত্ন লুকায়িত যে কেউ ফজুল সময় নষ্ট করবে। কিন্তু সকলে একমতের পোষক না হওয়ার ফলে, কারো কারো ধারণা দেখা দিলে : ছদ্মবেশী এইসব পতঙ্গদের কবর অথবা দাহ ক্রিয়াচারে সম্পন্ন করা আশু বাঞ্ছনীয়। গ্রামের এক চিকিৎসক এমন মতবাদের পেছনে আরো ইন্ধন যোগালেন এই ব্যাখ্যা মারফত : পতঙ্গের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে না, বরং আততায়ীর দুষ্কৃতির ফলে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। প্রমাণস্বরূপ তিনি বললেন, শরীর থেঁতলে বা চেপ্টে রয়েছে বিধায় স্পষ্ট প্রতীয়মান আভ্যন্তরিক অঙ্গ-বৈকল্যের হেন দশা হওয়ার কোন হেতু অসম্ভব তো বটেই, অন্য বিকল্পও অচিন্তনীয়। অতএব, ময়না-তদন্ত ব্যতিরেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ত্রাণকারী এইসব পবিত্রতা-সিক্ত পতঙ্গদের কোন আততায়ী গোষ্ঠীরূপে দেখা দিয়েছে, যারা ওই পাপকর্মে লিপ্ত। নিজ-নিজ সমস্যায় বুঁদ নিষ্ক্রিয় অনেকেই এতদিন ভেবেছে, কেঁদেছে নীরবে অথবা হতাশ্বাস ফেলেছে কি ঐ-জাতীয় একটা কিছুর ভেতর সেঁধিয়ে ছিল। তারা এবার কোমর বেঁধে হাতে ডান্ডা বা বান্ডা নিলে, এমনভাবে তৈরি হল যেন দুরাচারদের মোকাবিলা না করা পর্যন্ত জীবন বৃথা। রাতে পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছিল, যখন নিঃশব্দে পতঙ্গেরা স্ব-স্ব-রসদ সন্ধানে ব্যস্ত থাকত বা স্থানান্তরে যেত। তখন অর্বাচীন অন্ধকারে আতঙ্ক দেখা দিল যে পতঙ্গ-রক্ষার জন্যে তাদের এই ব্যবস্থায় আলোর প্রশ্ন অর্থহীন। যেহেতু আলো এবং দিন সমার্থবাচক আর দিনে হত্যা অনুষ্ঠিত হয় না, তখন আলো দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঘুটঘুটে তমসা যেমন চোরের হেফাজত করে, তেমনই সাপের চলাফেরায় সুবিধা যোগায়—যা আর এক অপ-মৃত্যুর প্রতিচ্ছায়া ছাড়া কী? তবু চৌকিদারি কেবল শুরু হল না, অনেকে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে পতঙ্গ-রক্ষায় এমন মনোযোগী হল তা অন্যান্য সমস্যা খেদিয়ে দিলে। দৈনন্দিনতার খোঁচানি থেকে রেহাই পাওয়ার বহু উপায় আছে বটে, কিন্তু যদি কেল উত্তাপ ছড়িয়ে হুজুগ-রচনার মতো আর

কোনটাই তেমন কার্যকরী নয়। রীতিমতো নিয়ম-মাফিক আহারের অভাবে এই গ্রামে সচরাচর ক্লান্তি প্রত্যেকের ছিল এবং যাদের এমন দুর্দশামুক্ত তাদেরও ছোটখাট মশলা-বিহনে চুল-মুখ সদা সাদাই থাকত। কিন্তু দেখা গেল, অমন সমস্যা যেন ঝড়ে উড়ে গেছে, যখন রাত-পাহারার হাঁক বেশ দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে দিতে থাকল—যার অনুসৃতি আততায়ীদের সতর্ক করে দিতে নয়, বরং তাদের ঘুম না এসে যায়, তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। খরিদ্দারের মন-যোগানোর উপর উপার্জন নির্ভরশীল। এমন কথা জানা আছে বলেই গ্রামের চিকিৎসক দশজনের গণ্ডায় আড্ডা দিয়ে বসে ছিল এবং সে কোন উচ্চবাচ্য তোলেনি, যদিও বাইরের এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ-ছিন্নতার ফলে তার ওষুধের স্টক নিঃশেষ। তার আরো জানা ছিল, তুকতাক ঝাড়ফুঁকে ভেষজ তেমন কিছু প্রয়োজনও করে না। মোহাম্মদ আলী কি কবিতা লিখেছেন, লিখতে না-পারার স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক পর্যায়ে, তা অপরিজ্ঞাত থাকলেও একটা হদিস স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সে আর তেমন বেরোয় না বা পথের লোক ডেকে ডেকে আলাপচারিতা মারফত তার সর্বচর মন সচল রাখে না। কিন্তু এই মওকায় তার সমর্থন কতদূর গড়াতে পারে, যখন দেখা গেল সে নিজে ডান্ডা হাতে পাহারাদারদের সঙ্গে হাঁটছে নিঃশব্দে চোখ ভেড়ে ভেড়ে এবং বেপরোয়া-ভাব সব বিষাদ ঝেড়ে ফেলে তেজী আরবী ঘোড়ার মতো তখন তা অনুমান করা যায় অতিশয় বিস্ময়ে, যার মাত্রা শুধু কারো মৃত পিতার আকস্মিক উপস্থিতি প্লান করে দিতে পারে সংখ্যায় এবং গুণে। বস্তুর ব্যাপারে যারা নির্বিকার, অ-বস্তুর ক্ষেত্রে তাদের আসক্তি বেশি। এই ধারণার বশবর্তী, মোহাম্মদ আলী বস্তুরাজ্যে নিজের দেহ ফেলে রাখে মাত্র আত্মার দীপঙ্করেরা যা করে এসেছেন যুগ যুগ, মুহূর্তে মুহূর্তে। পূর্বে নিস্তেজ হয়ে যেত গ্রাম সন্ধ্যার পর-পর, খুব জোর প্রহর-রাত্রি সজাগ। কিন্তু পরিস্থিতির মোকাবিলায়, চলাফেরার শব্দে যেমন সরীসৃপ-কুল পাখপাখালিদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়, তেমনই তখন মনুষ্য-চরণ।

কিন্তু আশ্চর্য, আশ্চর্য ব্যাপার পতঙ্গের লাশ অল্পবিস্তর সড়কে, গুপ্ত জায়গায় বন বাদাড়ের পাশে দেখা গেলেও, আততায়ী টিকি রাখলেও হয়তো দেখা যেত না। কারণ, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। হয়রানির সমুদ্রে এক রকমের ঝড় হামেহাল ওঠে এবং এও ঘটে যে তার বিশদ বয়ান নেপথ্যে থাক। তখন নিজেদের মধ্যে সন্দেহের ভূত সওয়ার হয় রণপা নিয়ে, দ্রুত হেঁটে যায় এক ঘাড় থেকে অন্য ঘাড়ে যেন সকলে পিছনে ফিরে তাকায়, কে চরণ রাখল দেখার জন্যে, যদিও কিছুই চোখে পড়বে না ভূতের অদৃশ্যতার জন্যে। তখন পেছনের লোকের উপর সন্দেহে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, আবার ভূতের পা ঘাড়ে বিধায়, মনে হবে, সামনের লোকও এমন ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। এই প্রক্রিয়া তখন ঘুড়ির সুতোর মতো প্যাঁচ খেতে-খেতে এত জড়িয়ে যায় যে আত্মধিক্কার না হোক, আশেপাশে যাকে পাবে তাকেই গালাগাল দিতে হয় যেমন বড়ো সাহেবের ধমক খেয়ে বাবুর্চি মুর্গীর ডানা ধরে আছাড় মারে - আর কিছু নাই পারুক।

অভিযানে অনেক দলে যোগ দিলেও সামন্তপাড়া এবং মিয়াপাড়া, দুই পাড়া গোদার মর্যাদা মাথায় বাঁশতলা সারগাদা ইত্যাদি চষে ফেলছিল যখন লাঙলের কর্ম অনেক কমে গিয়েছিল ফসলের অনিশ্চয়তাহেতু। আবার কাইজ্যা বাধল এই দুই পাড়ায় সন্দেহের শিমুল তুলো ফাটিয়ে এবং জোরশোর যার ফলশ্রুতি, পাহারাদারির কাজ যদিও গোয়েন্দাগিরির সামিল। এই পর্যায়ও রইল না, বরং শুরু হয়েছিল ভেতরে ভেতরে লাঠালাঠি তাপ কিছুদিন জমবার পর এবং একজনকে আততায়ীর টুপি পরিয়ে মা-চণ্ডীর থানে পাঠাতে লাগল বলির উদ্দেশ্যে। তারপর খাঁড়া দুই হাতে কালকে উঠল নৈরাজ্যের মন্ত্র হাঁকড়ে : যাকে পাও কোতল করো।

সেই সময় পতঙ্গের লাশ কিছু হ্রাস পাওয়াহেতু মানুষের মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধি। এই বিপরীত অনুপাত একটা নিয়ম রূপে চালিয়ে দিলে কোন অশুদ্ধি ঘটবে বা ঘটতে পারে, তার চিক্

অন্তত গোড়গ্রামে মিলল না। মোহাম্মদ আলীর কবি-চিত্ত মৃত্যুর ফলে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল বলে যদি ধারণা করা যায়, তা অমূলক বলার কোন পথ না-থাকার হেতু : তার দলভুক্তির পরিচয় অস্পষ্ট হলেও সে মজার খেয়েছে-দেয়েছে এবং দল-পরিচালনার কৌশল বাতলে দিয়েছে অনেককে, যারা তার কাছে গেছে উপদেশ-আলোকে মুক্তিস্নান বা যুদ্ধজয়ের উল্লাসের জন্যে। গফুরের উপর, বুলানের উপর এবং জাতীয় কিছু যুবক-কিশোরের উপর নজর পড়েছিল, যারা আততায়ীর ভূমিকা-পালনে শরিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু হাতেনাতে কোন প্রমাণ না-থাকার দরুন তেমন মুখ-ফোটা দোষারোপ কেউ করেনি এবং তা না-করার কারণ, পাহারায় ওদের গাফিলতি ছিল না। তবে ঘূর্ণীস্রোতের অভ্যন্তরে যেমন আরো নানাকার স্রোত পাক খায় এবং স্ব-স্ব কক্ষপথে আবর্তিত অথবা ধাক্কায় কক্ষচ্যুত হয়, এখানেও তেমন ব্যাপার ঘটতে লাগল, সবই অবিরাম গতিসমন্বিত। পূর্বের নিস্তেজ ভাবমুক্ত এই আবহাওয়ায় অবিরাম দৈনন্দিনতার অভিঘাত আরো জানান দিতে লাগল, যখন হত্যা পর্যন্ত আরো চিমে-তেতালা নয়, বরং তেওড়া কি চৌতালে পর্যবসিত। যার ফলে, যেমন আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল তেমনই উল্টো-ফোঁসের বাষ্প এইমাত্র ঝাঁপি থেকে মুমুক্ষু সাপের মতো হিসহিস শব্দ তুলে অস্থির।

যেহেতু বুড়ো মানুষ পাহারাদারির তাগদ-বঞ্চিত এবং বয়সের জন্যে স্থির শান্ত দৃষ্টি মারফত সবকিছু দেখতে অভ্যস্ত, মাদবর সেই সময় মোহাম্মদ আলীর নিকট গিয়েছিল, যদি কোন পন্থা মেলে যা বিপদের উপর বিপদ ওই আত্মকলহ থামায় বা চোদ্দ পুরুষের ভিটে ত্যাগ-রত যে-যেদিকে পারে ছুটছে তা রোধে সহায়ক হয়।

– আপনার কথা ঠিক মাদবর সাহেব। মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। মোহাম্মদ আলী সায় দিয়েছিল গলায় দীর্ঘশ্বাস জমিয়ে।

আজ্ঞে, আমি কই, ক্যান?

তার কারণ সোজা। মানুষ সবুর করতে শেখেনি। একটা কথা মন দিয়ে শোনেন। আপনি যখন চিন্তা করেন, আপনাকে চুপচাপ থাকতে হয়। তাড়াহুড়া চলে না।

আজ্ঞে, তা ই।

সব কাজের এই ধারা হওয়া উচিত।

জী।

মোহাম্মদ আলী ইতিহাস থেকে নজীর দানের ইচ্ছার ইতস্ততায় দোল খেতে গিয়ে সামলে নিয়েছিল এই উক্তি দ্বারা, কিন্তু ধৈর্য যদি ধাতে না থাকে?

জীবনে এই প্রথম মাদবর সাহস-সঞ্চয় মারফত একজন জ্ঞানী মানুষের উপর কিছু চাপ এবং ঝাঁকি দিতে বেশি বিলম্ব করেনি।

কিন্তু কবি-মহাশয়, পোলাবান ধুঁকে ধুঁকে মইরব। হে কী বাপ বইস্যা দেখতে পারে?

সমস্যার চোখে আপনি আঙুল দিয়েছেন, কবির জবাব যেন শানানো ছিল, ঝিলিক্‌তে বেরিয়ে পড়ল।

মাদবর বিস্ময়ে কবির মুখের দিকে তাকালেও চোখ আপসা হয়ে আসছিল উচ্চারণ নিক্ষেপ-কালে, কিন্তু মানুষে কী শত শত বছর সবুর করতে পারে?

পারা উচিত।

কঠিন কাম। সাধারণ মানুষের কাম না।

-পারা উচিত। নিজের ভিত্তিভূমিতে আরো শিকড় পুঁতে কবি যোগ করেছিল, উচিত অবশ্যই। চোদ্দ শ' বছর সবুর দরকার হলে করতে হবে।

—কিন্তু মানুষে বাঁচে কদিন?

—ষাট-সত্তর-আশি-নব্বুই।

—হুজুর, হে আর কয় জনা। গত দু মাসে আমাগো গাঁয় কম-সে-কম দুশ পোলাবান মরছে। বয়স এক মাস থেইক্যা সাত-আট বছর।

মাদবর কীভাবে অকস্মাৎ বুকের পাটা তৈরি করে ফেলেছিল, সে না জানলেও জবাব দিতে দেরি হয়নি।

—সকলে মরেছে।

—হু। কিন্তু ক্যান মরছে?

-কেন?

—দুধ পায় নাই, খাইতা পায় নাই।

· শুধু তা না। আল্লাও ওদের দুনিয়ায় রাখতে চায়নি।

একদম হঠাৎ জিভ-খসা ব্যক্তির মতো মাদবর নীরব হয়ে গেলেও বাকশক্তিসঞ্চয়ে তার বিলম্ব ঘটেনি এবং তখনই সে প্রশ্ন করেছিল দুধের বাচ্চা দুধের অভাবে মরছে। আপনি কন আল্লার মর্জি?

এমন দুঃসাহস মোহাম্মদ আলীর প্রত্যাশায় নথীভুক্ত থাকবে সে ভাবতে পারেনি বিধায় চোট সামলে চোট মেরেছিল,--আপনি বুড়া মানুষ, বুঝবেন না। পবিত্র পতঙ্গ। ছোকরারা চোরাগুপ্তা মারছে। আল্লার হয়তো তা ইচ্ছা নয়। গজব (অভিসম্পাত) কি সাধে আসে?

—কিন্তু কবি-মহাশয়—

—বলেন ।

—আপনি দ্যাখছেন—।

- কী—।

—বাপ-মার ভিটা ছাইড়া কতো মানুষে চইলা গেল।

- হ্যাঁ দেখেছি।

হেরা জানে না কোথায় যাইতাছে। হগ্‌গলে (সকলে) পোকার চাপে মইরব।

আপনি ওদের বোঝাননি?

কতো কইছি, হুনে কই।

কেন শোনে না?

—হুজুর, আমি তাগোর পেট ক্যামনে সামাল দিমু।

আত্মজয়ের উল্লাসে হাসতে গিয়ে আবার ভারসাম্য-আয়ত্তে, কবি জবাব দিয়েছিল, এই দেখেন -পেট আবার পেটের কথা। অথচ মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আপনি পেটের কথা তুলছেন।

—হুজুর, পেটও আল্লায় দিছেন। আমার কইতে দোষ?

মাদবরের গলা ঈষৎ চড়ে গিয়েছিল এমন পর্যায়ে যে লজ্জিত না হয়ে পারেনি। তা চাপা দিতেই অতি-খাদ কণ্ঠেই পরমুহূর্তে মরব,—পেট না হয় বাদ দিলাম। খাওন তো বাদ যাইব না। হেরা যায় ডরে।

—তা বলতে পারেন, ওরা যায় ভয়ে, ডরে।

—তা ঠিক।

—এই হচ্ছে কথা। মাঠে মরার চেয়ে ঘরে মরা ভাল।

—আজ্ঞে—।

—ওরা তা বুঝেন না।

—না।

—বুঝলেন, সবুর করতে পারছে না।

—জী, হাঁ।

—আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন। তা আমি প্রথমেই বলেছি।

মাদবর সেদিন মাথা হেঁট করেছিল, মনে মনে ভেবেছিল, জ্ঞানের সড়ক হয়তো বহুত এবং চৌমাথার সংখ্যা এত যে, শেষে কোনদিকে যাব—স্থির করা কেবল কঠিন নয়, খোদ জ্ঞানও সেখানে হালে পানী পায় না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তখন পাগ্লা মেহেরালীর মতো চিৎকার দিচ্ছিল (যদি সামনাসামনি কিছু বলেনি, বাইরে এসে বিড়বিড় করলে) এবং ঝুট-হ্যায়-ঝুট-হ্যায়-রবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকম্পিত—শুনতে পাচ্ছিল। আরো বয়সে মুগ্ধ, তবু অগ্রজসুলভ প্রাচীন শ্রেষ্ঠতা মাদবরকে ধাক্কিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সুরত মণ্ডলের আলিঙ্গনের মধ্যে—যখন সেই জরা কণ্ঠ গমগমিয়ে উঠল,—মাদবর ভাই, আমি অন্ধ। অন্ধত্ব আমার কাছে অভিশাপ নয়। আমাকে আর কিছুই দেখতে হচ্ছে না, কিছুই দেখতে হচ্ছে না—এত দুঃখ, এত জনের যন্ত্রণা। এ-ই আমার সান্ত্বনা, মাদবর-ভাই— ।

এগারো

জ্ঞানের ধর্ম ঠিক জলের মতো। বহমানতা খুইয়ে ফেললে প্রাচীন রূপ রক্ষায় অসমর্থ। বরং আরো ময়লা গজাবে আঁশের উপর এবং পরিশেষে, এই ক্রম চালু থাকলে চেনাই যাবে না, অজ্ঞানতা থেকে তার ফারাক কী? শুধু জ্ঞান নয়, সর্বপ্রকারের ভালমানুষিয়ানার ধারা একই খাতে চলে, যায় অচলতা, অ-মেরামতি ঠিক তার বিপরীতের সঙ্গে সখ্য পাতিয়ে বসে অজ্ঞানিতে। গৌড়গ্রামের বিচ্ছিন্নতা নানা দিক থেকে তার সাবেক বনিয়াদ ধরে টান দিতে লাগল, যখন বিপদের প্রতিষেধ পর্যন্ত ঘুলিয়ে গিয়েছিল। কারণ, মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন আর আক্কেলের পিঠে আরোহী নয়। বরং জঙ্গলে হাতীর পিঠে যেমন বানর বসে থাকে, উপরে চলাফেরার সুযোগে, এখানেও তা-ই ঘটে, যদি বিচারবুদ্ধিকে মর্কট কল্পনা করা যায়। একটা উদাহরণ দিলে অনেকের কাছে কিছু খোলসা হতে পারে। সব না বুঝলেও মোটামুটি মাদবরের সাহায্য অন্তত বৃহৎ কোন ব্যাঘাত ঘটাতে অক্ষম।

পতঙ্গ কখন দাওয়ায় হামলা করবে, কখন যাবে বা আর কোন জায়গায় যেখানে চিলুতে সবুজ ঝিলিক দিতে পারে, তখন একটা পূর্ববর্তী সতর্কতা আঁকড়ে ধরে থাকা উচিত। তাই হঠাৎ বর্ষীয়ানদের মস্তিষ্ক-নিঃসৃত এবং মোহাম্মদ আলী অগয়রহ-সমর্থিত ফরমান হেঁকে উঠেছিল,—বাড়ির উঠান আশপাশ পরিষ্কার রাখো, কোন অসুবিধায় পড়বে না। সামনে সাফাই অভিযানের একটা ফল দেখা গেল। সকালে অনেক ধুলো উড়তে লাগল। তার কারণ, সকলের একসঙ্গে ঝাঁটা-নাড়া—গৃহিণী, বিপত্নীক নিজে, অথবা দাসদাসী ইত্যাদির। এই ক্ষেত্রে হয়তো স্বাভাবিক চালু না থাকার হেতু, নতুন কাকের বিষ্ঠাহারের মতো সকলের উদ্যোগ, শক্তি রাতারাতি অনেক বৃদ্ধি পায় এবং ফলে সবকিছুর প্রবল আকারে আবির্ভাব ঘটে। ধুলোরও। অবিশ্যি গৌড়গ্রামের অধিবাসীদের অধিকাংশ যে নোংরা এমন দোষারোপ অচল, যদিও দু চার ঘর ব্যতিক্রম থাকা কিছু বিচিত্র নয়। ওই উপদেশ অনেকে গ্রহণ করেছিল এই ভেবে যে, কিসে-কী-হয় তা সব সময় কারো জানার কথা নয় এবং হেন পন্থায় একটা সুফল ফলেও যেতে পারে। সাফাইয়ের সঙ্গে পতঙ্গের সম্পর্ক-স্থাপন কার মাথায় খেলেছিল, তা অনুমানের ব্যাপার এইজন্যে যে তখন সবাই প্রতিষেধের আবিষ্কার-কর্তা বলে দাবি করবে। তাই বলা যেতে পারে, হয়তো পতঙ্গের তরফ থেকেই ঐ রহস্য সূত্র পাওয়া, যখন দেখা

গেল, পরিষ্কার জায়গায় তাদের আসন পড়ে না। কার্যকারণের এই সম্পর্ক বিশ্বাসযোগ্য, এবং তালি বাজে না, যদি দুই হাত একত্র না হয় সমান তালে। বিপন্মুক্তির আশায় রোগীর কত কী কল্পনা এবং যে-যা বলে তার উপর নির্ভরশীল হয়ে সে কেবল চিকিৎসা-সংকট সৃষ্টি করে না, আস্থা-হীনতার ফলে মৃত্যুকে আস্কারা দিয়ে বসে। রোগ যখন মুখ্য বিবেচ্য তখন ঔষধ-আবিষ্কারকর্তার নামধাম জাত-পাত নিয়ে বচসা পাকানো স্রেফ মূর্খতা ব্যতীত আর কোন বিশেষ্য দ্বারা ব্যক্ত হতে পারে? পরিচ্ছন্নতার অভিযান গ্যাস-বেলুনের মতো বিদীর্ণ, অন্য কোন দুর্গন্ধ সৃষ্টি করবে কিনা, তা কেউ ভেবে দেখেনি। কারণ, জ্ঞান সীমাবদ্ধ। প্রাচীর চতুর্দিকে। অধিবাসীদের ব্যাহত-কৌতূহল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ঘোড়ার মতো হ্রেষা তোলে, ঠ্যাং তুলতে অক্ষম - যার সাহায্যে সে দৌড় দেবে এবং শিবিরে পৌঁছলে চিকিৎসকের চোখে ধরা পড়বে। বোধ হয়, নিদানে খুঁত থেকে গিয়েছিল অথবা কিসে-কী-হয় ইচ্ছামত ঘটে না, পতঙ্গের অরাজকতা যেমন বেড়ে গিয়েছিল, চোরাগোপ্তা হত্যাপর্ব তেমনই অব্যাহত থাকল। পাহারার পর্যায় থেমে যাবে কী, তোড় আরও বেড়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সন্দেহ এবং দলাদলির ভিত পাকা হতে লাগল। সুতরাং ঐ সাফাই-পর্ব সোডা-পানির মতো অনেক বুদ্বুদ তুললে এবং যখন দেখা গেল, প্রতিষেধের গুলি ফাঁকা গেছে, তখন কে আর তা নিয়ে মাথা ঘামায়। উপদেষ্টাগণ দেখলেন, নিজের চরকায় তৈলপ্রদান অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত অপরের উক্ত যন্ত্র ধরে টানাটানি অপেক্ষা এবং উপদেশকে যদি আদেশ বানাতে হয় অথবা আদেশকে উপদেশ তাহলে তার পেছনে অনেক লকড়ি নয় শুধু মগজও খরচ। কার এত সময় আছে বা হাজারটা চোখ আছে যে সদা সক্রিয় রাখবে। অতএব, যা চলে তা চলুক বা না চলুক হঠাৎ-হঠাৎ দাবড়ি দাও অথবা নৈশ চৌকিদারের মতো হেঁকে ওঠো যেন ভীরুজনের পিলে চমকায়। এইভাবে বিপন্মুক্তির তামাসায় বহু তরুলতা জেরবার হয়ে গিয়েছিল, তেমনই বহু মানুষ যাদের সংখ্যা কমেছিল প্রাকৃতিক নিয়মে।

গফুর এবং তার বন্ধু রাখাল শেষে মন্তব্য করেছিল, সামনে সাফাই মানে জোয়ানকাল থেকে একটাই শিখেছি লোম । উভয়ে হেসেছিল এবং আরো অনেকে যারা এই দঙ্গলে জমায়েত হয়ে সুখদুঃখ খোনাই করছিল সহানুভূতির উত্তাপে। অস্বাভাবিক মনে হতে পারে এমন হাস্যজ্জটা, দুর্দিনের খেয়াঘাটে যদি মাঝি এবং নৌকা কিছুই না থাকে এবং ওপারে বন্যাপ্লাবিত এলাকা থেকে পরিত্রাণের আশায় আর্ত হাঁক দেয় পরিবারবর্গ। শামুকের মতো অনেককেই শক্ত আবরণ সৃষ্টি করতে হয় চতুর্দিকে যেন বুকের ঠোকর কি অন্য উৎপাত সহজে প্রাণকেন্দ্রে না পৌঁছায়। গফুর, রাখাল, বুলান এমন অনেকে হাসবে বৈকি যারা নিজেদের চারপাশে খোলস দিতে শিখেছিল এবং প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে ওঠা ছাড়া অন্য পথ নাস্তি এমন চিন্তা যাদের মনে হয়েছিল স্বতঃসিদ্ধ।

গৌড়গ্রাম ক্রমশ বিহঙ্গশূন্য হয়ে গিয়েছিল। যারা এসব লক্ষ্য করেনি, তাদের উপর দোষারোপ চলে না। নিজের দিকে তাকিয়ে যদি অষ্টপ্রহর কেটে যায়, তখন অন্য দিকে চোখ ফেরাবার সময় কোথায়? গাছ থাকে, ফল থাকে, পাখি থাকে এবং যখন মানুষ থাকে গাছ থাকে - যদিও কাটা এবং রোপণও তার দায়িত্ব। এখানে নির্বিহঙ্গতার কারণ, আকাশবিহারের প্রয়োজন যদি না মেটে বরং পদে পদে বাধা পড়ে ডানায় বা পায়ে, তাহলে পতঙ্গের ঝড়ে নভোলোক নাকচ হয়ে যায় এবং যখন নীলিমার বিস্তৃতি নষ্টভ্রষ্ট, বায়ুর সীমানা সঙ্কোচন মারফত দীর্ঘশ্বাসের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ, তখন ওড়ার প্রশ্ন ক্রমশ প্রলাপ ও শেষে অবান্তর হতে থাকে। ঘুঘু ছেলে বা মেয়ে হারিয়ে কাঁদতে পারে সমগ্র দুপুর বা বিষণ্ণ বৈকাল এবং মানুষ তা থেকে সান্ত্বনা অথবা অর্থ একটা খুঁজে বের করে। সন্তান-হারানো পিতামাতা প্রাণীর ডাকে সহানুভূতি খুঁজে পায়। গৌড়গ্রাম বিহঙ্গহীন, কাকজ্যোৎস্নার কথা ভাবতে পারে না যেমন প্রহর, বোঝে না পেঁচা কি শেয়ালের অভাবে। নেই,

নেই, নেই— নৌতির শন্‌শন বাতাস যখন উঠুক, যতই উঠুক বুকের শ্বাসে মিলতে গিয়ে ধাক্কা খাবে যেমন বাঁধা পুকুরে বন্যার জল—সব ঢুকলেও থাকতে অক্ষম।

গফুর ভাবতে শুরু করেছিল, গানের দল-গঠনের প্রাচীন স্মৃতি যদি ভর করে বসে ভূতের মতন সে কী নিয়ে গান বাঁধত (পাখি নেই) বা কে তার গান শুনত? অমন বাসনার প্রতি তার বিরাগ ছিল না কিন্তু মেজাজ তিরিক্ষি, প্রায়ই বে-কাতর। পতঙ্গের গ্রাস, দাঁতের অন্ধকারে কাপড়চোপড় পর্যন্ত কুটিকুটি—এমন পরিস্থিতির বক্রতা ও জটিলতা। টানাধারী গৃহিণী ভামিনী কামিনী রমণী রাণী...ফসল...বস্ত্র, ভিটেমাটি—এমনই একটানা অন্বেষণে জেরবার গফুর নিজের উপর মমতা দর্শনের সুযোগই পেত না—যখন মেজাজের ঘোড়া দূরপাল্লার দৌড়ে মত্ত।

সেদিন সুব্রত মণ্ডলের চক্ষুকোটরের মতো অন্ধকারে ঘর, গফুরের ঘর, ডুবে ছিল, একথা গোধূলি-সংলগ্ন সন্ধ্যায় বলতে কিছু দ্বিধা থাকা উচিত। কিন্তু পিদিম পর্যন্ত ছিল না যখন, তখন কোন মন্তব্যই আর অশোভন নয় বিধায় গফুর পরিস্থিতি যাচাই করতে এগোয়নি। ভিজা কাপড় শুকোতে দিয়ে অন্ধকারে এমন বসে থাকে স্ত্রী সখিনা, দিগম্বরীর আদিম সংস্করণ, যার প্রাণ ধড়ে নয় আলনায়- যেখানে বস্ত্র সজীবতা পেয়েছে রমণীর হাতে।

- কুথা বইস্যা?

গফুরের এমন অন্ধকার প্রীতির হেতু ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন যদি থাকত, বরং মঙ্গল ছিল। রসিকতা গফুর অনেক কমিয়ে দিলেও কালেভদ্রে নিরন্ন স্মৃতির চাগানে অতীত-সাঁতার কিন্তু কোন কূলে তরী ভিড়ত, সে জানত না।

কুথা বইস্যা?

বস্ত্রহীনতার লজ্জা ছিল গোপিনীদের বটে, তবু দুঃখ না থাকার হেতু ছিলেন স্বয়ং মুরারি, যিনি অভাবকে পূর্ণতার মর্যাদা দিতে সক্ষম। মজকুর ক্ষেত্রে যদি তেমন সুযোগের অবকাশ দেখা দিত, গফুর হয়তো আবার ডাক দিত, কুথা বইস্যা? কিন্তু স্মৃতি যতই জোরদার হোক, বর্তমান নিষ্ক্রিয় বেতো ঘোড়া, তা মনে ঠাঁই দেওয়া মূর্খতা। গফুর আর বাক্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং কর্মে মনোযোগের সংকল্প নিয়েছিল। কিন্তু অভীষ্ট বস্তুর স্থানভূমি যদি জানা থাকে, তখন হোঁচট খেতে হয়। এই ক্ষেত্রে ছোট্ট ঘরে একটা মাটির পেয়ালাও যদি ভাঙে, ক্ষতিপূরণ অনেক কিছু ধরে টান মারবে, যার পরিণামে আর যা-ই হোক, ভালবাসার ফুল ধরবে না। মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ এবং উত্তাপ, যে-দুই উপাদান সেখানে বর্তমান, তার খোঁজ করা যেতে পারে। গফুর চিন্তা করছিল, কান-খাড়া খন্দুর সম্ভব উৎকর্ণ, যদিও বাইরে কয়েকটা ঝিল্লী বেশ উচ্চস্বরে ডেকে-ডেকে বাগড়া দিচ্ছিল। উত্তাপের কথা, গফুরের মনে উদয় হওয়ার কোন কারণ ছিল না। আধপেটে উপোস যারা থাকে, তাদের শরীরের তাপমাত্রা, একমাত্র জ্বর ব্যতীত, আর কদ্দূর এগোতে পারে? পিদিমের খোঁজ আরো দুরূহ এইজন্যে, সখিনা তার ভাটিতে যেদিন কাপড় লুকানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল, সেদিনই সে সতর্ক হয়েছিল, এই চ্যাটা স্বামী থেকে রেহাই পেতে আলোর হাতিয়ারটা লুকিয়ে রাখা দরকার যেন সহজে কেউ নাগাল না পায়। গফুর সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নয়, যদিও আরো কয়েকবার অতি মোলায়েম কণ্ঠেই সে ডাক দিয়েছিল, কুথা বইস্যা আছো? ছোট্ট ঘর। একবার হাতড়ালেই সব উদ্ধার হয়ে যাবে—গফুর এই সমস্যা-সমাধান জানলেও সহজে ঘুম-উত্থাপনের পন্থায় বিশ্বাসী ছিল। একবার সামান্য হাত বাড়িয়ে সে পৌঁছিয়ে নিয়েছিল এই ভেবে যে, হয়তো মেজাজ ভাল থাকলে কাপড় ছাড়াই অভীষ্ট সামগ্রী বুকে এসে বাঁধা পড়বে এবং ফিসফিস-রব তুলবে,—দরজা যাইন্দা থুইছ ত? (খিল লাগিয়েছ ত)। কোন জিনিস হারিয়ে গেলে, শেষ-মাথা থেকে লোকে গোড়ার দিকে এগোয় কখনও স্মৃতির সাহায্যে, কখনও আগেকার কর্মের ধারায়,

পাওয়ার একটা সম্ভাবনায়। গফুর অন্ধকারে রোমাঞ্চিত-দেহ ঠিক তেমনি ফিসফিস-শব্দে উচ্চারণ করেছিল,—দরজা বাইন্দা থুইছি। কিন্তু এই রীতির আশ্রয়-গ্রহণ খামখা। খামখা স্মৃতির উপর চোটপাট, যখন জানা কথা, অভীষ্ট বস্তু ভঙ্গুর এবং তা পাওয়া গেলেও আর আস্ত থাকবে না। গফুর বুঝেছিল, তার গুলি লক্ষ্যস্থলে লাগা দূরের কথা, রেঞ্জের ভেতরই যেতে পারেনি। তাই সে বার বার হাতের মুঠি বাঁধছিল আর খুলছিল এবং অভ্যন্তরে-অভ্যন্তরে স্থির করছিল, যে-অভিমুখে সুরাহা প্রসারিত সেদিকে যাত্রাই যুক্তিযুক্ত। হস্তদন্ত কোন কিছু যখন অশোভন ঠেকে, অথচ বুকের মধ্যে সর্বপ্রকার গুরুগুরু-ডাক ঝঞ্ঝনা তোলে, তখন কর্তব্য সম্পর্কে বিমূঢ়তা না আসুক, হাত-পা সহজে এগোয় না। এই জড়তা যতটা বাইরের ততটা ভেতরের এবং উভয়ের সমাহার বিদ্যমান বিধায় অমন ক্ষেত্রে সক্রিয়তা এবং পশ্চাদপসরণের অনুপাত সমান। পুনরায় উৎকর্ণ গফুর কোন শব্দ-ধরার প্রার্থনায় ঘাড়ের রগ (শিরা) সাধারণ ত্বক সমতল থেকে অনেকখানি ঊর্ধ্বে তুলে ফেললেও তাতে কিছু স্বাক্ষর পড়ল না - যেন বিকল রাডারের দশা। কানামাছি খেলার মতো অন্ধত্ব অন্ধকার পূর্ণ করে দিয়েছিল এমন পর্যায়ে যে চোর ধরা সহজ ছিল না। গফুর সিদ্ধান্ত-সংকটের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছিল খুব ভয়ে ভয়ে, ভাঙা সাঁকোর উপর পারার্থী বোঝা-মাথায় হাটুরের মতো। একবার হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সে অনুভব করেছিল শূন্য তার হাতের মুঠোয় যাদের ন্যায়—ব্যাদন-মুখী, কিন্তু গ্রাসে অনীহা ষোল আনা। শূন্য জাল তুলেছিল এই ধীবর যদিও পেশায় গাড়োয়ান এবং পৈতৃক দক্ষতায় সে অন্ধকার পার হয় গান গাইতে গাইতে। নারীদেহ এবং বিবস্ত্র কোথাও ওৎ-পাতা, যার তখন বাঘ বা সিংহের বুভুক্ষু হিংস্রতা থাকা উচিত ছিল শিকার দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। কিন্তু তখন শিকার এবং শিকারীর পার্থক্য আদৌ স্পষ্ট নয় বলে এক দিক যেন অন্ধকার স্বয়ং, অন্ধকারে প্রবিষ্ট বা বিলীন। হঠাৎ স্তিমিত-তেজ গফুর ভাবতে লেগেছিল, হয়তো সখিনা গরহাজির, কারো কাপড় চেয়ে নিয়ে বেড়াতে গেছে পাশের বাড়ি বা আর কোথাও। কিন্তু এমন সম্ভাবনার কল্পনা অসমীচীন এইজন্যে যে বাড়তি বস্ত্র দেওয়ার মতো ধারেকাছে কেউ নেই এবং যেখানে আছে—কোন মিয়াবাড়ি কি বাবুবাড়ি এত দূরে; অধিকন্তু সখিনার আত্মসম্মানজ্ঞান এত টনটনে হাত প্রসারণে অসমর্থ—তখন যন্ত্রণা বা প্রয়োজনীয়তার প্রসার যতই আসমান-স্পর্শী হোক। দেশলাই নেই, যেহেতু সঙ্গে বিড়ি ছিল না। একটু আলো, এক চিলতে আলো, খুব ধূসর অতি অস্পষ্ট—তাহলে আর এত ধৈর্যগিরি মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। প্রাবাদিক কবন্ধ যেমন অন্ধ আবেগে-আক্রোশে কম-কম বাহু খোলে আর বন্ধ করে কঠিন আলিঙ্গনের পন্থা-জালে শিকারকে পিষে ফেলতে, গফুর তেমনই ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু ফলে, মেহনতের রসদ খেয়ে গেল, ইঁদুর পড়ল না। হয়তো লুকোচুরি-রত এক বিবস্ত্র রমণী। এই চিন্তা উদয়ের সঙ্গে রূপ অস্ত গেল, যার হেতু গফুরের নিকট স্পষ্ট : আহা, বয়স নেই, কমাসে বুড়িয়ে গেছে সখিনা। ঘরের একদম উত্তর কোণ ঘেঁষে একটু সামান্য জায়গা বারান্দার মতো বের করা ছিল বড় কুলুঙ্গির মতো এত বড় যে একটা ছ-ফুট লম্বা মানুষ স্বচ্ছন্দে খাড়া দাঁড়াতে পারে (বাড়ির গৃহিণী বলত, গরিব মানুষের ঘরের মধ্যে মসজিদ) এবং প্রয়োজনকালে ঘুঁটে, কন্থা বা ঐজাতীয় কিছু রাখা যায়। এতক্ষণ মশারির মতো ওই কুঠরির কথা গফুরের খেয়ালে আসেনি, বোধ হয়, স্ত্রী নামকরণ-অনুযায়ী সে নামাজী নয় বলে অথবা নিরক্ষরতা-হেতু আরবী শব্দ উচ্চারণে জিভের ডগা গররাজি বিধায়। গফুর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার পর সেদিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিল, যা নিতান্ত দৈবী ব্যাপার। হ-য-র-ল-ব লোয়াজিমা যেখানে থাকে, সেখানে বাড়ির গৃহিণী আত্মগোপন করবে—ভাবা যায় না। গফুর গুনগুন সুর ভাঁজছিল যখন মানুষ অনাহার-অনিদ্রা প্রেমের কাছে শুধু তুচ্ছ হয়ে গেল না, তাদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার স্তর থেকে নিচে নামতে-নামতে একটি মাত্র লয়ে তখন লুপ্ত। তাই গফুর

যে নিজেই লয়-প্রাপ্ত এতক্ষণ অধৈর্যের গঙ্গায় মজ্জমান ছিল, ভেসে উঠল আলতো সমীরের সঙ্গ-সুধায় এবং হাত নয়, দুটো আঙুল শুধু বাড়িয়ে দিতে লাগল যতক্ষণ না তা স্পর্শ করে একটা স্তনের চুচুক—গোল এবং নরম, অতি নরম, সন্তানের সর্বদৌরাত্ম্যাবধিকৃত। সাপের গায়েও হাত পড়লে হয়তো এত দ্রুত আঙুল পৌঁছিয়ে নিতে পারত না গফুর যেভাবে তার পশ্চাদপসরণ ঘটল। যেন সব অতৃপ্তিজাত কশাঘাত শুরু হয়েছিল তখনই। কিন্তু তন্মুহূর্তেই সে আঙুলের ডগা লাউডগার মতো, এখানে যদিও আলো নয়, বুকের দিকে ধাবিত করে—অতি শ্লথগতি, অতি মন্থর, এগোচ্ছে কি এগোচ্ছে না এমনই পারম্পর্য। পুনরায় পশ্চাদপসরণের সময় দুই জঙ্ঘামধ্যস্থিত বদ্বীপে যখন আঙুল লাগল, তখন গফুর অদৃশ্যশক্তি-আকর্ষিত যেন রকেটের কোন দাহ্য রসায়ন হঠাৎ জ্বলে উঠল না শুধু, গতির তোড়ে দিকভ্রান্ত আলিঙ্গনের খেপ্‌লা-জাল অনেকদূর ছড়িয়ে দ্রুত শামুক-মুখের মতো বন্ধ হয়ে গেল। ধরা পড়েছিল, বক্ষ নয় কটিদেশ যেখানে ইনামের মুখ ঠেকে গিয়েছিল এবং তার পটল (বেঁটেখাটো নাদুসনুদুস সাথিনার স্বামিপ্রদত্ত নাম) যেন নিমেষে শালবৃক্ষের উচ্চতায় অধিষ্ঠিত, তারই কচি শাখার মতো দোদুল, যেমন সিকের হাঁড়ি দোলে, দুলেছিল, হিন্দোল-হিন্দোল রাগ হোলির উৎসবে। অস্বাভাবিকতায় ধাক্কা গফুর সামলে উঠেছিল কি ওঠেনি এমন বাছবিচারের অবান্তরতায় ফাঁক দিয়ে দেখা গিয়েছিল, সে পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীদের পিদিম (যার সামনে বসে একজন তামাক খাচ্ছিল, এবং এবং সহসা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে চিৎকার পেড়েছিল, কে—কে?) এনে দেখেছিল গফুর—না দেখেনি, না দেখেছিল : তার সাথিনা আপন মহিমায় মঞ্চে কতো ঊর্ধ্বে উঠে গেছে এবং ঝুলছে সেই ভেজা বস্তের সাহায্যে কাঁড়বাঁশ-সংলগ্ন। যে-বস্ত্র তার লজ্জা নিবারণ করত, সেদিন তা রমণীর তাবৎ লজ্জা কেড়ে নিয়েছিল অথবা ঢেকে দিয়েছিল ঠাণ্ডা নৈঃশব্দ্যে, হিম-তুষার শৈত্যে।

বারো

জমা-শূন্য এবং মৃত্যু-খরচে বোঝাই জাবদা-খাতায় পরিসংখ্যানের নিয়মানুসারে শতকরা অনুপাত হ্রাস পায় গুরুত্বের দিক থেকে। ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি এমন ক্ষেত্রে বুদ্বুদ উত্থাপন করে বটে, কিন্তু তা সমজাতীয় বহু ফেনার সান্নিধ্যে আর তেমন লক্ষণীয় বা বৈচিত্র্যে মোহনীয় থাকে না। অনেক অভাগা একত্রিত হলে সাগর শুকিয়ে থাকে আগে থেকে এবং জেরবার চোখের পলকে জলশূন্যতায় ভূমিকা থেকে তা রেহাই পায়। গফুরকে ব্যাপারটা বুঝতে হয়নি। পরিস্থিতি তার কাছে এমন স্পষ্টতা অবলম্বন করেছিল যে তার মনে হয়েছিল, ঘাড়ে বোঝা হালকা বিধায় সে যতত্র জান-কবুল যে-কোন দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে পারবে এবং পিছু-হটা জানবে না। দুই বিপরীত কাঠি তাকে যুগপৎ একই সময়ে ঘুম পাড়াত আবার জাগিয়ে দিত সহজ স্পর্শ মারফত, যখন সে অনুভব করত, সুখ-দুঃখের মোকাবিলায় চেয়ে সহজ আর কিছু নেই দুনিয়ায়। অনুপার্জন-জাত অনিশ্চয়তা পূর্বে তাকে কাবু করে ফেলত গৃহপানে দৃষ্টিপাতের ফলে এবং একটা সোয়াস্তি তখন এমন খোঁচা দিত যে, তার কোন মতামত আছে কোন বিষয়ে তা সে বুঝে উঠতে পারত না। মাদবরের উপদেশ সে নীরবে পালন করেছিল। যেহেতু সে কারো উপর হুকুম চালায় না, বরং কাছে টেনে দুরাগমনের পন্থা বাতলায়। এমন ক্ষেত্রে মতামতের প্রশ্ন ওঠার কথা নয়। তা গফুর জানলেও বিষয়ে একদম ঘাসে রূপান্তরিত হতে-হতে হঠাৎ তার ভেতর সাপ পুষে ফেলত। এমন কয়েকবার ঘটেছে। সেকথা আর ধর্তব্যের মধ্যে, যেহেতু অতীতের ব্যাপার, মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু পরে সে নিজের মধ্যেই শক্তি অনুভব করেছিল, যা মুরুব্বিদের মুখেও সব ব্যাপার তলিয়ে দেখার পক্ষপাতী। ঠিক

বাচালতা নয়, সবকিছু বোঝার জন্যে আগ্রহ, নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়েও—যা ভেতরে হাই তোলে এবং পীড়া দেয়—এমন অস্থিরতা নতুনভাবে স্থিতি পেয়েছিল তার হালচালে। নিজের স্ত্রীর শোকবিরহ বিস্মৃতির গর্ভে জমা রেখে দেওয়ার হেতু এই যে, এমন যন্ত্রণার সঙ্গে তখন বহুজনেরই পরিচয় এবং তা সংখ্যায় বাড়ছিল, আদৌ হ্রাস পাচ্ছিল না। কিন্তু শোক যখন শ্রদ্ধায় ভিত্তি-উত্থিত এবং জানার আগ্রহ-কৌতূহল যখন অপরিসীম অথচ উৎস রুদ্ধ, তখন যে-আঘাত আসে তার কাছে প্রেমের লাভ-লোকসান তেমন নিদারুণ মনে হয় কি? কারণ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শুধু সান্নিধ্যের অভাব ধাক্কা মারে, যে-জায়গায় প্রথম ক্ষেত্রে ওই বিয়োগ ছাড়াও অনুভূত হয় একটা মানুষের সারা জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল-সৌরভের অনুপস্থিতি। সকলের জানা, গন্ধ ছাড়া পরিবেশের অপচ্ছেদ ঘটে না—শুধু স্বাদের তারতম্য আরো উৎকটরূপে দেখা দেয়। সদ্যকাটা টাটকা শশার গন্ধ শুধু বনজ-রসায়নের ব্যাপার নয়, যারা বোঝে মনজ আনন্দ, তাদের নিকট আর বয়ান বাহুল্য। গফুরের সকল তেজ, শক্তি একদিন এমন মিইয়ে গিয়েছিল সে ভাবতেই পারেনি, ঘাস আহারের মতো উত্থান-শক্তি আবার খুঁজে পাবে। পুরাতন দিনের কথা চোখের সামনে তুলে ধরতে সে শুধু অনিচ্ছুক নয়, উপরন্তু বিড়াল যেমন বিষ্ঠাত্যাগের পর চাপা দেয় এবং ভাসাভাসা চাপা নয়, বরং ধুলোর মধ্যে অক্লান্ত ডুবিয়ে ছাড়ে, গফুর তেমনই পন্থাগ্রহণে বাধ্য হয়েছিল বহুৎ যন্ত্রণাসহ—যা সখিনার মৃত্যু-জাত মর্মঘাতের নিকট তুচ্ছ। তখন কেবল সুরত মণ্ডলের কাছেই গফুর বসে থাকত একদম চুপচাপ অথবা বর্ষীয়ানের রেখাঙ্কিত লোল-চাম করস্পর্শের নিচে সেই মাভৈঃ মন্ত্র শুনত, যা সর্ববেদনাহর নিমেষে নিমেষে, যদিও জের সদা-বর্তমান। তখন কৃতজ্ঞতা সেই আধিপত্য বিস্তার করে বসত, যার ফলে শুধু মাথা অবনত নয়, এক প্রকারের নিষ্ক্রিয়তাও ভর করত। নিঃসঙ্গতার হাতে মার খাওয়ার দিনে অমন দোসর চিরদিনই আশীর্বাদ। অনাহার, উপবাস, নানা কৃচ্ছ্রতার উপর মৃত্যুর করাতে দ্বিখণ্ডিত গফুর প্রায়ই ভাবত, সে চারপাশের মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছিল শুধু সুরত মণ্ডল দাদুর কল্যাণে, হ্যাঁ, তারই পাকা চুলের মতো শুভ্র হৃদয়ের সৌরভে। বাইরে নানা কাজ, যদিও গাড়ি বন্ধ—ফাইফরমাস বা মুনিশের কাজ, যখন যা পাওয়া যায় কিছু করতে হত বৈকি। ব্যস্ত থাকলেও এক-একবার সব ছেড়েছুড়ে সে দৌড় দিতে চাইত, সুরত মণ্ডল যেখানে প্রারাব্ধ, নিজের তালপাতায় লেখেন, লেখন এবং তার পূর্বে গুনগুন করেন নিজের মনে, সময় সময় মাথা দুলিয়ে অতি সন্তর্পণে যেন ঘাড় তা থেকে ছুটে না যায়, বৃদ্ধ বয়সে যে-ভয়ও থাকে। দুই পাড়ার দলাদলিতে একটা গুজব খুব দানা বেঁধেছিল যে, পতঙ্গের লাশ এখানে ওখানে মাঝে মাঝে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তার পেছনে গফুর, রাখাল, বুলান এবং আরো এইজাতীয় ছোকরাদের যোগসাজস বা হাতযশ আছে, যার ফলে অমন ঘটনা এবং গুপ্ত ঘটনা ঘটছে, সহজে ধরার উপায় থাকছে না। মোহাম্মদ আলী, মসজিদের ইমাম এবং আরো গ্রাম-হিতাকাঙ্ক্ষীরা এইজন্যে এত চিন্তিত যে কয়েকবার সকলকে ডাকিয়ে তারা অনেক উপদেশ এবং সতর্ক করে দিয়েছিল, এমন অবুঝ কাজ আখেরে শয়তানির মালমশলা, প্রলয় সন্নিকট করে এবং একজনের পাপে তখন লাখজন ভোগে। কিন্তু সন্দেহ জিনিসটা চাপা থাকার কারণ, চাপা থেকেই জন্ম বিধায় হাটেবাজারে চালু হলেও হাঁড়ির মতো ভগ্ন হতে জানে না। এই পর্যায়ে একটা সুবিধা এই যে তখন অপরাধ-নিরপরাধ এমন একাকার হয়ে যায় (পরস্পর কাদা-ছোড়াছুঁড়ি আবহাওয়া—তা-ও চাপা) সত্যিকার দোষী জন পার পেয়ে যেতে পারে এবং তা খুব সাচ্ছন্দেই ঘটে। যেহেতু কেউ পায়ের মাটি সম্পর্কে সুনিশ্চিত থাকে না। এইসব অপরাধের রাজ্যে, তদুপরি স্বাভাবিক জীবন-যাপন ব্যাহত, মনের যে অবস্থা থাকে তা বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই গঠন করে না এবং যদিও স্বাভাবিকতার কিছু বায়ু টেনে আনে, তার মধ্যে খাদ থাকে ষোল আনা। গফুর কিন্তু রেহাই পেয়েছিল নানা

দিকের যন্ত্রণা থেকে একমাত্র দিকে, যেখানে প্রতিশোধের স্পৃহা ধিকিধিকি তুষানলের মতো জ্বললেও দাউদাউ রূপগ্রহণের অপেক্ষার্থী, যখন সময় আসে বা সুযোগ তৈরি হয় আপনা-আপনি। সুব্রত মণ্ডলের কাছে তার যাতায়াত অনেক কমে গিয়েছিল। হেতু—, সে তখন এমন মানসিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, যেখানে আর যেন কারো আশ্রয় প্রয়োজন নেই এবং মাঝে মাঝে ধাক্কা দিলেও আর তাকে এদিক ওদিক হেলতে-টলতে হয় না। ধীরে ধীরেই সে নিজেকে এমন আত্মস্থ দশায় এনেছিল না শুধু, নিজেকে বুঝতে চাইত সে, যদিও তার ইলেম নেই বা তেমন কোন হাতিয়ার নেই যা তার মদত দিতে সক্ষম। কিন্তু চতুর্দিকে চেয়ে-চেয়ে এবং পাড়াপড়শীদের জীবনের শরিক-রূপে সে কতগুলো সহজ বিশ্বাস রপ্ত করেছিল যা তাকে যেন পথ দেখাত, যখন অন্ধকারে হামাগুড়ি টেনে চলার কথা শুধু। হঠাৎ একদিন সে অতি বিচলিত হয়ে উঠল, তারই এক আত্মীয় খবর দিয়ে গিয়েছিল সুব্রত মণ্ডল দাদু নাকি পাগল হয়ে গেছে—বদ্ধ উন্মাদ। প্রাচীন রেস্তা নয়, স্মৃতির প্রবল ধাক্কায় গফুরের সেই মূষিকের দশা—যে জলভারে গর্তে পড়েও আর সাঁতার কাটেনি শুধু নিঃশ্বাস বাঁচানোর জন্যে। সংবাদের কতো রকম মাহাত্ম্য আছে, সেদিন গফুরের আর উপলব্ধির তেমন তাগদ ছিল না। তাই বোধ হয় এক দৌড় দিয়েছিল মণ্ডলপাড়ার দিকে যেখানে সকল তাপ-হরণ ছায়া তখনও তার জন্যে অপেক্ষার্থী—চিরদিন যা পেয়ে এসেছে স্বাভাবিক দাবির মতো। থমকে দাঁড়িয়েছিল গফুর সুব্রত মণ্ডলের অতি-চেনা ছোট বৈঠকখানা-ঘরে এবং তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, যখন সে দেখলে, বৃদ্ধ কবিরাজ একটা মাদুরের উপর (কাঁথা বিছানো ছিল কিনা দেখেনি) মুখ গুঁজে দুই হাতে কী যেন খুঁজছেন, খুঁজছেন। দুর্বল পেশীর সঞ্চালন শুধু অসহযোগিতার আঙুলগুলো নড়াচ্ছিল, কিন্তু তেমন দ্রুত নয় শরীরের ঝাঁকুনিতে স্পষ্ট।

—দাদু!

বসে পড়েছিল গফুর একপাশে, যদিও পার্শ্বস্থ আত্মীয় স-বারণ জানিয়ে দিয়েছিল, গায়ে হাত পড়লে বৃদ্ধ আরো চিৎকার দেবে বা গোঙানি শুরু করবে—যার ফল দুর্বলতা ও মৃত্যুকে আরো সন্নিকটে পৌঁছে দেওয়া।

—দাদু!

একটু গলা চড়িয়ে দিয়েছিল গফুর। কিন্তু তার ডাক বোধ হয় অতদূর যায়নি, যার সুড়সুড়ি শব্দ হিসেবে বৃদ্ধের কানে কোন তরঙ্গ তুলবে।

—দাদু!

এক বিধবা আত্মীয় বাতাস করছিল খুব সাবধানে যেন পাখা রোগীর গায়ে লেগে একটা অঘটন না ঘটিয়ে বসে, যার পরিণতির মাত্রা প্রাণঘাতী। আর ইহকালে হয়তো কোন জওয়াব পাওয়া যাবে না, এই ভেবে গফুর যখন চুপ করে গেল, তার দুই চোখ ডাক দিতে লাগল নিঃশব্দে দুই পক্ষ্ম থেকে পানি ঝরিয়ে, কখনও বা সব দৃষ্টিপথের আচ্ছন্নতা মারফত।

—দাদু! ডাক, ডাক, ডাক দে! কিন্তু কে কাকে ডাক দেবে, যখন এক-একজন নিজের কর্ণপটে একই দিকভ্রান্ত শব্দের সড়ক ধরে হাঁটতে থাকে এবং তা পরিত্যাগের কোন উপায় বা পন্থা পাকড়াতে পারে না। কাছাকাছি উপবিষ্ট গফুর দাদুর মাদুরে গোঁজা মুখ সোজা করে দিতে গিয়ে বিধবার কাছ থেকে আবার বাধা পেয়েছিল—সেই আগেকার যুক্তি। আবিশ্যি অমূলক নয় : কিছু করতে যেয়ো না, বাবা। যখন নিজের মনে কিছু চায় বা বলে তখন এগিও।

দাদু!—বিধবার বারণ ঠেলে অতি আলতোভাবে মণ্ডলের পিঠে হাত রাখা-মাত্র মনে হয়েছিল, বৃদ্ধ যেন স্পর্শ-সচেতন নিজের সড়ক ছেড়ে অন্যদিকে পা-ফেলার মতলব তন্মুহূর্তে আঁটলেন

এবং দৃঢ়-সংকল্প। হঠাৎ একটা হাত সশব্দে আছড়ে ফেলে, বোঝা যায় বেশ শক্তি দ্বারা, মণ্ডল চিৎকার দিয়ে উঠেছিল,—পাতা দাও, আমার তালপাতা দাও...তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে... তারি পাতা দাও...পাতা...।

পাতা!—গফুর যেন ধুয়ো ধরেছিল, তেমনই স্বরে উচ্চারণ, বিধবার দিকে তাকিয়েছিল, কোন ব্যাখ্যা থাকলে তৎক্ষণাৎ দিতে।

—পাতা...আমার পাতা দাও...পাতা...সব খেয়ে ফেলেছে...সব...পাতা দাও, আমি লিখব,... কালি দাও, কলম দাও। বৃদ্ধ মণ্ডল তৃষিত হাতের তালু যথারীতি চিৎ রাখে বটে, কিন্তু শীর্ণ শিরাগুলো স্থির থাকে না, বরং দেখা গেল, থরথর কাঁপছিল, কাঁপছিল—যেখানে আকাঙ্ক্ষার তাগিদ এত প্রচণ্ড যে শিরা ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে, যদি নিকটে কোথাও দু-এক ফোঁটা অবশিষ্ট থাকে।

—দাও—। দিলে না, দিবি না হারামজাদী... দে দে..(তাহা অশ্রাব্য গালাগাল। শ্রোতাদ্বয় কানে আঙুল দেয় না, লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে কৃপার দৃষ্টি মাটির উপর ফেলে, আসল পাত্রের উপর বর্ষণে অসমর্থ) দে-দে-। আমার পাতা, আমি লিখব গান...গান...লিখে যাব আর গাইব... কতো...লোক শুনবে, হাসবে, যেখানে কাঁদার কাঁদবে..দে—দে—তোদের সুখদুঃখই আমার গান... পাতা কোথায়?..আর গান গাইব না..ভাটির দেশে বিয়া করছিলাম...ও রংগিলা নায়ের মাঝি... পাতা, পাতা...।

মণ্ডলের চিৎকার মাঝে মাঝে গলার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যাচ্ছিল—যেন গোটা এলাকা তখনই ভূকম্পনে কাঁপবে, যখন কিছুই আর খাড়া বা স্থির থাকবে না। গফুর স্তব্ধতার মধ্যে ঈষৎ খোঁটা পুঁতে, বিধবা মহিলাকে সম্বোধন দ্বারা জানার কৌতূহলী, পাতা দিলেই কি দাদুকে চিৎকার থেকে নিবৃত্ত করা যায়- যা তার আয়ুর গায়ে কিছুটা বেমেয়াদী সুতো লাগাতে পারে। কিন্তু জানা গেল, আর কোন তালপাতা-সদৃশ পাতা যতই দাও, বৃদ্ধ ঠিক ধরে ফেলে, এবং তাকে প্রতারিত করা অত সহজ নয়।

আড়া কালি জাড্য কালি
কালি ঝলমল করে
সব দোয়াতের ঘন কালি
আমার দোয়াতে পড়ে।

হঠাৎ ছড়া গেয়ে উঠল শীর্ণকণ্ঠ মণ্ডল, একদা বাল্যকালে পাঠশালে অন্যান্য পড়ুয়াদের সঙ্গে লেখনী নেড়ে-নেড়ে কালির ঘনত্বের জন্য যে প্রয়াস পেত তারি জীর্ণ সংস্করণ—আদল আছে, কিন্তু ভেতরে আর মাদল বাজে না।

—পাতা...পাতা...। দুই শব্দে নিবদ্ধ চাহিদা ততক্ষণে আর তারস্বরে পৌঁছায় না। তা প্রতীয়মান, বৃদ্ধের কণ্ঠ-শিরার দিকে চেয়ে যা নীল-নীল লালচে সুতলী সাপের মতো নড়ছিল ঈষৎ কম্পনে এদিক-ওদিক।

বিধবার বয়ানে পরিষ্কার : সমস্ত তালপত্র পতঙ্গের জঠর-গহ্বরে প্রবেশ-হেতু আর তেমন কোন যোগানদানের সম্ভাবনা রুদ্ধ বিধায় বৃদ্ধের মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা দেয় এবং গান-বাঁধা ও তা লিপিবদ্ধ রাখার অভাবে এমন ঘটেছে—সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আত্মীয়া আরো কিছু কথনের প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু তখনই বৃদ্ধ সচিৎকার মাদুরের ভেতর গোঁজা মুখ তুলে চিৎ হয়ে পড়ল না শুধু, দুই চোখ মেলেও দুই পার্শ্ববর্তীদের দেখতে লাগল অদ্ভুত এক দৃষ্টির সাহায্যে, যেন কারো মুখ অবলোকন-মারফত সন্তুষ্ট নয়, বরং আরো গভীরে দেখার প্রয়াসী—যেখানে মানুষের সব সাধনা, কামনা, মায়া-মমতা একান্তে লুক্কায়িত থাকে। অতঃপর বিড়বিড় শব্দে সজ্জিত

ও সঞ্চালিত দুই ঠোঁট। তখন স্বাভাবিকভাবে বোধ হয় না, হয়তো ঈষৎ মনোযোগ দিলে শোনা যেত তার বক্তব্য : লিখতে দাও...গান বাঁধতে দাও...পাতা দাও। বাঁধো আসর, আমি গান করব। তার আগে পাতা দাও...পাতা।

গফুর তখন বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছিল, কান অতিমাত্রায় খাড়া, অর্থোদ্ধার-দুঃসাধ্য সব বিড়বিড়ানি শুনতে, যার মধ্যে মণ্ডলের জীবনের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল ছবি দেখা যাবে তৎমুহূর্তেই। কিন্তু ঠোঁটের কম্পন যখন থেমে এলো, ক্রমশ নিঃশব্দ, কোন শব্দই রইল না, চোখে যেন প্রবল জায়গা পেল, তখন শ্বাস উঠতে লাগল এবং মণ্ডলের গ্রীবা স্ফীত, স্ফীততর হতে আরম্ভ করল। আত্মীয় অভিজ্ঞতা-লব্ধ জল আনতে গিয়েছিল, শব্দ-তৃষিত ওষ্ঠে তারল্য বর্ষণে, যার জানার কথা নয়—বাতাস অদৃশ্য, নির্বস্তুক এবং সলিল বস্তুত দৃশ্যমান। বিধবার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই মণ্ডল শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল আপন বুকের হাপর থেকে, যেখানে আর আয়াস ছিল যা ছিল না, তা গফুরেরও অপরিজ্ঞাত। সে তখন লাশের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদছিল ডুকরে-ডুকরে যেন সদ্য-মাতৃহারা বালক, দুই চক্ষু বন্ধ—যেহেতু আর কোন মৃত্যুর মুখদর্শনে সে অক্ষম।

[আগামীবারে সমাপ্য]

আ লো চ না

অতুল বসু স্মরণে

১৮৬৪ সালে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে যেসব বিদেশী শিল্পী ট্রেনাররূপে এদেশে আসেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী কি শিল্পশাস্ত্রী কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। এদেশে বাস্তববাদী চিত্রকলার ভিত্তিরচনায় এ'দের প্রচেষ্টাকে লঘু করে দেখানো উদ্দেশ্য নয় আমার, কিন্তু একথা বলা বোধ হয় অমার্জনীয় হবে না যে, প্রাণচঞ্চল ইউরোপীয় শিল্পভুবনে যে নতুন নতুন তরঙ্গের অভিঘাত, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা অধ্যয়নলব্ধ কোন পরিচয়ই ছিল না এ'দের। এই নিষ্প্রসবা অবস্থা যখন এদেশের আর্ট স্কুলগুলির, তখনই—১৮৯৮ সালে—অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ই বি হ্যাভেল, এবং সূচনা হল সেই আন্দোলনের আমাদের পাঠ্যপুস্তকে যা ভারতশিল্পের পুনর্জাগরণ বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে। হ্যাভেলের অধ্যক্ষপদপ্রাপ্তি, অবনীন্দ্রনাথের উপাধ্যক্ষপদ স্বীকার, সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রতিষ্ঠা—আমাদের জাতীয় চেতনার অংশ এই ইতিহাসের পুনরুল্লেখ বর্তমানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আত্মপ্রসাদের অনুষঙ্গরূপে আমরা ভুলেছি যে এই তথাকথিত ভারতশিল্পের জন্য বাস্তববাদী চিত্রশিল্পকে স্বীকার করতে হয়েছিল এক সমূহ ক্ষতি।

এমনই এক সংশয়পীড়িত, অব্যবস্থিত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এলেন আর্ট স্কুলের সেরা ছাত্র অতুল বসু। তখনও তাঁর স্বকীয় বিকাশের পথ চেনা হয়নি। আর্ট স্কুলের শিক্ষাধারার সঙ্গে সৃষ্টিশীল প্রতীচ্য শিল্পকলার যোগাযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, '১৮৬০ থেকে শুরু করে মোটামুটি ১৯১০ সালে ইতালী থেকে প্রচারিত ফিউচারিস্ট ম্যানিফেস্টো অবাধ যে নতুন ভাবধারা ইউরোপের সর্বত্র কবি দার্শনিক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন ঘটিয়েছিল তা অনেকটাই ইংরেজদের এড়িয়ে যায়। আমরাও তখন ভিস্যুয়াল লজ অব অ্যাপিয়ারেন্স এন্ড রিয়ালিটি নিয়ে যেসব নতুন তথ্য চিত্রকলায় ব্যবহৃত হল, তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারিনি। আর্ট স্কুলে শিক্ষাকালীন (১৯১৬-১৮) অবস্থায় আমি ঐসব কথা তো শুনিইনি, পরেও খোঁজ নিয়ে জানি যে আমাদের দেশের তরুণ শিল্পীরা কোথাও এসব জানবার সুযোগ পাননি।' (বাংলাদেশে রাজনীতি ও চিত্রকলার একশ বছর' : অমৃত, ১৪ বর্ষ; ১২ সংখ্যা)

সুতরাং, অভ্যাসজীর্ণ রেনেসাঁস চিত্রকলার যে পল্বলস্রোতে আর্ট স্কুলের চঙ্ক্রমণ, তার থেকে মুক্তিলাভ ছিল, প্রকৃত শিল্পী হবার প্রথম শর্ত। আর এই মুক্তিলাভের সুযোগও অতুল বসু পেলেন, ১৯২১ সালে, লন্ডনের রয়েল অ্যাকাডেমীর ছাত্র হয়ে। ভিক্টোরীয় যুগ ও তার অবক্ষয়পীড়িত, অসার চিত্রকলার আয়ু ততদিনে অবসিত; মানে-হুইসলার-শিক্ষিত, বেলাসকেজ-অনুপ্রাণিত ইংলন্ডে তখন ইমপ্রেশনিজম-এর জয়-জয়কার। এর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ওয়াল্টার রিচার্ড সিকার্ট (Walter Richard Sickert ১৮৬০—), শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতিশিল্পী জন সিঙ্গার সার্জেন্ট (John Singer Sargent, ১৮৫৬-১৯২৫)। এ'রা লক্ষ্য করেছিলেন, দ্রষ্টার অভিজ্ঞতায় বাহ্য বস্তুর রূপান্তর সাধনে আলোর ভূমিকা অসাধারণ। কোন জ্যামিতিক পরিমাপ নয়, আলো, হাঁ, আলোই সেই স্বর্ণসূত্র—যার সাহায্যে দৃশ্যমান বস্তুসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে আপনা হতেই রচিত হয়ে ওঠে এক নির্মিতি বা কম্পোজিশন। অপিচ, কোন বস্তুর সংস্পর্শে আমাদের অক্ষিপটে প্রথম যা ধরা পড়ে—তা হল বস্তুর উপরিতলে ভাসমান আলোছায়ার এক অবিশ্রান্ত লুকোচুরি। এর ফলে,

ত্রিমাত্রিক অবস্থিতি বা গভীরতা—এককথায়, যা-কিছু আমাদের অভিজ্ঞতার সুফল—তা সবই বস্তুর উপর আরোপিত হতে থাকে ধীরে ধীরে। এবং হতে থাকে যে পরিমাণে, সেই পরিমাণে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে আমাদের প্রথম পরিচয়ের চকিত আনন্দটুকুও। এই প্রথম পরিচয়ের আনন্দশিল্পে সৃজন করবার অভিপ্রায়েই ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা স্থাপত্যধর্মী চিত্রকলার স্থলে বরণ করলেন দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকলাকে। তাঁরা ঘোষণা করলেন ছবির কোন অংশবিশেষকে মুখ্য আকর্ষণ করে তোলা নয়, এক বিশেষ পরিবেশে 'এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের চপল এক মুহূর্তের অনুভূতি'র রূপায়ণ-ই শিল্পরচনার লক্ষ্য হওয়া উচিত। 'The Late Breakfast' ছবিটিকে এই ধরনের চিত্র-রচনায় অতুল বসুর প্রথম প্রয়াস বলা যায়। চিত্ররচনার এই নতুন দর্শনের সঙ্গে তিনি প্রথম পরিচিত হলেন ওয়াল্টার রিচার্ড সিকার্টের মাধ্যমে।

ছবিটিতে দেখি মানুষ, আসবাব, তৈজস—কেউই এখানে অপ্রধান নয়। বরং যথাযথ স্থানে পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে এক পরিবেশ রচনাই যেন এদের কাজ। তেমনি সবকিছুর মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত এক নীলাভ আলো যেন নয়নমনে সঞ্চারিত করে যায় প্রভাতের এক সর্বব্যাপী প্রসন্নতা। 'The Late Breakfast' ছবিটিকে অতুল বসুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না হয়তো—শিল্পী নিজেই বলতেন ঐ ছবিটিতে 'artist in making'-কেই ভাল চেনা যায়—কিন্তু এইখানেই আমরা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রথম পদসঞ্চার শুনতে পাই। এই ছবিটি শিল্পী অতুল বসুর জীবনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

সামগ্রিকভাবে ইমপ্রেশনিজম-এর তত্ত্বে তিনি শিক্ষালাভ করেন সিকার্ট-এর কাছে। পক্ষান্তরে, প্রতিকৃতি রচনার কৌশল তিনি আয়ত্ত করেন সার্জেন্ট-এর ছবির প্রদর্শনী দেখে। এর প্রথম ফল 'Study of a Head' ছবিটি। অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর যে প্রদর্শকক্ষে অন্য সব ছবির সঙ্গে অতুল বসুর ছবিটিও স্থান পেয়েছে, সেখানে যে-কোন শিল্পজিজ্ঞাসু-ই প্রাক্-ইমপ্রেশনিস্ট এবং ইমপ্রেশনিস্ট ছবির পার্থক্য সহজেই অবহিত হতে পারবেন। অন্য সব ছবিতে দৃশ্যবস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের ক্রমিক চিত্রণ-ই যখন রচনার মূল কৌশল, অতুল বসুর ছবিতে ছবিতে সমগ্র অবয়ব, তথা বেশবাস তখন একই আলোর আচ্ছাদনে বিধৃত। এই কারণেই ছবির কোন অংশকেই চিহ্নিত করার কোন প্রয়াস শিল্পী করেননি, আলোর সামান্য তারতম্য ঘটিয়েই তিনি পেরেছেন বস্তুর আভাস আনতে। এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে গলবন্ধনী ও চুল, এইভাবেই—তুলির একটিমাত্র আঁচড়েই—বোঝানো সম্ভব হয়েছে গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য। আলোর তারতম্যে বস্তুর আভাস সৃষ্টি করা,—শিল্পের এই অঘটনঘটনপটীয়সী ক্ষমতার শিক্ষালাভ ইমপ্রেশনিস্টরা অবশ্য করেন সপ্তদশ শতকের স্পেনীয় চিত্রকর বেলাসকেজ-এর কাছ থেকে। যে কালে সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ফ্লোরেন্সীয় চিত্রবিজ্ঞানের একাধিপত্য, বস্তুত, যে কালে লিওনার্দো-মাইকেল অ্যাঞ্জেলো প্রবর্তিত চিন্তাধারার বিরুদ্ধতা ছিল প্রায় ধর্মদ্রোহিতা, সেই সময়েই বেলাসকেজ আদর্শ করেছিলেন ভেনেসীয় চিত্রকলার সূর্যকরোজ্জ্বল রূপকে। ফলত, তাঁর ছবিতে রেখার স্থান অধিকার করল বর্ণসুষমা, নির্ধারণার স্থলে এল ব্যঞ্জনা। সামান্য ইঙ্গিতে বস্তুর প্রতিভাস সৃষ্টি করার এই শিল্পচাতুর্য মানে (Manet) ও তাঁর পরবর্তী চিত্রশিল্পীদের প্রভাবিত করেছিল বলেই তাঁরা বেলাসকেজ্-কে বলেছিলেন 'Painters' Painter'। অন্যদিকে শিল্পরসিকের কাছেও ধরা-না-ধরার খেলা এই শিল্পের আকর্ষণও অপ্রতিরোধ্য।

এই শিল্পপদ্ধতিরই সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করি অতুল বসুর পরবর্তী দুটি ছবিতে। 'J. N. B.' প্রতিকৃতিতে দেখি একমাত্র আলোর উত্থানপতন ছাড়া বস্তুরূপকে বোঝানোর অন্য কোন উপায় সেখানে অবলম্বন করা হয়নি। কম্পমান আলোর এক বন্যায় যেন মানুষে, পশ্চাৎপট সবই

সেখানে ভাসমান; লম্বমান এক রেখা প্রতিফলিত হয়ে সে আলো নাসিকার তীক্ষ্ণতা, কখনও বা ওষ্ঠাধরের নমনীয়তা, কখনও বা চশমার বর্তুলভাব। আলো-ছায়ার রহস্যময় খেলার মধ্য দিয়ে প্রতিকৃতি ধরবার যে সার্থক প্রয়াস অতুল বসুর এই 'J. N. B.'-তে লক্ষ্য করি, তার একমাত্র তুলনা আমি পেয়েছি সার্জেন্ট-অঙ্কিত 'Vernon Lee' ছবিটিতে।

এইখানেই উল্লেখ করা যায় তাঁর 'আত্ম-প্রতিকৃতি'-র—হলুদ-সবুজ ও অনতিস্পষ্ট বাদামী রঙের জমিতে জমিতে আঁকা সেই ছবিটি যা দেখে বিখ্যাত রুশ চিত্রশিল্পী ঈ একানভ্ বলেছিলেন—"He is not only an artist, but a master"। ভারতবর্ষে প্রতিকৃতিশিল্পের ইতিহাসে অনন্য-পূর্ব এইসব ছবির জন্যই অতুল বসু অমরত্ব দাবি করতে পারেন। এইসব সৃষ্টিই তাঁকে বসিয়েছে বেলাসকেজ্-মানে-গেইনস্‌বরো-সার্জেন্ট-উইলসন্ স্টীর-এর পাশেই এক আসনে। দ্রুত রঙ প্রয়োগের জন্য তুলি টানার এক বিশেষ কৌশল এ'দের ছবিতে লক্ষ্য করি। এরই ফলে ছবিগুলি পায় স্কেচসুলভ এক অসম্পূর্ণতা, যা ছবির আকর্ষণ বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। সম্প্রতি কোন কোন সমালোচনায় এই বিশেষ শিল্পপদ্ধতিকে "Virtuoso School' or 'Brush stroke style of painting' বলে নিন্দা করার এক প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। যেন নিছক কলাকৌশলের চমৎকারিত্ব দেখাবার জন্যই এ ধরনের শিল্পপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, দৃশ্য-বস্তুর বিচ্ছিন্ন অংশকে এক আলোর তরঙ্গে মিলিয়ে, তথা বর্ণকাজগে এক অপ্রস্তুতির ভাব রক্ষা করে, শিল্পী যেন দর্শককেও আমন্ত্রণ করেন আপাতসম্পূর্ণ ছবিকে নিজ মনে সম্পূর্ণ করে তুলতে। তিনি যেন আমাদেরও কল্পনাকে মুক্তি দিয়ে যান, ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণতা দান করতে গিয়ে দ্রষ্টা নিজেই হয়ে ওঠেন স্রষ্টা। যে-কোন ব্যঞ্জনাধর্মী শিল্পের এই প্রধান গৌরব--প্রত্যেকের জন্যই তার নতুন নতুন সৃষ্টির, নব নব দিগন্ত বিস্তারের সুযোগ থাকে। দৃশ্যমান জগতের মধ্যেই যে অদৃশ্যের ইশারা, পলাতক আলো-ছায়ার মধ্যেই যে অধরা মাধুরীর অমোঘ আহ্বান, সেই আহ্বানকেই যেন আমরা নতুন করে শুনতে পাই এ'দের ছবিতে। সেই অধরকে ধরবার সাধনায়—হয়তো বা নিষ্ফল সাধনায়—আমরাও যে উৎসুক হয়ে উঠি, সক্রিয় হয়ে ওঠে আমাদের বুদ্ধি, অনুভূতি, অতুল বসুর ছবিতে দর্শকের সেরা লাভ তাই। কিন্তু ব্যঞ্জনাসৃষ্টির এ কাজ শিল্পে খুব সহজ নয়। একাধারে বস্তুর রূপ রঙ ও বর্ণসমন্বয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্য বিষয়েও যে সচেতনতা থাকলে এই ধরনের ব্যঞ্জনাধর্মী শিল্পসৃষ্টি সম্ভব, তা কেবলমাত্র প্রতিভাবান শিল্পীরই অধিগম্য। দৃশ্যবস্তু বিষয়ে যে অন্তঃসন্ধানী প্রত্যক্ষ জ্ঞান, শিল্পনৈপুণ্যের যে পরাকাষ্ঠা, অতুল বসুর এইসব ছবিতে বাস্তবের উজ্জ্বল প্রতিভাস সৃষ্টি করেছে, সহজাত বোধ ও অনলস তপস্যার সে মিলনের দ্বিতীয় উদাহরণ আমরা যতদিন না পাই, ততদিন, বলা বাহুল্য, শিল্পী হিসাবে অতুল বসুর আসন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠ কিছু নয়, সে তো বিশেষ শিল্পদর্শনেরই বাহ্যিক প্রকাশমাত্র। বস্তুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যে সজীবতা, তাকেই শিল্পে অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছিলেন ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীরা। কিন্তু এই সজীবতা নিজ মনে উপলব্ধি করেন না যিনি, তাঁর শিল্পকর্মে এই বাণী নিতান্ত নিষ্প্রাণ থিওরিতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। কিন্তু কতটুকু পারি আমরা দর্শনের সে আনন্দকে অক্ষুন্ন রাখতে? শিশু পারে; সামান্য স্পর্শসুযোগও তার হাসির উচ্ছ্বাসে, জানালা দিয়ে ঘরে ঠিকরে আসা আলোকে ধরবার নিষ্ফল প্রয়াসেও ব্যক্ত হয় পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম চিন্তাভারহীন পরিচয়ে তার আনন্দ। কিন্তু বয়স বাড়ে, পুঞ্জীভূত হতে থাকে আমাদের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ও। নতুন পরিচয়েও আমরা আরোপ করি পূর্বতন অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্র—সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে। এমনি করেই রূপ-রঙ-প্রকাশের গৌরবে মহান পৃথিবীর দৃশ্যবস্তুগুলির মধ্যে আমরা টানি বৈষম্যের ভেদরেখা—এ সুন্দর, ও কুৎসিত।

সৌন্দর্যের যে ছবি, রঙের যে কল্পনা আমাদের চারপাশে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে

যাচ্ছে, কোন মতবাদের দড়ি দিয়ে কি তাকে বাঁধা যায়, না চেনা যায় তাকে নিজের পছন্দ করা চশমা নাকে পরে? তাকে পাবার জন্য মনকে প্রস্তুত করে রাখতে হয়, আনন্দ পাবার ও আনন্দ দেবার একটি ইচ্ছা নিয়ে, শিশুর একটি সারল্যকে বুকের মধ্যে লালন করে। যদি বস্তুবিশ্বের সামনে উপস্থিত হতে পারি কেবলমাত্র দর্শন-শ্রবণকে পথপ্রদর্শক করে, তাহলে দেখব, যা কিছু প্রকাশের গৌরবে উজ্জ্বল, তাই সুন্দর—সেখানে জরাগ্রস্ত কাম্বারল্যান্ড ভিক্ষুকের সঙ্গে বীর ওথেলোর কোন পার্থক্য নেই, ক্ষুদ্র ডেইসি ফুল আর নক্ষত্রখচিত মহাকাল, দুই-ই এক প্রকাশের বার্তা বহন করে ধন্য। এমনি করে প্রকাশমাত্রকেই মহৎ বলে বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন বলে ইমপ্রেশনিস্টরা বলতে পারতেন ওর্ডসওয়র্থ-এর মতো, বলেছিলেন—শিল্পীর চোখে সুন্দর মুখ আর বাঁধাকপি দুই-ই সমান প্রশ্রেয়, উভয়েই শিল্পের উপজীব্য। এই যে স্বচ্ছ, সহজ মন, রূপের যে কোন প্রকাশই ছাপ রেখে যায় এমন একটি মন, এ মন অতএব নিষ্ক্রিয় নয়, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আনন্দের যোগস্থাপনের সেই একমাত্র সূত্র।

এক-একদিন বিস্ময়ের দরজা আমাদের চোখের সামনেও খুলে যায়। সকালে সানাই শুনেই চমকে ওঠে মন—এ কি আগমনীর সুর না? হাওয়া গায়ে লাগলেই বলে উঠলাম—শীত তবে গেল, এ যে বসন্তের হাওয়া! কিন্তু চকিত আনন্দের এই মুহূর্তগুলি আমাদের জীবনে যেমন অচির-স্থায়ী, তেমনি সংখ্যায় অল্প। একমাত্র শিল্পেই এরা অমরত্ব লাভ করে। একমাত্র শিল্পীর জীবনেই আনন্দের এই সহজ উৎসটুকু অভ্যাসে জীর্ণ হয়ে যায় না। শিশুর এই সারল্য, মুগ্ধ হবার এই স্বাভাবিক প্রবণতাটুকুই লক্ষ্য করেছি অতুল বসুর চরিত্রে ও মনে। ঘনিষ্ঠ কথোপকথনের সে অভিজ্ঞতা স্মৃতির অম্লান সম্পদ। নিজ শিল্পীজীবনের অতীতচারণায় কখনও সে মন অট্টহাস্যে উচ্চকিত, রেমব্র্যান্ট (Rembrandt) কিংবা যামিনী রায়ের মতো অগ্রজ পূর্বসূরীর প্রসঙ্গে শ্রদ্ধায় অবনত, কখনও বা রবীন্দ্রনাথের গান ('কহ রে সজনী দুরুযোগে/কুঞ্জে নিরদয় কান/দারুণ বাঁশির কাহে বজাওত/সকরুণ রাধা নাম') কিংবা কবিতা ('মনে যে গানের আছিল আভাস') উল্লেখে স্খলিত-বাক বিস্ময়ে অশ্রুসজল। আর সব প্রসঙ্গের মধ্য দিয়েই ঘুরে ফিরে ভাসে কত করতে পেরেছি তার হিসেব নয়, কত দেখলেম তারই তৃপ্তি। 'লাগল ভালো, মন ভুলালো,/এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই', বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা বালক রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি অতুল বসুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ১৮৮১ সালে আঁকা ঐ পেন্সিল-স্কেচটিতে লক্ষ্য করি সৌন্দর্যের প্রথম দর্শনে বালক রবির বিস্ময়বিমুগ্ধ দু চোখ। সদর স্ট্রীটের মাথায় সূর্যোদয়ে একদিন স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল যে কবির, দীর্ঘ আশি বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যসাধনায় এ বিস্ময় তাঁকে বারে বারে ডাক দিয়েছিল—পদ্মাতীরে সূর্যোদয়ে, প্রভাতের প্রথম জাগরণে কিংবা ফাল্গুনের মাধবীলীলায়। দূর প্রবাসে একদিন একটি লতা কবিকে ঔদাস্যের জড়তা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তাঁর সেই বিস্ময়ের আনন্দকেই তিনি ছন্দে-বাণীতে রূপ দিলেন—'নীলমণিলতা'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ছবিতে আনন্দিত বিস্ময়ের যে প্রতিরূপ, তারই সাক্ষাৎ আমরা পাই বারে বারে কবির কাব্যে, গায়কের সুরে, শিল্পীর শিল্পে। অভ্যাসের সীমা টানা, চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে ঘেরা এই পৃথিবীর মধ্যেই তাঁরা বিস্ময়ের সন্ধান পান; ঔদাসীনতার ম্লান কুয়াশায় আচ্ছন্ন জাড্যজীর্ণ আমাদের দুচোখের আবরণ সরিয়ে রূপে ভরা, রঙে উজ্জ্বল পৃথিবীকে দেখতে সাহায্য করেন; কৃতজ্ঞ বিস্ময়ে আমাদের নম্র মন তখন বলে, 'কেন এ কে জানে':

> কেন এ কে জানে এত বর্ণ গন্ধ রসের উচ্ছ্বাস
> প্রাণের মহিমাচ্ছবি, রূপের গৌরবে পরকাশ

যেদিন বিতানচ্ছায়ে, মধ্যাহ্নের মন্দবায়ে
ময়ূরে আশ্রয় নিল, তোমারে তাহারে একখানে
চেয়ে চেয়ে দেখিলাম, কহিলাম 'কেন এ কে জানে'?

রূপের গৌরবে প্রকাশিত, প্রাণের এই মহিমার ঘোষণাই অতুল বসুর শিল্পসৃষ্টির মর্মবাণী।

তপন রায়চৌধুরী

সন্ন্যাসের বিপক্ষে

সন্ন্যাসপ্রথার লোপ হবার সময় এসেছে। এখনো বহু সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সৎলোক; স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন; একথাগুলো সত্য কিন্তু অবান্তর। সন্ন্যাসীদের দ্বারা যে-সমস্ত ভালো কাজ হয়েছে তা প্রথার গুণে নয়, স্থানকালপাত্রের গুণে। সেই স্থানকাল-পাত্রের গুণ যে যুগে প্রায় সাধারণ ছিল সে যুগ ফুরিয়েছে।

প্রথাটার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি ওটা মানবচরিত্রবিরুদ্ধ। মানুষ মানে তাকেই যার বল বেশি, যার অভিজ্ঞতা বেশি, যার ভাগ্য বেশি। অর্থাৎ তাকেই মানে যাকে রাজা বলে চেনা যায়। এ ছাড়া মানে বিশেষজ্ঞকে, আর সব বিশেষজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবদেবীর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যে তাকে, অর্থাৎ পুরোহিতকে। রাজা বিশেষজ্ঞ নন, তিনি সর্বজ্ঞ, সবরকম বিষয়ে তাই রাজাকেই মানে বেশি, দেব-দেবীর বিষয়ে সুদ্ধ।

সন্ন্যাসীকে মানতে চায় না। কিছুদূর পর্যন্ত মানে হয়তো, প্রথাটা রয়েছে বলেই। বেশি দূর নয়। তাও তার সন্ন্যাসীকে মহারাজ সম্বোধন করা চাই, তাকে ধনদান করা চাই। সন্ন্যাসীদের উপর নির্ভর করলে সামাজিক ব্যবস্থা দুর্বল হতে বাধ্য। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন কী করে যথেষ্ট পরিমাণে হবে তাহলে? আরও কথা, ধর্মচর্চা যদি সন্ন্যাসীদের উপর নির্ভর করে তাহলে সে ধর্মে কাজ হবে কতটুকু?

কাউকে না কাউকে মানতে হয়ই। তা না হলে একা বেশি কিছু হয় না। সমষ্টিগত জ্ঞান না পেলে অজ্ঞান ঘোচে না সহজে। নিজের উপর নির্ভর করে যেটুকু জ্ঞান অর্জিত হয় তা বেশি নয়। সন্ন্যাসীদেরও দল থাকে। রাজা যেদিকে সেইদিকেই যাবার ঝোঁকটা তাই প্রবল।

কথা শুনবে না, শুধু ভান করবে কথা শোনার, অথবা কথা শুনবে অত্যল্প পরিমাণ, নামমাত্র —এই বৃত্তি তো ভালো নয়। এর উপর নির্ভর করলে কোনো বিষয়েই অজ্ঞান দূর হবে না, এমন কি দেবদেবীর বিষয়েও নয়।

সন্ন্যাসপ্রথার উৎপত্তি কেন হয়েছিল তবে—একথার জবাব প্রয়োজনীয় নয়। উৎপত্তি যে কারণেই হয়ে থাক, সমাজসংগঠনে সন্ন্যাসের দৌর্বল্য বোঝা কঠিন নয়।

সন্ন্যাস মানে ত্যাগ। ত্যাগ যদি উপযুক্ত হয় তাহলে তার থেকে বল বাড়ে, অভিজ্ঞতা বাড়ে, ভাগ্যও উন্নত হয়। কিন্তু সাধারণ লোককে ত্যাগের মহিমা বোঝানো শক্ত। রাজা ত্যাগী নন, ভোগী। ভোগের গুণেই বড়। ভোগীর কথাই লোকে শোনে বেশি।

সন্ন্যাসীরা খায় কম। কথাটা ঠিক, কিন্তু সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে পাওয়া যায়ও কম। কারণ লোকে নামমাত্র ছাড়া মানতে চায় না।

সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে আরো বলবার কথা আছে। সন্ন্যাসী কে, কার প্রতিনিধি? পুরোহিত যেমন

রাজশক্তির উপর নির্ভর, সন্ন্যাসী কি তাই?

প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের শেষের দিকে যখন সন্ন্যাসীদের সংগঠিত করা হয় তখন এ প্রশ্নের উত্তর ছিল পরিষ্কার। সন্ন্যাসীও রাজশক্তির উপর নির্ভর—কিন্তু নিকটস্থ ক্ষুদ্র রাজ্যের নয় দূরস্থ সমগ্র হিন্দুরাজাদের শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁরই উপর নির্ভর। সন্ন্যাসী দেবদেবী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতেও পারে নাও পারে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নয়। যৌগিক কতগুলি ক্রিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলে চিকিৎসক-তুল্য বিবেচিত হতে পারে। নয়তো সন্ন্যাসীকে বিবিধ কর্ম করতে হয়, রাজশক্তির প্রতিনিধি বটে কিন্তু বিশেষজ্ঞ নয়। ছেলেভুলোনো ম্যাজিক, বালকের শিক্ষা, দুর্গতের ত্রাণ, রোগীর হাসপাতাল ইত্যাদি অনেক কিছুই।

এ কাজগুলি নিকটস্থ ক্ষুদ্র রাজ্যের দায়িত্ব—অন্তত আজকালকার মতে। শেষোক্ত বিবিধ কর্মগুলি তো বটেই। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ক্রমশই এ বিষয়ে আরও সচেতন হয়ে উঠছেন। তাঁদের কাজ তাঁরা যতই হাতে নেবেন সন্ন্যাসের প্রয়োজন ততই ফুরোবে।

হিন্দুধর্মে সন্ন্যাসের স্থান ক্যাথলিক ধর্মে সন্ন্যাসের স্থানের সঙ্গে তুলনীয় নয়। ক্যাথলিক ধর্মে দেবদেবীর পুজো নেই, সন্তপুজো আছে। সন্তদের বেশির ভাগই সন্ন্যাসী চরিত্র। তা ছাড়া ক্যাথলিক ধর্মে সন্ন্যাসী পুরোহিত আলাদা নয়। সাধারণভাবে তাই হিন্দুদের পক্ষে সন্ন্যাসের লোপ অপেক্ষাকৃত সহজও বটে, একেবারেই সম্ভবও বটে।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তুলনা আরও অবাঞ্ছনীয়। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম অনেকদিন হল বিলুপ্ত হয়েছে। হিন্দু সন্ন্যাস বৌদ্ধ সন্ন্যাসের মতো নয়। বৌদ্ধধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করাও এ স্থানে ঠিক হবে না।

পুণ্যশ্লোক রায়

চতুর্থ অঙ্কের প্রতীক্ষায়

নাটকের তিন অঙ্ক দেখা হয়ে গেছে। চতুর্থ অঙ্কের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছি।

প্রথম অঙ্কে শুনেছি কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, লক্ষ্মীর পাঁচালী। যাত্রার আর পালাগানে প্রথম অঙ্কের দর্শকরা অবাক হয়ে দেখত পৌরাণিক আদর্শ, কবির লড়াই তর্জাতে হেসে গড়িয়ে পড়ত এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীগুলোও বিনা প্রয়াসে আয়ত্ত করত। প্রত্যেক বাড়িতে সন্ধ্যার ধুনো গঙ্গাজল, ছোটদের নিয়ে ঠাকুরমা'রা বলতেন রূপকথা—আরামের পালঙ্ক স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে বীর রাজপুত্রদের দুঃসাহসিক জয়যাত্রার রোমাঞ্চকর কাহিনী। বাবা-কাকারা একান্নবর্তী অনটনের সংসারে সকলের সমান খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করছেন প্রাণপাত চেষ্টায় অথচ হাসিমুখে শিক্ষকরা আধপেটা খেয়েও রামচন্দ্র-যুধিষ্ঠিরের আদর্শ প্রচার করতেন ছাত্রমহলে। বিদেশী শাসক সবেমাত্র জাঁকিয়ে বসেছে, সর্বস্তরেই শান্তি স্থাপন করেছে; উপার্জনের নব নব কর্মকাণ্ড দিকে দিকে প্রসারিত। যুবকরা ধনী হবার নতুন প্রেরণায় দেশবিদেশে বেরিয়ে পড়ছে। সাফল্যের অসংখ্য ধারায় প্রাচুর্যের বন্যা। তৈরি হচ্ছে ছোট-বড় ধনী, ব্যবসাদার, জমিদার। তাদের দানে গড়ে উঠছে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তা, সাঁকো, মন্দির, অতিথিশালা। গরিবের ঘর থেকেও মাথা তুলে বেরিয়ে আসছে এমন সব জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, মনীষীর দল যাঁদের জন্মের দ্বিশত-বার্ষিকী, সার্ধশতবার্ষিকী এখন আমরা পালন করছি নাচ-গান আর বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটিয়ে। এর

পরেই হয়েছিল প্রথম অঙ্কের যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা উঠল। লক্ষ্মীর পাঁচালীর জেল্লা আর তেমন নেই, কবিগান প্রায় অচল। তার জায়গা দখল করেছে 'ভনা' থেকে শুরু করে 'মেবার পতন'। যার মূলে শিক্ষা 'গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ'। সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী'। রামায়ণ থাকলেও সেই কৃত্তিবাসী নেই, তৎপরিবর্তে 'গাহিব মা বীররসে ভাসি', মেঘনাদবধকাব্য। সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সুর এক ও অদ্বিতীয়—'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়'। অন্দরমহলে ধুনো গঙ্গাজল আগের মতোই। ঠাকুরমা রূপকথা বললেও ছেলে মায়ের কাছে রান্নাঘরে বসে শুনতে চায় বিবেকানন্দের গল্প যা কিনা তার অল্পশিক্ষিত মা সেই সপ্তাহের 'হিতবাদী' বা 'বঙ্গবাসী' কাগজে সেই দিনেই বা তার দু-একদিন আগেই মধ্যাহ্নের অবসরে পাঠ করেছেন। অপরপক্ষে বেশির ভাগ একান্নবর্তী পরিবারেই ভেদবুদ্ধির অল্প অল্প কালো রেখা দেখা দিতে শুরু করেছে। কোন কোন বেশি মাইনের করিৎকর্মা লোকের মনের অন্ধকার কোণে সরলবিশ্বাসী নিকটতম আত্মীয়কে বঞ্চনা করার কুটিল স্বার্থবুদ্ধি দানা বাঁধতে আরম্ভ হয়েছে। ওদিকে শিক্ষকরাও বহুপঠিত পুরাণকাহিনীর পরিবর্তে ম্যাট্‌সুইনি, গ্যারিবল্ডির আদর্শে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করছেন, দরিদ্রসন্তান নেপোলিয়নের কীর্তিকাহিনীতে তৎকালীন তরুণ-সমাজকে মুগ্ধ করছেন। বিদেশী শাসক তার বন্ধনকে কঠিনতর করছে। উপার্জনের কর্মপরিধি ক্রমশ সীমিত হচ্ছে। সাগরপারের বিদেশী শোষক আর ভারতের ভিন্নভাষী অর্থসর্বস্ব বৈশ্যবংশ বাংলার ভাঁড়ারঘরে জবরদখল প্রতিষ্ঠা করছে। মন্ত্রগুপ্তির অন্তরালে অতি ধীরে প্রায় অজ্ঞাতেই বিদেশী শাসকদের তাড়াবার জন্য গড়ে উঠছে আত্মাহুতির সংকল্পে অবিচলিত 'সন্তান'দল, গড়ছে মহারাষ্ট্রে, বাঙলায়, পাঞ্জাবে এবং সাগরপারেও। ভবানী পাঠক, সত্যানন্দের মানসপুত্রেরা তৈরি হতেই গর্জে উঠল বোমা, পিস্তল, রাইফেল। বিদেশী পুলিসও তৎপর হল হাতকড়ি নিয়ে যার পরিণতি দ্বীপান্তর আর ফাঁসির দড়িতে। এইভাবেই আসমুদ্রহিমাচল কাঁপিয়েছিলেন যাঁরা, আমরা আজ সেইসব মনীষী এবং কর্মীদের জন্মশতবার্ষিকী পালন করি। আধুনিক বাঙলার অর্ধশতাব্দী-ব্যাপী দ্বিতীয় অঙ্কের এখানেই যবনিকাপাত।

তৃতীয় অঙ্কে একজন দুজন নয়, কিন্তর নেতা, জনদরদী, সাহিত্যিক দল বেঁধে এবং দলাদলি করি এগিয়ে আসছেন অসংখ্য, ভিড়ে ভিড়াক্কার, কিন্তু একালের রাজনীতি, জনসেবা, সাহিত্য—কোন কিছুরই বীজ এদেশের নয়, সমস্তই বিদেশী। সাহিত্যে 'গাহিব মা বীররসে ভাসি' নয়, আদি রসের অফুরন্ত প্লাবন। ছবিতে গানে তারই উন্মাদনা। দেশীয় ভাবধারার পুরাতন যাত্রা থিয়েটার একেবারে অচল, তার জায়গায় নানা ঢঙের নতুন আঙ্গিকের অভিনয়, যেখানে পুরাতন আদর্শবাদ ঘৃণিত, বর্তমান পরিবেশের দোহাই দিয়ে শ্রেণীবিরোধ ও পারস্পরিক ঈর্ষার প্রবল প্রেরণা এর একদিকে এবং অন্যদিকে বাস্তববাদের অজুহাতে যথেচ্ছ ব্যভিচার। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মুখোশ পরিয়ে স্বার্থসর্বস্বের অবাধ অত্যাচার। ভেঙে পড়েছে একান্নবর্তিতা। এক ভাইয়ের ঘরে খাদ্যপানীয়ের অফুরন্ত স্রোত, বিলাসের যাবতীয় উপকরণ; অন্য ভাই অন্নাভাবে দিশাহারা। এখনকার ঠাকুরমা'রা রূপকথা বলবেন কি, জানেনই না, রূপকথার জন্যে চেয়ে থাকেন 'মিকি মাউসে'র দিকে এবং মায়েদের সঙ্গে ছেলেদের সম্বন্ধ নামমাত্র। ধনী মা সন্ধ্যায় পার্টিতে যান, গরিব জননী পরের বাড়ি টিউশনি করেন। ছেলেরা সন্ধ্যায় বেওয়ারিশ রোয়াকে, পার্কের বেঞ্চিতে আর পাড়ায় পাড়ায় চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়, মধ্যবিত্তরা শোনে রেডিও যেখানে লোকসংখ্যা সীমিত করার প্রচণ্ড আগ্রহে জন্মনিয়ন্ত্রণের অশ্রাব্য উপদেশ। ধনিগৃহে সন্ধ্যায় পঠনপাঠনের প্রবেশ নিষেধ, কারণ সেখানে তখন টেলিভিশনের ভীষণ প্রতাপ। শিক্ষকরাও শিক্ষকতা ত্যাগ করে শিক্ষাজীবীর বৃত্তিটুকুই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন।

তাদের কাছে শিক্ষালয়ের দ্বারা প্রদত্ত মাসমাইনেটা এখন কেবলমাত্র রিটেনিং ফী। তাঁদের আসল উপায় টিউশনি আর কোচিং ক্লাস, যে উপার্জন ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা টেরও পায় না। দ্বিতীয় উপায় মানের বই লেখা। সেই লেখাতেও পুস্তক-প্রকাশকদের সঙ্গে নানা রকমের আলো-আঁধারি, লুকোচুরি, মাৎস্যন্যায়। এর উপর শিক্ষকদের আর-একটা বড় কাজ,—বেতনবৃদ্ধির দাবিতে বছরে দু-চারবার ধর্মঘট, মিছিল, রাজভবনের ফটকে লোক-দেখানো প্রায়োপবেশন।

তৃতীয় অঙ্কের আদর্শহীন, দাম্ভিক মানুষগুলোর দৈনন্দিন জীবনের শতসহস্র চাহিদা দ্রুতবেগে বর্ধমান। বিলাসিতার অজস্র উপকরণ, ব্যক্তিস্বার্থের লক্ষ রকম দাবি—এই-সমস্তের জন্যই চাই তার টাকা, আরও টাকা এবং অনেক টাকা। চাহিদাবৃদ্ধি, বেতনবৃদ্ধি, মজুরিবৃদ্ধি এবং তারই পরিণামে পণ্যমূল্যবৃদ্ধির দুষ্টচক্রে মানুষ আজ নিজের সৃষ্ট রাক্ষসী ক্ষুধায় নিজেই বিপর্যস্ত। শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, আন্তরিকতা—প্রথম আর দ্বিতীয় অঙ্কের এইসব মানবিক বৃত্তি তৃতীয় অঙ্কে 'কবিত্ব',—উপহাসের বস্তু; তৃতীয় অঙ্কের কৃতী লোকেরা এইসব ভাবধারাকে মনে মনে বর্জনীয় কুসংস্কাররূপেই গ্রহণ করেন। তৃতীয় অঙ্কের নায়ক-নায়িকার চোখে সংসার আর আশ্রম নয়, সংসার বিলাসের নর্মকুঞ্জ, খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার নিজস্ব আস্তানা। সেই বিলাসের জন্য অসবর্ণ বিবাহ এবং বিলাস ক্ষুণ্ণ হলেই বিবাহবিচ্ছেদ। দুয়ের জন্যই সরকারী আইন আর ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন। ভ্রূণহত্যায় সরকারী আইনের অবাধ প্রশ্রয়, সুশিক্ষিত চিকিৎসকদের ব্যাপক ব্যবস্থায় সাগ্রহ আমন্ত্রণ; সমাজের উদার স্বীকৃতি। এইভাবে কৃষ্টির ভূমিকায় 'খিস্তি'র এবং সংস্কৃতির মুখোশে দুষ্কৃতির অবাধ অভিযান এখন পর্যন্ত পূর্ণবেগে প্রধাবিত।

তৃতীয় অঙ্কের যবনিকাপাত একদিন-না-একদিন হবেই। কিন্তু আজ থেকে একশ বছর পরে যারা আসবে তারা অর্থাৎ আমাদের সেই অনাগত বংশধরেরা কি জন্মশতবার্ষিকী পালনের মতো এখনকার আমাদের মধ্যের একটা নামও খুঁজে বার করতে পারবে? আমরা তো আমাদের চারপাশে চেয়ে-চেয়ে এরকম একজনকেও খুঁজে পাই না যাকে মনে রাখতে ইচ্ছে হয়। শুধু বাঙলার নয়, সারা ভারতেই বা কে এমন আছে আজ থেকে শতবর্ষ পরে যিনি হবেন শ্রদ্ধায় কীর্তিতে বরণীয় আর স্মরণীয়?

এ রকম কেউ থাক আর নাই থাক, তৃতীয় অঙ্কের নিদারুণ রিক্ততা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের কুশীলবরা পূরণ করবে—এই আশাই আমাদের এখনকার প্রেক্ষাগৃহের একমাত্র সম্বল। অবচেতনে ক্ষীণ একটা আশাই বার বার উঁকি দেয়। আমাদের বাল্যকালের অর্ধাহারী শিক্ষকমহাশয় বলতেন, 'ওরে, গরিবের ছেলেরাই বড়ো হয়, বড়লোকের ছেলেরা পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে অধঃপাতে যায়'। গুরুবাক্যের দ্বিতীয় অংশ চোখের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের অসংখ্য ক্ষণজন্মাদের বংশধরদের অধঃপাতযাত্রার বিরাট মিছিল প্রত্যক্ষই দেখছি। অতঃপর সেই পরাধীন দরিদ্র যুগের অখ্যাত শিক্ষাগুরুকে স্মরণ করে প্রার্থনা করি-এই অনর্থপাতী অর্থপ্রাচুর্যে গর্বিত বর্তমানের ধনী অকিঞ্চনদের অনাগত ছেলেরা যেন আবার বড় হতে পারে, মানুষ হতে পারে, সভ্যজগতে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে পারে।

চতুর্থ অঙ্কের এই দৃশ্য যে কবে দেখব তা উইংসের অন্তরাল থেকে যে অদৃশ্য নিয়ন্তা এই কিম্বাভিনয় পরিচালন করছেন একমাত্র তিনি বলতে পারেন। দৈবনামক সেই অজ্ঞাত প্রম্পটারের মর্জির অপেক্ষায় প্রেক্ষাগৃহের বর্তমান দর্শকরা আকুলভাবে প্রতীক্ষা করছে।

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষার স্তর

ইংরেজ কবি রবার্ট গ্রেভ্‌স্‌ মনে করেন অনুবাদের কাজে হাত দেওয়ার আগে ভাষার স্তর ঠিক করা উচিত। মূল রচনায় ভাষার স্তর দেখে নিয়ে লক্ষ্য ভাষা বা গ্রাহী ভাষায় তার সংগত সমকক্ষ স্তর মনোনীত করা অনুবাদকের প্রথম কর্তব্য।

ভাষার স্তর বলতে কী বোঝায়? ভাষার মধ্যে উচ্চতা বা অনুচ্চতা আছে? সেই উচ্চতা বা অনুচ্চতার সঙ্গে কি শ্রেণীর মিল আছে? সামাজিক শ্রেণীর?

ভাষার ধরনধারনে সামাজিক শ্রেণী ধরা তো পড়েই। শিক্ষার বিস্তৃতিও ধরা পড়ে। একজন জেলেনীর কথার সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানীর কথা কি মেলে? অথচ দুজনই একই ভাষা বলে থাকতে পারে। একই ভাষার মধ্যে পার্থক্য অনেক রকম। শ্রেণী, শিক্ষা, বৃত্তি, অবস্থা—সবই প্রকাশ পায় ভাষায়। কী রকম ভাষায়?

ইউরোপে এককালে গ্রীক আর লাতিন ভাষায় কবিতা দক্ষতার সঙ্গে লেখা হত। ভারতে এখনও সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে লেখা হয়। গ্রীক বা লাতিন ছিল না কবিদের মাতৃভাষা। সংস্কৃত বা ইংরেজী ভারতীয় কবিদের মাতৃভাষা নয়। গ্রীক আর লাতিন ইউরোপে যেমন পড়া হত, ভারতে সংস্কৃত আর ইংরেজী পড়া হয়। সংস্কৃত লাতিনের মতন দেবভাষা। অন্য তিনটি ক্ল্যাসিক ভাষা থেকে ইংরেজী কিন্তু একটা বিশেষ কারণে স্বতন্ত্র। ক্ল্যাসিক ভাষার মর্যাদা পেলেও ইংরেজী জীবন্ত ভাষা। ক্ল্যাসিক ভাষা দাতা ভাষা। দেয় যত, তত নেয় না। জীবন্ত ভাষা গ্রাহী ভাষা। যেমন দেয় তেমনি নেয়। তার গ্রহণ করার ক্ষমতা তার বৈশিষ্ট্য। বহু ভাষার মূল রচনা নিত্য তার ভাণ্ডারে তুলে রাখা হচ্ছে। সব শ্রেণীর লোকের রচনা গ্রহণ করে। সব শ্রেণীর লোক এই সম্পদের সুযোগ সুবিধা পায়। ক্ল্যাসিক ভাষা রক্ষণশীল। জীবন্ত ভাষা প্রগতিশীল।

মানবজীবনের সব দিক ভাষায় প্রকাশ পায়—শারীরিক, মানসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধার্মিক, বৈষয়িক, সাহিত্যিক—চিন্তাশীল ও আবেগশীল। অভিজ্ঞতার বিস্তার এবং ভাষার বিস্তার একই। এই কারণে কাট্‌স্‌ ভাষাকে ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন অভিজ্ঞতা অনুসারে। এই ভাগগুলিকে স্তর বলা হচ্ছে এই প্রবন্ধে। এদের মধ্যে উচ্চতা বা অনুচ্চতা নেই। শ্রেণীর পরিচয় নেই। অভিজ্ঞতার বিভিন্ন রূপ প্রকাশভঙ্গির বর্ণনা করা হয়েছে—এই পর্যন্ত। তবে এই ধরনের বিশ্লেষণে অনুবাদকের অনেক সাহায্য হয়।

ভাষান্তর

০ — আবেগশীল ভাব ও বোধ
মানসিক আন্দোলন
মনোভাব
আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, বিস্ময়, রাগ, বিদ্বেষ ইত্যাদি
যেমন অঃ উঃ হেঃ যেৎ ধুৎ ছি ছ্যা-ছ্যা

– ১ অবচেতন মনের ভাষা

১ দৈনন্দিন ভাষা, সাধারণ যুক্তিবাদ,
বৈষয়িক ভাষা, ব্যবহারিক ভাষা

১ + স্বাভাবিক ভাষা
এর মধ্যে – ১, ১ এবং ০ স্তর অন্তর্ভুক্ত

– ২ স্বপ্নের ভাষা, কখন কখন দেববাণীর ভাষা,
ভবিষ্যৎ বাণীর ভাষা

২ বাহ্যবস্তু সম্বন্ধীয় চিন্তার সূত্রপাত
দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত
সংস্কৃতির আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করা এবং বিভিন্নতা দেখা
বিভিন্ন আচারের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ
সামাজিক সংস্কৃতির প্রকাশ
নৃতত্ত্বের সূত্রপাত

২ + বৈজ্ঞানিক বিদ্যার ভাষা। এই ভাষা দু প্রকার হয় :
(ক) তত্ত্বের বিদ্যা
(খ) ব্যবহারিক বিদ্যা

৩ বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি বা বিজ্ঞান-ভিত্তিক সংস্কৃতি
সংবাদ বা বার্তা হিসাবে মানবজীবনের সব অভিজ্ঞতা গুছিয়ে প্রকাশ করা হয়
এই অর্থে অন্য সব রকম সংস্কৃতি থেকে আলাদা

৪ ধর্ম ও দর্শনের ভাষা

৫ অঙ্কের ভাষা
যা কিছু সম্ভব অঙ্ক তার ভাষা

৬ দর্শনের উচ্চতম মনোভাবের প্রকাশ
যতরকম সমাজ বা সংসার জগতে সম্ভব তাদেরই ভাষা।

খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটা মূল রচনা আগাগোড়া ভাষার একটিমাত্র স্তরে আবদ্ধ থাকে। অনতিদীর্ঘ কবিতার বেলা সম্ভব হয়তো হতেও পারে, তবে সাধারণত হয় না। বিভিন্ন স্তরে যাওয়া-আসা কিন্তু বাধাহীন। অবলীলাক্রমে হয়। ভাষার স্তর সজ্ঞানে বদলানো যায় কোনো বিশেষ প্রয়োজনে। না ভেবেচিন্তেও ভাষার স্তর বদলে যেতে পারে কোনো এক আবেগশীল ভাবের চাপে। অনিচ্ছাকৃত হোক বা ইচ্ছাকৃত হোক, ভাষার ছয়টি স্তরের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো সহজ। এই ঘুরে-বেড়ানোর পথ অনুসরণ করে অনুবাদক তার একটি প্রতিরূপ বা মুদ্রারূপ তৈরি করে। এই প্রতি-রূপ বা মুদ্রারূপ অনুসারে অনুলিপি বানানো হয়। তার পরে গ্রাহী ভাষায় স্থানান্তর করে অনু-বাদক। এইভাবে স্থানান্তর যদি না করা হয় মূল রচনা বিকৃতভাবে নতুন ভাষায় আসবে। তার রূপ বিকৃত হলে মানেও বিকৃত হবে। অনুবাদ ঠিক হবে না। গ্রাহী বা নতুন ভাষায় মূল রচনা সুচারু-ভাবে আনা সম্ভব হবে না।

লেখার রীতি

ভাষান্তরের প্রতিরূপ বা মুদ্রারূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে মূল রচনার লেখার রীতি বা স্টাইল। কার উদ্দেশে কে কী বলছে দেখে লেখার রীতি নির্ধারিত হয়। যে শোনে সে কে? যে শোনায় সে কে? যে শোনে এবং যে শোনায় তাদের মধ্যে সম্পর্কটা কী? তারা কি ক্রেতা আর বিক্রেতা? মাতা-পুত্র? ভাইবোন? চোর আর পুলিস? সমবয়সী স্কুলের সঙ্গী? গুরুজন আর ছাত্র? স্বামী-স্ত্রী? সম্পর্ক যেমন রীতি তেমন। নানাভাবে প্রকাশ পাবে—অনুকম্পা, মন্দলোজ্ঞা, ঘৃণা, রাগ, উপহাস, অবজ্ঞা, ত্রাস, উত্তেজনা, হতবুদ্ধি ভাব, অনুনয়, অন্তরঙ্গতা, বিহ্বল ভাব, অপ্রতিভ ভাব, ব্যাখ্যাকারী ভাব, মন্ত্রণা বা উপদেশক ভাব, প্রণালীসংগত ভাব, আজ্ঞা, তিরস্কার,

ভর্ৎসনা ইত্যাদি। এক-এক রীতিতে এক-একটা ভাব প্রকাশ করা হয় এক-একটা সম্পর্কের সঙ্গে মিল দেখে। সবরীতি সব সম্পর্ক উপযুক্ত হয় না। সম্পর্কের সঙ্গে রীতির মিল যদি না থাকে বাক্য হাস্যকর হয়। কখন কখন লেখক মূল রচনায় ইচ্ছা করে এই রকম অমিল রাখে না তা নয়। রাখে। অনুবাদক যখন দেখে এই ধরনের অমিল রয়েছে তাকে চিন্তা করতে হয় কী উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হাস্যরসের প্রকাশে এই রকম বেখাপ্পা রীতি ব্যবহার হয়। অনুবাদককে গ্রাহী ভাষায় সমতুল্য রীতি খুঁজতে হয়। একই রচনায় যেমন একাধিক ভাষান্তর থাকতে পারে, বিভিন্ন রীতিও দেখা দিতে পারে। রীতিপরিবর্তনের সমতুল্য মুদ্রারূপ অনুসারে মূল রচনা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় স্থানান্তর করা হয়।

একই ভাষান্তরে যেমন কোনো রচনা আবদ্ধ থাকে না তেমনি একই রীতিতেও আগাগোড়া কোনো রচনা লেখা হয় না। অবস্থা, সম্পর্ক আর পরিবেশের সঙ্গে রীতি বদলায়। সমতুল্য রীতি খুঁজে দরকার মতো অনুবাদক সেটাকে পাল্টাতে থাকে।

স্থানান্তর

ইংরেজ কবি গ্রেভ্‌সের বক্তব্য শব্দচয়ন সম্বন্ধে। শব্দাভিত্তিক অনুবাদ হত মধ্যযুগে। শব্দের সমতুল্য শব্দ খোঁজ করা হত। অনুবাদের কাজ আজকাল শব্দকে অবহেলা করে না, তবে শব্দসমষ্টি, বাক্য, কথনের ধারা, পরিচ্ছেদ, অধ্যায় এবং সমগ্র রচনার গুরুত্ব ও মানে। সমগ্র রচনার সীমারেখা গ্রাহী ভাষায় অটুট রাখতে হয়। এই সীমারেখা বিকৃত না করে মূল রচনার প্রত্যেকটি অংশ যার যার স্থানে আর মাপে ত্রুটিহীনভাবে বসাতে হয়। ভাঙলে চলবে না। একটা বাগান থেকে অন্য বাগানে গাছ তুলে লাগানো যায়। বড় বড় গাছও বাগানান্তর করা সম্ভব। তবে গাছ যদি মরে যায় কোথাও না কোথাও ভুল হয়েছে। কাজটা ঠিকভাবে করা হয়নি। অপটুতার দরুন জীবন্ত একটা বাণী পথে নষ্ট হয়ে যায়। ভুল বোঝাবুঝির ফলে মানবসংসারে যত গোলমাল। মানুষের প্রাণ যায় মান যায় সবকিছু যায়। ব্যোমারোহণের যন্ত্রনির্মাতার মতো যথার্থতা এবং সুনির্দিষ্টতা না থাকলে লাভের চেয়ে ক্ষতি অধিক হতে বাধ্য।

লীলা রায়

পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যসাধনা

আমরা অনেক ভালো জিনিস হারাতে বসেছি। ফাঁকা জায়গা কমছে, গাছপালা কমছে, তেমনি কমছে ভালো লেখক। ভালো লেখক মানে তো এ নয় কার কতো বই হৈ হৈ করে কাটলো, কার পাবলিশার শাঁসাল, দু-কলমব্যাপী কার বইয়ের রিভিউ বেরোল, বা প্রাইজ পেল কি পেল না। আমাদের যতটুকু সাহিত্যবুদ্ধি তাতে ভালো লেখক মানে যিনি চারপাশের জগতের দিকে চেয়ে আছেন, সঙ্গে সঙ্গে যাঁর নিজের অন্তরের দিকেও অতন্দ্র দৃষ্টি, যিনি বাহির ও ভেতরের মাঝখানে সেতুবন্ধনে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কখনও সফল হয়েছেন কখনও হননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ইয়োরোপীয় উপন্যাসচর্চা আমাদের মনের দিগন্ত আলো করে রেখেছে, যেখানে এলিফেন্টার ত্রিমূর্তির মতো বালজাক-স্তাঁদাল-তলস্তয় দাঁড়িয়ে আছেন এবং সীমিত হলেও যেখানে বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কীর্তিও ভাস্বর সেখানে পাঠক হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা কমাতে আমরা নারাজ। এবং

এই ভালো সীরিয়াস উপন্যাসের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার যে অম্লান চেষ্টা অন্নদাশঙ্কর করেছেন পঞ্চাশ বছর ধরে, সেজন্যে আমরা তাঁর কাছে পাঠক ও লেখক হিসেবে কৃতজ্ঞ।

বলা বাহুল্য, সে চেষ্টা যে সব সময় সফল হয়েছে তা নয়। তাঁর দীর্ঘ 'সত্যাসত্য' অথবা পরবর্তীকালে 'রত্ন ও শ্রীমতী'র যেমন আইডিয়া অনেক ক্ষেত্রেই চমৎকার চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি কখনও তা রক্তমাংসের সজীবতা লাভে কিছুটা বা অসম্পূর্ণ। কিন্তু যে কথাটা অন্নদাশঙ্কর সম্পর্কে না বললে কোনো কথাই বলা হয় না তা হল, তিনি প্রায় সর্বদাই সজাগভাবে চেষ্টা করে গেছেন অন্তর ও বাহিরকে মেলাতে। তুর্গেনিভ যে অর্থে হ্যামলেটের চেয়েও ডন কুইক্সোটকে অনেক বেশী প্রাণবন্ত ও মহত্ত্বে উদ্ভাসিত মনে করেছেন সেই অর্থেই প্রবল প্রতিকূল পরিবেশে এই নিরলস ডন কুইক্সোট অন্নদাশঙ্করকে সেলাম।

আমাদের দেশে যখনই দুর্দিন এসেছে, দেশভাগ, ভারত-চীন সংঘর্ষ অথবা সংবিধান সংশোধনের জন্যে ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রায় উন্মত্ত তখন স্পষ্ট নির্ভীক অন্নদাশঙ্করের গলার আওয়াজ আমরা বারে বারে শুনেছি, কখনও তা মর্মভেদী ছড়ায় কখনও বা প্রবন্ধে। কোনো দলের দিকে বা কোনো গোষ্ঠীর দিকে চেয়ে তিনি কথা বলেননি। হিন্দু-মুসলমান কিংবা পাকিস্তান-বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কেও অগ্রজ লেখকদের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে সজাগ দৃষ্টি অন্নদাশঙ্করের। তাঁকে বার বার সেলাম।

অসীম রায়

বিকৃত-কথা

(সংশোধন)

মাঘ-চৈত্র ১৩৮৩ সংখ্যা চতুরঙ্গে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে কিছু ছাপায় ভুল আর লেখার অমনস্কতা আছে। সেগুলি সংশোধন না করলে প্রবন্ধটি হয়ত সর্বাংশে ঠিক বোঝা যাবে না। তাই করছি। শুদ্ধ পাঠ নিম্নরূপ .

পৃষ্ঠা ২৭৯ পংক্তি ১৯ "তিন হাজার বার চীৎকার (বা লড়াই) করেছিলেন।"
পৃষ্ঠা ২৮০ পংক্তি ৫ "বিকৃপদে"
পংক্তি ৮ "ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ"
পংক্তি ১১ "ছিলেন না।"
পংক্তি ১৩ "আরও" বর্জনীয়
পংক্তি ১৫ "অপোর্ণুতে"
পংক্তি ১৯ "ন পরাজয়েথে"
পংক্তি ২৪ "লড়াই (বা চীৎকার)"
পংক্তি ৩৩ "দিবো নপাতা"
পংক্তি ৩৫ "বৃষ্ণ চাবনকে"
পৃষ্ঠা ২৮১ পংক্তি ১৫ "তা মাঝে মাঝে প্রকাশ"
পংক্তি ২৯ "প্রধান অংশ—স্তব"
পংক্তি ৩৪ "এ সবই জমে উঠেছিল"

পৃষ্ঠা ২৮২ পংক্তি ১ "ধর্ম-ভাবনা যথাসম্ভব সরাসরি"
পংক্তি ৪ "কিন্তু আভিজাত্যের জন্যে"
পংক্তি ৫ "ধর্মব্যাপারে মোটামুটি"
পংক্তি ১০ "ঋগ্বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধানতম"
পংক্তি ১১ "মধু, ঘি, দুধ..."
পংক্তি ১৪ "যেন ঘরের ছেলে"
পংক্তি ৩৩ "আলোচনায় স্বতন্ত্রতা।"
পংক্তি ৩৫ "ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে নিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিকের উচিত নয়।"
পৃষ্ঠা ২৮৩ পংক্তি ৩ "জমাট বাঁধতে শুরু"
পংক্তি ১৯ "এক কৃষ্ণ'
পংক্তি ২০ "ঈয়ানঃ কৃষ্ণো'
পংক্তি ২৫ "স্নেহিতীর"
পংক্তি ২৭ "সাহায্য পেয়ে বীরের প্রবৃত্তি বশে"
পংক্তি ৩১ "অবর্তিষ্পিবাংসম্"
পংক্তি ৩৩ "কালো মেঘের মতো রয়েছে"
পৃষ্ঠা ২৮৪ পংক্তি ৩০ "আর 'পুরাণ'-গ্রন্থগুলির আগে"
পংক্তি ৩৬ "বলদেবের অর্জুন নামটি"
পৃষ্ঠা ২৮৫ পংক্তি ৬ "সংকর্ষণের বিশিষ্ট অস্ত্র"
পংক্তি ১০ "যথাক্রমে *wesu (দীর্ঘ এ-কার) ও *wesu (হ্রস্ব এ-কার);"
পংক্তি ১৪ "দেবতারূপে পূজিত"
পংক্তি ১৮ "নানাঘাট"
পংক্তি ৩০ "'মাধব' নামটি।"
পংক্তি ৩৭ "ধাতুতে যথাক্রমে"
পৃষ্ঠা ২৮৬ পংক্তি ১ "এবং ভজ্ ধাতুতে"
পংক্তি ৫ "co-sharer, shareholder"
পংক্তি ৬ "বা party mark।"
পংক্তি ১৫ "ভগ শব্দটি প্রচলিত ছিল"
পংক্তি ১৮ "এই শ্লোকটি (৭ ৪১.৫ কথ)"
পংক্তি ৩৬ "দুটি পৃথক্ দেবভাবনা"
পৃষ্ঠা ২৮৭ পংক্তি ১ "নামটি অর্থ কোন কোন"
পংক্তি ৪ "সূদ্ ধাতুর"
পংক্তি ২৩ "ঋতুসংবৎসর"
পংক্তি ২৬ "অর্থাৎ সূর্য (কালচক্র)।"
পংক্তি ৩১ "অহ্রমজ্দার"
পংক্তি ৩১ "অথবা অপর কোন খ্রীষ্টপূর্ব"
পংক্তি ৩৫-৩৭ নক্শাটি যেমন হবে পরপৃষ্ঠায় দেখানো হল

পৃষ্ঠা ২৮৮ পংক্তি ৩ "জানি বা পাই"

পংক্তি ১৩ "শাসনে বিষ্ণু-উপাসক বোঝাতে পরম ভাগবতের স্থানে"

পংক্তি ১৪ "'মাহেশ্বর' (= শিব-উপাসক) স্থানে"

পংক্তি ২৫ "যজ্ঞ করবেন কোথায়।"

পংক্তি ২৬ "ভূমি মেপে নেবার জন্যে বিষ্ণু মাটিতে"

পংক্তি ২৭ "সব দিকে হু হু করে"

পংক্তি ৩০ "সৃষ্টি করেছে।"

পৃষ্ঠা ২৮৯ পংক্তি ৮ "মানে "বেচারা"।)"

পাদটীকা ৪ "দেবভাবনার ও স্পষ্টমূর্তি অবতারভাবনার মধ্যে"

পাদটীকা ৫ "(২.১২.১২)।"

সুকুমার সেন

স মা লো চ না

Eyeless in the Urn *by* Sanjib Datza. Lalan Prakashani, Bangladesh. Ten Taka only.

সামাজিক বা ব্যক্তিগত ঘটনা-উপলক্ষে কাব্য-রচনার রেওয়াজ প্রায়-অন্তর্হিত। অবিশ্যি রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত দলাদলি, মৃত্যু, বিবাহ, উৎসব, বন্ধুবিয়োগ বা এইজাতীয় জের এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পূর্বোক্ত ধারা ঈষৎ চালু ছিল। চতুর্থ দশকে তেমন প্রবণতা অন্তর্হিত, এমন কি আধুনিক কবি-সমীপে অবজ্ঞেয়।

যখন সংবাদপত্র ছিল না, তখনও কবি ছিল। সমঝদারের সঙ্গে তাদের স্থানিক দূরত্বও তেমন ছিল না। শুধু স্থানিক দূরত্ব নয়, সেন্সিবিলিটিজ্ বা সংবেদনের ওলটপালটে কালের পট পুরাতন রেওয়াজ মুছে দিয়েছে। সে-কাহিনী আপাতত মুলতুবী থাক।

তবু ব্যতিক্রম আজও দেখা যায়। মহৎ কবি পর্যন্ত সাবেক রেওয়াজের শিকার হয়ে পড়েন। টি এস এলিয়টের "ফোর কোয়ার্টেট্স" এ-যুগের একটি উজ্জ্বল কাব্য-নিদর্শন। বাল্য-কৈশোরের পটভূমি এই কাব্য-রচনার প্রেরণা উৎস। কিন্তু উপলক্ষ এলিয়টের সৃষ্টিশক্তির কোন ক্ষতি করেনি। মানুষের জীবনে কাল এবং মহাকালের সম্পর্কে কৌতূহলী কবি, আর যা-ই হোক না কেন, কিছু অতুলনীয় রূপকল্প সৃষ্টি করে গেছেন। মানুষ এবং তস্য আবেষ্টনীর জটিল আবর্তের প্রশ্ন যে-কোন চিন্তানায়কের মতো মহৎ কবির পক্ষে এড়ানো অসম্ভব।

শ্রীসঞ্জীব-বিরচিত গ্রন্থের আলোচনায় পূর্বোক্ত মুখপাতটুকু প্রয়োজন ছিল। কারণ "আইলেস ইন দি আর্ন্" উপলক্ষপ্রসূত কাব্য।

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম দুইপারের বাঙালী-হৃদয় উন্মথিত করেছিল মর্মন্তুদ পটভূমির জন্যে। তখন ইসলামী জিগির-গর্জিত পাকিস্তানী সৈন্যদের নির্মম অত্যাচারের নিকট নাৎসী-বর্বরতা পর্যন্ত ম্লান। এমন চণ্ড-নীতির তোড়েই ভেসে গিয়েছিলেন কুমিল্লা শহরের অধিবাসী আজীবন দেশব্রতী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁকে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত করেন। বাংলাদেশ কেন, উভয় বঙ্গেই নায়কের মতো স্মরণীয় ওই নাম। অবিভক্ত বঙ্গে তিনি ছিলেন কংগ্রেসের ডেপুটি-লীডার। ১৯৪৮ সনে পাকিস্তান শাসনতন্ত্র-পরিষদে শহীদ ধীরেন দত্তই প্রথম বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দাবি করেন। রাজনৈতিক লড়াইয়ে সদা-কেল্লাফতে মুসলিম লীগের দাব্ড়ি-দবদবা তখন গর্মাগরম। জনমনে তার রেশ টগবগ ফুটন্ত। অনেকে সেই সময় ভেবেছিলেন শহীদ ধীরেন দত্ত করাচী থেকে ঢাকা-বিমানবন্দরে নামামাত্র খুন হয়ে যাবেন। অকুতোভয়তার নজির শহীদের জীবনে এমন একটি নয়। ২৩শে মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। শহীদ ধীরেন দত্ত সেই নিশানের সম্মানরক্ষার্থে ঠায় রয়ে গেলেন নিজগৃহে। প্রাণরক্ষা করতে পারতেন অতি সহজে। পঁচাশি বছর বয়সে যুগল চরণ কম মজবুত ছিল না। কিন্তু শির-দেগা-নেহি-দেগা-আমামার বাণী-দীক্ষিত, জরা-উপেক্ষাকারী বৃদ্ধ নিজাসনে অধিষ্ঠিত, আর নড়লেন না। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীদিলীপ দত্ত পিতৃদেবের সাহচর্যে জীবনের পরমার্থ খুঁজে পেয়েছিলেন, তা আজ আর কারো কাছে অস্পষ্ট অনুমান নয়। বৃদ্ধ এবং তরুণ, বয়ঃক্রমে দুইপ্রান্ত-বাসী একই বিন্দুতে উপনীত। কুমিল্লা শহরের নিকটবর্তী ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অবস্থায় উভয়ে মৃত্যুর বলি হন। বিদেশী

সাংবাদিক, সেনানী-শিবিরের নাপিত ও অন্যান্য জনরব-মারফত শহীদ ধীরেন দত্তের শেষ কটি দিনের কিছু হদিস মেলে। পাকিস্তানী জালেমরা তাঁর চোখ উপড়ে নিয়েছিল, দৈহিক নির্যাতনে হাঁটু ভেঙে দিয়েছিল। হামাগুড়ি-রত তিনি অস্তিমের মোকাবিলা করেছিলেন। হামাগুড়ি-রত শিশু এবং বৃদ্ধ—এখানেও দুই চরম এবং বিপরীতের মিলন।

কাব্যের বিষয়বস্তু সম্যক উপলব্ধির জন্যেই কিছু জোরের সঙ্গে স্বল্প পরিসরে দুই অন্ত-দেশের কথা উল্লেখিত। কাব্যের গোটা আবহ একই জ্যা-রেখায় আবদ্ধ।

১৯৭১ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে শহীদ ধীরেন দত্ত পাকিস্তানী নির্যাতন-শিবিরে পার্থিব সম্পর্ক সাঙ্গ করেন। দেশ এবং দশের সঙ্গে চিরদিন একাত্মতার সাধক নিজের আদর্শের কাছে আর যেন বেইমান হতে পারেননি। গণ-কবরেই তো এমন আত্মার চিরশয়ান বা তৎব্যবস্থা ন্যায়সিদ্ধ। পরিবার-পরিজন নয় শুধু, গোটা বাংলাদেশের মানুষের উত্তরাধিকার তাঁর লাশ বেওয়ারিশ ছিল না। তবু লা-হদিস হয়ে গেল সামরিক চামুণ্ডা-দলের বিবেকহীনতার দাবানলে।

"আইলেস ইন দি আর্ন" রচনায় এই পটভূমি বিশদ স্মর্তব্য। আরো স্মর্তব্য, কাব্যের রূবেন্দ্রর শ্রীসঞ্জীব শহীদ ধীরেন দত্তের সন্তান। পিতৃপ্রয়াণ এই রচনার অনুপ্রেরণা। এমন অবস্থা কাব্য এবং কবি উভয়ের পক্ষে দুর্বিপাক। শ্রীসঞ্জীব ভূমিকায় প্রথমেই সাফাই ও সতর্কতা পরিবেশন করেছেন :

A postmortem of the incident under study would not possibly pass me for an undertaking based on certain terms of aloofness for its honest performance.

The feeling need be taken apart to freely enter the function of art, to which I may lay no claim. This comes to my direct involvement in the offered subject throwing the issue in conflict with some valid aspects of poetry. Pity harnessed to private end, to name one, would lapse into self-indulgence.

No cover or appeal to arbitrary purgation the wise ancients prescribed, would possibly slave the consequent pretence. To be wise either, for another matter, is not necessarily being truthful. And truth is the firm divide between poetry and pastiche.

এলিয়টের 'ফোর কোয়ার্টেট্স'-এর মতো এই কাব্যগ্রন্থও শেষ পর্যন্ত উপলক্ষের সীমানা ছাড়িয়ে চেতনার বহু দূরদূরান্ত পরিব্রজনার সাক্ষী। য়ুরোপীয় ড্রামাটিক অর্কেস্ট্রার অনুসরণে গোটা গ্রন্থ ষোলটি মুভ্মেন্টে বিভক্ত। তেমনই কায়দায় মুখপাতের আস্থায়ী বার বার ফিরে-ফিরে এসেছে প্রসঙ্গ-পালটের গলি-পথে। এবং সমাপ্তি-প্রান্তে রেস্কারে-রেস্কারে বিবাদী-সম্বাদী নানা সুর-ঝংকারে এক নাদ-সমুদ্রের সংগমে পৌঁছেছে—যেখানে প্রশ্ন এবং জবাব, আদি-অন্তের ঘোঁট সর্পিল জটিলতায় সমন্বয়রূপে অবশিষ্ট বা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

যদিও ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যু কাব্যের প্রেরণা-উৎস, "আইলেস ইন দি আর্ন্" পঙ্ক্তোষ্টীর অগ্র-গতির মতো বিস্তার-পথে সব চুরমার করে বসে। কবির ভাবের অগ্রগতি ভায়োলেন্স্ বা চণ্ডতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্যে। হ্যামলেটের অনুরূপ শ্রীসঞ্জীব পিতৃপ্রেতচ্ছায়ার অনুগামী। কিন্তু গন্তব্য : চণ্ডতার উৎস-সন্ধান। ভায়োলেন্সের ফলেই তো মৃত্যু। চারণের চোখে পড়ে, আদর্শের সংঘাতই শেষ পর্যন্ত ভায়োলেন্স, যদিও পশ্চাতের হোমিদ যোধ শান্তি-পিয়াসীর স্বর্গ। কবির জবানে—

I've seen man, hating none, incense

Passion bypassing cause. I've heard
His heart beat about the orchard
Of a Mount Olive. However dead
And decayed on pliocene bed
Of rock and rumour, flushed with love.
Of eyes I've lived down and above
Detonation crowned with a child—
Head in the orb, of breasts the filed
Corrugation of wind design
On waters, wild ultramarine
Stir. —পৃষ্ঠা ৪১

নিষ্কলঙ্কতা, শ্রেষ্ঠতা, নিরীহতা প্রভৃতির দোহাই-নাদ উভয় তরফে সমান। তবু ফাঁক থেকে যায়। কবির কণ্ঠস্বরে—

These have no leave, nor they consign
A thing either on either side,
The destroyer and the destroyed
Caught in a tight grip, the gap wide. —পৃষ্ঠা ২৯

ধাঁধার মধ্যে যুগযুগান্তের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সিসিফাসের পণ্ডশ্রমের আবার যেন সূত্রপাত। এই গ্রন্থের দশম মুভমেন্ট প্রায় গীতার কাব্যিক অনুবাদ :

And who will draw the line, he said,
Between hands that strike and hands that stay? —পৃষ্ঠা ২৭

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম।
উভ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

যিনি ভাবেন আত্মা কাহাকেও বধ করে, যিনি ভাবেন আত্মাকে কেহ বধ করে, তাঁহারা উভয়ে কিছুই জানেন না। গীতা ২ : ১৮

শ্রীসঞ্জীব এই সাফাই পরিত্যাগ করেন। তার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সমস্যা-এড়ানোর চাতুর্যের স্পর্শহীন। আদর্শের শিকড় যখন বিস্তার-লাভ করে, তখন তার গায়ে কলুষের মাটিটি লাগে এবং ব্যক্তিমানুষ গৌণ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতার এই প্রশ্নে জোড়াতালি জবাব-প্রদান অনুচিত। আদর্শের বিস্তারে ভায়োলেন্স অবধারিত হয়ে ওঠে। তা ব্যক্তিমানুষকে খর্ব করে এবং সে আদর্শচ্যুত হয়। ভায়োলেন্স বা চণ্ডতা ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব চণ্ডতা ব্যক্তিত্ব-বিরোধী। এক্ষুনে মানবতা-বিরোধী। মুক্তি তথা স্বাধীনতার এই সমস্যা প্রায় গোটা কাব্যের বিষয়বস্তুর নিয়ন্ত্রক। মনোহর রূপকল্পে গড়া সতর্কতার সাইরেন চারণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

The cord be cut, maternal arm
Dying with the olibnum
Fall of threads too fragile to tie
The corpse and cause, for reasons why,
Lest the spoke would seek wheel, lest
The wheel would turn and turn to waste,

Be quiet, dear ghost.

একটি দেহ, একটি আত্মার নিপীড়ন-কেন্দ্রে কাব্যের সূত্রপাত। কিন্তু সমাপ্তি অন্য মেরুপ্রান্তে —যেখানে মানবগোষ্ঠী যৌথভাবে উপস্থিত। প্রথম পনেরটি মুভমেন্টে কবি নেপথ্য-কথক মাত্র। ষোড়শ বা শেষ মুভমেন্টে তিনি নিজে ভাষ্যকার এবং মানবিক অস্তিত্বের ট্র্যাজেডিটুকু নিঃশঙ্কে গ্রীবায় গ্রহণ করেন কাব্যসুধা বিতরণের জন্যে। প্রাচীন শাস্ত্রকার যেন সাক্ষ্য দিতে ছুটে আসে—

স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ
সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত।
সোঽগ্নিরভবৎ সোঽয়মগ্নি পরেণ
মৃত্যুমতিক্রান্তদীপ্যতে॥

তিনি প্রধান ইন্দ্রিয় বাক-কে লইয়া গেলেন। তাহা যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইল, তাহা হইল অগ্নিদেবতা। অগ্নি মৃত্যুর অতীত-রূপে দীপ্যমান রহিয়াছে।

· বৃহদারণ্যক : ১ম অধ্যায়, তৃতীয় ব্রাহ্মণ

মহৎ কবিতামাত্রেই শেষ পর্যন্ত পার্থিব এবং পরাবিদ্যার যুগপৎ লক্ষণে আক্রান্ত। জগৎ, ঈশ্বর, ব্যক্তি, সমাজ-জীবন— তাদের কাঠামো এবং দ্বন্দ্ব-আবেষ্টনীর সম্পর্ক পরিখা পূর্ণ করার দায়িত্ব সকল সৎ কবির। তত্ত্ব এবং কাব্যের ভেদ-রেখা এইভাবে সাতিশয় স্পষ্ট। চারণ রূপে শ্রীসঞ্জীব সেই ব্রত সম্পর্কে ঘন-সচেতন।

কিন্তু অস্তিত্বের নিপীড়ন ব্যক্তিহিসেবে বিভিন্ন। মননশীল হৃদয়ের যন্ত্রণা ও সাধারণ জীবনযাপনের যন্ত্রণার মধ্যে ফারাক আছে নিশ্চয়। নির্বস্তুক চিন্তারাজ্যে বিচরণশীল মনোপযোগী কাব্যের রূপ তাই স্বতন্ত্র। আধুনিক কাব্য সৃষ্টিশীল এবং ইন্টারপ্রেটেটিভ বা ভাষ্যপ্রাণ মনের ফসল। কাব্য এবং কমেন্টারির মিলন এযুগেই সম্ভব। এই ক্ষেত্রে কাব্যের গঠনকৌশল, কাঠামোর ভিত স্বতন্ত্র হতে বাধ্য।

শ্রীসঞ্জীবের কাব্যোপচার তার অজস্র প্রমাণ বহন করে। বিষয়বস্তুর জন্যে খড়কুটো আহরণের শ্রম ও সংখ্যা "আইলেস ইন দি আর্ন"-এ বিপুল। টি এস এলিয়ট জন ডান সম্পর্কে আলোচনায় লিখেছেন যে তাঁর ছিল "mechanism of sensibilities which devours all kind of experiences".

শ্রীসঞ্জীব সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। কাব্যের প্রারম্ভে দেখা যায়, উৎপাটিত চক্ষু এবং আকাশের সমাহার। অনুভূতি-উন্মোচনে গাঁটছড়া বাঁধে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, গ্রহলোকের অদৃশ্য গতিপথ আঁকড়ে। গীতা-বাইবেল-কোরানের পাশাপাশি জড়ো হয় চিকিৎসাশাস্ত্র, অ্যানাটমির উপমা। মধ্য যুগের চার্চ, ত্রাস শোকাবহ সংগীতধারা, রানী ময়নামতীর পাহাড় ও মাউন্ট সিনাই, সন্ন্যাসী গোপীচাঁদ, যীশুখৃষ্ট, সমাজতন্ত্রের প্রশ্নবাণ, কোন মহাকবির চকিত প্রতিধ্বনি, যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীর রণকৌশল, উদ্ভিদবিদ্যার খড়খাড় উত্তোলন, গ্রীক দর্শনের গলি—এমনতর তাবৎ পরি-শীলনের পরিচয়পত্র যত্রতত্র ছড়ানো। কেবল অন্ধকার অন্তর্লোক আলোকিত করার কাব্যিক উদ্দেশ্যে। "আইলেস ইন দি আর্ন"-এর চারণ স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের বংশধর নন, বরং মনন-পরিশীলিত বিশ্ববিহারী নাগরিক। চিরাচরিত ধারণায় বাঙালীর হৃদয় ও মনের স্থানিক অস্তিত্ব তাদের বুকে, যেন শির-চ্যুত। কবন্ধ-কবি-সম্প্রদায়-ভুক্ত নন শ্রীসঞ্জীব। বহুৎ দুঃখেই কবি মনোমোহন ঘোষ, যিনি ইংরেজী ভাষায় লিখতেন, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এক পত্রে জানিয়েছিলেন, "You ask How I like Calcutta. All peopled place are wonderful and this is not least so. I..........long insatiably for some intellectual excitement, to have someone to

talk about poetry with. There are people of course, and plenty of charming enthusiasm, (I have never been among a race so sensitive to poetry) but there is no true understanding of the thing".

এই কাব্যের শেষে কিছু নোট আছে, তা সামান্য। আরো বিস্তারিত নোট থাকা উচিত ছিল সহৃদয় পাঠকের সুবিধার্থে।

শ্রীসঞ্জীব ধ্রুপদী কাঠামো রক্ষার জন্যে সদা যত্নশীল। তাই চিন্তার কুয়াশা ছড়াননি কোথাও। কিন্তু আবেগের কুয়াশা আছে কাব্যের উপাদান এবং অলংকার হিসেবে। সাদামাটা ভাষায়, ব্যঞ্জনার খাতিরে। সুররিয়্যালিস্টদের বিপরীত প্রান্ত তিনি গ্রহণ করেছেন। নির্জ্ঞান মনের লজিক স্বীকার করে নিলেও চিন্তার লজিক-পরিত্যাগে তাঁর ঘোর আপত্তি। হয়তো ফর্মের প্রতি স্পর্শ-কাতরতা এই প্রবণতার সাফাই-সাক্ষী। সুররিয়্যালিস্টরা যুগপৎ ক্লাসিসিস্ট হলে যেসব আলো-আঁধারির ক্রীড়া শুরু হতে পারে শ্রীসঞ্জীবের ক্ষেত্রে তা ঘটেছে বৈকি। কিন্তু কবিকে দুর্বোধ্য অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

এই কাব্যের যাত্রাবিন্দু চর্চিত মনন। তার পরিক্রমা নিছক আবেগের রাজ্যে বসবাস নয়, বরং আবার মননের ফণি-মনসা-কণ্টকিত আচোট-ঊষর জমিনে প্রত্যাবর্তন। কারণে, সেখানেই শুধু মুক্তির আকাশ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশি, যদিও এই কবি-সমীপে নিসর্গ বহির্বস্তু—খুব জোর যন্ত্রণার পাশাপাশি বাড়তি সামগ্রীর ভিড়, রোমান্টিকদের বন্দিত মন্ময় সঙ্গী নয়।

গোটা কাব্যে এই প্রক্রিয়া কম-বেশি স্পষ্ট। তাই হয়তো য়ুরোপীয় ড্রামাটিক অর্কেস্ট্রার দিকে গোড়া থেকেই কবির আকর্ষণ—যেখানে বাদী-সম্বাদী সুর, তাল-ফেরতা লয়ের মিশ্রণ শাস্ত্রসিদ্ধ। "আইলেস ইন দি আর্ন"-এ গীতলতা গায়েব। আবহ অসম্ভব চণ্ডতা-দীর্ণ। গীতলতার ক্ষেত্র কম। তবু লিরিকের আমেজের সুযোগ ছিল। কিন্তু কবির নির্বাচিত রূঢ় শব্দ-সংহতির ফলে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল। গীতি-কবিতার তুলনা আলতো অধর-চুম্বন, অতস্থলে আবেগে দংশন নয়। বিদেশী ভাষার উপর আশ্চর্য দখল থাকা সত্ত্বেও শ্রীসঞ্জীব পাঠককে নরম মাটির কাছে আনেন, তৎক্ষণাৎ সজোরে ঊর্ধ্বে তুলে পটকান দেওয়ার উদ্দেশ্যে। নিবন্ধের কলেবর-বৃদ্ধির আশঙ্কায় দুই-একটি নমুনা—

(1) Loaded for a vast beyond

(2) Vexous vision of footlights widowed in the dawn.

রুক্ষতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে মাঝে মাঝে তিনি এমন পংক্তি যোগ করে বসেন—

> Tips as new of a new beginning
> Shadows after substance, foams
> Throwing flower on the sea's coffin.

কবি লিরিক হাওয়া আনেন কিন্তু তা ভাষায় বা ভাবে আহত, যদিও সকলের জানা—শব্দ বাতাস দিয়ে তৈরি হয়।

চড়া-কড়া শব্দের প্রতি শ্রীসঞ্জীবের মোহ তাঁর আঙ্গিকের অন্তর্গত। মোচড়ের প্রতি এই কবির আকর্ষণ হয়তো বিষয়বস্তুর ধর্মানুযায়ী। পনরটি মুভমেন্ট নানা আবর্তের সাক্ষী। প্রথম সাতটি নিহত এবং হন্তারকদের সম্পর্কের টানাপোড়েন বিবরণ, একক বা দ্বৈতভাবে। অষ্টম মুভমেন্ট হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি। রাষ্ট্রশক্তি, ব্যক্তি, চিত্তবৃত্তি (psyche) এবং যূথ-মানসের সমীকরণ-সন্ধানে তৎপর চারণ-কণ্ঠে অকস্মাৎ অভিশাপের চিৎকার—

And those the invaders did, provision for dead to the dead left,

Taxes for survival. power. Shadows rise and lumber away
Corpses with the rope and coil of siege from a common calvary.
Power. And atrophic in chain, astraddle, all at once
Women between their ravished thighs piss in the captive trench. Power

—পৃষ্ঠা ২৪

আবর্ত-সঙ্কুল নদীর মোহানায় খরস্রোত এবং অসম্ভব গর্জনশীলতায় দীর্ণবিদীর্ণ হয়। সব মুভমেন্টের গন্তব্য ক্রেসেন্ডো-অভিমুখে নিয়ে যাওয়া কম্পোজারের দায়িত্ব। সঞ্জীবের পদ্ধতি তদ্রূপ। কিন্তু আবর্ত আর শেষ হয় না—

Earth-borm, bound to earth and from affiant earth exhumed,
Three-fold contradictions recompensed in a syndrome
Possessing all space and species, a demesne of doom : —পৃষ্ঠা ২৫

অনুসন্ধিৎসার তীব্রতা যন্ত্রণা-প্রশমনের প্রচেষ্টা নয়। বিখ্যাত পোলিশ মঞ্চপরিচালক জার্জি গ্রোটওস্কি তাঁর আসরে অভিনেতা-গ্রীবা ও যন্ত্রযোগে অসম্ভব উচ্চগ্রামী চিৎকার আর্তনাদ-জাতীয় আদিম শব্দের ব্যবস্থা রাখেন। কারণ, তাঁর মতে, পীড়ক ও নিপীড়িত একে-অপরের আতঙ্কে অস্থির, পরস্পরের প্রতি সমান নিষ্ঠুর, তারা সমানভাবে অপরাধী। আবার সকলেই নিরীহ। রবীন্দ্রনাথের মতো মনুষ্যত্বে অটুট থাকার ফলে হয়তো মঞ্চপরিচালকের এমন সিদ্ধান্ত।

শ্রীসঞ্জীবের জগতে এমন অবরোহপন্থা নেই। তিনি ভায়োলেন্সের স্বরূপ উল্টে পাল্টে দেখেন। মনুষ্যত্ব-প্রতিষ্ঠা কেবল আস্থার কাজ নয়। ত্রয়োদশ মুভমেন্ট অন্য প্রতিধ্বনি

Dare the tensor
Of time stetched taut
Across the waste of space
No shelter might assuage.
Harrow hell, wrack, raze,
Face the foe, avenge,
Father !

নির্জীব নিরীহতা কাম্য নয়। 'ফাদার' এখানে আর্কিটাইপ মানবগোষ্ঠী। ভায়োলেন্স প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু আদর্শের প্রাতিজ্ঞিক পারিপার্শ্বিক যেন চোখের আড়াল না হয়। এই চেতনাই মনুষ্যত্বের সড়ক। আলোচ্য কাব্যের প্রচণ্ডতা, আবেগজাত বাঞ্ছিত এবং তীব্রতা য়ুরোপীয় মাল্টিপ্লেয়ার মিউজিকের মতো বহুমাত্রিক।

কাব্যের আবহ যেহেতু অস্থির চণ্ডতাদীর্ণ শ্রীসঞ্জীব প্রতিটি মুভমেন্টের গতি অব্যাগত রাখার প্রয়াস পেয়েছেন মেজাজ অনুযায়ী নানা ছন্দ-মারফত। কিন্তু প্রায়ই মিল অপেক্ষা অর্ধমিলের দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি। এবড়ো-খেবড়ো পথে হাঁটার পন্থাও মসৃণ নয়।

ভায়োলেন্স এবং হৃৎসমস্যা-জর্জরিত কাব্য হিসেবে "আইলেস ইন দি আর্ন" দেশীবিদেশী সকল শ্রেণীর সমঝদারের নিকট সমাদৃত হবে। নিপীড়ন এবং চণ্ডতার প্রতি ঘৃণার এমন সহৃদয় ধিক্কার-দানের দৃষ্টান্ত বিরল। তিরিশ সনের দিকে অডেন, ডে লুইস কি এলিয়ট কিছু শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ হেনেই খালাস, সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সাহস পাননি। ফ্রান্সে পল এলুয়ার অথবা আরাগঁ গালাগালে অভ্যস্ত, অভিশাপ দিতে নয়। তাঁরা দাহমান ম্যানসনের দিকে অসহায় চোখ রেখে ফুৎকার দেন, আগুন নেভানোর কাজে। ম্যানসন যেন নিভন্ত-শিখা কোন প্রদীপ। এদিকে

শ্রীসঞ্জীব পঙ্কোদ্ধারের অনন্য পথিক।

এই কাব্য বিদেশী ভাষায় লিখে শ্রীসঞ্জীব আরো মহৎ উপকার সাধন করেছেন। নিউট্রন বোমার ক্যাপসুলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর পক্ষে ভায়োলেন্সের প্রশ্ন এড়িয়ে থাকা আত্মহত্যার সামিল। গোলকী দেহাতে আজ প্রত্যেকটি দেশ। প্রচারের দিক থেকে ইংরেজি ভাষার ব্যাপকতা অনস্বীকার্য। তাছাড়া, ভাষা এবং ভূগোলের পৌত্তলিকতা বর্তমান বিশ্বে তাড়াতাড়ি দূর হওয়া উচিত। অন্যান্য দেশের সেন্সিবিলিটিজ বা সংবেদন-সম্ভ্রমে পৌঁছুতে না পারলে জাতীয়তাবাদ রীতিমত যূপকাঠ বিশেষ।

ইংরেজি কবির মাতৃভাষা নয়। এহ বাহ্য। "আইলেস ইন দি আর্ন"-এর চারণকে শার্লাটান ভাবার কোন অবকাশ নেই। ইংরেজি কাব্যের ঐতিহ্য ও আঙ্গিক সম্পর্কে তিনি বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল। এই কাব্যের আধেয় তার প্রভূত প্রমাণ। রূপকল্প ও ভাবের পারস্পরিক তর্জমা, আটপৌরে সংলাপের ধাঁচ হঠাৎ টেনে আনা, অতীতের আবাহন-বুকে বর্তমানের হাল্কা পোঁচ টেনে কালের যুগপৎ একাত্মতা ও বিচ্ছেদ রচনা এমনতর নানা টেকনিকের দিক্‌শূল সমঝদারের চোখে সহজেই পড়বে। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যের প্রারম্ভ গদ্যে বিরচিত লাক্রেমী (অবশ্য করণীয় - সুতরাং এখানে পাঠ্য) ভূমিকার তৃতীয় স্তবক থেকে যেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পাঠকের মনশ্চক্ষু ও তত্ত্বকর্ণপটের জন্যে মাত্র একটি বাক্যে নানা ব্যাপ্তির ছটায়, বিশ্বগ্রাসী প্রচ্ছন্ন বিনম্র একটি কাতরোক্তির বিচ্ছুরণ .

I submit rather to the dead, blinded and destroyed, by no man perhaps, but by a blind force vicarious on both sides on either end of the otherness, going out of himself on the part of the dead in a lifelong search of freedom without, even unto death, the body freed and far-flung, left perchance by an open ditch, uninvited and never to be found yet, not also to find all that he cherished for a lifetime, the freeing of a people he was not to see before he would realise the release in death by the ditch, contradictions confronting a life passed in prison through the best of years equated no less with a time he found himself in the country's top most post in the cabinet, juxtaposed by the pitch and toss of politics inseparable from a place by the ditch in the end but not for the burial yet, the body never so found, let him enter the poem no matter less than he was in life, in death not to careless a poem begging for no merit except a place between the lines for the burial of the dead.

শওকত ওসমান

বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায়—প্রথম খণ্ড। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা, ৭৩। মূল্য পনর টাকা।

গ্রন্থের নামকরণে অনেক সময় কিছু প্রত্যাশা জাগে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনার প্রতিশ্রুতিবহ তাবৎ সার্থক বইগুলির কথা স্বতই মনে

আসে তুলনার সংকেত নিয়ে। সেসব ক্ষেত্রে গ্রন্থকারগণ যে সুপরিকল্পিত ধারায় দায়িত্ব পালনে নেমেছিলেন, আমাদের মনোকেন্দ্রের বইটি সেরকম কোন মেথডোলজির নিরিখে লিখিত হয়নি কেন, এই প্রশ্ন প্রতিটি সাহিত্য-সমালোচনাপুস্তকের সজাগ পাঠকের সামনে অপ্রতিরোধ্য। এহেন ত্রুটি লেখক খণ্ডাতে পারতেন একটি ভূমিকায় দু-কথা বলে এবং তাহলে পাঠকের প্রত্যাশাও খর্ব বা অ্যাডজাস্ট করা যেত, আর সূচিপত্র খুলেই প্রথমেই লেখকের যথেচ্ছগামিতার দরুন পাঠকের অনিবার্য শক অনেকখানি অ্যাবসর্বড হয়ে যেত। কাজে-কাজেই প্রথম নজরে যা মনে হয়—বইটি কিছু সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্মের অবিন্যস্ত আলোচনার সমষ্টি—তা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হতে বাধ্য। মোদ্দা কথা দাঁড়াচ্ছে, গ্রন্থখানিতে কোন সুসমঞ্জস ধারাবাহিকতা ও মুখবন্ধে লিখিত পদ্ধতির পক্ষে কোনরূপ যুক্তির অবতারণা অনুপস্থিত থাকায় বইটির টাইটেলটিই যথেষ্ট সমর্থন পাচ্ছে না পাঠকের প্রাথমিক বিচারেই।

বিশ্বসাহিত্য কথাটি কম স্পর্ধিত ঘোষণা নয়, শব্দটি কম ভারি নয়। আলোচ্য গ্রন্থকারের বিশ্বমানচিত্রে অবশ্য এই খণ্ডের আলোচনায় রাশিয়া, ইটালি, গ্রীস, আমেরিকা, ভারত, আরব, স্পেন ইত্যাদি দেশের সাহিত্য অনুপস্থিত। পক্ষে দুটি সাফাই গাওয়া যায়। 'প্রতিভা' শব্দটিতে (টাইটেলে) কিছু সবিনয় বিধুক্তিকরণের আভাস হয়তো আছে। তাছাড়া আছে 'ব্লার্বে' দু-কথা বলার চেষ্টা। শেষোক্ত চেষ্টায় আরো বেশি অভিযোগ অর্শায় লেখকের উপরে। 'ব্লার্বে'র কথায় 'মধ্যযুগ ও আধুনিককালের বারোজন বিশ্ববিশ্রুত লেখকের জীবন ও সাহিত্যের সরস আলোচনা।.. .....।'

লেখক গ্রন্থটিতে দেশ-কাল-পাত্রের পূর্বসম্মানিত ও গ্রাহ্য কোন বিচারই মেনে চলেননি দেখলে তাঁর উপর পল্লবগ্রাহিতার অভিযোগ আনা স্বাভাবিক নয় কি?

আরো একটা কথা। এইজাতীয় সমালোচনা লেখার একটা সর্বজনস্বীকৃত কনভেনশন রয়েছে। প্রতিটি তন্নিষ্ঠ লেখক তা পালন করেন। এমনকি মৌলিক গবেষণা-গ্রন্থও কিছু মূল্যবান সমালোচনাকে আত্মসাৎ করার লক্ষণ দুষ্ট হয় এবং কখনো-বা লেখক অন্য সমালোচকের নামোল্লেখ করেন বা প্রাসঙ্গিক যুক্তি খণ্ডন করেন। এইসব মূল্যবান গ্রন্থে ঋণ স্বীকৃতির নিদর্শন হিসেবে বা উৎসাহী পাঠকের অধিক পাঠতৃষ্ণা উদ্রেকের বা নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অথবা সমগ্র গ্রন্থের শেষে অথবা পাদটীকায় বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের উল্লেখ বা গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়। কিন্তু এই কনভেনশন এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে।

'ব্লার্বে'র ঘোষণা অনুযায়ী, আলোচ্য লেখকদের যুগবিবেচনায় দেখা যায় প্রচলিত যুগবিচারের যে সময়সীমার নির্দিষ্ট ধারণা আছে, তা সব একাকার হয়ে যায় পাঠকের সামনে। সার্ভেন্টিস, শেক্সপীয়র, ডিফো, সুইফ্‌ট, জনসন, এমনকি ক্যাম্বেল, হাইনরিখ, হাইনে কোন্ যুগের লেখক এঁরা? মধ্যযুগের? আধুনিক কালের? কালপরিমাপের কোন্ আচরণবিধি লেখক মেনেছেন, বুঝি না। এই ধরনের অনেক অনেক অ্যানামালির (না, অ্যানার্কিজ্‌মের?) খোলস ছেড়ে শাঁসে পৌঁছাতে হয়।

অবশ্য কিছু ভালোর দিকে কথাও বলা যায়। গ্রন্থকার আলোচ্য লেখকদের জীবনের বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ আর রোমাঞ্চকর ঘটনা সন্নিবেশ করে বইখানিকে উপন্যাসের মতো আস্বাদ্য করে তুলেছেন। তাঁর ভাষা আধুনিকতার চমক ও আড়ষ্টতা থেকে বর্জিত এবং পাঠককে কখনো-কখনো একাগ্র করে তোলার মতো উপকরণে সমৃদ্ধ। না হলে তিনি এমন স্বল্পখ্যাত কবি ক্যাম্বেলকে বেছে নেবেন কেন? আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের সুপ্ত দেশপ্রেম, পরাধীনতার প্লানিবোধ ও স্বাজাত্যাভিমান জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট এই কবির কাব্যবিষয়ক আলোচনায়। অনেক সেন্টিমেন্টাল পাঠকের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই আলোচনাটি। তবে এইজাতীয় ভারত-অনুরাগী বিদেশী লেখক,

কবি আর বক্তাদের অবজেকটিভ আলোচনা যে-কোন একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা বাড়াত অনেক বেশি।

মুরাসাকি, ইভো এবং আর্চিব্রল্ড ক্যাম্বেলের মতোই স্বল্পখ্যাত। যদিও মুরাসাকি শিকিবুর মতো প্রায় অখ্যাত লেখককে মধ্যযুগ থেকে টেনে এনে আধুনিক পাঠকদের সামনে হাজির করা হয়েছে চিত্তরঞ্জনবাবুর সংবেদনশীল আলোচনায়। কিন্তু জানি না 'গেঞ্জি মনোগাতারি' উপন্যাসখানি কজন উৎসুক পাঠক সংগ্রহ করতে পারবেন। এক্ষেত্রেও, চিত্তরঞ্জনবাবু লেখিকার আলোচ্য উপন্যাস-খানির অনুবাদক বা প্রকাশকের প্রয়োজনীয় তথ্য সংবরণ করে রেখে ঠিক করেননি।

বাকি দশজনের আলোচনায় লেখকের ব্যাপক পঠনপরিচয় বহন করছে। অবশ্য ডিফোর আলোচনাটি অনেক বিতর্কের অবতারণা করতে পারে। সুইফট আর জনসন সম্বন্ধে আলোচনা দুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। (যদিও 'রসোত্তীর্ণ' শব্দটি সমালোচনা-গ্রন্থের সমালোচনায় অপ্রযুক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু 'ব্লার্বে'র ঘোষণায় আছে যে, ". . . বারোজন বিশ্ববিশ্রুত লেখকের জীবন ও সাহিত্যের সরস আলোচনা।")। বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পূর্বে লেখক আর একটু সাবধানী হবেন, এই আশা রইল।

শিশিরকুমার ভট্টাচার্য

সংগীত-পরিক্রমা— নারায়ণ চৌধুরী। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৭৩। মূল্য আঠারো টাকা।

কাজী নজরুলের গান— নারায়ণ চৌধুরী। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-৭৩। মূল্য পাঁচ টাকা।

লেখার দ্বারা তো দূরের কথা, সংগীতের গূঢ় সংকেত সর্বদা স্বরলিপির সাহায্যেও ঠিক বোঝানো যায় না। তাছাড়া সংগীতের ভালো-মন্দের বিচারও অনেকটাই ব্যক্তিগত রুচি-মর্জি এবং যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে সংগীত-সমালোচকমাত্রই একজন যোগ্য শ্রোতা এবং তাঁর সমালোচনা যুক্তি-পরম্পরায় গ্রথিত। তথাপি তিনি কি অন্য শ্রোতার রুচিতে হাত দিতে পারেন? তদুপরি থেকে যান কিছু অশ্রোতাও যাঁরা সমালোচনা থেকেই মোটামুটি একটা আন্দাজ পেতে চান। একজন সংগীত-সমালোচককে কলম ধরতে গেলে এই ধরনের যাবতীয় সমস্যাকেই মাথায় রাখতে হয়। যেহেতু তিনি কোনো কল্পতরু নন তাই সব তরফের মনোরঞ্জন তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। যে কোনো সাংগীতিক আলোচনার সূত্রেই সমালোচকের এই সীমা-বদ্ধতাটুকু মেনে নেওয়া উচিত।

'সংগীত-পরিক্রমা'-র প্রারম্ভেই শ্রীনারায়ণ চৌধুরী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এ-গ্রন্থে তাঁর উদ্দেশ্য সংগীতশাস্ত্রের মূল সূত্রাবলীর সঙ্গে সাধারণ পাঠককে পরিচিত করিয়ে দেওয়া। খুব সাদামাটা ভাষায় সহজ-সরল ভঙ্গিতেই এ-কাজটি তিনি করতে চেয়েছেন। এমন প্রাঞ্জল উপস্থাপনা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব যাঁর বিষয়ের ওপর আছে স্বচ্ছ ধারণা এবং ভাষার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় কোনো সংগীতশাস্ত্রীর ঔপপত্তিক জ্ঞান তর্কাতীত হলেও লিখনশৈলী অনায়ত্ত থাকায় আলোচনা মাঠে মারা যায়। পক্ষান্তরে ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল থাকা সত্ত্বেও বিষয়ের ওপর কর্তৃত্ব না থাকায় অনেকেরই আলোচনা শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে ভাসা-ভাসা। শ্রীচৌধুরী

সংগীতশাস্ত্রে যেমন সুপণ্ডিত তেমনি একজন সুলেখকও। ফলে তাঁর 'সংগীত-পরিক্রমা' দুই বিরল গুণের সমন্বয়ে অসাধারণ।

উপক্রমণিকা ও উপসংহারসহ গ্রন্থটিতে মোট তেত্রিশটি নিবন্ধ আছে যাদের দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে আছে মার্গসংগীতের আলোচনা এবং দ্বিতীয় অংশে কাব্যসংগীতের। কাব্য-সংগীতের আলোচনায় আসতে গিয়ে খুব সংগত কারণেই শ্রীচৌধুরী মার্গসংগীত-প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। এ যেন মূল সুরে আসার আগে আলাপ।

কিন্তু এ আলাপ যে সর্বদা সুবিন্যস্ত হয়েছে এমন দাবি বোধ হয় সমীচীন নয়। মতঙ্গ তাঁর 'বৃহদ্দেশী'-তে মার্গ ও দেশীসংগীতের একটি সাংগীতিক সংজ্ঞা দিতে চেয়েছেন। তাঁর মতে যে সংগীতে আলাপ-মূর্ছনা-তান-লয়-অলংকার ইত্যাদি আছে তা হল মার্গসংগীত। দেশীসংগীতে ওসবের বালাই নেই। মার্গসংগীত শিক্ষাসাপেক্ষ, দেশীসংগীত স্বতঃস্ফূর্ত। এই কারণেই একটা জাতির সাংগীতিক ঐতিহ্যের স্বরূপ জানতে হলে তার দেশীসংগীতকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। 'বাংলার লোকসংগীত' নিবন্ধটি এ-গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। মার্গসংগীতের সাধারণ আলোচনার পরই তার উপস্থাপনা বোধ হয় যথাযোগ্য হত। এবং অতঃপর কীর্তন-প্রসঙ্গ।

কীর্তন-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীচৌধুরী বিক্ষিপ্তভাবে অনেক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে আঙ্গিকের দিক থেকে এবং রসবিচারে পালাকীর্তনের সঙ্গে মার্গসংগীতেরই কুটুম্বিতা, আর পদাবলীর সঙ্গে লোকসংগীতের। কীর্তনের অপার ঐশ্বর্য কেবল ভক্তিরসাত্মক গানেই যেন আবদ্ধ না থাকে, তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়— সুরকারদের প্রতি এই আবেদন রেখেছেন শ্রীচৌধুরী। বাংলার প্রধান সুরকারেরা কিন্তু সকলেই কীর্তনের সুরকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন। হাসির গানে রজনীকান্তের কীর্তনাঙ্গের সুর-প্রয়োগ কি সহজে ভোলা যায়? আর রবীন্দ্রনাথ তো শুধু সুরপ্রয়োগেই ক্ষান্ত হননি, কীর্তনের রসে মজে তার অফুরান সম্ভাবনার কথা বার বার বলেছেন। তাঁর সব রসের গানেই কীর্তনের সুর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে।

গ্রন্থের প্রথম অংশে শ্রীচৌধুরী 'আবদুল করিম খাঁ ও ফৈয়াজ খাঁ' 'সংগীতে তিন পুরুষ', 'কেশরবাঈ কারকার ও হীরাবাঈ বরোদকার', 'রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী', 'জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী', 'ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ চক্রবর্তী' প্রভৃতি আলোচনায় যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। মার্গসংগীতের সবরকম সৌকর্য বজায় রেখেও করিম খাঁ সাহেব যে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করে-ছিলেন তার মধ্যেই শ্রীচৌধুরী খুঁজে পান মার্গসংগীতের সার্বজনীন আবেদন। এই চকিত-মন্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরাও টের পেয়ে যাই কেন তিনি সংগীতের আলোচনাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে চান। সুরসৌন্দর্যের স্বার্থে প্রচল শাস্ত্রীয় অনুশাসন থেকে সরে আসার অসীম সাহস তিনি লক্ষ্য করেন ভীষ্মদেবের গানে। উল্লেখ না করলেও আমাদের বুঝে নিতে দেরি হয় না এই সাহসের পেছনে কাজ করে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় বাঙালী ঐতিহ্য।

'হিন্দুস্থানী সংগীতের আরও কি উন্নতি সম্ভব'? এবং 'রাগসংগীতের ভবিষ্যৎ' নামে দুটি নিবন্ধে শ্রীচৌধুরী জানিয়েছেন মার্গসঙ্গীত নাকি উন্নতির চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে গেছে, আর তার উন্নতি সম্ভব নয়। সবিনয়ে জানাই এই নেতিবাচক উক্তিটি যতোটা দুঃসাহসী ততোটা যুক্তিসহ নয়। একথা ঠিকই অতীতের মতো নিপুণ কলাবন্তের আবির্ভাব এখন আর সচরাচর ঘটে না এবং একথাও অমূলক নয় যে অধুনা শাস্ত্রীয় সংগীতে কিছুটা চর্বিতচর্বণের একঘেয়েমি এসে গেছে। কিন্তু এটাকেই চরম সত্য বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই। নতুন প্রতিভার স্পর্শে এই আপাত-অন্ধকার কেটে যাবে। মার্গসংগীতের সুদীর্ঘ পরিক্রমণ-পথে মাঝে মধ্যেই তো তাকে বিশ্রাম নিতে

হয়েছে। তিন স্বর থেকে সাত স্বর, চোদ্দ শ্রুতি থেকে বাইশ শ্রুতি তো একদিনে সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় অংশের প্রারম্ভে চারটি নিবন্ধে শ্রীচৌধুরী রবীন্দ্রসংগীতের ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর অনুযোগ, এই গানে শিল্পীর সুরবিহারের স্বাধীনতা নেই (একদা দিলীপকুমারও এই অভিযোগে কবির সঙ্গে তর্ক-দ্বন্দ্ব বাধিয়েছিলেন। অতি-সম্প্রতি অবশ্য তিনি পূর্ব মত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।)। শ্রীচৌধুরীর মতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ধ্রুপদাঙ্গ গানগুলির রূপ সংযত, সংহত, গম্ভীর এবং সেইহেতু মনোগ্রাহী। এই মন্তব্যে আপত্তির কারণ দেখি না, কিন্তু তিনি যখন কবির উত্তরজীবনের গানের প্রতি কটাক্ষ করেন (পৃ ৯২) তখন অনেকের মনে হতে পারে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিন্তা-ভাবনা করেই তো কবি তাঁর উত্তরজীবনের আপাত-সরল গানগুলি বেঁধেছিলেন। প্রথম জীবনের গানে তাঁকে কষ্ট করে চিনে নিতে হয়, কিন্তু উত্তরজীবনের গানে তিনি স্বপ্রকাশ। গায়কবিশেষের অক্ষমতার কারণে সংগীত-স্রষ্টাকে দায়ী করা সুবিবেচনার কাজ নয়।

রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে এতাবৎ যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই রাবীন্দ্রিক পরিমণ্ডলের মানুষ (দিলীপকুমার এবং ধূর্জটিপ্রসাদকে বাদ দিয়েই বলছি, কেননা, তাঁদের আলোচনা প্রণালীবদ্ধ নয়) এবং তাঁদের অনেকেরই শিক্ষা রবীন্দ্রসংগীতেই নিবদ্ধ। ফলে তাঁদের লেখায় সমালোচনার চেয়ে ভক্তিভাবই বেশি প্রকটিত। এক্ষেত্রে শ্রীচৌধুরীর মতো সংগীতজ্ঞের কাছে যে অতিরিক্ত প্রত্যাশা ছিল তা কিন্তু পূর্ণ হল না।

আর একটি কথা। মার্গসংগীত থেকে সরাসরি রবীন্দ্রসংগীতে এলে মাঝখানে বোধ হয় একটা ফাঁক থেকে যায়। আগেই উল্লেখ করেছি সেই ফাঁকে প্রথমে আসতে পারে লোকসংগীতের আলোচনা, তারপর কীর্তনের। কিন্তু তাতেও বোধ হয় ভরাট হয় না। রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনায় আসার আগে 'প্রাচীন বাংলা গান' নামে একটি পৃথক নিবন্ধ রাখা যেতে পারে যেখানে দেখানো যাবে মার্গ-সংগীতের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়েই বাঙালী গানে কত স্বকীয়তা দেখাতে পেরেছেন। এ-প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি অবশ্যই নিধুবাবু।

নাট্যসংগীতের অশেষ সম্ভাবনার কথা শ্রীচৌধুরী বলেছেন এবং কৃষ্ণধনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও স্মরণ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংগীতগুলি কি এই অবকাশে আলোচনা করা যেত না?

দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল, দিলীপকুমার, হিমাংশু দত্ত, অজয় ভট্টাচার্য, তিমিরবরণ প্রমুখের আলোচনায় শ্রীচৌধুরী গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

মার্গসংগীত, যৌথসংগীত ইত্যাদির আলোচনা থাকলেও গণ-সংগীত উপেক্ষিত হয়ে রইল কেন? জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং অন্তত প্রথম পর্যায়ের সলিল চৌধুরীর কথা এ-প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে মনে আসে।

'সংগীত-পরিক্রমা'য় যা নেই তা নিয়ে আক্ষেপের পরিমাণ বোধ হয় একটু বেশিই হয়ে গেল। আসলে আমাদের হাতের কাছে তো তেমন কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নেই যেখানে আমরা গোড়া থেকে হাল আমল পর্যন্ত সুষ্ঠু সমালোচনা পেতে পারি। 'সংগীত পরিক্রমা' পড়ে মনে হয়েছে আমাদের এতদিনের সেই অভাব বোধ হয় একটু সংস্কারিত হলে এই গ্রন্থটিই মোচন করতে পারে।

'সংগীত-পরিক্রমা'য় 'কাজী নজরুল ইসলাম -গীতিকার ও সুরকার' নামে একটি নিবন্ধ আছে। 'কাজী নজরুলের গান' গ্রন্থটি সেই নিবন্ধেরই সময়োপযোগী সম্প্রসারণ।

গ্রন্থটি মোট দশটি নিবন্ধের সমষ্টি। শ্রীচৌধুরী এই নিবন্ধগুলিতে নজরুলের কবি-সত্তার সঙ্গে সংগীত-স্রষ্টার যোগ, পূর্বাচার্যদের কাছে তাঁর ঋণ, তাঁর গানের বিচিত্র উপাদান সম্পর্কে নানাবিধ কূটপ্রশ্নের অবতারণা করে গ্রন্থটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

বাংলার কাব্যসংগীতে নজরুলের আগমন রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত-অতুলপ্রসাদের পথ ধরেই। গানের সৃষ্টিপ্রাচুর্যে, প্রকরণবৈচিত্র্যে এবং জনপ্রিয়তায় তিনি মনে পড়িয়ে দেন রবীন্দ্রনাথকে। নজরুলের প্রেমের গানের অন্তত একটি পর্যায় কথা ও সুরের হরগৌরী-মিলনে রবীন্দ্রসংগীতেরই যোগ্য উত্তরসূরী। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ওজোগুণ তিনি নিজের করে নেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যে খেয়াল-ভাঙা গানের প্রবর্তন করেন তাকে তিনি আরও এগিয়ে নিয়ে যান। অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন বাংলা গানে ঠুংরির চাল এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য। রজনীকান্তের গানের ভক্তি-আকুলতা প্রকাশ পায় তাঁর ধর্মসংগীতে।

একটু তলিয়ে দেখলে নজরুলকে তাঁর গানে আলাদা করে চিনে নিতেও আমাদের কোনো ভুল হয় না। তাঁর বাংলা গজল, রাগপ্রধান, খেয়াল-ভাঙা গান, দেশাত্মবোধক গান, প্রেমের গান, বিদেশী সুরের গান, শ্যামাসংগীত, ইসলামী সংগীত ইত্যাদির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকে যা দিয়ে অনায়াসেই বোঝা যায় এ-গান নজরুল-গীতি।

অতুলপ্রসাদ দু-একটি বাংলা গজল রচনা করেছিলেন। কিন্তু সে ছিল নিছক রুচি-বদলের তাগিদে। বাংলা গানে এ-ধারার ব্যাপক প্রচার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় কৃতিত্ব নজরুলের। কাব্যসংগীত রচনার প্রথম পর্বে বাংলা গজল রচনা করে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বাংলা গানের ক্ষেত্রে এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন চমক। গজল গানের রচনায় এবং পরিবেশণায় একটি বিশেষ রীতি আছে। পারস্য দেশের এই প্রেমসংগীতে দুটি ভাগ- আস্থায়ী এবং অন্তরা। আস্থায়ী অংশ ছন্দোবদ্ধ -মধ্য বা দ্রুত লয়ে গেয়। পরবর্তী অংশ অন্তরা। অন্তরা গাইবার সময় তাল থেকে সরে সুরবদ্ধ টানা আবৃত্তি করতে হয়। তারপর আবার আসে আস্থায়ী। গজলে টানা আবৃত্তির অংশগুলিকে শের বলা হয়। শের সমৃদ্ধ বাংলা গজলের প্রবর্তন করেন নজরুল। এই ধরনের গানে তাঁর আদর্শ ছিলেন পারস্যের মরমী কবি হাফিজ। একটা সময় ফার্সী ভাষার চর্চা বাঙালীর খুব প্রিয় কাজ ছিল। কিন্তু কি অনুবাদে কি স্বাধীন রচনায় বাংলা ভাষায় ফার্সী-চর্চার তেমন নজীর চোখে পড়ে না। নজরুলই বোধ হয় প্রথম সার্থক গীতিকার যিনি বাংলা গজলে সেই কাজটি শুরু করেছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, অনেক কিছুর মতই এ-কাজটিও অসম্পূর্ণ রেখে তিনি অচিরেই অন্যদিকে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর পরেও তেমন কেউ এলেন না যিনি এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। নজরুল কি বুঝেছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের সুরা ও সাকী বাংলাদেশে খাপ খায় না? নাকি স্বভাব-বৈচিত্র্যেই তাঁর অন্যদিকে বাঁক নেওয়া? এই প্রশ্নের উত্তর আর পাওয়া যাবে না।

রাগপ্রধান বাংলা গানে নজরুলের স্বকীয়তা চোখে পড়ার মত। কিন্তু এ-আলোচনায় প্রবেশ করার আগে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে রাগপ্রধান আর খেয়াল-ভাঙা গান কাছাকাছি হলেও, এক নয়।

রাগপ্রধান গানে রাগের আমেজ যেমন থাকে তেমনি থাকে কথার কাব্যিকতা। খেয়াল-ভাঙা গানে কথার স্থান প্রায় গৌণ। এবং এই ধরনের গানের মূলে প্রায়শই কোনো হিন্দী গান থাকে যার আদলে এই গান রচিত হয়। রাগপ্রধানে ঠুংরীর চটুল ভঙ্গি, মিশ্র রাগের ছোঁওয়া চলতে পারে, খেয়াল-ভাঙা গানে তা হয় না। রাগপ্রধান এবং খেয়াল-ভাঙা দুই ধরনের গানই রচনা করলেও রাগপ্রধানে তাঁর পারদর্শিতা প্রশ্নাতীত। নিঃসন্দেহে এ-ব্যাপারে তাঁর কবি সত্তা এবং রাগজ্ঞানের পরিচয় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। উত্তর ভারতীয় সংগীতের মার্গ ও দেশী উভয় বিভাগ থেকেই তিনি এক্ষেত্রে যথেচ্ছ সাহায্য নিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতীয় এবং লুপ্তপ্রায় অপ্রচলিত রাগের সুর সংগ্রহ করেও তিনি রাগপ্রধান বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। শ্রীচৌধুরী তাঁর আলোচনায় অসতর্কভাবেই হয়তো 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর' গানটিকে একবার খেয়াল-ভাঙা গান (পৃঃ ৩৬) আর একবার রাগপ্রধান বলেছেন (পৃঃ ৬১)। গানটি শুদ্ধ ছায়ানটের দৃষ্টান্ত হলেও (জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের

গাইবার ভঙ্গিও খেয়াল-ঘেঁষা) কাব্যিকতা-গুণে একে রাগপ্রধানই বলা উচিত।

বিদেশী সুরের গান রচনায় নজরুল এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ প্রমুখ সুরকার পাশ্চাত্য সংগীতের সুরকেই তাঁদের গানে প্রয়োগ করেছিলেন। নজরুল আনলেন বাংলা গানে আরবী সুর, মিশরীয় নাচের সুর, মরিশ মেলডির আমেজ এবং দক্ষিণ-সমুদ্র-দ্বীপের গান। সংখ্যায় এসব গান বেশি নয়, কিন্তু গুণগত বিচারে খুবই অভিনব। নজরুলের এ-পর্যায়ের গান নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। এ-গ্রন্থে যেটুকু আছে তাতে আশ মেটে না। নজরুলের বিদেশী সুরে রচিত গান নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া উচিত।

বাংলা গজল ছাড়াও নজরুলের প্রেমের গানের সংখ্যা খুব কম নয়। প্রেমের সব পর্যায়ের গানই তিনি রচনা করেছেন। পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাথ কিংবা অতুলপ্রসাদ এবং অংশত দ্বিজেন্দ্রলালও প্রেমের একটি দিকই প্রধান করে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের কথা ও সুরে—সেদিকটি হল প্রেমিকের না-পাওয়ার বেদনা। দুঃখভারাক্রান্ত এই প্রেমসংগীতগুলির সঙ্গে নজরুল যোগ করলেন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের মিলনের আনন্দ। নীরক্ত প্রেমের গান প্রাণবন্ত হয়ে উঠল নজরুলের হাতে। মনে হয় পটভূমিরূপে এ-ব্যাপারে তাঁর ফার্সী-চর্চা তাঁকে সাহায্য করেছিল। বাংলার কাব্যসংগীতে নজরুলের প্রেমের গান দীর্ঘদিনের এক অভাব পূরণ করল। শ্রীচৌধুরী প্রাসঙ্গিকভাবে এসব তথ্য ছুঁয়ে গিয়েছেন এবং সেখানেই ক্ষান্ত হননি—খুঁজেছেন সুরকাঠামোয় নজরুলের গানের বৈশিষ্টকে। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ প্রমুখের সুরপ্রয়োগের রীতির সঙ্গে নজরুলের সুরপ্রয়োগের রীতির তুলনামূলক আলোচনা করে শ্রীচৌধুরী প্রশংসনীয়ভাবে দেখাতে চেয়েছেন কোথায় নজরুল পূর্ববর্তীদের চেয়ে পৃথক। মনস্বিতার সঙ্গে রসগ্রাহিতার সংযোগে এই আলোচনা অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এরপরও বোধ হয় আর একটি বৈশিষ্ট্য অকথিত থেকে যায়। এটি হল তাঁর গানে বাণী এবং সুরের অপরিমার্জিত সৌন্দর্য। মন্তব্যটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল—এঁরা সকলেই সংগীতের বাণীব্যবহারে এবং তার সুরসঞ্চারে অতি-সতর্ক ছিলেন। তাঁদের গান পরিশীলিত, মার্জিত। কিন্তু নজরুল কি কবিতায় কি গানে পরিমার্জনার বড় একটা ধার ধারতেন না। ব্যাপারটা শাপে বর হয়ে দেখা দিয়েছিল। অপরিমার্জনাহেতু তাঁর কবিতায় এবং গানে এক ধরনের টাটকা গন্ধ লেগে থাকে যা সহজেই পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম। ধরা যাক, 'কারার ঐ লৌহকপাট' কিংবা 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' এই দুটি দেশাত্মবোধক গানের কথা। এসব গানের বাণীতে এবং সুরে এমন এক ধরনের জ্বালা আছে যার আবেদন শ্রোতার কাছে সরাসরি। এবং এটা সম্ভব হয়েছে বাণী ও সুরের অমার্জিত ব্যবহারেই। রবীন্দ্রনাথের কোনো দেশাত্মবোধক গানে কি এ উচ্ছ্বাস কল্পনা করা যায়? দ্বিজেন্দ্রলালও এই নিরাভরণ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারতেন কি? শুধু দেশাত্মবোধক গানেই নয়, নজরুলের সব ধরনের গানেই এক স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে যা তাঁর গানকে করে তুলেছে প্রাণবন্ত। বাণীর সামান্য ত্রুটি ঢেকে গেছে সুরের আবেগ-ঐশ্বর্যে। নজরুলের গানের এই অশিল্পিত সৌন্দর্য নিয়ে গভীর আলোচনার প্রয়োজন আছে। কোন্ জাদুতে তাৎক্ষণিক গানকে তিনি চিরায়ত সম্পদ করে তুলেছেন তা আমরা তখনই উপলব্ধি করতে পারব।

নজরুলের কবিতা নিয়ে অনেক আলোচনা-গ্রন্থ এ-বাংলা ও-বাংলায় বেরিয়েছে কিন্তু গান নিয়ে গ্রন্থ বোধ হয় এই প্রথম। অল্প পরিসরে কবির গানের সমস্ত দিক ছুঁয়ে শ্রীচৌধুরী যে আলোচনার সূত্রপাত করলেন তার জন্যে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা প্রাপ্য। 'সংগীত-পরিক্রমা'-র পাঠক হিসেবে যে সামান্য ক্ষোভ ছিল স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই 'কাজী নজরুলের গান'-এ তিনি তা দূর

করে দিয়েছেন। শ্রীচৌধুরীর সংগীত-সূচি ও নজরুলের গান দিনে-দিনে গ্রন্থটিকে অসামান্য সৌন্দর্য দান করেছে।

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ—নবনীতা দেব সেন। আশা প্রকাশনী। বারো টাকা।

সমালোচনা-প্রবন্ধে সাধারণত দু ধরনের মনস্কতা আমরা দেখতে পাই। একদল লোক রূপ-রুচি ও সাহিত্যরসের দিকটাকে গুরুত্ব দেন। এর জন্যে তাঁরা সাহিত্যপাঠের মানসিক প্রতিক্রিয়ার (অ্যানাটমি অব ক্রিটিসিজমে নর্থরোপ ফ্রাই যাকে 'প্লেন সেন্স' ক্রিটিসিজম বলেছেন) দিকগুলোকে সাহিত্যতত্ত্বের অন্তর্গঠনের থেকে বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। আর, দ্বিতীয় দল শিল্পতত্ত্বের ব্যাকরণভাবনা, তার শিক্ষাগত শৃঙ্খলাকে তাঁদের চিন্তাবিস্তারের জিটেমাটি-গেরস্থালির মতো অপরিহার্য বলে মনে করেন। সমালোচনায় পাঠক এ হিসেবে দু রকমের। যাঁরা কেবল পাঠকের দায়িত্বে সীমাবদ্ধ থাকতে চান তাঁরা প্রথম সমালোচকগোষ্ঠীর অনুরক্ত হন। যাঁরা সাহিত্যের একনিষ্ঠ ছাত্র, সাহিত্য-পাঠ যাঁদের জীবনযাপনের অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় তাঁরা দ্বিতীয় দলের ভাবনা-পদ্ধতিতে বেশি আগ্রহ দেখান। 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য প্রবন্ধে' শ্রীমতী নবনীতা দেব সেন এই দু ধরনের পাঠকের মনোপযোগী এক মধ্যবিন্দুতে অবস্থান করেছেন। সাহিত্যের ছাত্রের ধ্যানপ্রয়াস এবং সাধারণ মানুষের উপযোগী এক স্পষ্ট, স্বচ্ছ ভাষা—এ দুটি লক্ষণই তাঁর এই প্রবন্ধ-সংকলনটির বিশেষত্ব। অথচ কোনোরকম পক্ষপাতিত্বের ব্যবধান এখানে নেই। "You will portrary drunkenness, war and love, my goodman, provided you are neither a drunkard, nor a lover, nor a soldier"—ফ্লবেয়ারের এই ঐতিহাসিক উক্তির চরিতার্থতা খুঁজে পাওয়া যাবে শ্রীমতী নবনীতা দেব সেনের রচনাপ্রকারে। আবার সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও বিকাশের দিকটি তাঁর মনন-বিস্তৃতির অন্তর্গত। অর্থাৎ শিল্প-মানসিকতায় সম্ভাব্য সমস্ত অন্তর্লীন সুখ ও অসুখের প্রতি মানবিক সহানুভব তাঁকে সমালোচকের কঠোর কঠিন নির্লিপ্তির বাইরে এক শুদ্ধ কোমলতায় রেখেছে।

যেমন 'প্রবাসী জন্মান্তর' ও 'বিবাগী ফুলের গন্ধ'। বাঙালীর কাছে যে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে আছেন জীবনের মর্মমূলে, পশ্চিমে কেন তাঁর আসন চিরস্থায়ী হতে পারল না শেক্সপীয়র, গোয়টে বা ডস্টয়েভস্কির মতো—তার অনুসন্ধানেই লেখিকার প্রথম প্রবন্ধ (ইংরিজি থেকে অনূদিত), 'প্রবাসী জন্মান্তর'। আমাদের খেয়াল রাখা উচিত যে মার্কিন প্রদেশে বসে লেখা ও সেই দেশেই প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি কিন্তু সে সময়ের (লিখিত ১৯৬১-৬২, প্রকাশিত ১৯৬৬) যখন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বা সৌরীন মিত্রের বই এমন কি স্টীফেন হে বা মেরি লেগোর বইও প্রকাশিত হয়নি। একথার উল্লেখ একজন্যেই করছি কেননা এই বইগুলির বিশ্লেষণপদ্ধতির অনেক আগেই যে রবীন্দ্র-নাথের পশ্চিমী মূল্যায়ন সম্পর্কে এই লেখিকার ভাবনাতত্ত্ব প্রকাশিত, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। এ প্রবন্ধে শ্রীমতী দেব সেন রবীন্দ্রনাথের মহৎ মনীষার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েই রবীন্দ্র-নাথের স্বয়ংকৃত ইংরিজি অনুবাদের দুর্বলতা, একদেশদর্শিতা ও কালজ্ঞানের অভাবকে নির্মোহ ভঙ্গিতে সমালোচনা

'বিবাগী ফুলের গন্ধ' প্রবন্ধটি (শঙ্খ ঘোষের 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ'　　সমালোচনা-

প্রবন্ধ) ইয়োরোপপ্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে তাঁর ব্যক্তিগত মানসিক সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। প্রেম-বন্ধুত্বে ও শিল্পের অন্তর্দ্বন্দ্বে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা-অপূর্ণতাকে আমরা এখানে জানতে সক্ষম হই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্যায়ন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের পারিপার্শ্বিক সমাজের অন্তর রূপ, সমকালীন ইয়োরোপের জটিল জীবন এবং রবীন্দ্রব্যক্তিত্বে উপনিবেশিতের জরুরি অন্তর্দ্বন্দ্ব লেখিকার এই প্রবন্ধ দুটিতে স্থান পেয়েছে। অবশ্যই শিল্পসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যতটা সমাজচেতনা বা কাল-অনুসন্ধান প্রয়োজনীয় তার বাইরে অনধিকার অনুপ্রবেশে লেখিকা আগ্রহ দেখাননি।

কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গে সমালোচনাগুলিতে (যেমন মালার্মের 'আঁগোয়াস' অনুবাদে সুধীন্দ্রনাথ বা বোদল্যায়ের 'লিমন্' অনুবাদে বুদ্ধদেবের স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা প্রসঙ্গে) শ্রীমতী নবনীতা দেব সেন মূল কবিতা ও তার অনুবাদের গঠন-বৈশিষ্ট্য, উপযুক্ত শব্দচয়ন, অর্থসংরক্ষণ, ও আঙ্গিকসৌষ্ঠবের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে দুটি অনুবাদের সংগতি, অসংগতি, ত্রুটি, সাফল্যের প্রতি তাঁর যুক্তিশুদ্ধ মতামত রেখেছেন।

নির্দিষ্ট ধারণার প্রতি কোনোরকম অন্ধ-অনুরাগ (ম্যাথু আর্নল্ডের মতে যার নাম 'টাচ-স্টোন থিয়োরি') নিয়ে তিনি সুধীন্দ্রনাথ বা বুদ্ধদেবের পরিমাপ করতে চাননি। মালার্মের স্বচ্ছতা-বোধের (ফরাসী 'ক্লার্তে') কতখানি দূরত্বে থেকে গিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ, এবং বোদল্যায়ের অনুভূতির তীব্রতাকে বুদ্ধদেবের অনুবাদে শুদ্ধ-চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সেই ভিত্তিতেই লেখিকার অনুসন্ধান। মূল ফরাসী কবিতার পাশাপাশি লেখিকা অনূদিত বাংলা আক্ষরিক অনুবাদ ছাড়াও ইংরিজিতে অ্যালেন ক্যডার (বোদল্যার) ও রজার ফ্রাই-এর (মালার্মে) অনুবাদ সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের অনুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে স্থান পাওয়ায় তুলনামূলক বিচারের একটা নির্ভরযোগ্য আবহাওয়া এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের ইংরিজি ভাষান্তর এবং ভার্জিলের ঈনীডের বাংলা অনুবাদ মূত ভাষায় রচিত ক্লাসিকস অনুবাদের বিশেষ আঙ্গিকের প্রসঙ্গে আলোচনা ছাড়াও, লেখিকা এখানে সাহিত্য ও সভ্যতার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দেশকাল ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিন্নতা ও একাত্মতার দিকে একাগ্র মনঃক্ষেপ করেছেন।

'রাজা' ও 'রক্তকরবী'- রবীন্দ্রনাথের এ নাটক দুটির প্রকাশভঙ্গি, প্রতীকব্যবহার, চরিত্র-বিশ্লেষ এবং পরিণতি-ভিন্নতার প্রতি সন্তর্পণ-মনোভাবের মধ্য দিয়েই 'বজ্রগর্ভ কুসুম' প্রবন্ধটিতে শ্রীমতী দেব সেন 'রাজা' ও 'রক্তকরবী' নাটক দুটির মৌল ভাবনার সাযুজ্য আবিষ্কার করেছেন। শেষ প্রবন্ধ 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী'তেও দুটি উপন্যাসের (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও আলব্যার কামুর 'প্লেগ') অন্তর-সাদৃশ্য উপস্থাপিত। গবেষকের মনস্কতায় লেখিকা এখানে বাংলার গ্রাম গাওদিয়া এবং আলজিরিয়ার 'ওরান শহরে' একই মৃত্যুশাসনের দূষিত বাতাসকে অনুভব করেন। দুই মুখ্য চরিত্রে যে দুজন ডাক্তার ('প্লেগে'র রিও এবং 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী) তাদের মানসিকতার প্রারম্ভেও সাযুজ্যকে (দুজনেই পেশায় ডাক্তার এবং সমাজ-সচেতন, মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁদের দুজনেরই নিরন্ত জেহাদ, সে অর্থে তাঁরা দুজনেই 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী') খুঁজে পান তিনি। কিন্তু পরিণতিতে শ্রীমতী দেব সেন রিওর আত্মবোধকে (যা বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় অস্তিত্ববাদী দর্শনে সুস্পষ্ট) শশীর ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। লেখিকার মতে বাংলাসাহিত্যে নিতান্ত খাপছাড়া এবং নিঃসঙ্গ নায়ক শশীর মনে জয়-পরাজয় সম্পর্কে রিওর মতো দার্শনিক নির্লিপ্ত নেই। তবে উপন্যাস দুটির পটভূমি এবং লোক-জীবনের সঙ্গে উপন্যাস দুটির যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শশীকে রিওর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া যায়। কেননা রিও ও ওরান

এবং শশী ও গাওদিয়া—মুখ্য চরিত্র ও উপন্যাস-পটভূমির এই দুটি অন্তঃসম্পর্কের তুলনামূলক বিচারে আগ্রহী পাঠক শশীকে রিওর তুলনায় অনেক বেশি প্রাণ নিয়ে, সহানুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকতে দেখেছেন। গাওদিয়া শশীর আপনার, ওরান রিওর নিজস্ব নয়, অনেকটা 'আউটসাইডারে'র মারসোর মতো রিওর ব্যবহার। হয়তো বা তা আলব্যার কামুর জন্মসমস্যা।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

অন্ধকারের কবিতা—ভোল্‌ফ বীয়ারমান। অনুবাদ-ভাষা-ভূমিকা-সম্পাদনা : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। অয়ন। কলিকাতা, ৯। মূল্য ছয় টাকা।

পূর্ব জার্মানিতে নিষিদ্ধ একগুচ্ছ কবিতার সংকলন অন্ধকারের কবিতা। ভোল্‌ফ বীয়ারমান আমাদের অপরিচিত একটি নাম। কিন্তু তিনি আজকের ইয়োরোপের এক ঝড়-তোলা বিতর্কিত কবি। বিভক্ত জার্মানির দুই অংশেই তাঁর কবিতা-গান নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে।

পূর্ব জার্মানির এই কবি ১৯৭৬ সালে দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। আর ১৯৬৩ সালেই তাঁর লেখা ও গান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। গোপন পত্রিকা বা নিষিদ্ধ সংকলন ভিন্ন পূবের মানুষেরা বীয়ারমান পড়বার সুযোগ পান না। অগুনতি রেকর্ড থাকলেও তাঁর রেকর্ড ওদেশে বাজানোও নিষিদ্ধ। স্বাভাবিকভাবেই এই নিষিদ্ধ কবিতাগুলি সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ জাগে।

বীয়ারমান পশ্চিম জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত কিন্তু সেখানকার প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরূপভাজন। পাস্তেরনাক বা সলঝেনিৎসিনকে নিয়ে সারা পৃথিবীতে যে তুমুল আলোড়ন হয় সুসংগঠিত প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে, বীয়ারমান প্রসঙ্গে সেই প্রচারযন্ত্রই পরিকল্পিত নীরবতার দ্বারাই মুছে দিতে চান কবিকে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বীয়ারমান জানেন তাঁর কবিতাকে গানের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিতে। এই চারণ-কবি, গীটার হাতে নেমে আসেন পথের ভিড়ে, তৈরি করেন এক নতুন জাতের ভিড় -শ্রোতা-পাঠকের এই ভিড়ে কবি মেলে ধরেন তাঁর চিন্তা-ভাবনা-সুখ-দুঃখ-আবেগ-অভিমান এবং অন্ধকার আবৃত্তিভঙ্গিমা সংগীতস্পন্দে। সুরেলা লালিত্য, পারিপাট্য নয়, বরং ব্রেশ্‌টের মতোই যুবগোষ্ঠীর জীবন্ত বুলি যা রেস্তোরাঁয়-পাবে ব্যবহৃত তাঁর কবিতায়-গানে আনে এক নতুন মেজাজ।

রাজনৈতিক কারণে বীয়ারমানের নিগ্রহ, রাজনৈতিক কারণেই পশ্চিমের বীয়ারমান-প্রসঙ্গে নীরবতা। কিন্তু নিগ্রহ আর নীরবতা খান খান করে ভেঙে দিয়েছে তাঁর কবিতা, তাঁর গান। শিকড়ে শিকড়ে এই কবি কিন্তু ভালোবাসেন গান গাইতে, গান শোনাতে। গান শোনানোতেই, তাঁর আনন্দ।

বীয়ারমান অন্ধকারের চারণ-কবি। ১৯৩৬ সালে হামবুর্গের এক কমিউনিস্ট পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯৫০ সালে, চোদ্দ বছর বয়সে তিনি প্রথম আসেন পূবে, বিশ্বযুবসম্মেলনে যোগ দিতে। এর তিন বছর পরে, ১৭ বছরের টগবগে বিশ্বাস নিয়ে, তিনি আবার আসেন এখানে পাকা-পাকিভাবে থাকতে। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৩ এই দশ বছর বীয়ারমানের নিজেকে তিলে তিলে খোঁজার সময়। হুমবোল্ট-এ ঢুকলেন পলিটিকাল ইকনমি পড়তে। যোগ দিলেন বার্লিনার আনসাম্‌ব্‌ল্‌-এ। হান্‌স আইসলারের প্রীতিভাজন হলেন। নাটকের কাজ ছেড়ে আবার শুরু করলেন গণিত ও দর্শন নিয়ে পড়াশুনো। তার আগে ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত পার্টির বিংশতি কংগ্রেস হয়ে গেছে। স্তালিন

বর্জন পালা শুরু হচ্ছে। বীয়ারমানের বক্তব্য পার্টিতে অগ্রাহ্য হলো। বলা বাহুল্য, পূবে এসে তিনি পেয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। ১৯৬০, ভিয়ঁ, তার থেকে বেশি হাইনে আর ব্রেশ্‌টের আদর্শে শুরু করলেন কবিতা লেখা, সঙ্গে সুর-সংযোজনা। ১৯৬১ সালে তৈরি হয়ে গেল বার্লিনের সেই পাঁচিল। আরো অসংখ্য সংবেদনশীল জার্মানের মতো বীয়ারমানের স্বপ্ন অবিভক্ত জার্মানি। এই পাঁচিল তাই বীয়ারমানকে আহত করলো। লিখলেন প্রথম নাটক 'বার্লিনের মিলনযাত্রা'। তার কবিতা, গানের বিষয়বস্তুতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের সরাসরি উপস্থিতিতে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকার বিরক্ত বোধ করলো। প্রকাশক পেলেন না কবি। সমস্ত সাহিত্যপত্রের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাধা হয়েই, গীটার নিয়ে নামলেন পথে-ঘাটে-পার্কে-পাবে-রেস্তরাঁয়, ধরলেন গান। ১৯৬০ সালে তাঁর গান গাওয়া নিষিদ্ধ হলো। পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলেন এই সময়েই। প্রচণ্ড বিরূপতার মধ্যেই প্রথম কবিতার বই 'তারের বীণা' প্রকাশিত হলো ১৯৬৫ সালে, পশ্চিম জার্মানি থেকে। ১৯৬৬ সালে তাঁর পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হলো। ১৯৬৮ সালে পশ্চিম থেকেই প্রকাশিত হলো দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মার্কস-এঙ্গেলসের জবানিতেই'। বীয়ারমান মার্কসবাদের নামে পার্টি-আমলা-যথেচ্ছাচার, মার্কসবাদকে অচলায়তনের রূপ দেবার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অঙ্গীকার করেছেন। এই কারণেই তিনি পূবের বিরাগভাজন। আর ঠিক একই রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির কাছে তিনি তখন মূল্যবান হলেন। কিন্তু পশ্চিমের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো যখন প্রকাশিত হলো 'ড্রাগনবধের পালা' নামক অষ্টাঙ্ক গীতিনাট্য। এই গীতিনাট্যে পশ্চিমের শক্তিলালসা-লোলুপতার বিরুদ্ধে আক্রমণ ছিলো। 'ড্রাগনবধের পালা' বা 'ডার ড্রা ড্রা' ১৯৭১ সালে মিউনিকে অভিনীত হলো হাইনার কিপহার্টের পরিচালনায়। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হলো বীয়ারমানের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'জার্মানি : এক শীতার্ত রূপকথা'। ১৯৪৪ সালে হাইনেও লিখেছিলেন একই নামে তৎকালীন শীতার্ত জার্মানির আলেখ্য। বীয়ারমান তাঁর এই আলেখ্যের প্রেরণা পেয়েছিলেন প্রাকৃতভাষাশ্রয়ী ব্যালাড-স্রষ্টা ও অনিকেত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ভিয়ঁ এবং হাইনরিখ হাইনে থেকে। ১৯৭৬ সালে পশ্চিম জার্মানিতে 'বুবমাস' উদ্‌যাপিত হয় নভেম্বরে। এই উপলক্ষে পূর্ব জার্মানির সরকার কবিকে সফরের পাসপোর্ট দেন। কিন্তু ১৩ই নভেম্বরে কোলনে বীয়ারমানের অনুষ্ঠান পূব ও পশ্চিম দুই সরকারেরই ক্ষিপ্ত মসৃণতাকে আঘাত করলো। পূর্ব জার্মান সরকার ১৬ই নভেম্বরে কেড়ে নিলো বীয়ারমানের নাগরিক অধিকার। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হলেন কবি।

বীয়ারমানের কবিতা ব্রেশ্‌টের অসন্তোষের ফসল। ব্রেশ্‌ট তাঁর 'ওয়র্ক নোট্‌স'-এ লিখেছেন, 'আদর্শবাদ, আদর্শবাদ আর আদর্শবাদ- কোথাও এতোটুকু নান্দনিকতার নামগন্ধ নেই, গোটা ব্যাপারটা যেন স্বাদহীন খাদ্যের বর্ণনা'। আদর্শবাদের আড়ালে যে আদর্শহীনতার ঢল নেমেছে। হেলমেটহাইস্যেনবুটেল যেমন বলেন সমাজতান্ত্রিক দেশে অনেকেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য-এর জন্য বেছে নেন কমিউনিস্ট পার্টিকে। কর্তাভজা হতে পারলে অভাব থাকবে না কিছু। এই মনোভাব থেকে যখন রোথার, গেরলাখ্‌, গের্ড হাইসের মতো শক্তিশালী কবিও জো-হুজুরপনাতে গা ঢালেন, তখনই অঙ্গীকারবদ্ধ এই চারণ-কবি বলে ওঠেন : সচ্ছলতা চাইনে তা নয়, কিন্তু শেষ প্রহরে/ সচ্ছলতা আমাদেরই হাত যেন না করে/মানুষ শুধু রুটির জন্যে টিকে রয় না ওরে (এটাই হবার কথা, তথাস্তু, পৃ ২৬) পূর্ব জার্মানি যখন বীয়ারমানকে কমিউনিস্ট-বিরোধী বলে প্রচার করছেন, তখন বিক্ষত কবি পার্টির প্রতি বলছেন . ভাই, তুমি ঐ ছুরিটা সরাও/আমার বক্ষ থেকে/বেশ কিছুদিন ধরেই আমার/রক্ত পড়ছে বেঁকে (পার্টির প্রতি তিনটি মিনতি, পৃ ২০) এই তিন স্তবকের কবিতায় বীয়ারমান পার্টিকে সম্বোধন করছেন, বোন, ভাই ও মা বলে। আদর্শবাদের দোহাই পেড়ে আমলাতন্ত্রের মুখ-উজ্জ্বল না করতে পারার জন্য কবির ক্ষোভ নেই। কিন্তু ব্রেশ্‌ট

যখন 'উত্তরপুরুষদের প্রতি' জানান আমাদের সময়টা ছিল অন্যরকমের। জুতোর চেয়েও বেশিবার দেশ পাল্টাতে হয়েছে। ফাশিবাদের তাণ্ডব শেষ হবার পর দেশগঠনের পালা এসেছে। তখন অনেক কিছুই সহ্য করেছি দেশগঠনের জন্য। ফলে, সমাজতন্ত্র গঠনের যুগে যেসব সহ্য করেছি, তা যেন পরবর্তীকাল সহ্য না করে।

কিন্তু তোমরা যারা এই বন্যার ভিতর থেকে আসবে
যে-বন্যায় আমরা ডুবে যাচ্ছি

*　　　　　*　　　　　*

হায়রে আমরা
যারা ভিত গড়তে চেয়েছি মমতার,
নিজেরাই পারিনি দয়ামায়াকে ধরে রাখতে শেষে।

কিন্তু পরে একদিন যখন আসবে
যেদিন মানুষ মানুষকে দিতে পারবে তার হাত,
সেদিন আমাদের বিচার করতে বসে
খুব বেশি নির্মম হয়ো না। (উত্তরপুরুষের প্রতি)

ব্রেশ্‌টের আদেশ মেনে নিয়ে চাপা-অভিমানে বীয়ারমান বলেন,

যদি যেতে চাও তোমায় বাধা দেবে কে/আমাদের এই অর্ধ-স্বদেশ থেকে/দেখেছি আমি তো উধাও হওয়া অনেকই/আমি এইখানে পড়ে থাকি প্রাণপণে/যতোক্ষণ না নিথর নখরাঘাতে/ঘৃণাহত পাখি ঠুকরে আমায় ছিঁড়ে নেয় আমি দেখি (প্রুশিয়ার ইকারুস, পৃ ৩৬) বা গভীর বেদনার সঙ্গে যখন বলেন : এদেশে আমরা বেঁচে রয়েছি/পরবাসী যেন আপন গেহে (হোল্ডারলীন গীতি, পৃ ৪)

বীয়ারমান ব্রেশ্‌টের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবান্বিত। ব্রেশ্‌ট যেখানে আপোস করেছেন কালের নির্দেশে, সেই একই নির্দেশে বীয়ারমান সেখানে করেছেন জেহাদ।

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, বীয়ারমানের কবিতার একটা বড়ো অংশই প্রোপাগান্ডা। এটা অবশ্যই পশ্চিম জার্মানির প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে নিষিক্ত সমালোচকদের মত। বীয়ারমান কবিতায় রাজনীতিকে আনেন বড় সরাসরি বোধ হয় এ-কারণেই এই মতের জন্ম। আর তারজন্য কবি নিজেও কিছুটা দায়ী। তিনি বলেন, চিরন্তনের কবি হবার সাধ নেই তাঁর। তিনি মুহূর্তের কবি হতে চান। অস্থির সমকালের বিবেকের স্বরলিপি তৈরি করেই তৃপ্ত হতে চান। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে বীয়ারমানের কবিতা স্বাদহীন খাদ্যের বর্ণনায় প্রতিক্রিয়ায় জন্মেছে। ফলে, কবিতায় গানের অংশ সুপ্রচুর এবং রাজনীতিও হয়ে ওঠে তাঁর কাছে প্রেমিকের কাছে প্রেমের মতোই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভবের তুল্য।

বীয়ারমানের বৈশিষ্ট্য, তাঁর কবিতার চূড়ান্ত সার্থকতা পাঠক-শ্রোতার কানে। গান হয়ে উঠে, তাঁর কবিতা মুহূর্ত পার করে পাড়ি দেয় চিরন্তনের দিকে। অর্থাৎ তিনি জানেন সংগীতের সেই তত্ত্ব ও প্রয়োগকলা, যার সাহায্যে কথার মধ্যেকার নিলীন সংগীতকে, কথা বলার ভঙ্গিতেই শরীরী রূপ দেওয়া সম্ভবপর হয়। কবিতার এই রিচুয়াল ধর্মে কবির আস্থা ও ক্ষমতার জন্যই বোধ হয় বীয়ারমানকে আজকের জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে চিহ্নিত করেন হাইনরীক ব্যোল।

কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে অনেক মত আছে। অলোকরঞ্জন মোটামুটি মানেন মূলের আনুগত্য আর অনুবাদের ভাষার ও ছন্দের স্বকীয়তার দাবি। ৩১টি কবিতা, একটি গীতি-নাট্যের অংশ এবং একটি আখ্যানকবিতার ৪টি সর্গ ও দুটি সর্গের অংশবিশেষ অনুবাদ করে অলোকরঞ্জন

এদেশে অচেনা এক প্রাণময় কবিকে হাজির করেছেন। সঙ্গে রয়েছে গুস্তের গ্লাসের আঁকা দুটি ছবি। বীয়ারমানের কবিতার প্রতি কবিতা-প্রেমিক পাঠকের উৎসাহ কতোখানি জাগবে জানি না। কিন্তু সাহিত্যপাঠক রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে এই নিষিদ্ধ কবিতাবলী আকর্ষণীয় হবে।

প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন করতেই হয়, বীয়ারমান, যিনি শ্রোতা-পাঠকের কবি, তাঁর কবিতা পাঠকের কাছে, শুধুই পাঠকের কাছে কতখানি আনন্দের খোরাক দেবে? সুলিখিত ছোট ভূমিকায়, বীয়ারমানের ছন্দ ও রাজনৈতিক বক্তব্য সম্পর্কে কিছু বলা দরকার ছিল। 'স্তালিনসরণীর নাম স্তালিনসরণী' হিসেবে টিকিয়ে রাখার পক্ষে আটটি যুক্তি কবিতা থেকে যদি কেউ অনুমান করেন যে, বীয়ারমান স্তালিনপন্থী, তখনই তিনি বিভ্রান্ত হবেন, স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির বীয়ারমান-প্রীতির সংবাদ শুনে।

গ্যেটে, হাইনে, হোল্ডার্লীন, রিলকে, ব্রেশ্‌টের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তাঁদের প্রতিষ্ঠার পর। কিন্তু বিতর্কিত এক কবিকে এইভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে দুঃসাহস আছে, তা এখান-কার প্রকাশকরাও নিতে ভয় পান না দেখে ভালো লাগল। আশা করা যায় বীয়ারমান এদেশেও ঝড় তুলবেন।

ধ্রুব দাশগুপ্ত

ঘাটালের কথা— পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও প্রণব রায়। ডঃ স্বদেশভূষণ চৌধুরী প্রকাশিত। ঘাটাল। মূল্য কুড়ি টাকা।

'ঘাটালের কথা' মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বিষয়ে লেখা। পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ও তাঁহার পুত্র প্রণব রায় যৌথভাবে লিখিয়াছেন। নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটির চারটি অধ্যায়—দ্বিতীয় (ইতিহাস), তৃতীয় (জনসাধারণ ও জনসমাজ), সপ্তম (সাহিত্য), অষ্টম (পুরাকীর্তি ও ধর্মস্থান), প্রণব রায়-রচিত। পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয় নিজের উদ্যোগে ও আন্তরিক উৎসাহে দীর্ঘকাল ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান বিশেষ করিয়া ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া স্থানীয় ইতিহাস রচনার বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল মন্দির ও পুরাকীর্তি সম্বন্ধে। বস্তুত, বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে যে অসংখ্য মন্দির ছড়াইয়া আছে তাহার প্রাথমিক পরিচয় নিরলস উৎসাহে পঞ্চানন রায় মহাশয়ই সংগ্রহ করিতে থাকেন। পরবর্তী-কালে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন অনেকেই। মন্দির সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য নিয়া পঞ্চানন রায় 'বাংলার মন্দির' নামে একটি গ্রন্থ এবং 'প্রবাসী'সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'দাসপুরের ইতিহাস' গ্রন্থেও দাসপুর থানার অসংখ্য মন্দিরের বিবরণ সন্নিবেশিত। আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই কাব্যতীর্থ মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সর্বশেষ রচনা 'ঘাটালের কথা' নিয়া আলোচনার আগে কাব্যতীর্থ মহাশয়কে নমস্কার জানাইতেছি।

বিগত পনেরো-কুড়ি বৎসর ধরিয়া আমাদের ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে দ্রুত রূপান্তর ঘটিতেছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর হইতে ঝোঁকটা সরিয়া আসিতেছে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপর। জনজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়া চিন্তা-ভাবনা, আলোচনা-গবেষণা করিবার আগ্রহও সৃষ্টি হইয়াছে প্রচুর। সব ক্ষেত্রে সজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টাসম্ভূত না হইলেও

যেসব সমস্যা ও প্রশ্ন নিয়া আলোচনা-গবেষণার চেষ্টা চলিতেছে, সবই সমাজবিকাশের গতি-প্রকৃতি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। বৃহত্তর সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিবার এই যে প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, নেতৃত্বের দোষে বিভ্রান্ত না হইলে বা কোন 'বাদে'র প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া গতিহীন না হইয়া উঠিলে, এই প্রচেষ্টা আমাদের দেশের ইতিহাস-চর্চায় নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিবে, সন্দেহ নাই।

নতুন ধারায় ইতিহাস-চর্চার পথে বাধাও কম নয়। সবচেয়ে বড় বাধা তথ্যের অভাব। এতদিন বেশির ভাগ কাজ হইয়াছে রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়া। তবুও কিন্তু এ বিষয়েও আমাদের জ্ঞান সীমিত। একটা উদাহরণ ধরা যাক। সপ্তদশ শতকের শেষে বর্তমান ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিং দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহী জমিদার ওড়িশার পাঠান-নায়ক রহিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হইয়া বর্ধমানের জমিদারকে পর্যুদস্ত করিয়া ফৌজদারী শাসনকেন্দ্র হুগলীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাপ্তি বা সময়ের প্রশ্নে খুব বড় না হইলেও শোভা সিং-এর বিদ্রোহের তীব্রতা কম ছিল না। মুঘল শাসন বিশেষ করিয়া ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বহু ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়াছিল অথচ মিটাইবার পথ রাখে নাই। বিদ্রোহের মূল কারণ ইহাই। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই কারণে বিদ্রোহ সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বভাবতই শোভা সিংহের বিদ্রোহ নিয়া কতকগুলি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। কয়েকটি প্রশ্নের তাৎপর্য সর্বভারতীয়, কয়েকটি আবার স্থানীয় অবস্থার মধ্যে বিধৃত। দুই ধারায় প্রশ্নের উত্তর মিলিলে তবেই শোভা সিংহের বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যাইবে। মুঘল ব্যবস্থা সর্বভারতীয় ব্যাপার। চেতুয়া-বরদায় সে ব্যবস্থা কী বিশেষ সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল? স্থানীয় প্রশ্নটা সেখানে প্রধান। চেতুয়া-বরদা ও সন্নিহিত স্থানসমূহে মুঘল শাসন ও ভূমি-রাজস্বব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা কিছু তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় সে সবটুকু একত্র করিলে সমস্যার স্থানীয় দিকটি বুঝা যাইত। এইরকমভাবে তথ্যসংগ্রহের সুযোগ ঘাটালের কথা'র ইতিহাস-অংশের লেখকের ছিল। কিন্তু তিনি সে কথা না ভাবিয়া প্রচলিত অজ্ঞতা বা সংস্কারমত বলিয়াছেন শোভা সিংহের বিদ্রোহের কারণ আওরঙ্গজীব কর্তৃক জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন।

আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণভাবে অনেক ভ্রান্তি এবং সংস্কার যে এখনও প্রচলিত আছে স্থানীয় পর্যায়ের বিস্তৃত ইতিহাস না থাকা তাহার অন্যতম কারণ। এককালে কতকগুলি ধারণা নিয়া সাধারণীকরণ হইয়াছিল। ধারণা ঠিক কি ভুল যাচাই করিবার মত পর্যাপ্ত তথ্য নাই, কারণ কোথায় কী ঘটিয়াছিল সে কথা অজ্ঞাত। ফলে আগের ধারণাগুলিই চলিয়া আসিতেছে। ঘাটালের ইতিহাস-লেখকও শোভা সিংহের বিদ্রোহ সম্পর্কে বহু পুরানো একটা কথা আবৃত্তি করিয়া যান।

শুধু রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সম্বন্ধেও এসব কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এখনকার দিনে অনেক প্রশ্নই উঠিতে পারে এবং প্রশ্নের যা ধরন স্থানীয় ইতিহাসে বিস্তৃত জ্ঞান থাকিলে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। একটা উদাহরণ দিতে পারি। সাংস্কৃতিক জীবনে ঘাটাল মহকুমার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত। বাংলার বৃহত্তম অংশ নবদ্বীপ-কেন্দ্রিক রঘুনন্দন স্মৃতি-শাসিত। কিন্তু কয়েকটি এলাকায় স্থানীয় স্মৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। নবদ্বীপ সমাজের বাহিরে স্মৃতিশাসনের স্থানীয় সমাজগুলির মধ্যে খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ অন্যতম প্রধান। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার একটা বড় অংশ এবং সন্নিহিত ঘাটাল মহকুমার আর-একটা অংশ নিয়া খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ। নিয়মকানুনের প্রশ্নে রঘুনন্দনকথিত অনুশাসনের সঙ্গে খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের প্রবর্তক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিব্যাখ্যা

অনেকাংশেই পৃথক। পার্থক্য সৃষ্টির একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে, মনে হয়। ঘাটাল ও আরামবাগ মহকুমার শিল্পসমৃদ্ধি ও বহির্বাণিজ্যের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সুতী বস্ত্র, রেশম বস্ত্র, রেশম, চিনি, পিতল-কাঁসার বাসন প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল ব্যাপকভাবে। আবার কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসাও ছিল বিস্তৃত। উত্তর ভারত হইতে পুরী যাইবার প্রশস্ত একটা পথ এই দুইটি মহকুমার মধ্য দিয়াই গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে সাধু-সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রীদের এই পথে যাওয়া-আসা লাগিয়াই ছিল। আবার রাজনৈতিক প্রশ্নে আরামবাগ ও ঘাটাল দীর্ঘদিন ধরিয়া বাংলা ও ওড়িশার মধ্যে প্রত্যন্তভূমি হিসাবে পরিগণিত হইত। সুলতানী ও মুঘল আমলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এখানে লাগিয়াই ছিল।

একদিকে শিল্প-বাণিজ্যসমৃদ্ধ অর্থনৈতিক জীবন, অন্যদিকে বহির্জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের ফলে আরামবাগ ও ঘাটালের জনজীবন বাংলার অন্যান্য অংশের একান্ত কৃষি-নির্ভর, অন্তর্মুখী জীবনযাত্রা হইতে পৃথকভাবে গড়িয়া উঠিবে ইহাই স্বাভাবিক। এই পার্থক্যটাই স্বতন্ত্র খানাকুল-কৃষ্ণনগর স্মৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বস্তুত, আরামবাগ ও ঘাটালের জীবন ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য সুগভীর। ঊনবিংশ শতকে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের সর্বপ্রধান হোতা, রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণ পরমহংস—তিনজনেরই জন্মস্থান আরামবাগ-ঘাটাল মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। এই ঘটনার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত উপেক্ষা করিবার নয়।

স্থানীয় ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিলে ভাল হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু করিতেই হইবে এমনও নয়। ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যাপক সমাবেশেই স্থানীয় ইতিহাসের সার্থকতা। এই গ্রন্থের জন্য আশীর্বাণী লিখিতে গিয়া ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ঠিকই বলিয়াছেন, "বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস রচিত না হইলে পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব নহে।"

যে কাঠামো নিয়া 'ঘাটালের কথা' লেখা তাহাতে ব্যাপক তথ্য-ভিত্তিক স্থানীয় ইতিহাস রচনার প্রতিশ্রুতি আছে। প্রয়োজনীয় প্রায় সব বিষয়ই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে তথ্য ও আলোচনা সন্নিবেশিত : দেশপরিচয়, পথ-ঘাট, উৎপন্ন দ্রব্যাদি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিশিষ্ট গ্রাম ও শহর, রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত, জাতি ও বৃত্তি, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবার, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার, উৎসব ও অনুষ্ঠান, মেলা, বিদ্যাচর্চা, মঠ-মন্দির প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাকীর্তি। ইহা ছাড়া পরিশিষ্টে ভূমিদান সনন্দ, পাট্টা, ফসল সংক্রান্ত ছাড়পত্র, সালিশ প্রার্থনা-পত্র, শাস্ত্রীয় বিচারের রায় প্রভৃতি অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলপত্র দেওয়া হইয়াছে। দলিল-পত্রগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের বহুবিচিত্র তথ্যের সূত্র।

কাঠামোটি চমৎকার, সন্দেহ নাই। কিন্তু কাঠামোর মধ্যে যে তথ্য দেওয়া হইয়াছে এবং যেভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কিন্তু সংশয়ের অবকাশ প্রচুর। তথ্যসম্ভার বহুক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ, সুশৃঙ্খলভাবে সাজানও হয় নাই। উপরন্তু ভুল-ভ্রান্তিও অনেক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত ইংরেজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাধানগর ও ক্ষীরপাই রেসিডেন্সির দলিলপত্র এবং ওলন্দাজ ও ফরাসীদের সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যাহা প্রকাশিত হইয়াছে সেসব একত্র করিলে ঘাটাল মহকুমার সুতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র ও রেশম শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। সূত্রগুলি কিন্তু ব্যবহার করা হয় নাই। শিল্প সম্বন্ধে নানা কথা বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়াইয়া আছে, কিন্তু কোথাও কোন শিল্প সম্পর্কে সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাইতেছে না। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঘাটাল মহকুমার সমৃদ্ধি রেশম-ভিত্তিক। তুঁতচাষ, রেশম ও রেশমবস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসায়ে জনসাধারণের

বিভিন্ন অংশে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ঘাটাল মহকুমায় কাহারা তুঁতচাষ করিত, কাহারা নকোদ ও বসনিয়া ছিল, কাহারাই বা দালালি, পাইকারি ও মহাজনি করিত সেসব কথা, তাহাদের পেশা, অর্থনীতি ও সামাজিক পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই 'ঘাটালের কথা' পড়িলে জানা যায় না। অথচ একটা মহকুমার মধ্য হইতে এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন কাজ কিছু নয়। প্রবীণ বয়সে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের পক্ষে হয়তো নতুন করিয়া মহাফেজখানা হইতে বা নানাস্থানে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করা কঠিনই ছিল, কিন্তু নবীন গ্রন্থকার এই ঘাটতি পূরণ করিয়া দিতে পারিতেন।

ইতিহাস রচনায় ব্যবহারযোগ্য তথ্য ও জনশ্রুতির মধ্যে পার্থক্য সব সময়েই স্পষ্ট থাকা দরকার। স্থানীয় ইতিহাস রচনায় জনশ্রুতির একটা স্থান আছে সত্য, কিন্তু নির্বিচারে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করা যে বিপজ্জনক একথা তো বিশেষভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। 'ঘাটালের কথা' গ্রন্থের রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোচনায় দেখিতেছি ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে জনশ্রুতি এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে অব্যবসায়ীর পক্ষে পৃথগ্‌ভাবে চিনিয়া নেওয়া কঠিন। অন্যদিকে আবার প্রয়োজনীয় তথ্যের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। মেদিনীপুর জেলা বাংলায় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের পীঠস্থান। এখানে গণপ্রতিরোধ সংগঠনের প্রধানতম নেতা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। কিন্তু ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গে দেশপ্রাণের ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। অথচ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মাতুলালয় ঘাটাল মহকুমায় অবস্থিত—এই সূত্রে তাঁহার সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন মন্দির ও পুরাকীর্তির দীর্ঘ পরিচিতি বইটির একটি অধ্যায় জুড়িয়া আছে। ঘাটাল মহকুমার মন্দির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠালিপি-সংবলিত এবং মন্দিরটি কোন সালে প্রতিষ্ঠিত সেকথা লিপিতে উল্লিখিত। কোন পুরাবস্তুর সঙ্গে উৎকীর্ণ লিপিতে সময়ের উল্লেখ থাকিলে আলোচনার সময় লিপি-কথিত সময়ের উল্লেখ করাই রীতি। 'ঘাটালের কথা'য় কিন্তু লিপি-কথিত সময়ের পরিবর্তে মন্দিরটি কত বৎসর আগে নির্মিত সেই কথা বলা হইয়াছে। প্রচলিত রীতি ভঙ্গের সার্থকতা কী সেকথা কিন্তু কোথাও বলা হয় নাই। লেখকের হিসাবে ভুল থাকিলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা বুঝিবার উপায়ও নাই। অথচ হিসাবে ভুল আছে। উত্তর গোবিন্দপুরে দামোদরজীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরের লিপিতে প্রতিষ্ঠাকাল দেওয়া আছে ১২৫২ সাল। 'ঘাটালের কথা' প্রকাশের বৎসর অনুসারে হিসাব করিলে মন্দিরটি ১০২ বৎসরের পুরাতন। বইতে কিন্তু বলা হইয়াছে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা ১২২ বৎসর আগে। স্বল্পীপুর গ্রামের রঘুনাথজীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নাই। কিন্তু লেখক বলিতেছেন ১৫২ বৎসর পূর্বে স্থাপিত। মন্দিরের সামনে একটি নবরত্ন রাসমঞ্চ আছে। প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে মঞ্চটি স্থাপিত হয় ১২০৩ সালে। অর্থাৎ গ্রন্থপ্রকাশের ১৫০ বৎসর পূর্বে মঞ্চটি নির্মিত হইয়াছিল। হইতে পারে রাসমঞ্চের লিপিটিকেই ভুলে মন্দিরে আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও হিসাবটা স্পষ্টতই ভুল। আর যদি অন্য সূত্র হইতে নির্মাণকাল নির্ধারিত হইয়া থাকে তবে তো তাহার কথা বলা উচিত ছিল।

প্রতিষ্ঠাকালের প্রশ্ন ছাড়াও মন্দিরের আলোচনায় আরও কিছু বিভ্রান্তিকর এবং ভুল তথ্য চোখে পড়ে। রত্নমন্দিরের রত্নগুলি হয় শিখররীতিতে অথবা চালারীতিতে নির্মিত। ইহার ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু লেখক বলিতেছেন, রত্নশিখর বা পিড়ারীতিতে গঠিত (পৃ ২১৭)। চালা রত্নের উল্লেখ নাই। আবার পিড়া রত্নের কোন দৃষ্টান্তও তিনি দেন নাই। চন্দ্রকোণা বড় অস্থলে সম্প্রতি গোলাকৃতি শিখর বসাইয়া একটি মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। ছবিতে মন্দিরটির পরিচয় লেখা হইয়াছে 'রেখ দেউল রীতির পঞ্চরত্ন।' (২২৫ পৃষ্ঠার সামনে)। মন্দিরটির সঙ্গে রেখস্থাপত্য বা রত্নরীতির কোন সাদৃশ্যই নাই। সমতলছাদবিশিষ্ট দালানমন্দিরকে লেখক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

চাঁদনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে দালানমন্দির বাংলা রীতির স্থাপত্য (পৃ. ২১৬)। সমতল ছাদের বাড়ি পৃথিবীর সর্বত্রই পরিদৃশ্যমান। ইহার মধ্যে বাংলার নিজস্বতা কোথায়? আবার চালা মন্দিরের আলোচনায় লেখক বলিতেছেন, আটচালার তুলনায় দোচালা, জোড়বাংলা ও চারচালা মন্দিরের সংখ্যা নগণ্য (পৃঃ ২১৬)। দোচালা ও জোড়বাংলা সম্বন্ধে কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু চারচালা মন্দির বাংলায় অসংখ্য। বস্তুত, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় চারচালা মন্দিরের সংখ্যাই সর্বাধিক। নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও রংপুর জেলায় চারচালা মন্দির প্রচুর। ওড়িশার মতো রেখ-মন্দির ঘাটাল মহকুমায় "একটিও নাই বলিলেই চলে" (পৃ. ২১৭)। এই মন্তব্যের ঠিক পরেই লেখক রেখরীতিতে নির্মিত ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রকোণার রঘুনাথ মন্দিরের উল্লেখ করিতেছেন। রঘুনাথ মন্দির যে রেখমন্দির একথা লেখকের অজানা নয়।

মন্দির প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন, তিনি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন "নানা অঞ্চল পরিক্রমা ও সরেজমিনে অনুসন্ধান করিয়া (পৃ. ২৩০)। তবুও যে এই ধরনের মারাত্মক ভুল-ত্রুটি লেখার মধ্যে থাকিয়া গিয়াছে ইহাতে আশ্চর্য না হইয়া পারা যায় না। আশ্চর্য আরও হইতেছি এই কারণে যে, অন্যতম গ্রন্থকার পঞ্চানন রায় মন্দির সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেকগুলি রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার 'বাংলার মন্দির' ও 'দাসপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে এবং 'প্রবাসী' প্রভৃতি নানা পত্রিকায় মন্দির বিষয়ক প্রবন্ধে ঘাটাল মহকুমার বহু মন্দিরের কথা বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন। পঞ্চানন রায় মহাশয়ের রচনায় বিতর্কিত মন্তব্য আছে বটে, কিন্তু তথ্যের ভুল কোথাও চোখে পড়ে না। যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা-লিপি আছে তাহার প্রসঙ্গে তিনি লিপি-কথিত সময়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, কত বৎসর আগে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত সে হিসাব দিবার প্রবণতাও তাঁহার ছিল না। পঞ্চানন রায় মহাশয়ের আগেকার রচনায় যেসব মন্দিরের আলোচনা ও পরিচিতি পাওয়া যায় 'ঘাটালের কথা' গ্রন্থের স্বাভাবিক কারণেই 'পুরাকীর্তি' ও ধর্মস্থান মঠ-মন্দির মসজিদ' অধ্যায়ে সেইসব মন্দিরগুলিই স্থান পাইয়াছে। কিন্তু এই অধ্যায়ের লেখক দ্বিতীয় গ্রন্থকার।

ভুল তথ্য শুধু মন্দির সম্পর্কিত আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজপ্রসঙ্গে জাতি ও বৃত্তির পরিচয়ে দেখিতেছি ধোবা ও স্বর্ণবণিক নবশাখ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আর ময়রা তাহার বাহিরে। বাংলার সর্বত্রই কিন্তু অবস্থাটা ঠিক বিপরীত। পরগনা বিভাগের কথায় লেখক সংবাদ দিতেছেন যে "মুসলমান আমলে ক্ষুদ্রতম সরকারী বিভাগ ছিল পরগনা" (পৃ. ৫৩)। প্রকৃতপক্ষে সুলতানী ও মুঘল আমলে সরকারী নিয়ম অনুসারে ক্ষুদ্রতম এলাকা গঠিত হইত এক বা একাধিক গ্রাম নিয়া। ক্ষুদ্রতম এলাকার নাম মৌজা। অনেকগুলি মৌজা একটি পরগনার অন্তর্ভুক্ত থাকিত।

ভুল-ত্রুটি বা অসংগতভাবে ব্যবহৃত তথ্যের তালিকা বাড়াইয়া লাভ নাই। কয়েকটির যে উল্লেখ করিয়াছি সে সতর্কতার জন্য। তথ্যের জন্য স্থানীয় ইতিহাসের উপরে অনেকেই নির্ভর করিয়া থাকেন। সীমিত অঞ্চলের বিবরণ সুতরাং লেখক পরিশ্রম করিয়া যথাযথভাবেই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, এমন একটা বিশ্বাস অনেকেরই থাকে। থাকা অন্যায়ও নয়। ফলে স্থানীয় ইতিহাসের তথ্য অনেকে অসংকোচে ব্যবহার করেন। স্থানীয় পর্যায়ের সব কথা তো আর সকলের জানা থাকে না তাই তথ্যের যথার্থতা বিচারের অবকাশও তাঁহারা পান না। বিশেষ করিয়া এই গ্রন্থের কাঠামোতে যে প্রতিশ্রুতি আছে তাহার প্রভাবে তথ্যসম্ভার সম্পর্কে অনেকে নিঃসংশয় হইবেন, ইহাও বিচিত্র নয়। অন্যদিকে আবার সাধারণ পাঠকের উপর স্থানীয় ইতিহাসের প্রভাব যথেষ্ট। ইতিহাস সম্পর্কে অনেকের ধারণা সৃষ্টি হয় স্থানীয় ইতিহাস পড়িয়া। ঘাটাল মহকুমার অধিবাসীরা অনেকেই 'ঘাটালের কথা'কে তাঁহাদের মহকুমার ইতিহাস বলিয়া আগ্রহের সঙ্গে পড়িবেন, এবং অনেকে হয়তো ইহাকে তাঁহাদের মহকুমার ইতিহাস বলিয়া স্বীকারও করিয়া নিবেন। নানা বিষয়ে বহু তথ্য গ্রন্থটির

মধ্যে একত্রে পাওয়া যাইবে। উপরন্তু, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বয়ং বলিতেছেন, বর্তমান গ্রন্থকার-দ্বয় "এই মহকুমার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিল্প প্রভৃতির (যে) বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক উপকরণের অমূল্য সংগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য।" আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ঘাটাল মহকুমা অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থে।" সাধারণভাবে আগ্রহী পাঠকের স্বভাবতই মনে হইবে 'ঘাটালের কথা'-র মধ্যেই রহিয়াছে ঘাটাল মহকুমার প্রকৃত পরিচয়। সুতরাং গবেষক ও সাধারণ পাঠক--উভয়ের পক্ষেই সতর্কতার প্রয়োজন আছে। ভুল-ত্রুটি এবং অসংগতির কথাগুলি বলিলাম এই কারণেই।

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

চতুরঙ্গ

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী : বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু করিয়া প্রতি তিন মাসে অর্থাৎ আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে "চতুরঙ্গ" বাহির হয়। সডাক বার্ষিক মূল্য ৮·৫০ পয়সা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা। বৈদেশিক দুই পাউন্ড পঞ্চাশ স্টারলিং এবং চার ডলার, উভয় ক্ষেত্রেই রেজেস্ট্রী খরচসহ।

"চতুরঙ্গে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য বাধ্যতা থাকিবে না। ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটওয়ালা লেফাফা না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

প্রতি সংখ্যার বিজ্ঞাপনের মূল্য :

সাধারণ পৃষ্ঠা ৩২৫·০০ টাকা। অর্ধপৃষ্ঠা ২০০·০০ টাকা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কভার পৃষ্ঠা ৪২৫·০০ টাকা ও চতুর্থ কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা ৫০০·০০ টাকা।

পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ২৫ দিন পূর্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধাদি বিনিময় পত্রিকাদি চিঠিপত্র টাকাকড়ি চেক ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি
পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা :

৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা, ৭০০ ০১৩

ফোন : ২৪-৬১২৭

বুদ্ধদেব বসুর
আমার যৌবন

কবিতা উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক অনুবাদ মিলিয়ে বুদ্ধদেব বসুর বইয়ের সংখ্যা আজ প্রায় দেড়শো। কিন্তু তিনি সোজাসুজি আত্মজীবনী লিখলেন 'আমার ছেলেবেলা'। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় বই 'আমার যৌবন'। দাম : চার টাকা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
নির্বাচিতা

বর্তমান শতাব্দী নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। বিশেষ করে স্মরণীয় কিছু বাংলা ছোটো গল্প এ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-সাহিত্যের উৎকর্ষসীমায় পৌঁছেছে। গত অর্ধ-শতাব্দী ধরে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্পের এই নির্বাচিত সংকলনের প্রত্যেকটি গল্প তাই। দাম : কুড়ি টাকা

. . . .

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সনস প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-৭৩

ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

৪নং ফর্ম

[রুল ৮]

১। প্রকাশ-স্থান : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
২। প্রকাশের সময় : প্রতি তিন মাসে
৩। মুদ্রাকর : নীরা রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
৪। প্রকাশক : নীরা রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
৫। সম্পাদক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৯/১/১এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলিকাতা ৩
৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা : শ্রীমতী এম রহমান, ৮এ শামসুল হুদা রোড, কলিকাতা ১৭; শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্তী, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩।

আমি, নীরা রহমান, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

নীরা রহমান
প্রকাশক

তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮

চতুরঙ্গ

চতুরঙ্গ চতুরঙ্গ চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির
প্রতিষ্ঠিত
ত্রৈমাসিক
পত্রিকা
মাঘ-চৈত্র
১৩৭৪

The Shankar Agro Industries Limited

Regd. Office : 9, Brabourne Road, (6th flr) Calcutta, 700 001

Telephone : 36-7385 (4 lines)

Telex : CALCUTTA 7611
Gram : CHINIMIL

Manufacturers of :

Best Quality WHITE CRYSTAL SUGAR
We also Manufacture white Crystal Sugar for Export

Mills at :

Po. Captainganj Dist. Deoria (U.P.)

Phone : 26

Gram : SUGAR Captainganj (Deoria)

॥ পাঠান্তর-সংবলিত গ্রন্থমালা ॥

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর অধিকাংশ রচনায় বারবার পাঠসংস্কার করেছেন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে বিশ্বভারতী নূতন সংস্করণ গ্রন্থে তার আনুপূর্বিক ইতিহাস রক্ষায় উদ্যোগী

সন্ধ্যাসংগীত

বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ, বর্জিত কবিতা, সাময়িকপত্রে প্রকাশসূচী, কবির মন্তব্য এবং দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি চিত্রে সমৃদ্ধ। মূল্য ৭·০০ টাকা।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

কবির মন্তব্য, সংস্করণ অনুযায়ী পাঠান্তর, বিভিন্ন সময়ে বর্জিত কবিতা ও 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত গদ্য রচনা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' এবং পাণ্ডুলিপি-চিত্রে শোভিত। মূল্য ৬·০০ টাকা।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর, পাণ্ডুলিপিচিত্র এবং ভাষান্তরে Sanyasi, or the Ascetic নাটকের দৃশ্য, চিত্র ও পঙ্ক্তির উল্লেখসহ রূপান্তরের তালিকাও সন্নিবেশিত। মূল্য ৮·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৭

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

THREE ESSAYS ON SHAKESPEARE

By Taraknath Sen

Introduction by S. C. Sengupta
1. Presidency College and Shakespeare
2. Hamlet's Treatment of Ophelia in the Nunnery Scene
3. Shakespeare's Short Lines with a list of the Writings of Prof. Taraknath Sen.

[Rs. 12.00]

OSCAR WILDE COMPLETE PLAYS

1 The Importance of Being Earnest, 2. Lady Windermere's Fan, 3. A Woman of No Importance, 4. An Ideal Husband, 5. Salome, 6. The Duchess of Padna, 7. Vera, or the Nihilists, 8. A florentine Tragedy, 9. La Sainte Courtisane.

[Price Rs. 12.00]

STORIES

1. The Picture of Dorian Gray, 2. Lord Arthur Savile's Crime, 3. The Sphinx Without a Secret, 4. The Canterville Ghost, 5. The Model Millionaire, 6. The Young King, 7. The Birthday of the Infanta, 8. The Fisherman and his Soul, 9. The Star-child, 10. The Happy Prince, 11. The Nightingale and the Rose, 12. The Selfish Giant, 13. The Devoted Friend, 14. The Remarkable Rocket.

[Rs. 12.00]

Rupa & Co.

15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073.

Also at—**Allahabad * Bombay * New Delhi.**

UNEQUAL EXCHANGE, IMPERIALISM AND UNDERDEVELOPMENT

An Essay on the Political Economy of World Capitalism

BY RANJIT SAU

What is the fundamental basis of the post-war phase of imperialism when colonies in the strict sense have ceased to exist ? In a word, how does neo-colonialism work ? If the centre-periphery unequal exchange has been going on for the last four centuries, how is it perpetrated in the neo-colonial area ? This is the central question of Sau's essay. In his exhaustive analysis, he indicates the order of magnitude of unequal exchange, demonstrates its ramifications, and finally concludes that unequal exchange is in essence a corollary as well as a cause of under-development in the wake of imperialism.
He begins with an examination of the economic crisis that assails the metropolis, or centre of world capitalism. He provides a history of unequal exchange before going into the nature of the international flow of capital and technology. He then reviews the bourgeois theories on economic development of the Third World. He finds the roots of unequal exchange not so much in relatively superficial elements like wage differential or even the monopoly power of the advanced capitalist countries in the area of international trade as in the basic alignment of the ruling classes in the Third World.

214 pages Cloth boards Rs. 50

Oxford University Press
Faraday House,
P-17 Mission Row Extn.,
Calcutta 700 013

CEMENT

The total installed capacity of the cement industry in India is around 20 million tonnes. By the end of 1977-78 a further capacity of 1.5 million is envisaged. About 65% of the production is now based on the Wet Process. But there is a growing tendency to switch over to the more economical Dry Process wherever technically feasible. Some projects are now in the making in Meghalaya, Kashmir, UP, Bihar, Orissa, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.

DCPL plays a concrete role

From Kashmir to Tamil Nadu, DCPL is rendering complete consultancy and engineering services to set up cement plants for the nation. At 6000 ft above sea level a grassroot cement plant is being engineered in Kashmir, at a site where equipment can only be transported through a tortuous and hazardous mountain road restricting the unit size to 300 TPD. In Meghalaya a 2 x 340 TPD plant at Mawmluh-Cherra is shaping up under the guidance of DCPL engineers. For the Bihar and Meghalaya governments the feasibility for a 3 x 600 TPD plant and a 900 TPD/1200 TPD plant respectively is being studied. For the West Bengal Industrial Development Corporation, DCPL has completed a Feasibility Study for a cement plant with three alternative proposals to overcome the hurdle of poor grade limestone occurring in Purulia.

As consultant to the Ministry of Industries and Civil Supplies Govt of India, DCPL is conducting a study on balancing and conversion from Wet Process to Dry Process and modernisation of 10 cement plants in Orissa, Kashmir, Bihar, Tamil Nadu and Andhra Pradesh.

Outside the country DCPL's greatest achievement in the sphere of cement is in Syria where the organisation has engineered and commissioned two plants of 1000 TPD each and is setting up 8 more with a combined capacity of 21 000 TPD. Another country worth mentioning is Tanzania where three Dry Process projects one of 1600 TPD size and two others of 800 TPD size are being engineered. These projects are under implementation now. Some other countries, where significant work has matured are Bangladesh, Nepal and Bolivia.

Concept-to-commissioning expertise and project-tested performance equip DCPL to accept larger assignments with corresponding competence.

engineering development with total involvement.

DEVELOPMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
24-B, Park Street, Calcutta 700 016

বর্ষ ৩৯ মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪

সূচিপত্র

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রে অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ২৯/১ ডক্টর লেন, কলকাতা-১৪
থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

দাড়ি আপনাকে কামাতেই হবে

তা আপনি যতই ক্লান্ত বিরক্ত আর আলস্য বোধ করুননা কেন ! কাজটা সহজ সুন্দর এবং মোলায়েম হয়ে যায় যদি রাত্তিরে শোবার সময় বোরোলীন মেখে শুতে যান। দাড়ি কামাবার পর আবার মুখে মেখে নিন বোরোলীন— সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম।

বোরোলীন ত্বককে করে তোলে নরম ও শান্ত। তাছাড়া হঠাৎ কেটে গেলে বা ছড়ে গেলেও ভয় নেই। বোরোলীন নিরাময়ী। বোরোলীন জীবাণু নাশক। এমন কি ফুসকুড়ি, ব্রণ—ইত্যাদির উৎপাতও জব্দ তার কাছে। সুতরাং দাড়ি কামাবার অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলুন আগে পরে নিয়মিত ভাবে বোরোলীন ব্যবহারের অভ্যাস।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

বোরোলীন হাউস, ১ গিরীশ এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

বর্ষ ৩১ মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪

লালন ফকির ও রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়

লালন ফকিরের শিষ্যদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে লালনের গানের পুঁথিই সুকৌশলে 'গীতাঞ্জলি'তে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং কবিগুরুর নোবেল পুরস্কার তথা বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূলে বাংলার বাউল লালন সাঁই। আমি যখন কুষ্টিয়ার মহকুমাশাসক তখন আমাকে একথা বলেন কুমারখালীর ভোলানাথ মজুমদার। সে সময় কুষ্টিয়ার দ্বিতীয় মুনসেফ ছিলেন মতিলাল দাশ, পরবর্তীকালে ডক্টর মতিলাল দাশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'লালন গীতিকা'র প্রধান গ্রন্থকার। তিনি স্বতন্ত্রভাবে সেকথা শোনেন।

তিনি লিখেছেন, "ভোলাই সার নিকট হইতে গানের পুঁথি আদায় করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। ভোলাই সা বলিল, 'দেখুন, রবি ঠাকুর আমার গুরুর গান খুব ভালবাসিতেন, আমাদের খাতা তিনি লইয়া গিয়াছেন, সে খাতা আর পাই নাই, কলিকাতা ও বোলপুরে চিঠি দিয়াও কোনও উত্তর পাই নাই।' এ কথার সত্যতা কতদূর কে জানে? কিন্তু ভোলাই কবিগুরুকে লালনের চেলা বলিয়া মনে করে এবং বলে যে, কবিগুরু লালনের গানকে রূপান্তরিত করিয়াই জগৎ-জোড়া নাম কিনিয়াছেন। ...সে যাহা হউক, বহুখের অনেক স্তুতি করিয়া কোনও ক্রমে একটি গানের নকল-পুঁথি যোগাড় করিলাম।"

ভোলানাথবাবু আমাকে অনুরোধ করেন আসল পুঁথিখানি আমি যেন কবিগুরুর কাছ থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করি। আসল পুঁথিখানি যে কবির কাছে আছে একথা মেনে নিতে আমার অনিচ্ছা ছিল। এ নিয়ে গুরুদেবকে বিরক্ত করা আমি অসমীচীন মনে করি। কুষ্টিয়া মহকুমায় অবস্থিত শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো যান ১৯২২ সালে। ততদিনে জমিদারির বাটোয়ারায় পতিসর পড়েছে তাঁর ভাগে ও শিলাইদহ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের ভাগে। শিলাইদহে জমিদার হিসাবে তখন তাঁর আর কোনো মর্যাদা নেই। প্রজারা আর তাঁর প্রজা নয়। পরে তো সুরেন্দ্রনাথও দেনার দায়ে শিলাইদার সম্পত্তি হারালেন। মালিক হলেন ভাগ্যকুলের রায়রা। আমি যখন যাই তখন ঠাকুরবাবুদের পুরাতন কর্মচারীরাই আমাকে শিলাইদহের কাছারি ও খোরশেদপুর গ্রাম ঘুরিয়ে দেখান। তাঁদের চাকরি তখনো যায়নি, যদিও মালিক বদল হয়েছে।

পুরাতন কর্মচারীদের একজন ছিলেন শ্রীশচন্দ্রনাথ অধিকারী। পরবর্তী কালে ইনি গুরুদেব

ও শিলাইদহ প্রসঙ্গে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। দিনকয়েক আগে আমার পুরোনো চিঠিপত্রের মধ্যে কুষ্টিয়ার জনাব মহম্মদ গোলাম রহমানের লেখা একখানি চিঠি আবিষ্কার করি, তার সঙ্গে গাঁথা ছিল গোলাম রহমানকে লেখা শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর একখানি চিঠি। শচীন্দ্রবাবু সে চিঠি লিখেছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৪৪ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে। তাতে ছিল—

"শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু আমাকে তাঁহার আঁকা (১৯১৩) কয়েকখানা স্কেচ দিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে তিনি লালন ফকিরের একটা পেনসিল স্কেচ আঁকিয়াছিলেন, তাহা যে কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।"

এই স্কেচ ছাড়া আরো একখানা ছবির কথাও শচীন্দ্রবাবুর চিঠিতে ছিল। তিনি এ বিষয়ে রথীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন। রথীবাবু সে ছবির কথা স্মরণ করতে পারলেন না। তবে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনের জন্যে যখন পুরাতন ছবির বাক্স খোলা হবে তখন সন্ধান নিতে বলেছেন।

নন্দবাবুর আঁকা স্কেচ পরে প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লালন-গীতিকা'র মলাটে সেই স্কেচই মুদ্রিত। কিন্তু নন্দবাবু তো লালনকে চোখে দেখে আঁকেননি। যতদূর জানা যায়, যা দেখে এঁকেছিলেন সেটিও একটি স্কেচ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা। সম্ভবত শচীন্দ্রবাবু যে ছবির কথা উল্লেখ করেছেন এ সেই ছবি। বাক্সবন্দী হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। ইতিমধ্যে উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু কেউ বলতে পারে না কবে ও কোথায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালনকে দেখেন।

ছবি না হয় পাওয়া গেল, কিন্তু আসল খাতাখানির কী খবর? এর উত্তর পাওয়া যাবে ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জবানিতে—

"ছেলেবেলা হইতে দেশের নানা মুসলমান ফকিরের মুখে লালনের গান শুনিয়া আসিতেছি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লালনের বিষয় জানিবার জন্য খুবই আগ্রহ হয়। ১৯২৫ সালে ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত লালনশাহী ফকির হীরুশাহের সঙ্গে বাড়ী হইতে দশ মাইল পথ হাঁটিয়া লালনের সেঁউড়িয়া আখড়ায় উপস্থিত হই।...ঐ সময়ে আশ্রমে রক্ষিত একখানা পুরানো গানের খাতা দেখি। উহা নানা প্রকারের ভুলে এমন ভর্তি যে, প্রকৃত পাঠোদ্ধার করা বহু বিবেচনা ও সময়সাপেক্ষ। আশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা বলে যে, সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহের 'রবি বাবুমশায়' লইয়া গিয়াছেন। ...লালনের শিষ্যরা আবার সেই গানগুলি বর্তমান খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহারা আরো বলে যে, সাঁইজীর সেই গানের খাতা পাইয়াই রবীন্দ্রনাথ অত বড়ো কবি হইয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।...তারপর ১৯৩৬ সাল হইতে কুষ্টিয়ায় যখন স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করি তখন লালনের সমস্ত গান পূর্ণাঙ্গ ও শুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি। তখন সেই খাতাখানি আর একবার দেখিবার প্রয়োজন হইলে আখড়ার তদানীন্তন মালিক ভোলাই শা ফকির বলে যে, ঐ খাতা মুনসেফ মতিলালবাবু লইয়া গিয়াছেন, উনি তাহা দেখিতে লইয়া আর ফেরত দেন নাই।... মতিলালবাবু যে খাতা লইয়া যান নাই, সে খাতা লালনের আস্তানাতেই আছে, তাহার প্রমাণ শীঘ্রই পাওয়া গেল। যা হোক, সেই খাতা দেখিবার আবার সুযোগ মিলিল।"

উপেন্দ্রবাবু দেশবিভাগের পর কলকাতায় এসে কোনো এক সূত্রে খবর পান যে, রবীন্দ্রনাথের পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে লালন ফকিরের গানসম্বলিত একখানা খাতা পাওয়া গেছে। ঐ খাতা শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে আছে। তখন তাঁর মনে হলো এই বোধ হয় সেই বহুশ্রুত, বহুকথিত 'সাঁইজীর আসল খাতা'। সেই খাতা দেখবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৪৯ সালে শান্তিনিকেতনে যান। সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সৌজন্যে খাতাখানা হস্তগত হলে দেখা গেল, এটা সেই নানা প্রকারের ভুলের নমুনাভরা লালনের আখড়ার খাতাখানির একটি কপি। বেশ বোঝা গেল 'আসল খাতা' সেই একমাত্র খাতা যার নকল রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন,

যা মতিলাল দাশ দেখেছেন ও যা উপেন্দ্রবাবুও কয়েকবার দেখেছেন। শচীন্দ্রবাবু বললেন এই হাতের লেখা তিনি ভালোরূপে চেনেন। এটি শিলাইদহের ঠাকুর এস্টেটের এক পুরোতন কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যের। তখন উপেন্দ্রনাথবাবুর মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ লালনের আখড়া থেকে খাতাখানি সংগ্রহ করে তাঁর এক কর্মচারীকে দিয়ে নকল করিয়ে নেন। পরে ওর থেকে কতকগুলি গান নিয়ে শুদ্ধ করে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন। দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা লালনের আসল খাতা নিয়ে যাওয়ার যে গল্প চলে আসছিল তার মূলে যে বিশেষ কিছুই নেই তা পূর্বে অনুমান করলেও এবার নিঃসন্দেহ হলেন উপেন্দ্রবাবু।

রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লালনের গানগুলি প্রকাশিত হয় ১৩২২ সালে 'প্রবাসী'র 'হারামণি' বিভাগে। তার মানে ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে। নোবেল পুরস্কারের তথা বিশ্বজোড়া খ্যাতির পূর্বে নয়, পরে। বাউলদের সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ তাঁর বাইশ বছর বয়সের রচনা থেকে প্রমাণ করা যায়। সে বয়সে তিনি 'ভারতী'তে 'বাউল গান' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 'বাউলের গাথা' নামে একটি গ্রন্থের সমালোচনাও করেছিলেন। কিন্তু বাউল বলতে কি কেবলমাত্র লালন ফকিরকেই বোঝায়? মদন বাউল, গগন হরকরা, বিশা ভূঁইমালী, গঙ্গারাম—এঁরাও তো বাউল। রবীন্দ্রনাথের গানের উপরে বাউল গানের প্রভাব পড়ে থাকলে এঁদের গানের প্রভাবও পড়ে থাকবে। শুধু লালনের গানের নয়। লালনের যে গানটি তিনি 'গোরা'য় উদ্ধৃত করেছেন সেটির প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি তিনি কোথায় কোন বাউলের কণ্ঠে শুনেছিলেন তা কেউ জানে না। আখড়ায় রক্ষিত পুঁথিতে সে গানটি পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রভবনে আবিষ্কৃত পুঁথিতেও না। 'প্রবাসী'তেও সে গানটি প্রকাশিত হয়নি। পূর্ণাঙ্গ গানটি উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যই পরবর্তী কালে সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। কবিগুরু যদি 'গোরা' লেখার আগে পুরো গানটি না শুনে থাকেন তবে ভনিতা পর্যন্ত না এসে কেমন করে জানতেন যে ওটি লালন ফকিরের সৃষ্টি?

তাছাড়া লালন ফকিরের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ওই গানটি ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁর দ্বারা সংগৃহীত কুড়িটি গানেই সীমাবদ্ধ। তাঁর সারা জীবনের প্রকাশিত রচনাবলীতে লালন ফকিরের নাম একবারও উল্লিখিত হয়নি। তারপর এটাও মনে রাখতে হবে যে বাউলদের প্রতি তাঁর অনুরাগ সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত ওরা মানুষতত্ত্বের সাধক। বাউলদের সাধনা কেবল কি মানুষতত্ত্বের সাধনা? আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি আরো কয়েকটি তত্ত্বও বাউল গানের বিষয়। আর সেই যে "খাঁচার ভিতর অচিন পাখী" তার বাকিটা শুনলে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'য় বা অন্যত্র উদ্ধার করতেন কি? তার খানিকটা নিচে দিচ্ছি—

"আট কুঠুরি নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা
তার উপর আছে সদর কোঠা
আয়না মহল তায়।"

মানুষতত্ত্বের সঙ্গে এর তেমন কোনো সম্পর্ক নেই যেমন দেহতত্ত্বের সঙ্গে। বাউল সাধকরা অ-ধরকে ধরতে চাইতেন দেহের ভিতরে। লালনের অপর একটি গানে তার সঙ্কেত আছে—

"ধরো রে অধরচাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে
ক্ষীরোদ মৈথনের ধারা
ধরো রে রসিক নাগরা
যে রসেতে অধর ধরা
দেখ রে সচেতন হয়ে।"

দেহের সঙ্গে দেহের মিলন না হলে মাধুর্যভজন হয় না। আর মাধুর্যভজন না হলে মানুষে হয়ে জন্মানোর সার্থকতা কোথায়? এই হলো বাউলদের মৌল জিজ্ঞাসা। এর উত্তর রবীন্দ্রনাথের মানুষতত্ত্বে নেই। লালনের মানুষতত্ত্বে আছে।

অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছুই নাই
দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।...
এই মানুষে হবে মাধুর্যভজন
তাই তো মানুষরূপ গড়ল নিরঞ্জন।..."

সেই মাধুর্যভজন কি কামগন্ধহীন? যেমন রজকিনী ও চণ্ডীদাসের প্রেম? লালনের উত্তর, না। এতে কামেরও ভূমিকা আছে। তিনি বলেন,

"শুদ্ধ প্রেম সাধলে যদি, কাম-রতিকে রাখলে কোথা?
আগে উদয় কামের রতি
রস আগমন তারই সাথী
সেই রসে হয় স্থিতি
খেলছে মানুষ দেখ্‌গে তোরা।
মন জানে সেই রসের করণ
না করে সে রস আস্বাদন
জল সেঁচে তাই হয় রে মরণ
কথায় কেবল বাজি জেতা।"

এখানে রস বলা হয়েছে তাকেই যার অন্য নাম প্রেম। রস না হলে খেলা হয় না। আর খেলা বলা হয়েছে যাকে তার অন্য নাম লীলা। লালন বলেন,

"করি কেমনে শুদ্ধ প্রেমরসের সাধন
প্রেম সাধিতে কেঁপে ওঠে কামনদীর তুফান।...
বলব কী সেই প্রেমের কথা
কাম হইল প্রেমের লতা
কাম ছাড়া প্রেম যথা, তথা নাই রে আগমন।"

বাউলরা তাই জোড়ে জোড়ে থাকে। বাউল সাধনা একাকী পুরুষের বা একাকিনী নারীর সাধনা নয়।

এই সাধনা একান্ত দুরূহ। সিদ্ধি কজনেরই বা ভাগ্যে ঘটে? আর ঘটলেও তা মানবজীবনের পূর্ণ সার্থকতা নয়। লালন বলেন,

"সাধিলে সিদ্ধের ঘরে
শুনিলাম সেও পায় না তারে
মাধুর্যে মুক্তি পেলেও সে ব্যক্তি ঠকে যাবে
এমনি শুনি রে ভাই।"

লালনের জীবনের অভিষ্ট ছিল "এই মানুষে" "সেই মানুষের" দর্শনলাভ। কিন্তু তাঁর সে অন্বেষণ কোনোদিন সম্পূর্ণ হয়নি। তাঁর আত্মা অপরিতৃপ্ত। তাঁর অন্তরের ক্রন্দন এই গানটিতে যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমন আর কোথাও নয় :

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ির কাছে আরশী নগর
এক পড়শী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী
পারে।
মনে মনে বাঞ্ছা করি দেখব তারি
কেমনে সে গাঁয় যাই রে।
বলব কী সেই পড়শীর কথা
ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা
নাই রে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।"

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে যে এই গানটি কেউ প্রকাশ করেননি তা নয়। এটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী'তে ১৩০২ সালে। পাঠ বিভিন্ন সংগ্রহে বিভিন্ন প্রকার। লালনের প্রায় সব গানেরই তাই। কেউ তো কখনো লিখে রাখেননি তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন যেমনটি গেয়ে শুনিয়েছেন। লেখার পালা আসার আগেই পাঠ বদলে গেছে শিষ্যদের বা শ্রোতাদের মুখে মুখে। 'আসল খাতা' খুঁজতে যাওয়া বৃথা। 'আসল' কোনোটিই নয়। রবীন্দ্রনাথের নকল খাতায় ছিল ২৯৮টি গান। তাঁর উপরে লালনের প্রভাব যদি পড়ে থাকে তবে 'ফাল্গুনী'তে। 'গীতাঞ্জলি'তে নয়।

লালনের বেশীর ভাগ গান কি ইংরেজীতে যাকে বলে মীস্টিক, না যাকে বলে এসোটেরিক? রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান কখনো কখনো মীস্টিক, কিন্তু এসোটেরিক কদাপি নয়। আর বাউল-দের গান বহুস্থলেই এসোটেরিক। তার মর্ম ভেদ করতে পারে দীক্ষিত শিষ্যরাই। বাইরের শ্রোতার কাছে তার প্রকৃত অর্থ গোপন থাকে।

তাই যদি হয় তবে রবীন্দ্রনাথের উপর বাউল প্রভাব একান্ত সীমাবদ্ধ। লালনের প্রভাব তো আরো কম। যেটুকু তিনি নিয়েছেন সেটুকু ওই মানুষতত্ত্ব। আর সেক্ষেত্রেও মানুষ বলতে তিনি যা বুঝেছেন তা মীস্টিক পর্যায়ে পড়ে, এসোটেরিক পর্যায়ে নয়। বাউলরা বেদ কোরান মানে না, মন্দির মসজিদ মানে না, পূজো পার্বণ রোজা নামাজ মানে না, দেব দেবী অবতার পয়গম্বর মানে না, সাকার বিগ্রহ মানে না, এমন কি ঈশ্বর আল্লাহ্‌কে ডাকে না। তা বলে তারা নিরীশ্বরবাদী নয়। তাদের যিনি সাঁই তিনি আলেক মানুষ বা অলখ মানুষ। সকলের অন্তরেই রয়েছেন। অন্তরেই তাঁকে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় উপলব্ধিও তাই। এই পর্যন্ত বাউলদের সঙ্গে তাঁর মিল। বাউল এই অর্থে তিনিও একজন। অধ্যাপক ডিমক তো বলেন রবীন্দ্রনাথই বাউলদের শিরোমণি। কথাটা ভুলও নয়, ঠিকও নয়। ঠিক নয় এইজন্যে যে বাউলদের সাধনাকে স্বীকার না করলে শুধুমাত্র তত্ত্বগতভাবে বাউল হওয়া যায় না। থিয়োরিই যথেষ্ট নয়। চাই প্র্যাকটিস। বাউলদের প্র্যাকটিস কি রবীন্দ্রনাথ আপনার করে নিয়েছিলেন? না, সেখানে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ।

লালন ফকিরের গান রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্যে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়ে সুধীমহলে সংবর্ধনা লাভ করে। কিন্তু লালনের নাম তিনি এর আগে বা পরে একবারও উল্লেখ করেননি। বাউলদের কথা যখনই বলেছেন তখনই বলেছেন নামনির্বিশেষে। যেন বাউলদের সকলের একই বাণী, একই বিষয়। অথচ শুধু লালন ফকিরই শতখানেক বছর ধরে গান বেঁধেছেন হাজার হাজার।

আর বিচিত্র প্রকার। সুফীভাবের, বৈষ্ণবভাবের, সহজিয়াভাবের, বিশুদ্ধ ইসলামীভাবের গানও কি তিনি কম গেয়েছেন? বিশ্লেষণ করলে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ ধারাও নজরে পড়ে। একদা বৌদ্ধদের দেশ ছিল বাংলাদেশ। বাউলদের ভাষায় তার রেশ থেকে গেছে।

লালনের গান প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর দেহরক্ষার দুই সপ্তাহের মধ্যে 'হিতকরী' পত্রিকায় ৩১শে অক্টোবর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরে ১৩০২ সালে 'ভারতী' পত্রিকায়। প্রবন্ধের নাম 'লালন ফকির ও গগন'। লেখিকা সরলা দেবী। 'ভারতী' ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা। সরলা দেবী রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী। লালনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে থাকলে প্রবন্ধটিতে তার উল্লেখ থাকত। কবি নিজেও সেকথা তাঁর লেখায় বা বক্তৃতায় উল্লেখ করতেন। লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতের কথা কবির জীবিতকালে শোনা যায়নি। পরে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে শিলাইদহের শচীন্দ্রনাথ অধিকারীই এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য নিরূপণের অধিকারী। 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তিনি 'লালন ফকিরের সঙ্গে মোলাকাৎ' নামে লালনের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ দেন তা পরে প্রত্যাহার করেন। কাহিনীটি তিনি শুনেছিলেন বরকন্দাজ হায়দার মিঞার কাছে। হায়দার সম্ভবত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' বলতে গিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ' বলেছিল। দুজনেই তো 'বাবুমশায়'। লালনের স্কেচ এঁকেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

কেন রবীন্দ্রনাথ নয় তার সোজা উত্তর লালনের মৃত্যুর সময় কবির বয়স ছিল ঊনত্রিশ আর লালনের একশো ষোল। অন্তত একশো বারো। সাক্ষাৎকারটি রবীন্দ্রনাথের ক'বছর বয়সে ঘটেছিল তা কেউ বলেনি। যদি তেইশ বছর বয়সে হয়ে থাকে তবে তখন লালনের বয়স একশো দশ বা একশো ছয়। লালন সে বয়সে কোথাও গেলে ঘোড়ায় চড়ে যেতেন। পায়ে হেঁটে যেতেন না। ছেঁউড়িয়া আর শিলাইদহ পাশাপাশি গ্রামও নয়। মাঝখানে গোরাই নদী ও কাঁচা রাস্তা। এত ক্লেশ স্বীকার করে লালন মোলাকাৎ করতে যাবেন কেন? কবি কি সেই বয়সেই বিশ্বকবি? না, বঙ্গবিখ্যাতও না। বাউলরা অন্যের লেখা কবিতা পড়ে না। মোলাকাৎ করতে গেলে যেতে হয় কবির সঙ্গে নয়, বাবুমশায়ের সঙ্গে। হায়দার বরকন্দাজ নাকি বলেছিল, আজ সকালে ছেঁউড়ের প্রজারা দরবার করতে এসেছিল। তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই লালন ফকির ছিল। হায়দারের এ ধারণার কারণ এক বৃদ্ধের ফেলে যাওয়া সাপমুখো লাঠি নাকি লালন ফকিরের। হায়দারের কথা সত্য হলে প্রপিতামহবয়সী অথর্ব এক বৃদ্ধকে তরুণ জমিদার পরের দিন আবার হাজির হতে বলেন। তাঁর কণ্ঠে যে যে গান শোনেন তাও নাকি হায়দারের মনে ছিল। কিন্তু কবে মনে ছিল? যবে রবীন্দ্রনাথও আর নেই। মাঝখানে কেটে গেছে খুব কম করে ধরলেও একান্ন বছর।

শিলাইদহে ষোল সতেরো জন প্রজা দরবার করতে আসে। তাদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধও এসেছিল। তার কোন দরকার ছিল না। কোন রকম বক্তব্য বা জিজ্ঞাসাও ছিল না। সে শুধু নীরবে তিন চার ঘণ্টা ধরে দুটি চোখ ভরে রবীন্দ্রনাথকে দেখছিল। তাঁর মুখের কথা শুনেছিল চুপটি করে। কিন্তু এমন চমৎকার খোশগল্পটি প্রত্যাহার করে শচীন্দ্রবাবু আমাদের গল্পপ্রিয় দেশবাসীদের হতাশ করেছেন। তার আগে তিনি অনেক অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, "এই সত্য কাহিনীটির নায়ক রবীন্দ্রনাথ না হতে পারেন। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গেই সাঁইজীর ঐভাবে আলাপ হয়েছিল।" জ্যোতিরিন্দ্র সাঁইজীর স্কেচ এঁকে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তো একখানা গান পর্যন্ত লিখে নেননি। গানের খাতা সংগ্রহ করেন শিষ্যদের কাছ থেকে কে জানে কতকাল পরে! এসব বিবেচনা করলে কাহিনীটিকে রবীন্দ্রজীবন থেকে বাদ দিতেই হয়। লালনজীবন থেকেও। দুজনেই যে যার গগনে দীপ্যমান। ততদিনে একজন অস্তাচলগামী, অপরজন উদয়াচলে আসীন। কিন্তু দুই জ্যোতিষ্কের সাক্ষাৎকার প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ লালনের জন্যে দুটি মহৎ কাজ করে গেছেন। একটি, তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী'র যোজনা। যদিও তখন তিনি জানতেন না যে গানটি লালন ফকিরের। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পূর্বে আর কেউ এটি আদ্যোপান্ত ও ভনিতাসমেত সংগ্রহ করেননি। যাই হোক, বাংলা সাহিত্যের অমর উপন্যাস 'গোরা' লালনের একখানি গানকেও অমর করে দিয়েছে।

আর একটি কাজ, অক্সফোর্ডে দেওয়া বক্তৃতায় কবিগুরু আবার সেই 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী'রই ইংরেজী তর্জমা যোজনা করেছেন। সেইটেই বাউলসাধনার মূল সুর। রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্মে'রও মর্মবাণী। সেটি যে লালনের রচনা একথা বোধ হয় তখনো তাঁর অজানা। তাই লালনের নাম উল্লেখ না করে বলেন,

"This village poet evidently agrees with our sage of the Upanishad who says that our mind comes back baffled in its attempt to reach the Unknown Being ; and yet this poet like the ancient sage does not give up adventure of tho Infinite, thus implying that there is a way to its realisation."

উপনিষদের ঋষির সঙ্গে পল্লীকবির তুলনা করে লালনকে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে অমর করে দিয়েছেন। ফলে লালন সম্বন্ধে শিক্ষিত শ্রেণীর ঔৎসুক্য বেড়ে গেছে। তিনি এখন আর নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের সাঁইজী নন। তিনি এখন উন্নত মানের সাধক, গায়ক ও কবি। এর পরে হয়তো শোনা যাবে যে তিনি একজন শরিয়তী মুসলমান, নৈষ্ঠিক হিন্দু, সদাচারী গৃহস্থ, আজন্ম ব্রহ্মচারী, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ। কিন্তু তাঁর গানগুলি যদি বেঁচে থাকে তবে তাঁর প্রকৃত পরিচয় তারাই বহন করবে। কতক গান যে বেঁচে থাকবেই, এটা ধ্রুব।

'ছন্দ' বইখানিতে রবীন্দ্রনাথ লালনের নাম উল্লেখ না করে তাঁর ভাষার প্রশংসা করেছেন। ভাষার নমুনা যা দিয়েছেন তাতে লালনের নাম ভনিতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। ভাষার বিচারেও লালন ফকিরের গান কবিগুরুর নিকষে উত্তীর্ণ।

"ভাষার শব্দে অর্থ আছে, সুর আছে। অর্থ জিনিসটা সকল ভাষাতেই এক, সুরটা প্রত্যেক ভাষাতেই স্বতন্ত্র। 'জল' শব্দে যা বোঝায় 'ওয়াটার' শব্দেও তাই বুঝি, কিন্তু ওদের সুর আলাদা। ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেইরূপ সৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলা ভাষার আপন সম্বল পণ্ডিতেরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন। কেননা তাঁরা অর্থের মহাজন, কিন্তু যাঁরা রূপরসিক তাঁদের মূলধন ধ্বনি। প্রাকৃত বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই অশিক্ষিত লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলা ভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই :

> "আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
> সে কি আর জপে মালা!
> নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।...
> ওরে লালন ভেড়োর লোকদেখানো
> মুখে হরি হরি বলা।"

আর একটি—

> "এমন মানব জনম আর কি হবে
> যা কর মন ত্বরায় কর, এই ভবে।..
> এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন

তাই তো মানুষরূপে গঠিল নিরঞ্জন
এবার ঠকলে আর না দেখি কিনার
লালন কয় কাতরভাবে।”

এই ছন্দের ভাষা একঘেয়ে নয়। ছোট বড় নানা ভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু প্রসাধনে মেজে ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো। এই খাঁটি বাংলার সকল রকম ছন্দই সকল কাব্যেই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।”

জন্ম, পুনর্জন্ম

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কঠিন থেকে কঠিনে তার উত্তরণ
যতদিন না পথের শেষ হয়।
সেখানে নিঃসঙ্গ মানুষ দেখে জীবন আর মরণ
এক হয়েছে আলিঙ্গনে। সামনে জ্যোতির্ময়
নবজন্ম কাঁপছে! দূরে নদীর মতো রক্তধারা পাহাড় থেকে
সমতটের দিকে
মিলিয়ে যায় ভোর হচ্ছে; ভোর হয়েছে' তবু সে তার বুকের মধ্যে
আদিকালের প্রেমের প্রশ্নটিকে
মলিন দেখে, গভীর বিস্ময়ে
ভাবছে আরও কতো পাহাড়, পাহাড়ের পর আবার পাহাড়,
একা থেকে আরও কঠিন একা...

মৃত্যু-বিষয়ক কবিতার খসড়া

অরুণ ভট্টাচার্য

আমার হাড়গুলো শক্ত অথচ ভিজে
আগুনে পুড়তে সময় লাগবে ঢের
আমার মাংস সব শিথিল আর জল-থইথই শরীর
আগুনে ঝলসাতে সময় লাগবে ঢের।

ততক্ষণ তুমি গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে
আগুনের দাউদাউ শিখাগুলির দিকে চেয়ে
একপাশে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধির ধুলো
অন্যপাশে অবন ঠাকুরের।

মধ্যিখানে অখ্যাত কবির শব ঊর্ধ্বে, আকাশের দিকে।
বাতাসের ভারী শব্দ, থমথমে আগুনের হাওয়া এসে
তোমার রাঙা পাট-পাট শাড়ি, ঢেউ-তোলা বিবস্ত্র চুলে
এলোমেলো ধাক্কা দেবে।

হয়তো মনে পড়বে, এই কবির সঙ্গে শ্মশানের ঘাটে
গঙ্গার ঢেউ গুনেছিলাম এক দুই তিন।

বাড়ি চাই

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আজকাল বাড়িগুলো আর আস্ত নেই, মাজা ভাঙা,
ইট-বারকরা—
কিম্ভূত-কিমাকার : বিগত-যৌবন বৃদ্ধ।
তার অন্দরমহলে
পিলপিল ঠাসা পিঁপড়ের মতো মনুষ্য-বসতি,
ঠিকমতো পাইপ বেয়ে পানীয় জল পড়ে না রোজ
একমাত্র রাস্তার জল-ই ভরসা ;
তবুও, ঐ রকম হাড্ডিসার, ন্যুব্জ বাড়ি
অধুনা ক্বচিৎ মেলে, হায়রে আমাদের মতো
খাটো-শ্রেণীর কাছে—যাদের শুনোটাকি, নেই
বাঁচার সংস্থান ;
অথচ, তেমনি একটা বাড়ি মিলতে পড়ের মাঠ নয় পকেট—
বেশ রেস্তভর্তি চাই, ফাঁপা নয়,— বাড়তি রোজগার।

ইঁদুর হলে খানাগর্তে মাথা গোঁজা যেত ;
তা নয় বলেই বাড়ি একটা চাই কম-পয়সায়—ভালো বাড়ি—
কে দেবে ? সেই গোরু, যে খাবেও কম, দুধ দেবে বেশি,
তাই হন্যে হয়ে বাড়ি খুঁজছি—ঐ রকম বাড়ি
সারা কলকাতায়।

নদী, অন্তর্গত

রবীন সুর

গলায় জমাট গান। পাহাড়চূড়ায় অবিরাম
নদী কল্লোলের নিস্তব্ধ তুষার :
বোবা টেপরেকর্ডার
এখন সমস্ত দিন
সমস্ত রাত
থাকে অপেক্ষায়।

কোথায় মানস, মধুময় তামরস ?
এখনো কি তার নীল জলধারা ছুঁয়ে
সহস্র হাঁসেরা ওড়ে পদ্মগন্ধী সমাচার ডানায় মাখিয়ে ?

তখন উড়ন্ত ডানা গান হয়ে বেজে ওঠে পালকে পালকে।
হিমালয় পার হয়ে
ক্রমাগত সমতলভূমির উদ্দেশে
—জীবনের ওম রোদ খাদ্যের নিশ্চিতি :
প্রজন্ম প্রজন্ম ব্যাপ্ত সময় আবহমান, ঘড়ি ঘণ্টা ঋতু ও বৎসর।

কোথায় সমুদ্র ভাঙে কূলে কূলে   স্তব্ধ বালিয়াড়ি
কণা কণা অবয়বে উড়ে যায়
সমস্ত পৃথিবী দশদিক দেশান্তরে.
কোথায় কখন
ঘুম ভাঙে জমাট গানের
গোমুখীর দ্বার খুলে ভাগীরথী শঙ্খে ভাসে মুক্ত জলধারা,
সমস্ত দক্ষিণ জুড়ে মোহানার দ্বীপময় গর্ভের গোপনে
অরণ্য লাফিয়ে ওঠে বীজ খুলে ডালপালায় আকাশ নাড়িয়ে !

বৃত্তের গভীরে

তুলসী সেনগুপ্ত

রোজকার মতো খুব ভোরে জয়দেবের বুকের উপরে উঠে বসল টিপু। জয়দেবের ছোট ছেলে টিপু; বড় ছেলে নিপু আজ বছর দুই হল বেপাত্তা। ওর কথা মনে পড়তেই ভুরু কুঁচকে নিজের মনেই বলে ওঠে- শুয়োরের বাচ্চা। পার্বতী মাস দুই হল মারা গেছে। বেঁচে থাকলে ও এই গালাগালটা শুনে নিশ্চিত বলত, -নিজে শুয়োর, তাই ..। জয়দেব কি ও কথা শুনে প্রতিবাদ করত? না, মুখ খিঁচিয়ে বলত,- শালী পরচুলানি! এমন সব কথা জয়দেব কতই তো বলেছে; সে-সব সময় পার্বতী আত্মপক্ষ সমর্থন করার মতো কোন উত্তরই দেয়নি। উপরন্তু জয়দেবের বুকের ভেতরের নিভোন আগুনটাকে আরও উস্কে দিয়ে মুচকি হাসত, মায়াবিনী হাসি!

টিপু বুকের উপরে বসে ওতক্ষণে হুসহুস করে মোটর চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কখনো কখনো ট্যাক্সির ড্রাইভার হয়ে যায় টিপু; কখনো বা ডবল ডেকার বাসের কন্ডাক্টর। কল্পিত দড়িতে হাত দিয়ে টিং টিং করে বেল বাজায় টিপু! আধো-আধো অস্পষ্টভাবে বলে হাজরা; কালিঘাট; ভেতরে চলে যান; টিং টিং। হুস শব্দে ফের ছেড়ে দেয় ডবল ডেকার। টিপু এসব বলে আর জয়দেবের লোমশ বুকের উপরে বসে লাফাতে থাকে।

টিপুর অমন আচরণ জয়দেবের ভাল লাগে। অনেকক্ষণ ধরে ক্রমাগত বুকের উপরে দাপা-দাপিতে বুকটা ব্যথা করতে থাকে; সে কষ্ট কষ্টই না; সব সহ্য করে ও। কেমন আধ-বোজা চোখ; ঘুমোবার ভান করে টিপুর সবকিছু লক্ষ্য করে জয়দেব। এবং এরই ফাঁকে অনেক অনেক কথা মনে পড়ে যায় ওর। পার্বতীর কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি, চলন-বলন-সবকিছু বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কোন এক অদৃশ্য জগৎ থেকে একটা ব্যথা ক্রমাগত বুকের মাঝে পাক খায় মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায় মুহূর্তে। টিপুকে বুক থেকে নামিয়ে পাশে শোওয়ায়, ওর মুখে গালে পর পর বেশ কয়েকটা চুমু খায় জয়দেব। জয়দেব যখন আদর করে, সে সময় খিলখিল করে হাসে টিপু; এমন হাসে মনে হয় দম আটকে যাবে বুঝি এই। অবলীলায় ব্যথাটা সরে গিয়ে কেমন এক শিরশিরানি অনুভূতি জয়দেবকে আচ্ছন্ন করে দিতে থাকে; সুখের না দুঃখের, কিছুই ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না; গলার কাছে একদলা কফ যেন হঠাৎই হাজির হয়ে ওকে ভীষণ অস্বস্তিতে ভরিয়ে দিতে থাকে। ওসব বোধ-টোধের পেছনে না ঘুরে টিপুকে বুকে টেনে নিয়ে বলে টিপু, আমার টিপু। আমার টিপু সুলতান।

ও সেসব বোঝে না। ভীষণ সুড়সুড়ি লাগে টিপুর; খিল খিল করে হাসতে হাসতে জিওল মাছের মতো খলবল করতে থাকে বিছানায়। এমন সুখের দৃশ্য পার্বতী দেখতে পেল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বেরুল। থমথমে, ভারী হয়ে গেল মনটা।

টিপু বেশ কিছুক্ষণ জয়দেবের গলা জড়িয়ে শুয়ে রইল। একসময় ও হঠাৎ বলল বাবা জিলিপি খাব, খিদে লেগেছে।

খোলা জানালার দিকে চোখ যেতেই বুঝল জয়দেব, বেলা বেশ হয়েছে। বিছানা থেকে উঠে টিপুকে কোলে করে নিয়ে মুখ হাত ধোবার জন্য কলতলায় চলে এল জয়দেব। আঁজলা করে জল নিয়ে বার কয়েক চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই চোখ দুটো করকর করতে থাকলেও বেশ একটু আরাম বোধ করল জয়দেব। টিপুর মুখে চোখে জল দিয়ে ওর চোখের কোণ থেকে পিচুটি টেনে

টেনে বের করে বলল- তোর মা কোথায় গেছে জানিস?

টিপু অমনি ওর ছোট্ট হাত আকাশের দিকে তুলে দেখায়, ওই ওখানে।

– হ্যাঁরে ব্যাটা। ওখানে সকলের জন্য ঘরবাড়ি ঠিক করা আছে। একদিন আমিও যাব, তুইও যাবি।

—অতদূরে কী চেপে যাব? টিপু শুধোয়।

হি হি করে হাসে জয়দেব।—ওখানে না অনেকগুলো দাদা আছে তোর; কার্তিকদা, গণেশদা, নারানদা, বিল্টুদা...

--ওরা বেড়াতে আসে না কেন?

- ওদের বৌরা ওদের আসতে দেয় না। হাড়কেপ্পন তো, খরচা হবে এই ভয়ে আসতে দেয় না। কথা শেষ করে হি হি করে হাসে জয়দেব।

-ওরা পাজি, দুষ্টু। কৃত্রিম রাগ করে টিপু ওদের বৌদের উদ্দেশ্য করে বলে--মারব।

খুশির হাওয়ায় দুলতে থাকে জয়দেব। বলে- ওখানে না তোর একটা বৌ আছে; কী সুন্দর ফুটফুট করে দেখতে, তাকেও মারবি?

হ্যাঁ মারব। এমনি এমনি করে মারব। ভঙ্গিতে মারের ধরনটা দেখিয়ে দেয় টিপু। হঠাৎ কী মনে করে বলে ওঠে- শালা শুয়োরের বাচ্চা, মাগী। মুখ থেকে অমন কথা বেরুতে না বেরুতেই জয়দেবের চোয়াল দুটো অসম্ভব শক্ত হয়ে যায়; চোখ থেকে আগুনের হলকা বেরুতে থাকে। কার ওপরে যেন সে অন্ধ আক্রোশে ফুঁসতে থাকে। বোঝে এসব কথা টিপু কোত্থেকে শিখেছে। শীতল আর লক্ষ্মীদের ঘরে প্রায়ই এ ধরনের কথা হয়; টিপু এসব ওখান থেকেই শিখেছে। জয়দেবের নিজের মুখ ভাল নয়, কিন্তু পার্বতী মারা যাবার পর ও কাকে এসব কথা শোনাবে। মনে মনে হিসেব কষে দেখল, পার্বতী মারা যাবার পর থেকে সামান্য শালা শব্দটাও একবারও উচ্চারণ করেনি। যত রাগ এই মুহূর্তে গিয়ে পড়ল শীতলের উপরে। টিপুকে জোরে প্রায় হ্যাঁচকা মেরেই টেনে তুলে কলতলা থেকে সরে এল জয়দেব। গেঞ্জিটা গায়ে গলিয়ে টিপুকে কোলে করে ঘর থেকে বেরিয়ে জিলিপির দোকানের উদ্দেশে পা বাড়াল জয়দেব।

টিপু অত শত বোঝে না, জয়দেবের কান টানতে থাকে, চুল টানতে থাকে। টিপুর আচরণে একটুও বিরক্ত হল না ও। টিপুর মুখ থেকে অমন কথা উচ্চারিত হতে শুনে মনটা তার বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে ঠিকই এবং নিজেই স্তোকবাক্য উচ্চারণ করল,- শালা আর শুয়োরের বাচ্চা একটা গালাগালই না। এখন তো ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা, বাপ-মা এমন কথা হামেশাই বলে থাকে। মনের বিষণ্ণতা নিজেই ঠেলে সরিয়ে দিল, স্বস্তির প্রলেপে মনটা ঠাণ্ডা হল। টিপুকে একটা চুমু খেয়ে বলে,–তোর মা আমাদের উপর রাগ করে আর কখনো আসবে না বলেছে।

টিপুও চটপট জবাব দিয় ফেলে,--আমিও মার কাছে আর যাব না। তুমিও যেও না।

সাবাস বেটা। আদরের ভঙ্গিতে জয়দেব ছেলের পিঠ চাপড়ে দিল। একমনে টিপুর জিলিপি খাওয়া দেখল। একসময় জয়দেব বলল,--তোর একটা দাদা ছিল জানিস?

কিছু বুঝল না, কেবল ফ্যাকাশে চোখে চেয়ে রইল টিপু জয়দেবের দিকে। কেমন একটা হোঁচট খেল নিজেও। নিপুর জন্য মনটা তার অনেকদিন পর ব্যথায় টসটস করতে থাকল, হিসেব কষে দেখল, নিপু এখন দশ পেরিয়ে এগারোয় পা দিল। কোথায় আছে নিপু কে জানে। ভগবান, ও যেন বেঁচে থাকে। মনে মনে প্রার্থনা করল জয়দেব। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল, গলার কাছে একটা বাধা অনুভব করল। মাঝে মাঝে মনটা যে কেন এমন হয়, ভেবে পায় না জয়দেব। দীর্ঘ বছরগুলোর মধ্যে পার্বতীর পেটে ছেলে আসেনি। আসবে কী করে : একটা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে বেরুল

বুকের মাঝখান থেকে। মাঝের প্রায় সাতটা বছর জয়দেবকে এ-জেল ও-জেল ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। পুলিশের খাতায় ওর সম্পর্কে সব লেখা আছে : ওর ছবি, আঙুলের ছাপ—সব। চোর, ছিনতাই-কারী, প্রতারক—এইসব বিশেষণে বিশেষিত হয়ে আছে ও। ছেলেটার মুখের দিকে আড়চোখে একবার তাকাল ; থুতু আর জিলিপির রসে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে টিপুর মুখ ; সুখে আর আনন্দে ডগমগ টিপু একমনে হাতের আঙুলে লেগে-থাকা রস চেটেপুটে খাচ্ছে। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে : এই কিছু নেই- -আবার সবকিছু আছে এমন একটা ভাব ইদানীং হয় ওর ; ও তা লক্ষ্য না করে পারেনি। বয়স বাড়লে এমন হয়, না, অন্য কোন কারণে তা সঠিক বুঝে উঠতে পারে না ও। ওসব ভাবনার জটে না জড়িয়ে টিপুর মুখের দিকে চোখ রেখে বলে, --আর একখান খাবি নাকি বাপ্।

মিষ্টিতে মুখ মেরে গেছে টিপুর। ও নাক কোঁচকায়, ভুরু কোঁচকায়। মুখে কোন উত্তরই দেয় না।

দাম মিটিয়ে বলে, --হেঁটে যাবি, না, কোলে ?

টিপু কোলে উঠতে চায় না। ও জয়দেবের বাঁ হাতের আঙুল ধরে দোকান থেকে বয়স্ক মানুষের ভঙ্গি করে বেরোয়। থৈ থৈ খুশিতে এবার জয়দেবের বুক ভরভরাট। রোদ্দুরের তেজ তেমন নেই। আকাশটা এখনও মেঘলা মেঘলা। গত রাতে জোর জল হয়েছিল। যদিও বুঝল, এ মেঘে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তবুও জয়দেব টিপুকে বলল, হ্যাঁরে, বাড়ি যাবি তো ?

--না। স্পষ্ট জবাব দিয়ে জয়দেবের হাতে একটু জোর খাটিয়ে হেদোর দিকে চলতে ইশারা করল টিপু।

হাসি পেল জয়দেবের। পার্বতীর পেটে যখন টিপু, বিকেলের দিকে প্রায়ই যখন শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করত, সে-সব সময় পার্বতী হেদোর দিকে যেতে ভালবাসত। ব্যাটা মায়ের পেটে থেকেই হেদো দেখেছে, চিনেছে তো...ঈষৎ একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা সাময়িক ফুটে উঠল ওর মুখে। আবার পরক্ষণেই বুকের মাঝখানে ভারী পাথর বসানো আছে বলে মনে হল ওর। বেশি দেরি না করে, জয়দেব টিপুকে কোলে তুলে নিয়ে একটু দ্রুত পায়ে হেদোর ভেতরে ঢুকে বার দুই পাক দিয়ে সোজা বাড়িমুখো হল।

শীতলের বৌ লক্ষ্মী ঘর নিকোচ্ছিল। জয়দেবের পায়ের শব্দে পিঠের শাড়ির আঁচলটা টেনে দিল। কিন্তু জয়দেবের পাকা খেলুড়ে চোখ লক্ষ্মীর সারা শরীরটাকে এক পলকে চেটে নিয়ে কেমন থম মেরে গেল। কেননা, ঠিক সেই সময় জয়দেবের কানে গেল লক্ষ্মীর স্বগতোক্তি, --হারামজাদা, শকুনের দল, থুঃ, থুঃ, মারি ঝাঁটা মুখে, একদিন ঠিক দেব চোখ দুটো গেলে, তখন বুঝবে।

অন্য দিন হলে ঠিক একটু দাঁড়াত জয়দেব। আজ বুঝল, চাটু তেতে আছে। কিন্তু কার উপরে যে লক্ষ্মীর রাগ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। টিপু সরসর করে জয়দেবের কোল থেকে নেমে এল। জয়দেব আর একদণ্ডও দাঁড়াল না, হন্তদন্ত ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা বিড়ি ঠোঁটে গুঁজে ধাঁ করে আগুন জ্বালাল। ঘন ঘন বিড়িতে টান দিয়ে ডাকল,—টিপু।

টিপু তখন লক্ষ্মীর পিঠে চেপে বসেছে। খুব জোরে গলা জড়িয়ে ধরেছে। আর লক্ষ্মী গম্ভীর, হাসছে না একটুও। কেমন বিরক্ত।

—যা না, যা। তোর বাপের কাছে যা, এখানে রইছিস কেন--ওই ডাকছে তোর বাপ, যা যা নইলে এক্ষুনি...

জয়দেব ঘর থেকে গলা কেয় করে বলে,—না না এমনি ডাকছিলাম।

লক্ষ্মী মুহূর্তে চোখ দুটোতে আগুনের ঝড় ছড়াতে ছড়াতে বলল,—তা তোর কী রে হতচ্ছাড়া, বদমাশ, চোর!

সারস পাখির মতো যেমন গলাটা বের করে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। নড়ল না, চড়ল না। কোন উত্তরও দিল না। ছবির মতো হয়ে রইল।

লক্ষ্মী টিপুকে সামনে নিয়ে এসে বলল,—এই সাত সকালে কী সব ছাইভস্ম গিলে এলি রে টিপু?

হি হি করে হাসল টিপু। চোখ দুটো গোল গোল করে তাকিয়ে রইল।—কী খেয়েছি বল তো মাসী?

টিপুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল লক্ষ্মী। ওর কচি মুখের দুধেল গন্ধ এখন আর নেই। মুখটা যেন টিপুর নয়, জয়দেবের। বিড়ির গন্ধ ভক ভক করে বেরুচ্ছে। টিপুর মুখটা দ্রুত সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় লক্ষ্মী। জয়দেবের সারস পাখির মতো গলা-বার-করা মুখটার দিকে তাকিয়ে বলে,—ছেলেটার মুখে তাড়ির ভাঁড় আর গাঁজার কলকে কবে থেকে তুলে দিবি রে হতভাগা?

ওর কথায় একটুও চটল না জয়দেব। চোখ দুটোকে আরও বেশি খেলুড়ে করে তুলল ও। এ বিষয়ে ও সিদ্ধিলাভ করেছে অনেকদিন আগে থেকেই। খুব মিহিন সুরে উত্তর দেয়,—দিন আর কাটছে না লক্ষ্মী, ছেলেটা মা-মা করে হাড়ে দুব্বোঘাস গজিয়ে দিল।

লক্ষ্মী চটুল হাসল সে কথায়। একটু প্রশ্রয়ও দিল যেন জয়দেবকে। বলে,—আহা তা তো হবেই। মিনিট কয়েক চুপ করে থেকে একমুহূর্তে জয়দেবের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে,—হতচ্ছাড়া চোর, পার্বতীদির অমন হাল কে করেছিল, আমি জানি না ভেবেছিস?

সোজা পথে চলতে গিয়ে হঠাৎ এই হোঁচট খাওয়া ভাল লাগে না জয়দেবের। ঘরের ভেতরে সামান্য একটু ঢুকে আপন মনেই বলল,—পার্বতী আগের জন্মের শোধ নিল রে লক্ষ্মী। ওর জন্য একজোড়া কানপাশা গড়াতে দিয়েছিলাম হায় রে হায়, একেই বলে কপাল; স্যাকরা বলছে, ওটা হয়ে গেছে; ভাবি, কী হবে এনে, যার জন্য বানানো সেই যখন নেই, ভাবছি, বলে দেব বেচে দিতে। একটানা কথাগুলো বলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়দেব।

—বেচতে হয় আমার কাছেই বেচিস, পুরো দাম পাবি। লক্ষ্মী খুব বড়লোকী ভাব দেখিয়ে বলে কথাগুলো। চোখের কোলে কেমন এক চটুল হাসি ঝিকমিক করে। ও হাসি দেখলে অকারণেই কী না কে জানে, ছলাৎ ছলাৎ করে, নিজেকে বড় বেশি কাঙাল মনে হয় জয়দেবের তখন। শূন্যতায় বুকটা ঢিবঢিব করে, একটা রবারের বল নিয়ে কে যেন অবিরাম ড্রপ ফেলে বুকের মাঝে। তবুও সতর্ক জয়দেব ধরা গলায় উত্তর দেয়—আমি তো তোর চোখে চোর আর শকুন। একটুক্ষণ থেমে ফের বলে ভরসা দিলে বলি, ও জিনিসটা আমি তোর জনাই গড়িয়েছি।

ন্যাতার জল নিঙড়ে নিঙড়ে বালতির মধ্যে ফেলতে থাকে লক্ষ্মী। জয়দেবের ওসব কথা যেন কানেও যায় না ওর। পাথরের মতো থমথমে মুখ আর বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বাইরের দিকে কী যেন দেখে। কী মনে করে বলে,—বাজার থেকে ছেলেটার জন্য একটু মাছ আর কাঁচকলা নিয়ে আসিস তো...ছেলেটাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে কী সব ছাইভস্ম খাওয়াস; দেখবি একদিন ছেলেটা হেগে হেগে মরে যাবে। বড়টা পালিয়ে বেঁচেছে, আর এটা মরে বাঁচবে।

ভীষণ অসহায় হয়ে যায় একমুহূর্তে জয়দেব। কান্নার মতো কিছু একটা গলার কাছে আটকে আছে বলে মনে হয় ওর। সারা শরীর ভীষণভাবে গুলোতে থাকে। লক্ষ্মীর দুহাতের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে করুণ গলায় বলল জয়দেব, দু-চারটে টাকা ধার দে না লক্ষ্মী। বিশ্বাস কর, সুদেমূলে সব শোধ করে দেব।

কথা কটি কানে যেতেই খিল খিল করে হাসল লক্ষ্মী। বলল—কানপাশার কথা বলছিলি যে হতচ্ছাড়া! গরম দেখাস কাকে রে শকুন! পাতলা ফিনফিনে ঠোঁটে হাসির রেশ রেখে ফের শুধোয়,—কবে শুধবি বল?

—বাজারটা একটু মন্দা যাচ্ছে, পেলেই শোধ করে দেব; কথা দিচ্ছি...জয়দেব ফ্যাসফেসে গলায় উত্তর দেয়।

—তোর কাছে আমার অনেক পাওনা হয়েছে, সুদেমূলে তা প্রায় শ'দেড়েক তো হবেই...

—তা তো ঠিকই। কতদিন ধরে এক কানাকড়ি রোজগার নেই, ছেলেটাকে তুই-ই তো বাঁচিয়ে রেখেছিস লক্ষ্মী, আমাকেও। মিনিট কয়েক চুপ থেকে বলল,—আমাকে তুই কিনে নে লক্ষ্মী, টিপুটা মাসী বলতে আর চায় না—ও চায় তোকে মা বলে ডাকতে। নতুন নয়, এ ধরনের কথা আকারে ইঙ্গিতে বহুবারই শুনেছে ও। প্রথম প্রথম শুনলে মজা পেত, একটা উতরোল আনন্দের ঢেউ বুকের মাঝে গুরগুর করে ভেসে বেড়াত; নিজের উপর অনেক অনেক আস্থা আর বিশ্বাসে বুকের নরম মাটি শক্ত হয়ে যেত। কিন্তু এখন এসবই বড় জোলো মনে হয়। জয়দেবের ও ধরনের ভিখিরিপনাকে একদম বরদাস্ত করতে পারে না। বিরক্তি নয়, কেমন এক ধরনের ঘেন্না-ঘেন্না ভাব মনটাকে কেমন বিস্বাদ আর তেঁতো করে দেয়। ওখান থেকে সরে যায় লক্ষ্মী। ঠিক সেই সময় জয়দেব শুনতে পায় শীতলের কণ্ঠস্বর।—বড্ড তোর গতরের জ্বালা রে লক্ষ্মী, আমি সব বুঝি, সব দেখি। একদিন তোরও দশা ওই পার্বতীর মতো হবে। পুড়ে মরতে হবে তোকেও।

দাঁড়িয়ে থাকতে মন চায় না জয়দেবের। ঘরের ভেতরে ঢুকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা বিড়ি ধরায়। বিড়ির ধোঁয়া মুখে কেমন বিস্বাদ, তেঁতো-তেঁতো ঠেকে। দেখে ঘরের এক কোণে বসে টিপু নিজের মনে কী সব নিয়ে খেলায় মশগুল। শরীরটা গুলোতে থাকে; মাথার ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে। ইদানীং এমন মাঝে মাঝেই হয় ওর। বিশেষ করে পার্বতীর মৃত্যুর পর থেকেই। যে-সব কথা ওর একদম মনে পড়ার কথা নয়, সেইসব কথা মনের ভেতরে ডালপালা বিস্তার করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জয়দেব তখন স্থির নিস্পন্দ অবস্থায় ও-সব কথার রাজ্যে আচমকাই বলা চলে ভেসে বেড়াতে থাকে। স্টেশন রোড, আদ্রা, ক্যানাডিয়ান এঞ্জিন, লোকজন, কুলি, যাত্রী আর ভেন্ডার-দের টুকরো টুকরো অনেক কথা আবছা থেকে ক্রমশ স্পষ্ট ওর মনে ভেসে ওঠে। বেশ মনে আছে, পর পর দুদিন বেশ ভালমত দাঁও মেরেছে ও ভিড়ের বাসে; তিনদিনের দিন ছিল মাসপয়লা; ক্যাপেষা একজনকে সর্বস্বান্ত করে বিলিতি মদ গিলেছিল দেদার। নেশা করলেই ও কানে ট্রেনের হুইসেল শুনতে পায়; ঠিক তখন ওর চোখের সামনে ছেড়ে আসা দেশের সবকিছু স্পষ্ট ভেসে ওঠে—থৈ থৈ নদীর জল, কাশফুল, বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, ভাসানের গান, পয়নার নৌকো—এ সবই ওকে বড় বেশি টানে। সে টান এতই শক্তিশালী যে, জয়দেব কোনক্রমেই সে-সব উপেক্ষা করতে পারে না। ওর ধারণা, যে-কোন ট্রেনই ওর দেশ না ছুঁয়ে যেতে পারে না। এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী জয়দেব প্রচণ্ড মত্ততা নিয়ে ট্রেনে চেপে বসে রেলের লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে। অনেক রাতে ট্রেনটা প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। মাথার মাঝে অজস্র যন্ত্রদানবের হুড়োহুড়ি যা এতক্ষণ ওকে বিহ্বল করে রেখেছিল, সে সবই মুহূর্তে থেমে গেল। চোখের দৃষ্টিও হয়ে যায় স্বচ্ছ। সবকিছু ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে ওর একটুও সময় লাগে না। এক সময় টুপ করে ও নেমে পড়ে ট্রেন থেকে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেও ও বুঝতে পারে ওকে নিয়ে প্ল্যাটফরমে গোটা-দশেক লোক রয়েছে। মামারা কেউ নেই, বুঝতে পেরেছিল জয়দেব এবং এতটুকু সময় নষ্ট না করে ও স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। রাত শেষ হতে তখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। এবার সন্তর্পণে কৌশলে বিকেলের ট্রামের ভিড়ে সংগ্রহ করা মানিব্যাগটা খুলতেই ওর নিশ্বাস প্রশ্বাস সবকিছু

যেন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। দেখল, ট্রামের ভিতরের সেই লোকটার পুরো মাসের মাইনের টাকাই এখন ওর হাতের মুঠোয়। নিজেকে সতর্ক করে নিয়েছে জয়দেব। সেদিন আর যা সে সংগ্রহ করেছিল, সে হচ্ছে পার্বতী। স্বামীর অত্যাচার আর ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই, বাড়ি ছেড়ে অনিশ্চিত জীবন বেছে নিয়েছিল। আঁটসাঁট গড়ন, মসৃণ পিচ্ছিল গায়ের চামড়া। শীতে জড়সড় হয়ে স্টেশন ইয়ার্ডের বাইরে ছাতিমগাছের নিচে বাঁধানো জায়গায় শুয়েছিল। ব্যাগের ভেতরের টাকা পয়সাগুলো বের করে নিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলল যেই অমনি ওর কানে এল, খুনখুন কান্নার আওয়াজ। কী মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল জয়দেব। জিগ্যেস করেছিল,—এই কাঁদিস কেন রে?

—কিছু খাওয়াবে বাবু,—দুই রাত্তির পেটে কিছু পড়ে নাই—বড় কষ্ট—ক্ষীণ গলায় উত্তর দিয়েছিল পার্বতী।—তোমার অনেক টাকা, আমি সব দেখেছি বাবু।

জয়দেব জানে, পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোন ব্যাধিই হচ্ছে ক্ষুধা—ও কাউকে রেয়াত করে না—নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র—সকলকেই বড় নাজেহাল করে ও। পেটের ভেতরে ক্ষুধার্ত ইঁদুরগুলো যখন চোঁ চোঁ ছুট মারতে থাকে, তখন সবকিছু তোলপাড় করে দিতে ইচ্ছে হয়; সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দিতে পারলে তবে না শান্তি।

কেমন যেন মায়া হয় জয়দেবের। বলেছিল,—আয় আমার সঙ্গে। সেই নির্জন রাতে, থমথমে আকাশের বুক চিরে যখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরে পড়ছিল, গাছের পাতা থেকে টপটপ করে ঝরছিল বৃষ্টির জল, দূরের রেল স্টেশনের আলোগুলোকে অস্পষ্ট রহস্যময় মনে হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় জয়দেব আর পার্বতী, ভিন অঞ্চলের দুই নর-নারী, কেমন যেন অভিন্ন হয়ে উঠছিল। ক্রমশ একটা চায়ের দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। অল্পবয়স্ক দোকানদারের চোখ সতর্ক। জয়দেব শুধোল,—কেক বিস্কুট কুছ মিলেগা—রোটিওটি ঔর চা?

—মিলেগা।

জয়দেব ইঙ্গিতে রুটি-বিস্কুট আর চা দিতে বলে কেমন আত্মতৃপ্তির সুর তুলে বলেছিল,—পহেলে এক প্যাকেট সিগ্রেট লাও তো?

সিগ্রেটের প্যাকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ঠোঁটে ছোঁয়াতেই খিলখিল করে হেসেছিল পার্বতী। অস্ফুট গলায় শুধোল,—ব্যাগটা ফেলে দিলি কেন বাবু?

—চোপ। চাপা গলায় ধমকে উঠেছিল জয়দেব।

দ্বিতীয় আর কোন কথা বলেনি পার্বতী। রুটি চায়ে ভিজিয়ে খেতে খেতে, নিজের নাম-ধাম সবকিছু ধীরে ধীরে বলে গেল পার্বতী।

সব শুনে হেসেছিল জয়দেব। স্বল্প আলোর মধ্যে, জয়দেব পার্বতীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বুঝল, ওকে ছাড়া যাবে না। যেন এই প্রথম, শরীরের ভেতরে একটা ঘুমন্ত সিংহকে আবিষ্কার করল ও। অসম্ভব অস্থির করে তুলতে থাকল ওকে। পার্বতীর কোন জীবনেতিহাস শোনার কোন মোহ নেই—পকেটে এখন তার অনেক টাকা—কেবল একটা আশ্রয়—এ ছাড়া আর কিছুই সে সময় ওর চাইবার ছিল না, যে-আশ্রয়ের মধ্যে এসে দুজন দুজনের শরীরী মায়ায় নিকটতর হতে পারবে, সহজ হতে পারবে আরও বেশি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হতে চলল লক্ষ্মী এল না। শীতল আজ প্রায় মাসতিনেক হল শয্যাশায়ী। সার্কাসে শীতল ট্রাপিজের খেলা দেখাত। এ খেলায় ও ছিল অদ্বিতীয়। শাদা ধবধবে আঁটো পোশাক-পরা শীতল যখন রিং-এর মধ্যে এসে দাঁড়াত—তখন ওকে ভীষণ শক্তিশালী অলৌকিক

পুরুষ বলে মনে হত। সার্কাসে ওর নাম ছিল এস দি গ্রেট। ঝমঝম বাজনা, মায়াবী আলোর মাঝে ও অদ্ভুত কায়দায় বাঁহাত-ডান হাত তুলে, মাথা নেড়ে দর্শকদের অভিনন্দন কুড়োত—অনেক দূরের মানুষ যেন ও—একাগ্রমনে খেলা দেখাত; হাততালি, বাজনা আর চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই ওর কানে আসত না। রতন পোড়েলের একমাত্র মেয়ে লক্ষ্মী খেলা দেখতে এসে এক নিমিষেই হারিয়ে গেল—লুকিয়ে শীতলের সঙ্গে দেখা করল। সার্কাস পার্টির তাঁবু একদিন উঠে গেল আর তার পরদিন থেকেই লক্ষ্মীরও কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। বছর ঘুরতে না ঘুরতে লক্ষ্মী যখন বুঝল, এবার সংবাদ দেওয়া যায়,ঠিক তখনই সে রতন পোড়েলকে জানাল, সে সুখে আছে। মা-মরা মেয়েটার সংবাদ পেয়ে রতন পোড়েলের বুকে ঢেউ উঠল, কিন্তু লক্ষ্মী বাড়ির ঠিকানা দেয়নি। ফের হতাশ হয়ে পড়ল রতন পোড়েল। কিন্তু শীতলকে দিয়ে লক্ষ্মী তার বাপের সব খবরই রাখত। যখন শেষ-বারের মতো বিছানা নিল রতন পোড়েল, তখন একদিন কাঁদতে কাঁদতে শীতলকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়ে গেল লক্ষ্মী। রতন পোড়েল মারা গেল। যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল একদিনেই ওরা। লক্ষ্মী শীতলকে সেই মারাত্মক খেলা দেখাতে বারণ করল, কিন্তু শীতল ছাড়তে পারল না। শিরদাঁড়ার হাড়ে প্রচণ্ড জখম হয়েছে—জীবনে আর কখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না ও। লক্ষ্মীও বেশ কিছুদিন আগে থেকেই জেনে গেছে, মা হতে পারবে না সে। কার দোষ ওর, না, শীতলের! এ-সব মাথাতেই এল না; বুকের ভেতরটা কেমন শূন্য—অনন্ত এক ক্ষুধা লক্ষ্মীকে ভীষণ অসহায় করে দিতে থাকল। পুরনো দিনের সার্কাস পার্টির লোকজন—দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন যারা আসে তাদের মধ্যে ও স্পষ্ট কুৎসিত আর লোভীর অস্তিত্ব খুঁজে পায়। জয়দেব সে তুলনায় অনেক ভাল। বিশেষ করে টিপু যখন ওকে গলা জড়িয়ে ধরে, সে-সব সময় সবকিছু উজাড় করে দিতে ইচ্ছে হয়। ছোট্ট টিপু যখন ওর কচি হাত দিয়ে ওর বুক খামচায়, তখন আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না লক্ষ্মীর। লুকিয়ে লুকিয়ে টিপুকে লোভ দেখিয়ে বলে,—খা খা দুধ খা। টিপু সে স্তনে মুখ দিয়ে দু-একটা টান দেয়, কিন্তু দুধ আসে না দেখে মুখ সরিয়ে নেয়। এই ওর অনেক। এই প্রাপ্তি ওর পরম প্রাপ্তি। ক্ষণিকের এই সুখ ওকে বড় বেশি বিহ্বল করে দেয়। এ-সবই লুকিয়েচুরিয়ে নানা কৌশলে দেখে জয়দেব। লক্ষ্মী এখন কী করছে দেখতে ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু সামান্য এতটুকু ব্যবধানকে ভীষণ কঠিন মনে হয়। ঠায় নিজের মনে চুপ করে বসে থাকে। টিপুকে একবার ও ঘরে পাঠালে কেমন হয়! হঠাৎ কী ভেবে টিপুকে বলে,—এতক্ষণ চুপচাপ কী করছিস রে টিপু? যা না ও ঘরে যা—মাসী কী করছে দেখে আয় তো?

টিপু ও ঘরে ঢুকতেই শীতল শুয়ে শুয়েই বলে ওঠে,—কে টিপু! আয় বাবা, এদিকে আয়।

টিপু ধীর পায়ে এগিয়ে যেতেই শীতল ওর ফোলা-ফোলা গাল দুটো টিপে দিয়ে বলে,—যা তো ও ঘরে তোর মাসী কী করছে দেখে আয় তো।

বিস্ময়াভিভূত টিপু এদিক ওদিক চেয়ে ধীর পায়ে ওঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। মাসী কাঁদছে। সারা মুখ চোখ মাসীর লাল। ও এগোতে পারে না. ঠায় ওখানে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট কয়েক। একসময় কী মনে করে ধীর গলায় ডেকে উঠল,—মাসী, খিদে পেয়েছে, খেতে দাও।

টিপুকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেল লক্ষ্মী। তারপর ওকে কোলে করে নিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা জয়দেবের ঘরের ভেতরে ঢুকে বলল,

—বাপ হয়েছিস, ছেলেকে খেতে দিতে পারিস না, জানোয়ার। ও মরলে তুই বাঁচিস, না রে! শয়তান, চোর, হারামজাদা, বজ্জাত!

টিপু কী বোঝে কে জানে। ওসব কথায় মিটিমিটি হাসে। মাসীর গলা জড়িয়ে ধরে এপাশ ওপাশ দোল খেতে থাকে। দশ টাকার একটা নোট জয়দেবের হাতে দিয়ে বলে,—এ থেকে দু টাকা

নিয়ে আট টাকা ফেরত দিবি। নইলে তোর একদিন কী আমার একদিন।

সে কথায় লম্বা করে জিব কাটল জয়দেব। যতটা সম্ভব পারল দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলল সরলতা। নিজের গালেই ঠাস ঠাস চড় কষাল। বড় বেশি সংকোচ আর অপরাধীর ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে বলল,—তুই ঠিকই বলিস লক্ষ্মী; আমি কী মানুষ। ফের গালে ঠাস ঠাস করে চড় কষায়। ছিঃ ছিঃ। থুঃ। নিজের উদ্দেশ্যে নিজেই থুতু ছেটায়। সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে,—এই যাব আর আসব। হঠাৎ চলা থামিয়ে দিয়ে সরাসরি লক্ষ্মীর দিকে তাকাল এবং ফ্যাসফেসে গলায় বলল,—আগের জন্মে তুই আমার কাছে অনেক ঋণ করেছিলি, তাই এ জন্মে শুধছিস।

মিষ্টি হাসল লক্ষ্মী। টিপুকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এল।

আকাশটা সকাল থেকেই মেঘলা। খুব ভোরের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তবুও কেমন যেন ভ্যাপসা গরম অনুভব করল জয়দেব। বড় রাস্তায় পড়ে বাঁদিকে মোড় নিয়ে বেশ কিছুটা এগুতেই নন্দু সাহার দোকান হঠাৎই বলা চলে নজরে পড়ে গেল তার। বুকের ভেতরটা ভীষণ শুকনো খরখরে ঠেকল—কতকাল নন্দুর দোকানের এক নম্বর মাল পেটে পড়েনি। দুরন্ত পিপাসায় গলা বুক সব শুকনো ঠেকল। মোহাচ্ছন্নের মতো নন্দুর দোকানে ঢুকে একটা বোতল নিয়ে একটা কোণ বাছাই করে বসে পড়ল। লোকজনের ভিড় নেই—চেঁচামেচিও কানে এল না জয়দেবের। গেলাসটা প্রায় কানায় কানায় ভর্তি করে নিয়ে বেশ বড় রকমের একটা চুমুক দিয়ে গুম মেরে বসে রইল। মিনিট কয়েক গলা বুক জ্বলল। তার পরের চুমুকেই গেলাস শেষ করে বাকিটাও ঢেলে নিল গেলাসে। মাথার মাঝে অদ্ভুত সব বাজনা বেজে উঠল ট্রেনের হুইসেল—প্ল্যাটফরম—পান বিড়ি সিগ্রেট, গরম চা...থৈ থৈ নদীর জল...কাশফুল...গোয়ালন্দ স্টীমার ঘাট...ঘাঘর নদী...মনসার পাঁচালি...দুর্গাপুজো...নৌকা বাইচ...ছলাৎ ছলাৎ জল...পার্বতী...নিপু...ব্যস; তারপর গেলাসের পর গেলাস শেষ করতে থাকল জয়দেব। বহুকাল অমৃতের স্বাদ ভুলে ছিল। মাথাটা আর সোজা রাখতে পারল না। দু চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম ভিড় করল...চোখের পাতায় আঠা লাগিয়ে দিয়েছে যেন কেউ। টেবিলে মাথা রেখে সবকিছু ভাবতে চেষ্টা করল—বনবন লাট্টুর মতো খালি ঘুরছে, সবকিছু ভেঙেচুরে দুমড়ে কোথায় কোন অজানা অচেনা জায়গায় চলে যাচ্ছে, কিছুই ঠাহর করতে পারল না জয়দেব। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। নন্দু সাহা ঠেলে তুলল জয়দেবকে। এই বাড়ি যাবে না—বাড়ি যাও; এখন আর এখানে থাকা চলবে না, বাড়ি যাও। উঠে দাঁড়িয়ে পকেট হাতড়ে বিড়ি বের করল জয়দেব। শুকনো ফ্যাকাশে হাসি হেসে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। সে সময় আকাশ থেকে অন্ধকার চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছিল। সবকিছু স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। পা দুটো অসম্ভব ভারি ঠেকল জয়দেবের। অনেক রাত পর্যন্ত ইতস্তত এদিক ওদিক পায়চারি করল। একসময় দরজা খুলে ঘরে ঢুকে দেখল, টিপু ঘরে নেই।

লক্ষ্মীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল কী যেন ভাবল। তারপর অস্পষ্ট গলায় ডাক দিল,—টিপু, টিপু রে, টিপু...

কবিতা কেন ?

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সত্যিই তো, কেন ?

আমাদের চতুর্দিকে অহোরাত্র যে অসংখ্য রকমের কর্মকান্ড চলেছে, এবং যার উপরে নির্ভর করছে আমাদের বৈষয়িক ভাল-মন্দ, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, তার সঙ্গে যদি কবিতা রচনা ও পাঠের ব্যাপারটাকে কার্যকারণের সূত্রে যুক্ত করে দেখানো যেত, এবং যদি বলা যেত যে, কিছু লোক কবিতা লেখেন ও কিছু লোক কবিতা পড়েন বলেই এত-সব কাজ অবাধে চলতে পারছে, নইলে এসব কাজের চাকা কবেই অচল হয়ে পড়ত, তাহলে আর কথাই ছিল না, একবারে নিশ্চিন্ত হয়ে সেক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারতুম যে, এই তো, এরই জন্যে কবিতা। কিন্তু সেইসব কর্মকান্ডের কোনোটার সঙ্গেই কবিতার ঠিক তেমন কোনো যোগসূত্র আমরা খুঁজে পাই না। রাতারাতি জলাভূমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে, ধাপে-ধাপে লাফিয়ে উঠছে অভ্রংলিহ অট্টালিকা, বিশাল বনস্পতিকে লাথি মেরে মাটিতে শুইয়ে দিচ্ছে বুলডোজার, কারখানার চিমনি গিয়ে মেঘের বালিশে মাথা রাখছে, নদীর গর্ভ থেকে উঠে আসছে মস্ত-মস্ত পিলার, তার উপরে ঢালাই হয়ে যাচ্ছে কংক্রীটের সড়ক, চায়ের পেটি কিংবা আলুর বস্তা ঘাড়ে নিয়ে হাইওয়ে কাঁপিয়ে ট্রাক ছুটছে, জাহাজের উদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে গম, তেল, যন্ত্রপাতি কিংবা নিউজপ্রিন্ট, মাটির তলায় পাতা হচ্ছে রেলের লাইন, রানওয়ে থেকে উর্ধ্বশ্বাসে উর্ধ্বাকাশে উঠে যাচ্ছে এরোপ্লেন, - এই যে এত-সব বৃহৎ ঘটনা, এর প্রত্যেকটিকে নিয়েই কবিতা লেখা যায় বটে, কিন্তু কবিতাকে এর একটিরও হেতু হিসেবে নির্দেশ করা চলে না। অর্থাৎ, এককথায়, এসব কাজের কোনোটার সঙ্গেই কবিতার কোনও কার্যকারণের সম্পর্ক নেই। এমন কি, নিতান্ত জীবিকার্জনের জন্যে ন্যূনতম যেটুকু উদ্যোগ আমাদের না-থাকলেই নয়, তার সঙ্গেও না। উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে কেউ কখনও কবিতা লিখতে বসেনি।

জীবিকার্জনের উদ্যোগের সঙ্গে কবিতার এই যে সম্পর্কহীনতা, রবীন্দ্রবর্ণিত কবি-গৃহিণী একেবারে সরাসরি এর দিকে আঙুল তুলেছেন। ভদ্রমহিলার উক্তি খুবই স্পষ্ট। স্বামীর উদ্দেশে তিনি যখন বলেন :

> গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
> মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম ;
> মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
> না মিলে শস্যকণা..[১]

তখন আমরাও তাঁর সঙ্গে একমত হই। আমরা বুঝতে পারি যে, এই গঞ্জনা একটা মস্ত বড় অভিমান থেকে উঠে আসছে বটে, কিন্তু তাঁর কথাটা তাই বলে মিথ্যে নয়।

প্লেটো অবশ্য অন্য দিক থেকে তাঁর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। 'রিপাবলিক'-এর দশম গ্রন্থে কবিতার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি, তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে, (ক) এমন সমস্ত বস্তুকে সে অনুকরণ করে দেখায়, যারা নিজেরাই অনুকরণ বা প্রতিচ্ছবিমাত্র ; উপরন্তু (খ) আমাদের হীন ও দুর্বল প্রবৃত্তিগুলিকে সে উস্কে দেয়, এবং বশবর্তী হতে শেখায় এমন সমস্ত আবেগ-বাসনার, যেগুলিকে দমন করা দরকার।[২]

এই ধরনের আপত্তি যে এ-দেশে কখনও ওঠেনি, তাও নয়। রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'য় যেসব আপত্তির উল্লেখ করেছেন, তা হল এই যে, (ক) কাব্যে মিথ্যা বিষয়ের বর্ণনা থাকে, (খ) অসৎ বা গ্রাম্য বিষয়ে উপদেশ থাকে, এবং (গ) অশ্লীল বিষয়ের বর্ণনা থাকে।[৫] (সুতরাং তার অধ্যয়ন বা আলোচনা অনুচিত।) রাজশেখর অবশ্য এসব আপত্তি গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু সেকথা আবার পরে আসবে। আপাতত প্লেটোর প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

কবিতাকে প্লেটো যে কেন 'ছায়ার অনুকৃতি' বা 'অনুকরণের অনুকরণ' বলে গণ্য করেন, তা আমরা জানি। বস্তুত, শুধু কবিতা কেন, যাবতীয় শিল্পকর্মই তাঁর কাছে 'অনুকরণের অনুকরণ' মাত্র, তার বেশি মর্যাদা তিনি তাদের দেন না। কেন দেন না, 'রিপাবলিক'-এ নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মোদ্দা কথাটা এই যে, জাগতিক যেসব বস্তু আমাদের চতুর্দিকে আমরা দেখতে পাই, তাদের প্রত্যেকটিরই পিছনে রয়েছে সেই বস্তু সম্পর্কিত ধারণা, এবং সেই ধারণাই হচ্ছে মূল সত্তা, বস্তু যার অনুকরণ মাত্র। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, ছুতোর-মিস্ত্রি যে টেবিল বানাচ্ছেন, সেই টেবিলও আসলে টেবিল-সংক্রান্ত ধারণা বা টেবিলের মূল সত্তার অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলত, কোনও শিল্পী যখন সেই টেবিলটিকে এঁকে দেখান, তখন সেটা অনুকরণের অনুকরণ হয়ে দাঁড়ায়। প্লেটো বলছেন, বস্তুর মূল সত্তার স্রষ্টা হচ্ছেন ঈশ্বর, এবং ঈশ্বর যদি স্বয়ং একটা টেবিল বানাতেন, তাহলে তাঁর বানানো সেই টেবিল একটি মৌলিক সৃষ্টি বলে গণ্য হতে পারত। কিন্তু, যেজন্যেই হোক, তা তিনি বানাননি। টেবিল বানিয়েছেন সূত্রধর, এবং শিল্পী সেই টেবিলের ছবি এঁকেছেন। শিল্পীর টেবিল অতএব টেবিলের মূল সত্তা থেকে তৃতীয় ধাপের দূরত্বে রয়েছে।[৬]

ঠিক ততটাই দূরে রয়েছে কবিতাও। যেমন শিল্পীর ছবি, তেমনি হোমারের কাব্যও অনুকরণের অনুকরণ, অর্থাৎ মূল সত্তা থেকে অনেক দূরবর্তী ব্যাপার। প্লেটো অন্তত এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছেন। তাঁর যুক্তি : কবিদের দৃষ্টি মূল সত্যের প্রতি নিবদ্ধ নয়, তাঁরা তার প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবিটিকেই শুধু দেখেন। এমন কি, সেই প্রতিচ্ছবিটিরও নির্মাতা তাঁরা নন। তাঁরা শুধু সেই প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছবি রচনা করেন। তাঁরা না-যোদ্ধা, না-জনসেবী, না-চিকিৎসক, না-পণ্ডিত। হোমারের কাব্যে যেসব বৃহৎ কর্মের বর্ণনা আমরা পাই, তিনি নিজে তার নায়ক নন। 'রিপাবলিক'-এ প্রশ্ন তোলা হয়েছে, হোমারের কালের এমন কোনও যুদ্ধের কথা কি কেউ জানে, যে-যুদ্ধের সাফল্য তাঁর নেতৃত্বে অথবা পরামর্শে অর্জিত হয়েছে? মানুষের উপকার হয়, এমন কোনও বাস্তব কৌশলের কি তিনি উদ্ভাবক? কিংবা এমন কোনও শিক্ষাকেন্দ্র কি তাঁর দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল, শিক্ষার্থীরা তাঁর উপদেশ শ্রবণের জন্য যেখানে সমবেত হত? এসব প্রশ্নের প্রত্যেকটিরই উত্তর হচ্ছে 'না'। অর্থাৎ, অন্যে পরে কা কথা, হোমারের মতো মহাকবিও নিজে কিছু ঘটান না, অথবা নিজে কিছু করেন না। অন্যের দ্বারা আয়োজিত ঘটনার অথবা অন্যের কৃত কর্মের বর্ণনা দেন মাত্র।[৭]

তা-ই যদি হয়, তাহলে আমরা কবিতা পড়ব কেন? মূল সত্তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কেন আমাদের আগ্রহকে সংহত করব সেই রচনার উপরে, যা আসলে ছায়ার ছায়ামাত্র? প্লেটো বলছেন, সত্যিই তা করা উচিত নয়। বলছেন, শুধু হোমার কেন, সত্য সম্পর্কে কোনও কবিরই কোনও যথার্থ জ্ঞান নেই। সুতরাং কবিতার উপরে আমাদের আগ্রহকে তো আমরা সংগ্রহ করবই না, বরং মানব-জীবনে কাব্যের প্রভাব যে কত অনিষ্টকর, অন্যদেরও তা জানিয়ে দেব।

বলা বাহুল্য, অন্যদের জানিয়ে দেবার ব্যাপারে প্লেটোর উদ্যোগে কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাঁর চেতাবনি সত্ত্বেও যে কবিতা রচনা ও পাঠের আগ্রহ এতাবৎকাল অব্যাহত থেকেছে, তা আমরা জানি। জানি যে, প্লেটো তাঁর কল্পরাজ্য থেকে কবিতাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু

আমাদের কল্পনাকে দীপিত করবার ব্যাপারে তার ভূমিকার কোনও অবসান তবু ঘটেনি, মানুষের চিত্তভূমিতে তার আসন চিরকাল অটুটই ছিল। উপরন্তু আমরা এও জানি যে, কবিতার প্রতি প্লেটো নিজেও কিছু কম আসক্ত ছিলেন না। বস্তুত, 'রিপাব্লিক'-এর ওই দশম গ্রন্থেই হোমারের প্রতি তাঁর আশৈশব অনুরাগ ও শ্রদ্ধার কথাটা তিনি অকপট ব্যক্ত করেছেন।

প্লেটো তাহলে আর কবিতার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন কেন? উত্তরটা আমরা প্লেটোর মুখেই শুনেছি। তিনি সত্যসন্ধ দার্শনিক; তাঁর দৃষ্টি সর্বোপরি সত্যের দিকে নিবদ্ধ। এবং কবিতা যেহেতু সত্যের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়, তাই—হোমারের রচনার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-ভালবাসা সত্ত্বেও—এই শিল্পকে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে তিনি স্থান দিতে পারেন না। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, আবেগনির্ভর কবিতাকে তিনি যুক্তিনির্ভর দর্শনের বিরোধী একটি শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন। কবিতা সম্পর্কে তাঁর অন্যাবিধ আপত্তি, বলা বাহুল্য, এই মৌল আপত্তির সূত্র ধরেই এসেছে।

কিন্তু কবিতা কি সত্যিই সত্যের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়? নাকি সে তার নিজস্ব পথে পৌঁছতে চায় দ্বিতীয় কোনও সত্যের ক্ষেত্রে, যাকে আমরা শিল্পের নিজস্ব সত্য বলে গণ্য করতে পারি? এই যে প্রশ্ন, এর উত্তর খুঁজে নেবার প্রয়াসে আমরা প্লেটোর শিষ্য আরিস্টটলের কাছ থেকে সাহায্য পাব, যাঁর কাব্যবিষয়ক প্রস্তাবকে অনেকে—আমরা আগেই বলেছি—কবিতার প্রতি প্লেটোর উগ্র উষ্মার উত্তর বলে গণ্য করে থাকেন।

যেমন অন্যাবিধ শিল্পকে, তেমনি কাব্যকেও আরিস্টটল যে অনুকরণ বলে মনে করতেন, কিন্তু অনুকরণের অনুকরণ নয়, তার কারণ, বস্তুজগৎ তাঁর কাছে নিতান্ত ছায়ামাত্র ছিল না, তাকে তিনি সত্য বলে মানতেন। ফলত, বস্তুজগৎকে যা অনুকরণ করে দেখায়, সেই কাব্যকে তিনি কখনও সত্য থেকে তৃতীয় ধাপের দূরত্বে অবস্থিত ব্যাপার বলে মনে করেননি। কাব্যবিচারে গুরুশিষ্যের মতামতে আর-একটি পার্থক্যও আমরা লক্ষ না-করে পারি না। আমাদের চিত্তের উপরে কাব্যের ক্রিয়া সম্পর্কে গুরু ও শিষ্য দুজনেই অবহিত ছিলেন; কিন্তু তাঁর গুরুর মতো, আরিস্টটল কখনও এমন সিদ্ধান্ত করেননি যে, কাব্যের কাজ হচ্ছে নেহাতই আমাদের দুর্বল প্রবৃত্তিগুলিকে উসকে দেওয়া। বরং তাঁর কাব্যবিষয়ক প্রস্তাবে তিনি স্পষ্ট করেই বলছেন যে, কাব্যের আবেদন আমাদের চিত্তের গভীরে গিয়ে সাড়া জাগায়। শুধু তা-ই নয়, কাব্য যে দর্শনবিরহিত ব্যাপার, এমন কথাও তিনি মানলেন না। ইতিহাস ও কাব্যের তুলনাপ্রসঙ্গে বরং জানালেন যে, ইতিহাসের চেয়ে কাব্য আরও দার্শনিক ও তার তাৎপর্য আরও দূরপ্রসারী, কারণ, কাব্য যেক্ষেত্রে সর্বজনীন সত্যের কথা বলে, ইতিহাস সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কথা শোনায় মাত্র।*

কাব্যের বিরুদ্ধে অনৈতিকতার যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তাকে আমল দেননি আরিস্টটল। বলেছেন, কোনও উক্তি অথবা আচরণকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করলে এক্ষেত্রে চলবে না; দেখতে হবে, কথাটা কে বলছে অথবা কাজটা কার। সেই সঙ্গে দেখতে হবে যে, সেই উক্তি অথবা আচরণের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিই বা কে। ..উক্তি অথবা আচরণের উদ্দেশ্য অথবা অভিপ্রায় কী, সেটাও হিসেবের মধ্যে ধরা চাই। ভেবে দেখতে হবে যে, বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য, অথবা বৃহত্তর অমঙ্গলকে এড়াবার জন্য, কথাটা বলা হচ্ছে কি না অথবা কাজটা করা হচ্ছে কি না।*

এই যে কোনও উক্তি অথবা আচরণকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে, উদ্দেশ্য তাৎপর্য ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করে, সম্পৃক্ত করে দেখা, সাহিত্যবিচারে এই পদ্ধতির মূল্য যে কতটা, তা আমরা জানি। কিন্তু শুধু এই পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না আরিস্টটল, এই সঙ্গে তিনি আরও একটা কথা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, কাব্যবিচারের ব্যাপারে যা কিনা আরও জরুরী। ইতিপূর্বে তিনি আমাদের

বলেছেন যে, কাব্য কীভাবে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ সত্যকে অতিক্রম করে সর্বজনীন সত্যের ক্ষেত্রে পৌঁছে যায়। এবারে তারই সূত্র ধরে তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে এলেন। কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা নির্ভুল, তার বিচারের প্রসঙ্গে এসে বললেন, কাব্যশিল্প ও অন্যবিধ সামাজিক ক্রিয়াকর্মের পদ্ধতি এক নয়, সুতরাং তাদের (বিচার করবার) মানদণ্ডও হবে আলাদা।

কবিতা কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে প্লেটোর কাছে আমরা শুনেছিলুম যে, কবিতা কেন নয়। এবারে আরিস্টটলের কাছে পাল্‌টা উত্তর শোনা গেল। শিল্পকর্ম সম্পর্কে প্লেটোর অভিমতকে অবশ্য অন্যভাবেও খণ্ডন করা যায়। তাঁর কাছে আমরা তিন রকমের টেবিলের কথা শুনেছি। ঈশ্বরের টেবিল (অর্থাৎ টেবিলের মূল সত্তা), ছুতোর-মিস্তির টেবিল ও চিত্রকরের টেবিল। আরও শুনেছি যে, ছুতোর-মিস্তির টেবিল ও চিত্রকরের টেবিলকে মৌলিক সৃষ্টি বলে গণ্য করা যায় না। কেননা, টেবিলের মূল সত্তা থেকে তারা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপের দূরত্বে অবস্থান করছে। দ্বিতীয়টি মূল সত্তার অনুকরণ ও তৃতীয়টি মূল সত্তার অনুকরণের অনুকরণ। এই যে তিন রকমের টেবিল, এদের মধ্যে প্রথমটিকে অর্থাৎ টেবিলের মূল সত্তা বা ঈশ্বরের টেবিলকেই প্লেটো সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা যায় যে, তিনটি টেবিলের উপযোগিতাও তিন রকমের। ঈশ্বরের টেবিল বা টেবিল সংক্রান্ত বিশুদ্ধ ধারণা ব্যতিরেকে সূত্রধরের টেবিল নির্মিত হতে পারত না, একথা স্বীকার করে নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায় যে, সেই বিশুদ্ধ ধারণার উপরে কি আমরা ভাতের থালা রাখতে পারি? তা আমরা পারি না। তার জন্য সূত্রধরের টেবিলই আমাদের চাই। আবার সূত্রধরের টেবিল আমাদের নান্দনিক ক্ষুধা মেটায় না। সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য চাই চিত্রকরের আঁকা টেবিল। অর্থাৎ প্লেটো যাদের 'অনুকরণ' ও 'অনুকরণের অনুকরণ' বলছেন, উপযোগিতার বিচারে গুরুত্ব তাদেরও কিছু কম নয়।

প্লেটোর আপত্তিকে, বলাই বাহুল্য, সেদিক থেকে বিচার করেননি আরিস্টটল। কিন্তু নানাবিধ শিল্পকর্মের প্রেরণা ও শ্রেণী-বিভাজন[৮] সম্পর্কে সাধারণভাবে নানা কথা বলে নিয়ে অতঃপর বিশেষ-ভাবে কবিতা সম্পর্কে তিনি যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর যুক্তিজাল, এবং যেভাবে ইঙ্গিত করেছেন এই শিল্পের ধ্রুব ভূমিকার দিকে, ভবিষ্যৎকালের সাহিত্যচিন্তাকে যে তা কতটা প্রভাবিত করেছিল, আরিস্টটলের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরে—খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও উনবিংশ শতাব্দীতে—রচিত কবিতা-বিষয়ক দুটি অতিবিখ্যাত নিবন্ধ তা আমাদের জানিয়ে দেয়। সেখানে, সেই নিবন্ধ দুটির উপরে, আরিস্টটলীয় কাব্যভাবনার ছায়াকে আমরা বারে বারে সঞ্চারিত হতে দেখি। বলা বাহুল্য, আমরা সিডনির 'অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি' এবং শেলির 'এ ডিফেন্‌স অব পোয়েট্রি'র কথা বলছি, পরে যাকে আমরা সংক্ষেপে শুধুই 'অ্যাপোলজি' ও 'ডিফেন্‌স' বলে উল্লেখ করব।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, কবিতাকে প্লেটো যেক্ষেত্রে দর্শনের বিরোধী শক্তি হিসেবে দেখে-ছিলেন (অন্তত দেখেছিলেন বলেই আমরা অনুমান করে থাকি), 'অ্যাপোলজি' অথবা 'ডিফেন্‌স'—কোনওটিরই লেখক সেক্ষেত্রে দর্শন ও কবিতার এই পারস্পরিক বিরোধের ব্যাপারটাকে মানতে চান না। 'অ্যাপোলজি'র লেখক, বস্তুত, তাঁর নিবন্ধের সূচনাতেই প্রাচীন কালের এমন অনেক দার্শনিক ও চিন্তানায়কের কথা আমাদের জানিয়ে দেন, যাঁরা—অন্তত প্রথম দিকে—কবিতার মাধ্যমে জন-সাধারণের কাছে তুলে ধরতেন তাঁদের চিন্তালব্ধ শস্যসম্ভারকে, এবং, সেই কারণে, সমকালীন জন-সাধারণ যাঁদের, মূলত, কবি বলেই জানত।[৯] অর্থাৎ, যেটা তাঁদের বলবার কথা, সেটাকে তাঁরা কবিতার পোশাক পরিয়ে বলতেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁরা ছিলেন ছদ্মবেশী দার্শনিক। 'অ্যাপোলজি'র লেখকের এই বক্তব্য যে কবিতা ও দর্শনের মধ্যবর্তী পাঁচিলটাকে বেশ জোরালো রকমের একটা ধাক্কা মারে, তাতে সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে, 'ডিফেন্‌স'-এর লেখক সেই পাঁচিলটাকে একেবারে গুঁড়িয়ে

দেবার জন্যে বলেন যে, কবিতার প্রতি যাঁর 'ক্ষমাহীন বিরূপতা'র কথা আমরা শুনে আসছি, সেই প্লেটোও আসলে একজন ছদ্মবেশী কবিই। বলা বাহুল্য, কবিতা ও গদ্যের কোনও কৃত্রিম বিভাজনকে শেলি কখনও মেনে নেননি। কবিতাকে শনাক্ত করতে গিয়ে তার শারীরিক গঠন-বিন্যাসের উপরে চোখ রাখতেন না তিনি, গুরুত্ব আরোপ করতেন আমাদের ভাবনায় যেটা ব্যক্ত রূপ, তার অন্যবিধ লক্ষণের উপরে। প্লেটোর রচনায় সেই লক্ষণগুলিকে যখন তিনি দেখতে পেলেন, তখন প্লেটো যে বস্তুত কবি, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হল না।[১০]

দার্শনিকেরা কিংবা ঐতিহাসিকেরা যে কেন কবিতার মাধ্যমে তাঁদের তত্ত্বকথা অথবা ইতিবৃত্ত প্রচার করতেন, 'অ্যাপোলজি'র লেখকের কাছে তাও আমরা শুনেছি। তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, অন্য মাধ্যমের প্রতি সাধারণ মানুষের ততটা আগ্রহ ছিল না, যতটা ছিল কবিতার প্রতি। ফলত, সাধারণ মানুষদের কাছে কোনও বক্তব্যকে পৌঁছে দিতে হলে কবিতার মাধ্যমেই সে-কাজ করতে হত, তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। (কবিতার মাধ্যমকে স্যর ফিলিপ সিডনি আসলে 'a great passport' বা 'মস্ত একটি ছাড়পত্র' আখ্যা দিয়েছেন, যা থাকলে তবেই জনচিত্তে প্রবেশ করা যায়।) অতঃপর তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে যান, এবং বলেন যে, দার্শনিকের চেয়ে কবির ভূমিকা আরও বড়, এবং তাঁর ক্ষেত্রও আরও ব্যাপক। দার্শনিকের কথা তো শুধু মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত লোকে বোঝে, অর্থাৎ যারা ইতিপূর্বেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে, তিনি তাদের শিক্ষক। আর কবির কথা সেই তুলনায় অনেক সহজপাচ্য (তাঁর গ্রাহ্যতার ভূমিও তাই অনেক বড়), এবং সেদিক থেকে বিচার করলে বলতেই হয় যে, কবিই হচ্ছেন জনগণের প্রকৃত দার্শনিক।[১১]

আর অনৃতভাষিতা? ঠাট্টা করে সিডনি বলছেন, পৃথিবী থেকে নানা গ্রহতারার দূরত্ব যাঁরা মেপে দেখান, সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মিথ্যের বহরটা কি আরও বড় নয়? কিংবা চিকিৎসকদের? কবিরা বরং সবচেয়ে কম মিথ্যাবাদী। মিথ্যুক কারা? না যেটা সত্য নয়, সেটাকে যারা সত্য বলে জোর গলায় জাহির করে, তারাই হচ্ছে মিথ্যুক। কিন্তু, কবিরা (দ্বিধায়, কুণ্ঠায়, সন্দেহে, সংশয়ে সারাক্ষণ যাঁরা পীড়িত, এবং 'যেন' ও 'হয়তো'র রাজ্যে যাঁরা ঘুরে বেড়ান) তো তেমন জোর গলায় কিছুই জাহির করেন না। মিথ্যেটাকে সত্যি বলে "অ্যাফার্ম" করবার কোনও প্রশ্নই এক্ষেত্রে উঠতে পারে না, কেননা, সিডনি বলছেন, 'অ্যাফার্ম' করাটাই তাঁদের ধাতে নেই। ("..the poet never affirmeth.")

অনৃতভাষিতার যে অভিযোগ, তার উত্তর অবশ্য অন্যভাবেও দেওয়া যায়। বলা যায় যে, যাকে আমরা 'অসত্য' ভাবি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা অতিশয়োক্তি মাত্র। এই যে অতিশয়োক্তি বা বাড়িয়ে বলা, যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন যে, এর প্ররোচনা কোত্থেকে আসে, তো উত্তরে আমরা শিল্পীর আবেগোচ্ছ্বাসের সঙ্গে একে যুক্ত করে দেখাতে পারি। বিজ্ঞানে কি ন্যায়শাস্ত্রে অতিশয়োক্তির কোনও অবকাশ নেই। তার কারণ, আবেগোচ্ছ্বাসেরও কোনও ভূমিকা নেই সেখানে। সেখানে যা-কিছু দাঁড়ায়, তা শুধু তথ্যভিত্তিক নিপাট যুক্তির উপরে দাঁড়ায়। অন্য দিকে, ইংরেজিতে যাকে "ক্রিয়েটিভ আর্জ" বলা হয়, শিল্পসৃষ্টির সেই আন্তর তাগিদের সঙ্গে আবেগোচ্ছ্বাস একেবারে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আর তাই, কিছু-না-কিছু অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জন সেখানে ঘটেই। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি :

> "আজ বসন্তে বিশ্বখাতার
> হিসেব নেই কো পুষ্পে পাতায়
> জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
>   সকল কথাই বাড়িয়ে বলে"[১২]

তখন আমরা বুঝতে পারি যে, অতিরঞ্জনের এই ব্যাপারটাকে তিনি প্রকৃতির সৃষ্টিলীলার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর মানুষের সৃষ্ট শিল্পমালা তো সেক্ষেত্রে অসংখ্য অতিরঞ্জনে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু এই অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি যে শিল্পেরই অঙ্গ, সে-কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। বায়রন যখন বলেন ·

> "Maid of Athens, ere we part,
> Give, oh give me back my heart !
> Or, since that has left my breast,
> Keep it now, and take the rest !" [১৩]

কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন :

> "একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
> ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী" [১৪]

কিংবা আমাদের তরুণ কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন বলেন :

> "অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে-মুখে রটে যায়
> নীরার খবর
> বকুলমালার তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশি" [১৫]

তখন যুক্তিবাদী তার্কিক হয়তো বলবেন যে, এসব একেবারে নির্জলা মিথ্যে কথা, বায়রন মোটেই তাঁর বক্ষ থেকে হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে সেটি আথেন্সের কোনো ললনার হাতে সমর্পণ করেননি, সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে (শুধু সুধীন্দ্রনাথ বলে কথা কী, কোনও মর্ত্যমানবের পক্ষেই) সম্ভব নয় ইন্দ্রপুরীর আনন্দ আন্দাজ করা, এবং সুনীল যা-ই বলুন, লক্ষ-লক্ষ মানুষের মুখে নীরা-নাম্নী একটি বালিকার খবর রটে যাওয়াটা একেবারে আদ্যন্ত অসম্ভব একটা ব্যাপার; কিন্তু আমরা যারা অতিবাদকে শিল্পের অঙ্গ বলে জেনেছি, তারা এইসব উক্তির মধ্যে কোনও দোষ দেখব না, বরং শিল্পের রসে রঞ্জিত এই অতিশয়োক্তিগুলিকে আমরা কবিতার এক-একটি মহার্ঘ অলঙ্কার বলেই চিনে নেব।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তো বটেই, গানেও এই ধরনের অলংকার আমরা প্রচুর দেখতে পাই। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ছে "একদা তুমি, প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে" গানটির কথা। ফুলসজ্জায় সজ্জিত হয়ে কবির তরুমূলে যে মেয়েটি একদা উপবেশন করেছিল, তাকে সম্বোধন করে কবি বলছেন যে, সেদিনকার কথা তার হয়তো মনে নেই, কিন্তু নদী তাকে ভোলেনি; এমন কি, নদী তার স্রোতের মধ্যে সেই মেয়েটির বেণীর ছবিটিকে আজও ধরে রেখেছে।[১৬] শুনে, সত্যান্বেষী তার্কিক হয়তো এক্ষেত্রেও বলবেন যে, এটা একেবারে নির্জলা মিথ্যে কথা, নদী কাউকে মনে রাখে কিংবা আপন স্রোতোধারার মধ্যে ধরে রাখে কারও বেণীর চিত্র, এই সংবাদ আদৌ বিশ্বাসজনক নয়। কিন্তু আমরা সে-কথা বলব না। আমরা ঠিকই বুঝে নেব যে, কবিই সেই মেয়েটিকে আজও ভুলতে পারেননি, এবং, নদীর বাঁকা স্রোতের দিকে চোখ পড়বামাত্র, কবিরই আজও সেই মেয়েটিই বঙ্কিম বেণীর কথা মনে পড়ে যায়, কিন্তু এই সত্য কথাটা সরাসরি না বলে কবি যে তাঁর স্মৃতিকে এক্ষেত্রে নদীর উপরে আরোপ করেছেন, এতেই বরং আরও সম্পন্ন হয়ে উঠেছে তাঁর গানের বাণী। এটা অবশ্য অতিশয়োক্তি নয়, ঘুরিয়ে কথা বলবার ব্যাপার, কিন্তু অলংকার হিসেবে এর মূল্যও অপরিসীম।

কিন্তু আর নয়। কবিতার বিরুদ্ধে হরেক অভিযোগের ফিরিস্তি আমরা শুনেছি, এবং জেনেছি যে, কেন সেগুলি ধোপে টেঁকে না। সওয়াল-জবাবের মধ্য দিয়ে এই কথাটা আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে, কবিতার প্রতি বিরূপ হবার সত্যি কোনও কারণ নেই। কিন্তু এটা হল নঙর্থক

কথা, উলটো-দিক থেকে বিচার করবার ব্যাপার। এবারে সোজাসুজি আমরা কবিতার দিকে তাকিয়ে জেনে নিতে চাই যে, কোন্ সদর্থক (পজিটিভ) গুণ রয়েছে তার। বুঝতে চাই, ও কে আমরা সময় দেব কেন। অর্থাৎ, কেন আমরা কবিতা পড়ব।

কিন্তু তার আগে একটা সহজ কথা বোধ হয় স্বীকার করে নেওয়া ভাল। সেটা এই যে, কবিতা না-পড়লেই যে মানবজীবন একেবারে অচল হয়ে পড়বার আশঙ্কা, তা কিন্তু নয়। এমন একটা রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার কথা অনেকেই কল্পনা করেছেন, যেখানে কোনও মানুষেরই খাওয়া-পরার কোনও কষ্ট থাকবে না। তা ছাড়া, কাউকে সেখনে নিরাশ্রয় হয়ে দিন কাটাতে হবে না, বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে না, এবং প্রত্যেকেই সেখানে লেখাপড়া করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু, অন্তত এখনও পর্যন্ত, এমন কোনও রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার কথা কেউ কল্পনা করেননি, যেখানে সবাই দিনের মধ্যে অন্তত কিছুটা সময় গান শুনতে কিংবা ছবি দেখতে চাইবে। ঠিক তেমনি, সর্বজনে যেখানে কবিতা পড়তে চাইবে, এবং পড়বার সুযোগ না-পেলে ভাববে যে, জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল, এমন কোনও রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থার কথাও কেউ কল্পনা করেননি।

কেন করেননি, সেটা বুঝতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়। কবিতাপাঠ আমাদের ন্যূনতম চাহিদা বলে গণ্য হয় না। হবার কোনও কারণও নেই। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা, সাক্ষরতা ইত্যাদি যে আমাদের ন্যূনতম চাহিদা বলে গণ্য হয়, তার কারণ, এগুলি ছাড়া কারও চলে না। কিন্তু যেমন গান কিংবা ছবি, তেমনি কবিতা ব্যতিরেকেও অসংখ্য মানুষের দিন দিব্যি কেটে যায়।

সত্যি বলতে কী, তেমন মানুষ আমাদের চারপাশেই আমরা অহরহ দেখতে পাই। কবিতার প্রসঙ্গে বলি, আমাদের প্রত্যেকেরই এমন বিস্তর প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধব রয়েছেন, যাঁরা প্রতিবেশী আত্মীয় কিংবা বন্ধু হিসেবে হয়তো খুবই ভাল ও নির্ভরযোগ্য, কিন্তু কবিতা নামক ব্যাপারটার ছায়াও পারতপক্ষে মাড়ান না। কখনও যে তাঁরা কবিতা পড়েননি, তা হয়তো নয়, ছাত্রাবস্থায় নিশ্চয়ই পড়েছিলেন, কিন্তু সে তো নেহাতই পরীক্ষায় পাস করবার জন্যে নোট মিলিয়ে পড়া, পরীক্ষার পাট চুকে যাবার পরে কবিতার সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক তাঁরা চুকিয়ে দিয়েছেন, এবং তার জন্যে যে এঁদের জীবন কোথাও ঠেকে থাকছে, তাও নিশ্চয় নয়। একদা তাঁরা দায়ে ঠেকে, বাধ্য হয়ে গুটিকয় কবিতা পড়েছিলেন, কিন্তু সেই বাধ্যবাধকতার পর্ব শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং আর-কখনও তাঁরা কবিতা পড়বেন না।

অনেকেই পড়েন না। এবং তা সত্ত্বেও তাঁদের দিন দিব্যি কেটে যায়। যেমন গান না-শুনে এবং ছবি না-দেখেও অনেক মানুষেরই দিন দিব্যি কাটতে থাকে, এও তেমনি ব্যাপার, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং ধরে নেওয়াই ভাল যে, কবিতা নামক ব্যাপারটা সকলের জন্যে নয়।

কারও-কারও জন্যে। জীবনানন্দ বলেছেন, সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি। এক্ষেত্রেও সেই একই কথা। সকলেই পাঠক নয়, কেউ-কেউ পাঠক।

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, কেন পাঠক? কবিতা কি সত্যিই তাঁদের কিছু দেয়? যদি দেয়, তো সেটা কোন্ বস্তু? কী সেই প্রাপ্তি, যার প্রত্যাশায় তাঁরা কবিতার দিকে, আবহমান কাল ধরে, হাত বাড়িয়ে আছেন?

একটা প্রাপ্তির কথা আমরা 'ডিফেন্স'-এর লেখকের কাছেই শুনি। তিনি বলেছেন, কবিতা আমাদের চিত্তকে জাগিয়ে তোলে ও তার প্রসার ঘটায়। পৃথিবীর গোপন সৌন্দর্যকে সে অনবগুণ্ঠিত করে দেখায়, এবং এমনভাবে দেখায় যে, যে-বস্তুজগৎকে আমরা চিনি, তাকেও যেন অচেনা ঠেকতে থাকে।[১৭]

আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষায় ছন্দের রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।"[১৮] সেদিক থেকে যদি দেখি, তাহলে বুঝতে হবে যে, কবির অনুভূতি এই যে ভাষার মধ্যে, অর্থাৎ, রূপের মধ্যে, নিজের নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করছে, এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই পাঠকের পক্ষে একটা মস্ত প্রাপ্তি।

কবিতা কেন, এই প্রশ্নের আরও অনেক-অনেক উত্তর নিশ্চয় খুঁজে বার করা যায়। কিন্তু আপাতত তার দরকার নেই, অন্য-কোনও উত্তরের সন্ধানে ব্যাপৃত হবার আগে বরং এই দুটি উক্তিকেই আর-একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শেলি বলছেন বস্তুজগতের কথা (কবিতা যার গোপন সৌন্দর্যের নির্মোকটাকে খসিয়ে দেয়) আর রবীন্দ্রনাথ বলছেন আন্তর অনুভূতির কথা (রূপের মধ্যে যে-অনুভূতির নিত্যতা নিজেকে 'প্রতিষ্ঠিত করতে' চাইছে)। হঠাৎ শুনলে এই উক্তি দুটিকে—যার একটিতে দৃশ্য জগতের উপরে জোর পড়েছে ও অন্যটিতে আন্তর অনুভূতির উপরে—পরস্পরের বিরোধী বলে মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু তা যে নয়, বরং এই উক্তি দুটি যে পরস্পরের পরিপূরক, একটু বাদেই তা আমরা ধরতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, যা দিয়ে কবিতা তৈরি হয়ে ওঠে, সেই অপরিহার্য দুটি অংশের কথাই দুই কবি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। একজন বলছেন বিষয়বস্তু বা উপকরণের কথা। অন্যজন উপলব্ধির।

বলা বাহুল্য, কবিতার যেটা বিষয়বস্তুর দিক কোনও কাহিনী কিংবা কোনও ঘটনা কিংবা কোনও দৃশ্য সরাসরি তার কাছ থেকেও আমরা অনেকেই অনেক-কিছু পেয়ে যাই। দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথেরই কয়েকটি কবিতার উল্লেখ আমরা করতে পারি। রাত্রি যখন আসন্ন, গর্জিত মহাসমুদ্রের উপর দিয়ে সঙ্গিহীন একটি পাখি তখন উড়ে চলেছে, তাঁর 'দুঃসময়' কবিতার এই যে বিষয়বস্তু, শুধু এরই গুণে এই কবিতা যে কারও-কারও চিত্তে সাহসের সঞ্চার করে, আবার কারও-কারও চিত্তে প্রেরণা জোগায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও পরিণামের কথাচিন্তা না-করে আপন ভূমিকায় সুস্থিত থাকতে, সেকথা স্বীকার্য। ঠিক তেমনি 'বর্ষশেষ' কবিতার বিষয়বস্তু আমাদের জানিয়ে দেয় যে, ভয়ংকর বিপর্যয়ের ভিতর দিয়েই সম্ভব হতে পারে, হয়ে থাকে, নবীনতার অভ্যুদয়। আবার একইভাবে, 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটি থেকে আমরা আমাদের শোকার্ত সময়ে কিছু সান্ত্বনা পেতে পারি, এবং 'দুই পাখি' কবিতাটির বিষয়বস্তু থেকে বুঝে নিতে পারি যে, সুখ ও স্বাধীনতা কেন, আত্যন্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না।

এই যে সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষা এই কবিতাগুলির ভিতর থেকে অনেকে পেয়ে আসছেন, এবং আরও অনেককাল ধরে আরও অনেকে পাবেন, এসব প্রাপ্তির কোনওটিরই মূল্য কিছু কম নয়। কবিতা পাঠের খুবই মূল্যবান কয়েকটি পুরস্কার বলে এদের আমরা গণ্য করতে পারি। কিন্তু, বিষয়বস্তুর সঙ্গে এদের সরাসরি যোগসম্পর্ক সত্ত্বেও, এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন ওঠে। সেটা এই যে, কবিতার নিজস্ব প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যদি না এরা পাঠকের কাছে এসে পৌঁছত, তাহলে এই সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষার ব্যাপারটা ঠিক এতটাই জোর পেত কি না। তা যে কিছুতেই পেত না, আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই তা আমরা বলতে পারি। আমরা জানি যে, এই ধরনের সাহস, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শিক্ষার কথা নানা নীতিগল্পের মধ্য দিয়েও আমাদের শোনানো হয়ে থাকে, কিন্তু এই কথাগুলি সেখানে এর সিকির সিকিও জোর পায় না।

কেন পায় না, সেটা বুঝবার জন্যে শেলির কাছেই আবার আমাদের ফিরতে হবে, এবং আর-একটু নজর করে দেখতে হবে তাঁর উক্তিটিকে। শেলি বলছেন, কবিতা এই বস্তুপৃথিবীর গোপন সৌন্দর্যকে গুণ্ঠনমুক্ত করে দেখায়, এবং এমনভাবে দেখায় যে, যেসব বস্তুকে আমরা চিনি, তাদেরও

যেন অচেনা ঠেকতে থাকে।" এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যার সৌন্দর্যকে গোপন বলা হচ্ছে, সেই বস্তুপৃথিবী নিজে কিন্তু গোপন নয়, আমাদের চোখের সম্মুখেই সে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এমন কি, কবিতার সাহায্য ব্যতিরেকে যে তার সৌন্দর্যসম্ভার কারও চোখে পড়ে না, তাও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বস্তুত, যাঁরা কবিতা পড়তে অভ্যস্ত নন, তাঁরাও তার অরণ্যের শ্যামশোভা, পর্বতের ধূমল বিস্তার, নদীর তরঙ্গভঙ্গ ও সমুদ্রের সফেন উচ্ছ্বাস দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, তা-ই যদি হয়, তবে আর এই বস্তুপৃথিবীর সৌন্দর্যকে 'গোপন' বলবার অর্থ কী, এবং এমন কথাই বা আমরা কী করে মানব যে, কবিতা সেই সৌন্দর্যকে গুণ্ঠনমুক্ত করে দেখায়?

শেলির উক্তির দ্বিতীয়াংশে এসে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পেয়ে যাই আমরা। সেখানে তিনি বলছেন, সৌন্দর্যের গুণ্ঠনমোচন করে কবিতা তাকে "এমনভাবে দেখায় যে, যেসব বস্তুকে আমরা চিনি, তাদেরও যেন অচেনা ঠেকতে থাকে।" এই যে উক্তি, বস্তুত এটি একটি ধ্রুব ইঙ্গিত, এবং এরই সূত্র ধরে আমরা বুঝতে পারি যে, শেলি যাকে সৌন্দর্যের গুণ্ঠনমোচন বলছেন, আসলে তা বিভিন্ন বস্তুরই এমন এক ধরনের উপস্থাপনা, আমাদের প্রাত্যহিক পরিচিতির স্পর্শে মলিন নানা বস্তু যার ফলে কিছুটা রহস্যময়তা পেয়ে যায়। পুরনো, পরিচিত বস্তুসম্ভারকে সেই রহস্যময়তাই আবার নবীন করে তোলে।

তবে কি এসব বস্তুকে আমরা যেখান থেকে যেমনভাবে দেখি, কবিরা ঠিক সেখান থেকে দেখেন না বলেই তেমনভাবে দেখেন না? ঠিক তা-ই। তাঁদের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন বলেই আলো-ছায়ার বদল ঘটে ও বস্তুগুলির তাৎপর্য অনেকটা পালটে যায়, এবং, কবিতা পড়বার সময়ে তাঁদের চোখ দিয়ে দেখি বলেই, আমাদের কাছেও সেই বস্তুগুলি কিছুটা রহস্যময় হয়ে ওঠে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে, নির্দিষ্ট যে রূপের সীমার মধ্যে যাকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত, শুধু তারই মধ্যে তার রূপগত সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যায়নি, অনাত্তর রূপও তার মধ্যে নিহিত হয়ে ছিল, এবং কবি আমাদের দেখিয়ে না-দিলে সেই অনাত্তর রূপ আমাদের চোখে কখনও ধরাই পড়ত না।

বলা বাহুল্য, যেমন বস্তু সম্পর্কে, তেমনি বিষয় সম্পর্কেও একথা সত্য। কবি তাঁর আপন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর আপন অনুভূতি অথবা উপলব্ধির আলোয় যখন দেখেন, তখন তাঁর সেই দেখার গুণে আমাদের পরিচিত নানা বিষয়ের তাৎপর্যও অনেকখানি পালটে যায়, এবং তারই ফলে আমাদের চিত্তে সেইসব বিষয়ের অভিঘাত আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

সত্যি বলতে কী, সেই অভিঘাত যদি সাহস, প্রেরণা, শিক্ষা কিংবা সান্ত্বনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়ে না উঠত, তাতেও কোনও ক্ষতি ছিল না। কেননা, কবিতার কাছে আমাদের প্রাপ্তি শুধু এইটুকুই নয়, আরও বেশি। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সৌন্দর্যদর্শন। যার অভিঘাত আরও ব্যাপ্ত হয়ে, বস্তুত আমাদের সমগ্র চিত্ত জুড়ে, কাজ করতে থাকে। শেলি যে বলেছেন, কবিতা আমাদের চিত্তকে জাগিয়ে তোলে ও তার প্রসার ঘটায়, এই হচ্ছে তার তাৎপর্য। তিনি যে আসলে বস্তুজগতের উপরে জোর দেননি, জোর দিয়েছেন কবির চোখে চোখ মিলিয়ে তাকে দেখবার উপরে, তা আমরা জেনেছি। জেনেছি যে, যাকে তিনি সৌন্দর্যের গুণ্ঠনমোচন বলেছিলেন, আসলে সেটা আমাদের প্রতিদিনের দেখা সৌন্দর্যের অতিরিক্ত কোনও সৌন্দর্য আবিষ্কারের ব্যাপার। কবি তাঁর আপন উপলব্ধির আলোয় তাকে খুঁজে নেন, এবং আমাদের চোখের সামনে তাকে তুলে ধরেন।

সৌন্দর্যের সঙ্গে এই যে পরিচয়, প্রাপ্তি হিসেবে এরই মূল্য হয়তো সর্বাধিক। কবিতা এই পরিচয়ের ক্ষেত্র রচনা করে দিচ্ছে; একের উপলব্ধিকে সে সর্বজনের করে তুলছে। শুধু তা-ই নয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা ছিল একটি বিশেষ মানুষের একটি বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতি, তাকে

সে উত্তীর্ণ করে দিচ্ছে নিত্যকালের দুয়ারে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, "কবিচিত্তে যে অনুভূতি গভীর, ভাষার রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়", তখন কবিতার এই নিত্যকালীন আবেদনের কথাটাই তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন।

পাদটীকা

১. পুরস্কার। 'সোনার তরী'।

২. "..Poetry, the false Siren, the imitator of things which themselves are shadows, the ally of all that is low and weak in the soul against that which is high and strong, who makes us feed the things we ought to starve and serve the things we ought to rule." আরিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব'-এর ইনগ্রাম বাইওয়াটার-কৃত তর্জমার ভূমিকা। গিলবার্ট মারে।

৩ 'রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা'। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৪ "..the work of the artist is at the third remove from the essential nature of the thing.." প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর এফ এম কর্নফোর্ড-কৃত তর্জমা।

৫. হোমার যে কবিমাত্র, আর কিছু নন, এত জোর দিয়ে একথা বলবার হেতু নাকি এই যে, বিশেষভাবে হোমারকে ও সাধারণভাবে ট্রাজেডি-রচয়িতাদের সেই সময়ে—সফিস্ট ও হোমার-অনুবৃত্তিকারদের পক্ষ থেকে—সর্বগুণান্বিত মানুষ হিসেবে প্রচার করা হত। বলা হত, তাঁরা পদ্মভুক মানুষ নন, মালবাহী শকট নির্মাণ ও রথচালনা থেকে শুরু করে সমরকৌশল-নির্ধারণ পর্যন্ত অসংখ্য বিদ্যা তাঁদের অধিগত; উপরন্তু নীতি ও ধর্মের ব্যাপারেও সর্বসাধারণকে তাঁরা সঠিক পন্থার নির্দেশ দিতে সক্ষম। প্লেটো বস্তুত এই দাবিটাকেই অসার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন; যে-দাবি কবিকে দার্শনিকের আসনে বসায়, এবং দর্শনচর্চার পরিবর্তে কাব্যচর্চায় উৎসাহিত করে মানুষকে, তা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। (প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর কর্নফোর্ড-কৃত তর্জমায় দশম গ্রন্থের সূচনায় সন্নিবেশিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

৬ "..poetry is something more philosophic and of greater import than history, since its statements are of the nature rather of universals, whereas those of history are singulars." আরিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব'-এর ইনগ্রাম বাইওয়াটার-কৃত তর্জমা।

৭. কবিতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে রাজশেখরও পরবর্তী কালে অনেকটা এই ধরনের কথাই বলেছেন। কাব্যে অন্তর্ভুক্ত যে উপদেশ বা আলোচনাকে সমালোচকেরা অনৈতিক (অসৎ বা গ্রাম্যতা-দোষযুক্ত) মনে করেন, তাকে সমর্থন করতে গিয়ে রাজশেখরও তুলেছিলেন উদ্দেশ্যের কথা। বলেছিলেন, "এমন উপদেশ অথবা আলোচনা আছে ঠিকই, কিন্তু তার তাৎপর্য নিষেধমুখী, বিধিমুখী নয়।"

৮ আরিস্টটলের 'কাব্যতত্ত্ব' যে কাব্যের অন্তরঙ্গ ঐশ্বর্য সম্পর্কে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করে না, তা নয়, তবে অধিকতর উৎসাহ দেখায় নানাবিধ কাব্যের শ্রেণী, রূপ ইত্যাদির পরিচয় নির্দেশে। অর্থাৎ, তত্ত্বের তুলনায়, তথ্যের উপরেই সেখানে বেশি জোর পড়ে। 'কাব্যতত্ত্ব'-এর আলোচনা, সেদিক থেকে, মূলত বহিরঙ্গভিত্তিক। 'সমালোচনা সাহিত্য' গ্রন্থের ভূমিকায় (গ্রন্থ-পরিচিতি) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ".. গ্রীক সমালোচনকে অনেকটা তথ্যপ্রধান ও বহির্বর্ণনামূলক বলিয়া মনে হয়।" এক্ষেত্রে তিনি অবশ্য আলাদা করে আরিস্টটলের নামোল্লেখ করেননি, কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই মন্তব্য যখন করেন, তখন, প্রধানত, 'কাব্যতত্ত্ব'-এর কথাই তিনি ভাবছিলেন।

৯. "..the philosophers of Greece durst not a long time appear to the world but under the masks of poets. So Thales, Empedocles and Parmenides sang their natural philosophy in verses. So did Pythagoras and Phocydides their moral counsels. So did Tyrtaeus in war matters and Solon in matters of policy." An Apology for Poetry.

১০. "The distinction between poets and prose writers is a vulgar error. The distinction between philosophers and poets has been anticipated. Plato was essentially a poet—the truth and

splendour of his imagery, and the melody of his language, are the most intense that it is possible to conceive." A Defence of Poetry.

১১. "..the philosopher teacheth, but he teacheth obscurely, so as the learned only can understand him, that is to say, he teacheth them that are already taught ; but the poet is the food for the tendered stomachs ; the poet is indeed the right popular philosopher." An Apology for Poetry.

১২. অভিশাপ। 'কণিকা'।

১৩. Maid of Athens, ere we part. 'Occasional Pieces'.

১৪. শাশ্বতী। 'অর্কেস্ট্রা'।

১৫. নীরার অসুখ। 'বন্দী, জেগে আছো'।

১৬. "সেথা যে বহে নদী　নিরবধি　সে ভোলেনি,
তারি যে স্রোতে আঁকা　বাঁকা বাঁকা তব বেণী..."

১৭. "It [poetry] awakens and enlarges the mind itself. ..Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world, and makes familiar objects be as if they were unfamiliar." A Defence of Poetry.

১৮. আধুনিক কাব্য। 'সাহিত্যের পথে'।

পতঙ্গ পিঞ্জর

শওকত ওসমান

শেষ।

তা হয় না।

জিঞ্জিরের মতো ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার বাঁধা শৃঙ্খলা থাকে বলে শুধু এক জায়গায় কোন এক কাজের পরিসমাপ্তি ঘটবে, আশা করা অন্যায়। জীবন যেমন আরো জীবন-যোগে সক্ষম অনুকূল পরিবেশে মৃত্যু তেমনই তহবিল বাড়িয়ে তোলে অন্য মৃত্যুর হাত-পাকড়ে, যদিও উভয়ের মধ্যে নানা ব্যবধান থাকতে পারে গঠনে ও বৈচিত্র্যে। গফুর কিন্তু সখিনার প্রয়াণের পর ধীরে ধীরে নিজের গুটি কেটে বেরিয়ে আসছিল, যা নিতান্ত বাইরে দৃষ্টিপাতের ফল এবং ঘাত-প্রতিঘাত সামলে নেওয়ার ক্ষমতা-সঞ্জাত। তাই এক ধরনের হনোমি তাকে পেয়ে বসেছিল এবং সে সর্বদা একটা-না-একটা কিছু করতে চাইত তক্ষুনি অতি বেসবুর, এবং আগাপাছা ভেবে দেখার জন্যে সময়-খরচের ব্যাপারে ঘোর অনিচ্ছুক। তখন মাদবর যেমন তাকে প্রকৃতিস্থ করতে পারত, তেমন আর কেউ না। একথা গফুরের জানা ছিল বলে সে বেশ বিস্ময় বোধ করত এবং ভাবত, মাদবর চাচা কি তার দাড়ি না মিষ্টি কথায় হেন অসাধ্য সাধনের জের মেটায়? ওই প্রৌঢ় ব্যক্তি, না, প্রায়-বৃদ্ধের ব্যক্তিত্বে একটা জাদু ছিল আকর্ষণের এবং সংলাপকালে অপর পক্ষকে বোঝার চেষ্টার, যখন নীরব মিষ্টি হাসি মুখে ফুটেই থাকত। মাদবর কবি মোহাম্মদ আলীর সীমানা থেকে অনেক ক্রোশ দূর ব্যবধানে চলে আসেনি শুধু ও-পথ তার পায়ের ধুলো-বঞ্চিত এমনই যে সে অনেক ঘুর-পথে নিজের গন্তব্যে পৌঁছাত, তবু সহজ সড়ক ধরত না। গফুরের প্রস্তাব শুনে সে ইতস্তত করেছিল এড়িয়ে যাওয়ার কায়দায় এবং বলেছিল, "হ, ভাইব্যা দেহন উচিত। হুড়মুড়ের যাত্রা, যা করে বিধাতা, কথাডা কথার কথা। তাই আমি কই--কই "। তখন মাদবরের চোখ কারো মুখের উপর নিবদ্ধ থাকত না, বরং মাটির উপর পতিত যা বস্তুধর্ম বা প্রাণজ ধর্মে একদিকে ধাইবেই। তখন গ্রামপ্রধান যেন আর-এক মানবে পরিণত; পাশ থেকে যার ছবি দেখলে মনে হবে আকাশ-রেখায় মুখ-রেখা মিশে যায় খুব সহজে এবং তা সংগতি-রক্ষায় অশেষ সমর্থ। মানুষটার যেন এই আসল রূপ, যা বছরের পর বছর জীবন-সংগ্রামে, অভিজ্ঞতার কড়াইয়ে চোলাই এক ধরনের অমৃতবারি মারফত সে লাভ করেছিল, যা-তে ভেজাল কিছু নেই বা কেউ তার শরিক। স্ত্রী-কন্যার মৃত্যু এবং পরবর্তী কালে আট বছরের দৌহিত্রকে নিয়ে আয়ুর সড়কে হাঁটার সময় আত্মস্থ হওয়ার সাধনায় মস্তিষ্কের কলকব্জাগুলো এমন পালিশ করে নিয়েছিল যে তা আর পদার্থ-পর্যায়ে নেই, বরং তারই চেনাশোনা প্রতিবেশীতে পরিণত যারা আয়ত্তে না থাকলেও জুলুম চালায় না, কথা শোনে, কিছুটা উৎকর্ণ হৃদয়। মাদবরের কণ্ঠের মোটা হাড় ঘুণের দোসর এমন মন্তব্যে সায় দেবে না কেউ বরং পালটা দেবে, "তাগদ আছে, আছে বৈকি। হাতির গুপ্ত দাঁত, শত্রু-গ্রাসের সময় বেরোয়।" এই ব্যাপারটা গফুর একবার পরখ করেছিল প্রাক-পতঙ্গ আমলে পাঞ্জালড়ায়ে, যখন অবসর-বিনোদনে এমন সব খেলা-কসরত অনুষ্ঠানের সময়ও পাওয়া যেত রেওয়াজ-অনুযায়ী। এমন স্মরণ অর্থ, সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে আসে বহু শ্যাওলার দল যেন দালান থেকে তোলার সময় : বৃক্ষ, সবুজ পাতা, মাঠ, গোরুছাগল, তরমুজের খেত, অঢেল-জল নদী--যার কিনারায় সবুজ ঘাসের আতিথ্যে উপস্থিত তৃণভোজী জন্তু, ক্লান্ত বিশ্রামবিলাসী চাষী কি রাখাল বালক। যেমন সখিনাকে কবরে চাপা দিয়েছিল গফুর তেমনই

অনেক-কিছু মাটিচাপা করেছিল সে—এই জেনে যে যতই মাথা খোঁড় পাষাণে, পাষাণ থাকবে অনড়, নির্বিকার, নির্বাক, যদিও অবিকৃত নয়: যেহেতু তোমার ফাটা কপালের রক্ত ফোঁটা-ফোঁটা অথবা চাপ-চাপ বসে গেছে প্রলেপের মতো তার গায়ের রঙ বদলে দিতে। এক জায়গায় মাদবর ও গফুরের সংযোগ-কেন্দ্র ছিল, তা প্রৌঢ়জনের মাতৃহীন নাতি, যে অক্লেশে কোন বন্দনা করতে পারত এবং বলতে সক্ষম হত কচি দাঁতের হাসি ছিটিয়ে, "এই আমার মামা, গাড়ি চালায়, চাঁদ ধরে ধরে দিতে পারে। দ্যাহেন দ্যাহেন নানু...ওই চাঁদ।" হয়তো অপত্যস্নেহ-বঞ্চিত অথবা দুমড়ানো জীবন যেমন স্বপ্ন দেখে আগামী দিনের এবং তংহেতু কোন বাহন ধরে, তেমনই জের হিসেবে গফুর বালক বেলালের প্রতি স্নেহপরায়ণ, তাকে মাঝে মাঝে বাড়ি নিয়ে গিয়ে সখিনার জোরপূর্বক খোলা স্তনে মুখ গুঁজিয়ে আদেশ বর্ষণ করত ('খা ব্যাটা খা, মামীর দুধ খা'।—'আমার সরম করে'—'তবে দে এক কামড়।'—'আমার সরম করে'। বেচারা গ্রামবধূ প্রথমে নাজেহাল পরে সতেজ সর্পিনী কাটান দিত কথায়,—'মামা পারে না, অহন ভাগ্নে জুটিয়েছে।') এবং কাতুকুতু-যোগে ওকে হাসিয়ে সারা বাড়ি পূর্ণ করে তুলত। মমতার স্রোত আজও প্রবাহিত যতটা না বাইরে, ভেতরে আরো বেশি, কেবল স্মৃতির শিকার-সন্ধানী নরবেশের জন্যে অথবা সম্পর্কের আরো শিকড় এদিক ওদিক সঞ্চারিত ছিল, যা কারো বিশ্লেষণ-বহির্ভূত—এমনই জটিল সেই সড়ক। মাদবর গফুরের তপ্ত ব্রহ্মতালুর উপর হাত দিলে অনুভব করত, বরফের ঠান্ডা হিম বিষুব-রেখার উপর তাকে ঘুমন্ত দেখার জন্যে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে অতি সন্তর্পণে যেন মাত্রার তারতম্য সব উলটো না করে বসে। গ্রামজীবনে সমষ্টির বেষ্টন যেমন কাউকে গোত্রচ্যুত করে আবার তেমনি টেনে আনে নিকটে—যখন কোন পাষাণ-ভার একা বইবার দায়িত্ব থেকে সে খালাস পায়। তবে বৃত্তের মধ্যে বৃত্তের অবস্থানের মতো খুব নিকট-পরিধিতে অনেকে এমন অঙ্ক-রচনা করে, যার ফলে যন্ত্রণার ভাগী মেলে এবং তখন সমষ্টি আছে বা নেই—অন্তত তত প্রকট থাকে না। প্রৌঢ় বা আসন্ন-বৃদ্ধ কি জোয়ানে এমন সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্থানবিশেষে, কখনও জীবন-যাপনের ধারা থেকে উৎসারিত বা বিশেষ সুবাদের পর্যায়ে। অবিশ্যি মাদবর গফুরের চাচা ছিলেন না বা দূর-আত্মীয়তার কোন সামান্য সূত্রেও উভয়ের মধ্যে আবিষ্কার কঠিন। আবার নাতি বেলালই নিমিত্ত—এমন সিদ্ধান্ত শুধু ভুল নয়, তার উপর জোর রাখলে দুজনের মানসিক আদলের সঠিক পরিচয় অপরিজ্ঞাত থেকে যাবে। মানুষে মানুষে ব্যবধানের উপর ঠেস রাখলে তাদের নৈকট্যের রেখাগুলো ক্রমশ ঝাপসা হতে থাকে এবং তা কোন কালেই আর গোষ্ঠী-জীবন গড়ার পক্ষে অনুকূল নয়।

বেপরোয়া-ভাব বেলালকে ছেলেবেলা থেকেই পেয়ে বসেছিল আদরের আতিশয্য থেকে। হয়তো। আতিশয্য থেকে সূত্রপাত এবং স্বভাবের তাগিদে ক্রমশ স্ফুটমান। হয়তো। বনবাদাড় গাছপালা শুধু সবুজ রঙ দিয়ে বেলালকে প্রলুব্ধ করত, স্নেহক ছায়ায়, মাতৃহারার পক্ষে যা লোভনীয়। হয়তো। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম : গোটা দুনিয়া যখন ঘর, তার বাসিন্দা থাকবেই। তা শহরের বেলা যেমন প্রযোজ্য, অরণ্যের বেলায়ও সেই খাতে বইতে থাকে, নড়চড় হয় না। তেমন ঘটলে, কীটপতঙ্গ যথা প্রজাপতি কি গঙ্গাফড়িং কি গোবরেপোকা অথবা আরো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব-বৃন্দের বার বার বাবাবর হতে গেলে তা যেমন তাদের পক্ষে অনিষ্টকর, তেমনই তাদের পক্ষে—যারা এদের গোত্রীয় না হলেও, পাশাপাশি অবস্থান মারফত পরিচয় দৃঢ় করেছে, যদিও কখনও সুবাদ বা কখনও বিবাদ ছিল সম্পর্কের মধ্যে। প্রচরণশীলতাও নিয়মের বাইরে যায় না, যদ্যপি মৃত্যুর করকতি সেখানে প্রচণ্ড এবং অনিশ্চয়তা মোদ্দা কথা। বেলাল এবং বনবাদাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিবেশিত্ব গড়ে উঠলেও তা কোন বাল্যসুলভ প্রবৃত্তির ফলশ্রুতি-রূপে গ্রহণ না-করার পেছনে যুক্তি হচ্ছে, ওই পাশাপাশি বাস তো আদিম ব্যাপার এবং সেখানে যদি ব্যবধান ঘটে তা একটা মেয়াদে

সীমাবদ্ধ। যেহেতু পঞ্চভূতের কাছেই আবার ধরা দিতে হয়, ইহকালের দানাপানি ফুরিয়ে গেলে। তা ছাড়া রক্তপিপাসুদের যে-পানপাত্র প্রয়োজন, তার নির্মাণকান্ড যদিও দেহের ভেতর তবুও উপাদান শেষ পর্যন্ত বহিরাগত এবং সেখানে গেলেই তৃষ্ণা মেটানো যায়, এমন কি, কৃত্রিম স্বর্গ যতই বনবাদাড়ের বাইরে গড়ে তোলা হোক না কেন। বেলাল বালক বিধায় তার মনোরাজ্যে কী ঘটত এবং কী কী আকর্ষণে সে আকৃষ্ট হত, অনুমানের কোন ফটকা না খেলেও বলা যায়, সঙ্গীরা হয়তো তাকে জায়গার এমন স্বাদ দিয়েছিল এবং পরে তাদের বিনা উপস্থিতিই সে একা একা হাজির হত নিজের মনে, সবুজের প্রতি সহজাত আকর্ষণে। কিন্তু যখন শস্যশ্যামল হরিৎখন্ড ক্রমশ বিস্তার থেকে সংকীর্ণতার খাপে ঢুকতে লাগল এবং অতি অকস্মাৎ-অকস্মাৎ, তখন সে হন্যে হয়ে উঠত, কোথাও যদি-কিছু-থাকের সন্ধানে। এমন কি উঠান বা কোথাও তার চোখের নাগালের বাইরে কোন সঙ্গীহীন বৃক্ষ থাকলে সে চেয়ে চেয়ে দেখত যতক্ষণ না ঘাড় ধরে আসে বা চক্ষু আর কিছু ধরতে নারাজ হয়। পিতামহের বুকে মুখ গুঁজে সে দেখতে চাইত সেইসব খোওয়ানো মাঠ, ঝোপজঙ্গল -বেবাক সমারোহ-সমন্বিত - যা কিছুদিন পূর্বেও সঙ্গীদের সহযোগিতার তোলপাড় করত পাখির ডিমের সন্ধানে, ঝিঁঝিঁ ধরতে, কখনও আসন্ন সন্ধ্যায় জোনাকিপোকার পেছনে দৌড়-তৎপর -এমন শত শত খন্ড অকেজো কর্মপরায়ণতার চলমান ছবি। বহু সঙ্গী মৃত, এলাকাত্যাগী, নিরুদ্দিষ্ট। কোথায়? কোথায়? এই প্রশ্নের জবাব যারা দিতে পারত, তারও মৃত, এলাকাত্যাগী, নিরুদ্দিষ্ট অথবা ধুঁকছিল কোথাও নির্মম বিছানার রাজ্যে - কেউ কেউ চলৎশক্তিহীন, বাড়ি গেলে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে উঠান পর্যন্ত এগিয়ে আসে বা ম্লান হাসি হাসে, ফ্যাকাশে চোখ, প্লীহাজাত ঢোল-উদর। বেলাল অনেকটা সুস্থ মাদবরের আওতায় এবং তা সম্ভব হয়েছিল, গ্রামের মুখ্য ব্যক্তির অভাব অত প্রকট নয় অথবা থাকলেও সবাই তো চক্ষুসত্তা হারিয়ে ফেলেনি। তারা তাকে এটা-ওটা দিয়ে যেত, চিরদিন যেমন সম্মান দেখিয়ে এসেছে সেই স্রোত অক্ষুণ্ণ রাখতে। দারিদ্র্য সহজে মনের প্রবাহ ধ্বংসে অক্ষম, একথা নতুন করে জানার বিষয় নয়।

বেলাল হঠাৎ কল্পনা করত, সে কোথাও হারিয়ে গেলে তার মাতামহ ও অন্যান্যদের কী প্রতিক্রিয়া হবে - তারই কিছু চিত্রাবলী। এই খেলার সূত্রপাত কিন্তু তার নিরুদ্দিষ্ট সঙ্গীদের দশা এবং মুখের কথা ভেবে-ভেবে - যখন সে জাল-ছাড়ানো কই-মাছের মতো আথালিপাথালি করত তাদের সঙ্গ পেতে এবং তাদের সঙ্গ-পাওয়া মানে কোন হরিৎ দ্বীপে আকস্মিক উপস্থিতি যেখানে অফুরন্ত দৌড় বা ঝাঁপ দাও, চিৎকার কর, ইচ্ছামত বৈঁচিবন থেকে ফল তুলে খাও অথবা জলাশয় থেকে পানিফল। কিন্তু বিরান জাঙ্গাল, ফাঁকা মাঠ, ঝোপঝাড় ক্রমশ নিঃশেষ - শেষে কোথাও যদি এতটুকু থাকে সকলের আগে হাড়-জিরজিরে প্রায় ভাগাড়-যাত্রী গোরুগুলো ছুটে-ছুটে যায় একদম স্বাধীন। যেহেতু ওগুলোকে কেউ আর বাঁধে না, বাঁধার দরকার হয় না—খাওয়ার আছে কী? বেলালের বোঝার কথা নয় যদিও, কিন্তু এইভাবে এক ধরনের স্বাধীনতা মেলে, যার বিচার দুই প্রান্ত থেকে একই জায়গায় গিয়ে ঠেকে : তাবৎ গোরুর পাল এবং স্বাধীন। সজীব গোরুও এক ধরনের আছে, যা তাদের বোঝার সাধ্যির বাইরে। পশু ও মানুষ এইভাবে এক ঘাটে জল খায় এবং কাওয়ালী গায়, যখন গোড়গ্রামের দশার মতো সব ঠাঁই। বেলাল হঠাৎ বর্ষীয়ানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাই কৈশোর কালের খোঁট পাকড়ে ফেলেছিল এবং সে পূর্বে যে-সহজ বুদ্ধিতে কোন কিছু বুঝত বা বুঝতে চাইত - -তা আর হয় না। বরং সেই হাই তুলে ভাবত যেন গোটা রাজ্যের চিন্তা তার মাথার ভেতর কিলবিল-রত এবং সেগুলো বেরুনোর পথ না পেলে তার মাথার খুলি চৌচির ফেটে যাবে। মাতামহের সান্নিধ্যেও সোয়াস্তি পাওয়া যেত না বিধায় ঘুম ভেঙে গেলে সে জানালার বাইরে চেয়ে থাকত এবং দেখতে চাইত সবুজ কিছু যা তার সব জড়তা তখনই হরণ করে তাকে অগাধ তাজা

দেবে গোটা গাঁ চয়ে ফেলতে। অথচ বাইরে ন্যাড়া-ন্যাড়া গাছ, (যথা—খেজুরগাছ কল তখন মগজ থেকে ধীরে ধীরে হলুদ হত এবং খুব জোরে কাক বসত ঠোকর দিতে)কঙ্কালের মতো খাড়া রয়েছে, আর বাতাসে কিছুই দুলছে না। কোন কুঁড়েমি-ভাবের আজন্মতা যদিও বেলাল ঠিক তলিয়ে দেখতে শেখেনি, তাকে ঘিরে থাকে, তা সে বোঝে এবং মাতামহকে দেখে মনে করে সে খেলায় সঙ্গী হতে পারলেও তার পক্ষে যোগ দেওয়া অশোভন কি অসম্ভব। মাতামহ বৃদ্ধ হাড়েগোড়ে বেঁচে ছিল কেবল কারো দয়ায়, যদিও মানুষটা তার জানার বাইরে।

মাদবর একদিন দুপুরের চলা-মুখে গফুরের নিকট ছুটে এসেছিল দৌহিত্রের খোঁজ নিতে, যদি সেখানে সে এসে বা কোন অছিলায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে থাকে। কিন্তু নিরুদ্দিষ্ট বালক কি তেমনই কিছু করে বসেছিল আর দশজনের মতো খুব নিশ্চিত জানা সত্ত্বেও যে গ্রামের সীমান্ত পার হওয়ার যো নেই বা জানকবুল করে এগোলেও কেউ তা অতিক্রম করবে—তেমন জামীন কেউ হতে চাইবে না। এই হেতু, মাদবর এবং ইনাম যদ্দুর পেরেছিল খোঁজাখুঁজি করলেও কোন হদিস-সন্ধানে ধারে-কাছে যাওয়ার কথা কি যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ আবার গন্তব্য সেখানেই শেষ হয়েছিল। তখন সারা গ্রাম যারা মাদবরকে ভালবাসত সমীহায় শরিক এগিয়ে যেতে লাগল এক-এক দল দিক ভাগ করে ঠিক জেলের জালের কায়দায় যেন শিকার কোন ফাঁক গলে না পালাতে পারে · সতর্কতার বেড় এমনই। মুহূর্তে মুহূর্তে মাদবর তখন তার প্রৌঢ়ত্ব পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল, পাকড়াও করছিল বৃদ্ধত্বের লক্ষণ, যেমন সাদা চুল, অল্পে ক্লান্ত ঘন ঘন নিঃশ্বাসের হাপর টানা এবং দৃষ্টিক্ষীণতা। গফুর কঠিন রেখায় মুখ ঢেকে, যথা আহার-বঞ্চিত অর্ধশীর্ণ শরীরের কথা ভুলে কর্তব্য সম্পাদন করছিল যার তাগিদ ভেতর থেকে এমনই প্রচণ্ড যে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল সেও মুখ থুবড়ে জমিনের উপর পড়ে যাবে এবং আর উঠবে না, কোনদিন একবারের তরেও। শোনা যায়, বন্য বরাহ পর্যন্ত সন্তানের সন্ধানে হন্যে ছুটোছুটি করে এবং সম্মুখে যাকে পায় হামলা চালায় আক্রোশে নয়, বরং ত্রাসের জন্যে কেউ সাথী হচ্ছে না কেন এ-ই গোস্বায়। মাদবরের তাগদ ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল নাকি, কে জানে, গফুর তাকে নিরস্ত করছিল এই সান্ত্বনা দিয়ে যে খোঁজ আপাতত মুলতুবী থাক, বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু মাদবর যেন মৃত্যুর কটু গন্ধ পেয়েছিল, যখন সে বারণ শুনতে নারাজ আরো তৎপরতার নির্দেশ দিলে, নিজের দশার কোন তোয়াক্কা রাখলে না। এই সময় গফুরের মনে হয়েছিল, গোটা গ্রাম যেন কোন মৃত্যু পরিখার হাঁ-মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কোন অদৃশ্য টানে বা থেকে মুক্তির আর কোন উপায় উদ্ভাবন অথবা চিন্তা-জাগা অসম্ভব। সে-ও স্বপ্নের ঘেরাটোপের মধ্যে হাঁটছিল, দুই চোখ খোলা, যদি হঠাৎ তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে ওঠে গোটা দিনের মেহনতের পুরস্কার কড়ায়-গণ্ডায় পুষিয়ে দিতে। কারো জানা ছিল না, বেলালের আকর্ষণ কোন্ দিকে বা কোন্ পথে, যার সূত্র ধরে তারা একটা সুরাহা করতে পারে। নিরুদ্দিষ্টের পেছনে সকলে যখন নিরুদ্দেশ হয়, তখন কানামাছির খেলা-কালে চোরের সকলেই চোখ বেঁধে মওজ চালু রাখলে যা হয়, এখানেও তা ঘটছিল। গফুরের চোখ শেষে মাদবরের উপর যতটা বেশি, রাস্তার বা রাস্তার আশপাশ, গলিঘুঁজি, পুকুরপাড়ের (কলাগাছ নেই আর যার আড়ালে ছেলেরা খেলা করবে) দিকে ততটা নয়। এই সময় ঝড়-তুফানে দরিয়ায় শক্ত হাতে হাল-ধরা মাঝি, আবার চর-দখলের লাঠিয়াল (মাদবরের নানা ভূমিকার সঙ্গে গফুর পরিচিত) মাদবর টান-টান এমন অবস্থায় যে কোনদিন পড়েনি, তা গফুরের উপলব্ধিতে এত দাগ কাটে, সে আর স্থির থাকতে পারেনি এবং এই পর্যায় অব্যাহত রইলে কার কী হত কারো পক্ষে বলা অসাধ্য ছিল। কারো না কারো—হয় গফুর অথবা মাদবরের ধড়ে প্রাণ অন্তত আর কোনমতেই থাকত না—এমন সিদ্ধান্তের জন্য বহুত আক্কেল বা অনুমান অবান্তর। বন্যারোধী বাঁধের মাটি কাটার ফলে

অনেক নিচে একটা জায়গায় কিছু ছোট ছোট লতাগাছ লতিয়ে-লতিয়ে অনেক দিনের বংশানু-ক্রমসান্নিধ্যে একটা ঢিবির মতো সৃষ্টি করে রেখেছিল। মাটির নয়, লতার। সেখানেই একটা শিশুর পা দেখা যাচ্ছিল। হুড়মুড় জনতা সেখানে পৌঁছানোর পর আর বুঝতে কারো দেরি হয়নি কিভাবে গোটা ব্যাপারটা ঘটেছিল না শুধু ঘটার পারম্পর্য সৃষ্টি করেছিল। শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা সবুজ ওই এক জায়গা রাস্তার অনেক নিচে চোখের আড়ালে খানিকটা ছিল। তা-ও শুধু লতায়-লতায় সৃষ্টি, যার সামান্য সরিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে ভেতরে থরায় দিনে শুয়ে পড়তে পারো, তোমায় ঘুম ধরতে বেশি দেরি হবে না। অনেক দিনের শৈত্য-স্নেহ সেখানে জমাট যুগ-যুগ ধরে, হয়তো বহু মন্বন্তর, এবং এই মায়া হয়তো আরো বেশি সুখপ্রদ—যার পরিচয় ভুক্তভোগীই শুধু দিতে পারে। মনুষ্য-শিশুর উপর সবুজ, সবুজের উপর শত শত উপবিষ্ট পতঙ্গ কুরে-কুরে খেয়ে-খেয়ে চলেছে এবং তৎপূর্বেই চতুর্দিকে জমাট চাপ, যখন বাতাস রুদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। নিঃশ্বাসও তখন পালিয়ে যেতে বাধ্য যমদূতের ভয়ে, যে ওৎ পেতে ছিল, ওৎ পেতে ছিল।

১৪

পর্যায় শেষ হয় পর্যায়ান্তরে যদিও, তবু সেখানে ঠিকুজির চিহ্ন পাওয়া যায় সহজে। যেহেতু গতির নিজস্ব ঘটন-পটুত্ব আছে এবং তা অজ্ঞানিতেই সকল কর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, যখন কর্তা ও তার ক্রিয়া স্ব-স্ব বিন্দুতে থাকার সুযোগ পায় না বটে, কিন্তু সাবেক যাত্রাবিন্দুর একটা রেখাভাব রেখে যায়। গৌড়গ্রাম তো কোন ব্যতিক্রম নয়, এক বর্তমান দুর্বিপাক ব্যতীত—যা যে-কোন দেশেই হতে পারে এবং অতীতে অন্য দেশে ঘটেছিল, সুতরাং ছকের বাইরে যাবে কিভাবে? অবিশ্যি অভাবের মধ্যে যখন আর পথ থাকে না উত্তরণের, তখন তারি মধ্যে একটা শান্তি-সন্ধানের মন গড়ে তুলতে হয় এবং তাতেও যখন কুলোয় না, তখন অসোয়াস্তি ঘুমের মধ্যে ঢাকা দিলেও, মাটির অনেক নিচে জলের চুঁয়ে মায়ার মতো -যা পরে ধ্বংসের কাজ করে—উপায়-উদ্ভাবন অব্যাহত থাকে। মাদবর, একটা নমুনা ধরা যাক, যেমন আগে ছিল, তখনও পূর্ববৎ নিজের কেন্দ্রে অবস্থিত থাকলেও সে ঝুঁকে পড়ত এদিক ওদিক নয়-এক দিকে এবং সে-তরফ গফুর। এমন ঘটেছিল, কারণ, নিজের মধ্যে মগজে, রক্তে অনেক-অনেক নিজস্ব ছাপ এবং যদিও বাইরের রগড়ানি-ঘষড়ানিতে তার বহু জায়গা আর স্পষ্ট নয়, তবু একটা মোটামুটি পরিচয় ছিল, ঠিক মানুষের নামের মতো—যা তার বয়স বা বুদ্ধির পরিমাপ করে না, কিন্তু অনড় থাকে। তা না হলে পারস্পরিক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যেত কোন ভাব নেই বলে নয়, আদানপ্রদানের আর কোন সুযোগ থাকত না। এই রকম, অনেক সময় সুযোগ অ-যুক্তি পুষে রাখার সুবিধা এত যে তার ফিরিস্তি বহু দেওয়া যেতে পারে, যদিও মনের সায় এতটুকু কোথাও মেলা ভার। বেলালের মৃত্যু আর দশজনের মতো মাদবরকে এমন ঘায়েল করেছিল যে হয়তো গফুরের মধ্যে সে সব সান্ত্বনার ছায়াভাণ্ডার না পেলে আর কিছু ঘটিয়ে বসত বা মসজিদের ইমামের সহবাসে দিনরাত বসে থাকত বুঁদ, নিশ্চুপ এবং নিজের অদৃষ্টের নিকট খেদোক্তি জুড়ত বাক্যে নয়, দীর্ঘশ্বাসে। কিন্তু যেহেতু সে মাদবর—আর দশজনের জীবনের শরিক এবং এইখানে তার একটা অহমিকা নয় আত্মশ্লাঘা ছিল-সে ধীরে ধীরে নিজস্ব মহিমায় আপন শূন্য আসনের কাছে এগিয়ে যেতে লাগল এবং কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ উলটো ঘুরপাক খেতে-খেতে দেখত, গফুর দাঁড়িয়ে নয় শুধু, এতক্ষণ দেহরক্ষীর মতো ছিল পেছন-পেছন। তখন তার কাঁধেই হাত রেখে আবার সে অতিক্রম্য পথ পার হওয়ার আশায় পা ফেলতে থাকে। আসন চেয়ে আছে

প্রতীক্ষায়। মাদবর তা জানলেও বুঝেছিল, আরো কাজ আছে যা সমাধার পূর্বে সে কোথাও বসবে না, বিশ্রাম নেবে না এবং সেইহেতু আসনের প্রশ্ন অবান্তর।

—মাদবর চাচা!

—কী ভাইপুত?

বহুকাল পরে সম্বোধনের এমন সহাস জবাব দিতে সমর্থ পিতৃব্য তাই বিস্ময়াবিষ্ট বাক্যকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে আরো হতভম্ব হয়েছিল, যেহেতু দেখেছিল, মাদবরের দাঁত থেকে স্মিত হাসি ছিটিয়ে পড়ছে এবং প্রমাণ রাখছে তখন সে নৌকার উপর, নৌকা তার উপর নয়।

—চাচা, একটা কথা কই।

—একটা?

—হু।

– আমি হুনতাম না।

—ক্যান, চাচা?

– তুমি একশটা কও, তয় হুনি। একটা না। গফুর তখন অনুভব করেছিল, মাদবর মুরুব্বীর আসন থেকে আত্ম-বরখাস্ত নিচে নয় যেন এক উঁচু দেওয়াল-আরোহী এবং সেখান থেকে প্রসারিত-কর সকলকে সম্বোধন-রত, "যারা নিচে আছো, আমার হাতে ভর দিয়ে উপরে উঠে এসো। এই খাড়াই—উচ্চতা পার হওয়া কিছু না, খুব সহজ।"

—চাচা।

—কও ভাইপুত।

—পোকা।

—পোকা?

—হ্যাঁ, এগুলো পোকা।

—কোন্‌গুলো?

—আপনি জানেন না?

—পোকা নয়, ছারখার।

—সুরত দাদুর পাতায় লেখা সব গান গাইছে।

—ঐ পোকাগুলোর কথা বলছ?

—আপনে ওগুলোরে পোকা মনে করেন?

—তা ছাড়া আর কী?

—তয় সবাইরে কন না ক্যান

—অসুবিধা আছে।

—কী অসুবিধা?

—আমি গাঁয়ের মাদবর। দলাদলির ডর।

—দলাদলির কী বাকী আছে?

—আরো বাড়বে। শোকের জ্বালায় অস্থির। আরো দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে।

—বেধে তো আছেই।

—ও ছোটখাট, প্রলয়ের আকারে শুরু হবে।

—আপনি মানেন, ওগুলো পোকা?

—আগে বুঝতাম না, অহন বুঝি।

পোকা—পোক্।

—সর্বনেশে পোক্।

আসুন, পিটিয়ে শেষ করি। আগুনে লাগাই, কদিন টিকবে?

—হে করতা যাইও না। বাধা পাবে।

—তবে—।

উপায় বের করতে হবে।

আখেরে পেটানো ছাড়া পথ নেই।

তা ঠিক।

তবে।

অহন না। সময় বুইজ্যা।

—কহন সময় আইব?

আইব। ভাবা লাগে। তোমরা যারা চোরাগুপ্তা পোক মারছ, তাগোর সবাইরে জোডাও।

চুপি চুপি দলে আমি নাই।

তুমি আছো। ঝুট বলো না। তুমি আছো তাই কাউরে আমি কিছু কই না।

পিতৃব্যের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল বটে গফুর, কিন্তু তা শ্রদ্ধা-নিবেদনের ছলমাত্র এবং স্নেহে আপ্লুত বিধায় আর কোন কথা উচ্চারণে অসমর্থ চুপচাপ বসে থাকতেই রাজী ছিল, যা মাদবর ভাঙা সাঁকোর মতো নাড়িয়ে দিলে, হিলিয়ে দিলে।

জড়ো হও, তারপর অন্য কথা।

কুথা?

চুপি চুপি ব্যাটা।

চুপি চুপি ক্যান?

ব্যাটা বেসবুর। কারণ আছে। আমার বাড়ি আইও মগ্‌রবের (সন্ধ্যা) বাদ।

পিতৃব্যের এবম্বিধ আচরণে গফুর এত তলিয়ে যাচ্ছিল যে দিশা পাওয়া তার পক্ষে কষ্টকর নয় শুধু, অসোয়াস্তিকর, এবং সে আকাশ-পাতাল ভাবছিল, এই প্রৌঢ় মানুষটির মধ্যে কী আছে, যার সাহায্যে সে সকলের এত নিকটে আসে অথচ ধরা দেয় না সহজে। গফুরের উদ্দীপনা-উৎসাহের সঙ্গে এই আমেজ তাকে আরো কর্মঠ স্বপ্নচারী করে তুলছিল এবং সে ভেবে পাচ্ছিল না, এতগুলো লোক এসে জুটল, যদিও আসল ব্যাপার সম্পর্কে তখনও সকলে প্রায় অজ্ঞ—বলা চলে। পণ্ডিত-পাড়ার কজন, সঙ্গে বুলান যে কয়েক মাসে তার কৈশোরকাল সহজে বিসর্জন দিয়েছিল। কাজি-পাড়ার কজন মুখে ফেটি-বাঁধা বসে গিয়েছিল আত্মগোপনের পরিপূর্ণতায়। এসেছিল মুনশী-পাড়ার লোক। সংখ্যায় তারাই বেশি হওয়ার কারণ, সবাই পাটচাষী এবং সবচেয়ে ছারখারের থাবা-রূপে তাদের জীবন অতি কষ্টে ধুঁকছিল অহোরাত্র শুধু টিকে থাকার উগ্র তাগিদে। গফুর জানত না, এত মানুষ রয়েছে তার জানার বাইরে এবং মুখিয়ে আছে একটা কিছু করার জন্যে—যা তাদের এই অবস্থা যেখানে খুশি নিয়ে যাক—আরো কোন বিপদসমুদ্রে, তবু হেথা নয়। একটা সিদ্ধান্ত সকলের স্থির : অবিচ্ছিন্ন ধৈর্য আসলে কাপুরুষের ছুতা ভিন্ন অন্য কিছু না, যদিও কোথাও-কোথাও মেয়াদী সবুরের প্রয়োজন আছে এবং তা আক্কেল-সম্মত। এবং পতঙ্গ যে পক্ষী বা আশীর্বাদ-রূপী দেবদূত, সে বিষয়েও আর সন্দেহ-পোষণ অন্যায়। কেননা, তার লক্ষণ যখন কয়েক মাসেও অজ্ঞাত রইল, তখন তা আবার স্পষ্ট হবে এবং যথাক্রমে ডিম পাড়বে কি আবির্ভূত হবে—

এমন কোন আশা-রক্ষা সুদূরপরাহত। অতএব, একটা কিছু করেই দেখা যেতে পারে এবং যেহেতু মৃত্যুর বাড়া গাল নেই, কী আর হবে বা হওয়ার বাকী আছে, এক নিঃশ্বাস চিরতরে বন্ধ ব্যতীত?

মাদবরকাকা অশিক্ষিত মানুষ হিসেবে মোহাম্মদ আলীদের নিকট মর্যাদাহীন হলেও একটা ব্যাপার ঠিক, পতঙ্গ-আবির্ভাবের পর তিনি গ্রামে সকলের নিকট প্রিয়পাত্র ছিলেন বটে, কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষী-রূপে অভিভাবক এবং সকল ঝুঁকি তিনি গ্রহণ করেন, বর্তমানেও করবেন। এসব তার মুখের কথায়, গলার আওয়াজে স্পষ্ট, অতি স্পষ্ট ছিল সেদিনও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। সাদা দাড়ির উপর সঞ্চালিত-কর মাদবর হঠাৎ যেন ভাস্করের মূর্তিলোকে উপনীত, শুধু ঠোঁটের আন্দোলন অব্যাহত ছিল মাত্র।

বৃদ্ধ গ্রামপ্রধান বলে চললেন,—আমি অনেক ভেবেছি। আর তাই আমার মনে হয়, একটা জিনিস, তুমি আমি কেউ খেয়াল করিনি। এই পতঙ্গ নাজেল (আবির্ভাব) হওয়ার পর বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমরা বুঝতে পারিনি, কী করব। কী করা উচিত আমাদের জানা নেই। এগুলো পোকা না আর কিছু, তা নিয়ে নানান লোক নানান কথা বলছে। ফলে, বোঝার গোঁজামিল আছে, ভুল আছে। নানা গোলযোগ। জানা কথা, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে কোন হদিস পাওয়া মুশকিল। ঘরের জানালার দিকে যদি ফাঁক না থাকে, তবে কি বাতাস ঘরে ঢুকবে? বাতাস যে-ঘরে সেঁধোয় না, সে-ঘর আর চুলো এক। তার মধ্যে বাস অসম্ভব। একটা কাজ হয়। তুমি সেদ্ধ হতে পার, মানুষ না হয়ে যদি আলু বা কচু হও। (সকলের হাস্য) আর মনে রাখতে হবে ।

– মাদবরকাকা! জনান্তিকে পণ্ডিতপাড়ার একজন মনের-কথা-টেনে-বলার চোটে অস্থির হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠেই থেমে গিয়েছিল, যখনই তার খেয়ালে আসে, গোপনীয়তা সেখানে পবিত্রতা।

– আরো শোনো। আমরা বিছানায় শুই। যদি এপাশ ওপাশ করোট ফিরতে না পাই কড়া নিষেধ থাকে, তাহলে কি ঘুম আসে? না ঘুম ধরে? না ঘুম হবে কোনকালে? এপাশ ওপাশ মানেই ওই বাইরের জায়গা—যদিও সামান্য জায়গা তবু তা একান্ত দরকার। তাছাড়া ।

(জনান্তিকে।– মাদবর ভাই।)

—থামো ভাই, পরে তোমার কথা শুনব।

আচ্ছা।

– আমি তাই মনে করেছি, আমাদের বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা উচিত, আসল ব্যাপার কী? এই পোকাগুলো কী? সুরত মণ্ডল-ভাই (তাঁর আত্মার মুক্তি হোক) বলেছিলেন, পঙ্গপাল। যদি তা-ই হয়, তার দাওয়াই কী? জানা দরকার, কিভাবে ধ্বংস করা যায়। আমরা বহুৎ ধ্বংস হয়ে গেছি। জানি না তার পরাচিত্তির (প্রায়শ্চিত্ত) করতেই হবে। তবে এখনও আমরা যারা কোনরকমে বেঁচে আছি, তাদের কথা বাদ দাও, আমরা কিছু দানাপানি খেয়েছি। আমাদের আওলাদ—বংশধরদের কথা ভাবতে হবে। তারা যেন দগ্ধে-দগ্ধে, ধুঁকে-ধুঁকে না মরে। তারা যেন পাকা বয়স হওয়ার কবর বা শ্মশানের দিকে না এগোয়। এসব আমাদের দেখতে হবে। দেখতে হবে, মা-বোন ইজ্জত ঢাকতে না পেরে যেন জান না দেয়। আমাদের পয়লা দরকার বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ। অসুবিধা অনেক। চতুর্দিকে ওই পোকাগুলো এতটুকু জায়গা রাখেনি, নিঃশ্বাস ফেলা যায়। অসুবিধা কম নয়। আমাদের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। হ্যাঁ উপায় –।

—উপায়! উপায়!—আমরা পাটচাষী সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।...সব পোক...হাজার পোকে খাইছে...।—পাটচাষ কম।—পাটচাষ বাড়াও।—কথার শেষ নাই।—অহন কিতা করমু চাচা।—

একডা কিছু করন পড়ে।—সবাই চ্যাতছে...অহন ভাবি আগে চেতলাম না ক্যান?—এইবার কিছু অইব, হোনেন চাচা কি কয়।—প্যাডে কিছু নাই।—লাঙল কে বানাইব, কামারপাড়া শ্যাষ।—অহনও সময় আছে, হোনেন, হোনেন, গোলমাল করেন না ..।

মাদবরের গলা চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং তার স্বর থেকে খরিস্কার, নানা মতভেদের বান ঢেকেছে কিছুক্ষণের জন্য। ভাটার মুখে অনেকেই মাদবরের মুখনিঃসৃত কথা শোনার পক্ষপাতী, যদিও কিছু গুঞ্জন ছিল এদিকে ওদিকে, অবিশ্যি সবই গোপনীয়তার আব্রু বজায় রেখে। মাদবর শেষে মতামত দিয়েছিল,—বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ, এটাই আসল কথা। কিন্তু আমাদের অসুবিধা আছে। গ্রামে অনেকে তা পছন্দ করে না আর তা নিয়ে লাঠালাঠি হয়ে গেছে। ওরা মরবে, তবু লড়বে না। কাজেই আমাদের কাজ চালাতে হবে খুব গোপনে যেন কাকপক্ষীও না জানতে পারে। আমি তার আগে এই মাটি ছুঁয়ে যে-মাটি আমাদের মা, যার ফসলের মতো দুধ খেয়ে আমরা বাঁচি, বেঁচে আছি সেই জন্মের থেকে—হ্যাঁ আমি নই সকলে মাটি ছুঁয়ে কসম—পিতিজ্ঞে করো—কেউ আমাদের হালচাল জানবে না, কথাবার্তার গন্ধ পর্যন্ত কেউ পাবে না। আমার মাথায় কথাটা এসেছে। এখন তোমরা ভেবে দ্যাখো, ফলাফলের কথা ভাবো। এখানে শত মাথা আছে, আমার মাথার চেয়ে দামী নিশ্চয়। শুধু একটা মাথা দামী হতেই পারে না।

মাটি।...

মাটি।...

মাটি।...

এই শব্দের মধ্যে এত মাদকতার আবন্ধ (অনেকে খাটুনির পর গায়ের ব্যথা সারতে গঞ্জে ধেনো টানে) তা পূর্বে কেউ যেন অনুভব করেনি এবং ভাবতেও পারেনি যে বাঁচার এমন উপাদান ছিল এত নিকটে, এত সহজে লভ্য। গফুর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বেমাত্রা, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রতিপালনে সকলেই একত্রে একই জায়গায় মাটি স্পর্শ করলে। যে-যার স্বতন্ত্র, আবার একত্রীভূত মানবগোষ্ঠী সঙ্ঘ-উজ্জ্বলতার আরশিতে নিজেকে দেখছিল সবিস্ময়, এ কি সম্ভব? প্রশ্ন সরবে নয় নীরবে। দৃষ্টির শ্লেটে তোলা। ক্ষুৎপিপাসা যা মানবিকভাবে মানুষকে পীড়িত করে, মনে হয়, বহুদিন এই গোড়গ্রামে প্রবেশই করেনি, মাঝে মাঝে অভ্যুদয় তো দূরের কথা। এক পাটচাষীর কান্না এসে যায়, আনন্দের আতিশয্য তাকে ধারণার বাইরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ করেছিল। লুঙ্গি কোমরে-আঁটা সে যেন হঠাৎ-বধির চতুর্দিকে তাকিয়েছিল এক মুখ থেকে অন্য মুখে দৃষ্টি ছড়িয়ে এবং সত্যি আর মুখ খোলেনি, যতক্ষণ মাদবরের সভায় ছিল, যদ্যপি এই তল্লাটে আদিখ্যেতার ছিঁচ-কাঁদুনে হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ, যে ঘামাচি হলে বলে বেড়াত পাকা বিষফোড়া। থমথমে আবহাওয়া আরো ঘনীভূত হয়ে এসেছিল, যখন সকলে মাদবরের যুক্তি শোনার আগ্রহে মাটির উপর থেবড়ে-বসা থেকে উৎকর্ণ, উবু হতে লাগল।

—আমি ভেবেছি, আমাদের গাঁ এক কোশ চওড়—এক কোশ আমরা সুড়ং কাটব সবাই মিলে। তবেই বাইরের গাঁয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। পতঙ্গ থাক উপরে। আমাদের রাস্তা মাটির নীচ দিয়ে।

গফুরের গোরুগাড়ি বন্ধ থাকার দরুন আর বাইরে যেতে অসমর্থ বিধায় এক অস্থিরতায় ভুগছিল এবং তা স্বাভাবিক হওয়ার হেতু, সে আর দশজনের সঙ্গে মেলামেশা থেকে বঞ্চিত। রাস্তায় তক্তা পেয়ে বসলে উড়ুউড়ু-ভাব কেউ কোনকালে সহজে কাটিয়ে উঠতে সমর্থ, এমন সম্ভাবনা কম। গফুর সম্পর্কে তা জানা ছিল মাদবরের। অমন প্রস্তাবে সে চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং সহজে শান্ত হতে পারেনি—যতক্ষণ না মাদবর তাকে নির্দেশ দিয়েছিল চুপ থাকতে এবং ধৈর্য

ধরতে। যেহেতু কাজ জোড়াতালি দিয়ে না করলে আখেরে এমন পরিণামে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে যা পতঙ্গ-অবস্থানের সর্বনাশ ও হয়তো আরো দুর্বিষহ।

—কিন্তু আমাদের কাজ গোপনে। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটলে, জানা যাবে, তখন কী করা উচিত। তাই আমি বলছি, বাইরে অন্য লোকের সামনে কেউ কোন উৎসাহ দেখাবে না। সব তাগদ, উৎসাহ জমা রাখতে হবে মাটি খোঁড়ার কাজে। আর মনে রাখতে হবে ওটাই আমাদের আসল কাজ।

—তবে আর দেরি কেন।—শুভ কাজে দেরি ভাল নয়।—হালা আমাদের সর্বনাশ করছে।—অহন আর তর সয় না—মানুষ, বেদম মানুষ।—আমি কই আগুন দিলে হালা পোক যায়। মাদবর চাচা কয়, দাওয়াই আছে।—হালা রোগ আছে, আর দাওয়াই নাই? কও কী?—তা হৈতে পারে না।—ও পাড়ার মানুষে কয় ওগুলো লোক—হালা পোকরে কয় লোক। একটা সুড়ং খুঁড়বে, কেউ জানবে না।

নানা ফিসফাস শব্দের মধ্যে যা গর্জনেরই পূর্বাভাস আবার ফেটে পড়ল মাদবরের জটিলতা-উন্মোচনে ব্যস্ত, শঙ্কিত কণ্ঠ,—সবাই বুঝতে পারছ, অসুবিধা আছে। খোলাখুলি জমিনে এসব কাজ করা যাবে না। আমি তাই ঠিক করেছি, আমার ঘরের মেঝে থেকেই কাজ শুরু হবে। তোমরা ভাববে, আমার ঘর নষ্ট হয়ে যাবে। তা যাক। এটা দুনিয়ার নিয়ম। হাজার হাজার ঘর বাঁচাতে গেলে এক-আধটা ঘর বরবাদ করতে হয়, উপায় থাকে না।

—কাকা, আমার ঘর থেকে শুরু হোক।

—না, আমার ঘর থেকে।

—না, আমার ঘর।

—না।—তোমাদের বাচ্চাকাচ্চা আছে। আমার ওসব বালাই নেই।

—শুভ কাজে কিছু গায়ে আঁচ লাগলে কিছু আসে যায় না।

—আমার কাচ্চাবাচ্চা নেই—তোমাদের কথা বাদ দাও।

গফুর চুপচাপ বসে ছিল শুধু ভেতরের উত্তেজনা থেকে রেহাই পেতে এবং চিন্তা করছিল, কিভাবে সে অভিযানে অনেক কাজে আসতে পারে। কিন্তু মাদবরের একটি কথা বার বার শোনার পর, তার খেয়াল হয়েছিল, সেও তো গ্রামপ্রধানের মতো নিঃসঙ্গ, নিঃসন্তান, সে কেন প্রস্তাব দেয়নি, তার ঘরও মজুদ।

—চাচা, আমারও কাচ্চাবাচ্চা নাই।

কিন্তু মাদবর অনেক বেশি বিচক্ষণ এবং তার বয়স তো শুধু দিনের মাপকাঠিতে গণনা হয়নি। উত্তর নিক্ষেপ করতে তার বিলম্ব ঘটেনি,—ভাইপুত, তোমার নাই, হতে পারে। আমার হে-গুড়ে বালি।

গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে তখনই কিছু বাতাস বইতে লাগল, যখন সকলে হেসে উঠেছিল মায় গফুর পর্যন্ত। বহুদিন পরে একই আনন্দমেলার শরিক সকলে, কর্মে ব্যাপৃত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে আড়মোড়া ভেঙে নেওয়ার মতো। তা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল, যখনই দেখা গেল টান-টান কাঠিন্যে সবই খাড়া—যথা, মুখ চোখ কান, মগজ ও চিন্তার অন্যান্য কলকব্জা।

১৫

প্রথমে যা মনে হয়েছিল নির্বোধের অভিধানে-প্রাপ্ত শব্দ—অবিশ্বাস্য অসম্ভব—তা-ই ঘটতে লাগল ধীরে ধীরে অস্পষ্ট এবং পরে এত দ্রুত স্পষ্ট যে তার সামাল দিতে বহুত কাঠ-খড় দরকার।

মাদবরের ঘরের মেঝে থেকে শুরু, মাত্র কয়েকজন নিয়ে এবং তা স্বাভাবিক ছিল এইজন্যে যে গাঁইতি শাবল কোদাল চালানোর ব্যাপারে সহজ পরিসর ঘরের মধ্যে ছিল না। অমন সুযোগের সাক্ষাৎ মেলা ভার বিধায় অল্প লোকেই কাজ আরম্ভ করেছিল, যা সহজ কথায়, কোদাল বা শাবল চালিয়েছিল। তবে পেছনে বহু মদৎগার-সমন্বিত পটভূমি কাউকে সহজে ক্লান্ত হতে দেয়নি। যখন সুড়ঙ্গ অনেকখানি প্রসারিত, তখন বহু লোকের সাহায্যের নিঃশ্বাস এসে লেগেছিল ছোটখাট নানা কাজে। যথা, সুড়ঙ্গের গায়ের মাটি চাঁচা, কোথাও জল উঠতে পারে, তাই বালুযোগে ধুরমুস-পেটাই প্রভৃতি প্রভৃতি। নৈশ অন্ধকারে-অন্ধকারে সর্বপ্রকার গোপনীয়তা রক্ষাপূর্বক অতখানি কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তা-ও স্বাভাবিক আহার, শরীর বা বিশ্রামে নয়—কখনও পেটের ক্ষুধা পেটেই হত্যা করে অথবা মাথা ঝিমঝিম-রত তবু কোদাল চালিয়ে যাওয়া ঠিক স্বপ্নার্পিতের মতো—কত কঠিন তা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পর্যন্ত বহুদিন গিয়েছিল ঠাওর করতে। অনেকের বিশ্বাস হতে চায়নি তারা অসুরের কাজ সম্পন্ন করেছে পলকা শরীরে, কাঠবিড়ালীর মতো যদিও উৎসাহ-অস্থিরতার অভাব ছিল না। মাদবরের চুল পাকা শন হয়ে গিয়েছিল কয়েক দিনে, যার জন্যে দায়ী সে নিজে। একথা পাড়াপড়শীরা বলতে পারত বটে, তার কাছে স্বীকৃতি পাওয়া যেত না। দিনরাত্রি পাহারা, বিশেষত দিনে না কেউ টের পায়, আবার রাত্রে কাজে শামিল হওয়া (হাজার বারণ সত্ত্বেও সহজে কোদাল ছাড়তে চাইত না মাদবর। খুব পীড়াপীড়ি করলে কোদাল ছেড়ে শাবল দিয়ে সুড়ঙ্গের গা চেঁচে-চেঁচে পেটা দিত যেন এদিক ওদিক ধ্বসে না পড়ে) এই বয়সে যে-কোন তরুণের সঙ্গে পাল্লা দিতে

এক ভূতে-পাওয়া ব্যাপার ছাড়া আর অন্যভাবে ব্যাখ্যাদান অচল। কিন্তু ভূত একজনকে নয়, বহু-জনকে এমন পেয়ে বসেছিল যে পরদিন সকালে যারা রাত্রে প্রচণ্ড খাটুনি খেটেছিল তাদেরই দ্যাখো যেন কিছুই হয়নি। নিদ্রাহীনতাজাত ছাপ থাকে, পিচুটি পড়ে, তাও এতটুকু বের করা দুঃসাধ্য। তখন মনে হবে, সকলেই যেন অমৃত-বারি বা ফলখাদক ফলে, তাদের পার্থিব কোন আহারে প্রয়োজন নেই এবং তাদের সর্ব-আসুরিক শক্তির উৎস সেই রস। বুলান, রাখাল, গফুর—এমন একশ নাম করা যায়, শারীরিক শ্রম বলে কিছু দুনিয়ায় আছে, যাদের কাছে প্রমাণ করা বড় কঠিন ছিল। সবই তারা শিখেছিল হেসে উড়িয়ে দিতে, এমন কি হঠাৎ যখন পেটে ব্যথা উঠত অন্ধকারে শাবল বা কোদাল চালিয়ে। ততদিনে কিশোর বুলান এবং গফুরের মধ্যে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল কেবল শ্রম-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে, যার প্রসারণ রসিকতায়। —আমার প্রসব-বেদনা উডছে, কাকা। —প্যাডে বেদনা। এই হারামী তর মারে ডাক, নালে বাচ্চা ধইরব কেডা?—চাচা, আপনের বাবা আপনেরে অমাবস্যার রাইতে জন্ম দিছিল। তুই বুঝি ব্যাডা তহন তা-ই দোহার জন্যে ছিলি?—কাকা, হালা পোকে হগ্‌গল খাইছে, আমার দাদুরেও খাইছিল। —এইবার হালা পোকের আরে হেই তরে সুড়ং বানাই। —আমি কী করমু, কাকা? কাম কর, ব্যাডা।

মাদবরও ভাবতে পারেনি, তার গাঁয়ের এইসব ছেলে-ছোকরা এমন একটা কাজে হাত দিয়ে শেষ পর্যন্ত উতরে নিয়ে যাবে বা অত উৎসাহ জীইয়ে রাখতে পারবে (অতি কষ্টে খাওয়া তামাক, পাতার অভাবে বিড়ি বন্ধ) শুধু তামাকের ধোঁয়ার সাহায্যে এবং কথার দ্বারা। কিন্তু হপ্তা বাদ, প্রাচীনকালে যা ঐশীবাণীরূপে কথিত এমন প্রতিধ্বনি উঠেছিল তার কানে: মানুষ যখন ঘুমায় সে মড়া। যখন জাগে সে ধরা (পৃথিবী)। নাকী কান্না (আর বাঁচুম না বুকে বেদ্‌না, তিনদিন উপাস আছি, হা রে সোনার দ্যাশ ম্যান কেয়ামত আইল) আর শোনা যেত না, যদিও তেমন খেদোক্তি এবং অসহায় করুণ অভিযোগের জন্যে সর্বদা কান প্রস্তুত রাখত। গফুর যত কথা বলত তত কাজ, প্রমাণ দিতে—তার কথা ও কাজ নিশ্ছিদ্র। অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, কোথাও মাটি শক্ত কোথাও এত নরম যে জল উঠে পড়ে বা পাঁক বেরোয় নিচের দিকে টান দিতে। এসব তারা সামাল দিয়েছিল

নিজেদের উপস্থিত ও সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে—যখন যেমন প্রয়োজন বা ধৈর্যের সঙ্গে পদে পদে অগ্রসর হওয়ার দৃঢ় পণের উপর নির্ভর। তাই কাজ এগিয়েছিল, যতটা ঢিমা থাকার কথা, তা হয়নি, বরং দ্রুতই বলতে হয় সমগ্র অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী। প্রেতায়িত অন্ধকার কেবল সুড়ঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল না, তার বিস্তার ঘটেছিল সুড়ঙ্গের মুখ ছাড়িয়ে গোটা গৌড়গ্রামের অবশিষ্ট লতায় পাতায়—আততায়ীর দাঁত থেকে যেটুকু রক্ষাপ্রাপ্ত বা চোখের আড়ালে থাকার ফলে তখনও সজীব, অবিশ্যি অবহেলায় পরিত্যক্ত। এমনই ঘটে, যখন মানুষ নিজের উপর অবজ্ঞা ঢেলে-ঢেলে রাখে, সামনে আর কোন উজ্জ্বল ইশারার অভাবে। তখন আশপাশে যা থাকে তা-ই বিবর্ণ ধূসর, রুক্ষছুট হতে থাকে বা যত্নের অভাবে অরণ্য-স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তখন সকলেই সাধ্যমত রক্ষা করার চেষ্টা পাচ্ছিল যেন আখেরে কোন না কোন কাজে লাগে। এই মনোভাবের পরিচয় পরিষ্কার দেখা গেল, যখন অনেক উপরে নাগালের বাইরে আততায়ীদের জুলুম চালানো চোখে পড়লে, আর কিছু না হোক একটা ঢেলা অন্তত ছুঁড়ত। পূর্বে এসব চিন্তা ছিল দুরূহ কি অভাবনীয়, যে কোন পর্যায় থেকে। তারপর আরো পর্যায় শুরু হয়েছিল যার জন্যে এতদিন অহোরাত্র এত খাটুনি, এত উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা।

গ্রামগ্রামান্তরে গোশকট-চালক হিসেবে যেতে অভ্যস্ত বিধায় মাদবর গফুরকে ভার দিয়েছিল প্রথম সুড়ঙ্গ-মুখ-পথে অন্য এলাকার সঙ্গে যোগাযোগকল্পে। পশ্চাতে মাদবরের মাভৈঃ বাণী : যখন ফিরবে, আমরা তোমার জন্যে সারি সারি পিদিম জ্বালিয়ে রাখব। সুড়ঙ্গ অন্ধকার দেখবে না।

সৌভাগ্যই বলতে হয়, সুড়ঙ্গের মুখ এমন এক জায়গায় গিয়ে ঠেকেছিল যেখানে গাছপালার ওত ছিল না বটে, কিন্তু প্রাচীন বৃক্ষের গুঁড়ি এবং মোটা মোটা শুকনা শিকড়, প্রায় শিলীভূত, এত জমে ছিল যে বেশ গোপনে গোপনে উপরে উঠে যাওয়া চলে, সকলের চক্ষু এড়িয়ে। প্রাচীন অথচ পড়ে আছে, কারো কোন কাজে লাগ না- এমন সামগ্রীও, তাদের আশ্রয় দিতে পারে শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে! গফুর অবাক হয়ে গিয়েছিল। একজন দুরূহ কাজ-সমাপ্তকারীর বুকে আরো বিপদের ঝুঁকি-লোভী এত স্ফীতি লাভ করে যে তার কাছে কোন কিছুই আর দুরধিগম্য বা দুঃসাধ্য মনে হয় না। গফুর তেমনই প্রেরণা-বিস্তীর্ণ একা-একা উঠে গিয়েছিল ওইসব প্রাচীন আশ্রয়ের সিঁড়ির ধাপে-ধাপে এবং অন্য এলাকায় পৌঁছেছিল, যে-গন্তব্যের জন্যে কতো-কতো মাস না তারা হা-পিত্যেশ বসেছিল দুই চক্ষু বন্ধ করে। কিন্তু দুই এলাকার মাঝখানে সে এক দৃশ্যে এমন স্তম্ভিত যে কাউকে কিছু বলবে বা বলবে না—এমন দ্বিধাদ্বন্দ্বে বহুক্ষণ মুহ্যমান ছিল। কয়েকদিন পরে অবিশ্যি মাদবর একমাত্র ব্যক্তি প্রথমে ব্যাপারটা সব জেনে অনেকক্ষণ ম্রিয়মাণ বসে ছিল বিরাট এক খেদোক্তিসূচক প্রশ্নচিহ্নের মতো,—বড় দেরি হয়ে গেল, আহ্‌হ্‌...উচ্চারণের পর।

সুড়ঙ্গ-মুখ বেশ চাপা দিয়ে হঠাৎ যেন কারো নজরে না পড়ে, গফুর একটা উঁচু ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে সেদিন চতুর্দিক জরীপ করেছিল অন্ধের হঠাৎ প্রাপ্ত দুই চোখ নিয়ে। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল বার বার, যদিও বুক টান-টান, অনেক অনুভূতির ঝড়ের নিকট নিজে উৎসর্গীকৃত। অমন বাতাসও তার গায়ে বহুদিন লাগেনি। যেন অপরিজ্ঞাত স্পর্শের জননী-স্নেহে বহমান। গফুর দেখেছিল, মরুভূমি বানিয়ে ফেলেছে পতঙ্গদল সীমাপ্রান্ত জুড়ে, যেখানে চাঁচর বালুরাজ্য এবং তারই সমতলের উপর পতঙ্গেরা চলাফেরা-রত (হয়তো ডিম পেড়েছে অনেক) উড়ছিল শতে শতে হাজারে হাজারে -যার ব্যূহভেদ কঠিন। অন্য এলাকায় পৌঁছানোর একটা পোড়া বনসদৃশ প্রান্তর দেখা যায় এবং সেই পথেই তাকে যেতে হবে, গফুর জরীপ করে নিয়েছিল। একদা-সবুজ-প্রবাহের চারণ-ভূমি এলাকাটা পতঙ্গ-দন্তের নিকট সবুজখোরার কেবল অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল প্রাচীন মৃত গাছপালা এবং শক্ত লতার সান্নিধ্য বিস্তার মারফত। নিকটে একটা সরু খাল,

যদিও মজা, তবু বহমান ছিল ক্ষীণ ধারায়—অতীতের কোন মহাপুরুষের বাণীর মতো। সামান্য এগিয়ে সে দেখেছিল, এক প্রাচীন বৃক্ষের দুই গুঁড়ির মাঝখানে, এক বালক শায়িত এবং পাশে উপবিষ্ট একটি মানুষ অপরজনের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি। গফুরের চোখে পড়েছিল, সারিসারি বহু কবর (দুর্বিপাকে শ্মশানও মহার্ঘ)—বন্দুর দৃষ্টি যায় আর অন্য কিছু অকিপট যোগান দিতে অসমর্থ। লোকটার চুলে জটা, দাড়ি ধুলোকাদায় নিরেট বস্তু এবং সে যে বহুদিন নানা কৃচ্ছ্রতায় হিংস্র পাগল বা আর কিছুতে রূপান্তরিত—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বিজনে মনুষ্য-সৌরভ গফুরের মতো সাহসী জোওয়ান-কে আরো বেপরোয়া করে তুললেও সে হাতে, কেবলিক সহায় যষ্ঠি সদৃশ একটা গাছের ডাল নিয়েছিল এবং বার বার দেখছিল, না, ভাবছিল : ওটা মানুষ কিংবা ভূত বা আর কিছু। বুকের পাটা মেলে এগোতে থাকলে লোকটা গফুরের দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি-তূরপুণ চালানোর পর হাউমাউ কান্না জুড়ে, কয়েক পলক, খুন্ট গলায় জিজ্ঞেস করেছিল,—তুমি.. রহিম গাড়োয়ানের পোলা না?

মানুষটা আর যাই হোক, ভূত নয়। একথা এত দ্রুত গফুরের বিচারবুদ্ধির উপর দিয়ে গড়িয়ে যায় যে সে যথারীতি কুশলাদির জায়গায় এমনি বলে বসে, কত্তো দিন এখানে আছো, ভাই।

- হেই পোকার বছর থেইক্যা।

এতটুকু উচ্চারণের পর, ইনামের (সে ডাল ফেলে দিয়ে পাশে উবু বসে গেছে) অস্তিত্ব-বিস্মৃত লোকটা শায়িত বালকের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, বাবা, কিছু খাবি?

- না।

জবাবের পর ছেলেটা আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি, উঠে বসার চেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু সক্ষম হয়নি। এই অকৃতকার্যতার চাপে যেন আরো অস্থির ক্ষীণকণ্ঠে সে উচ্চারণ করেছিল,—বাবা, বা-জান।

বাবার তখন গফুরের দিকে মুখ। যথারীতি কুশলালাপ শুরু হয়েছিল সাবেক রেওয়াজ-অনুযায়ী। বিলম্বে নারাজ গফুর তখনই প্রস্তাব দিয়েছিল, রুগ্ন বালককে সে কাঁধে করে নেবে এবং পিতা সঙ্গে সঙ্গে যাবে, যতক্ষণ না নিকটস্থ এলাকায় কোন চিকিৎসকের সাক্ষাৎ ঘটে। কিন্তু তার উৎসাহে ঠান্ডা বরফ পড়ে গেল, যখনই বললে, সে আর কোথাও নড়বে না এবং তার হেতু সংক্ষেপে বয়ান করলে। গ্রাম ছেড়ে উপবাসী, পতঙ্গের দংশন ঠেলে-ঠেলে ক্ষতদেহ প্রথমে যখন তারা ওইসব এলাকায় পৌঁছেছিল, তখন তাদের কুষ্ঠরোগী ভেবে আর গ্রামে ঢুকতে দেয়নি এবং অনুনয়ের বদলে অনধিকার-প্রবেশের যে-শাস্তি সেই শাস্তি দিয়েছে গলাধাক্কা, ঘাড়ধাক্কা।

গফুর তবু ছেলেটাকে কোলে তুলে নিতে গিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত, যখন সে দেখলে, রুগ্ন কিশোর অতি কষ্টে শ্বাস ফেলছিল, ক্রমশ অন্তিমের পথে। স্তব্ধ উপবিষ্ট দুইজন রোগীর পাশ থেকে শুধু দেখছিল। দেখছিল, মুহূর্তে সেখানে কী উপদ্রব নিয়ে উপস্থিত হয়।

একসময় গফুরের বুক আরো ধ্বসে যায়, ঠিক বেলাশেষের বেহুরা ছেলেটা যখন মুখ খুলেছিল,—গাঁয়ে যাব।

—যাবে বৈকি, কাকা। জবাব দিয়েছিল গফুর।

ছেলেটা তখনই পিতার দিকে চোখ ফেরাতে বাবা মুখ আরো কাছে নিয়ে গিয়েছিল সন্তানের গন্ডদেশের সন্নিকট।

বালক বিস্ফারিত, উদাস-নয়ন ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিল,—বাবা, গাঁয়ে কি কবর দেওয়ার জায়গা ছিল না? তুমি কি আমাদের এখানে কবর দিতে আনছিলে?

একথা আরো সন্তানের জনক এই সময় চিৎকার দিয়ে উঠেছিল, যখন অন্যদিকে রুগ্ন বালক

কয়েকবার দ্রুত শ্বাস টেনে নিথর হয়ে গেল একটা প্রবল ঝাঁকুনি তোলার পর ধীরে ধীরে ক্লিষ্ট মুখে চরম প্রশান্তির ছাপ রেখে।

পঙ্কজ চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল লোকটার কাঁধে হাত রাখতে—সান্ত্বনা-দানের তাগিদে নয়, নিজেই আশ্রয় পেতে যেন তখনই মাটিতে সে মুখ থুবড়ে পড়ে না যায়। কিন্তু কার কাঁধে হাত রাখবে সে, শূন্যতা যেখানে আবার হেঁকে ধরেছিল।

পঙ্কজের সম্বিৎ ফিরে এসেছিল চিৎকারে। এই ধূসর অরণ্যের আর এক প্রান্তে ছুটে গিয়ে তখন লোকটা হাঁক দিচ্ছিল তারস্বরে. হা—হা হাহ, কী করে গেলে পুত কী করে গেলে আবার কও—।

শব্দ বেজে-বেজে উঠছিল সমস্ত নীরবতা চূর্ণবিচূর্ণ করে এক প্রেতায়িত অট্টহাস্যের ধারায়। লোকটাকে ধরা দূরের কথা, আর দেখাই গেল না, যার ফলে কিছু করা যেত।

শুধু কণ্ঠস্বর বজ্রস্বরের মতো দিগ্বিদিক ছিন্নভিন্ন করতে লাগল বার বার স্থান বদলে, বিভিন্ন স্বরগ্রামে সকল নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে, হা, কী করে গেলে পুত পুত।

১৬

রাজা মজুমদার সেইসব সাংবাদিকদের অন্যতম যারা শুধু ঘটনার অনুধাবন করে না, বরং তার স্বরূপ বুঝতে চায় এবং তার জন্যে যত রকমের ঝুঁকি আছে, মাথা পেতে নিয়ে এগোয় কোনকালে পশ্চাদপসরণের কথা মনে জায়গা না দিয়ে। মজুমদার জানত, ওই এলাকা দুরধিগম্য এবং এতই কষ্ট-সাপেক্ষ যাতায়াত, একমাত্র প্রাণ বলি দিতে পারলেই, হয়ত তাও অনিশ্চিত এসপার-ওসপার করা যায়। দুরন্ত সাহসের অধিকারী, তাই যখন ঝুঁকি নিয়েছিল, সে ভাবেনি, অনেক ক্ষেত্রে শুধু ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তাই সব নয়, বরং তার সঙ্গে সম্ভাবনার একটা যোগাযোগ লাগে এবং তা মজকুর ঘটনার কেন্দ্রে আছে কিনা দেখতে হয়। সে-ও পতঙ্গ-ঝটিকার ব্যূহভেদ-অভিযানে চোখে মুখে অনেক চোট ও দাগ নিয়েছিল, এতটুকু শঙ্কিত না হয়ে, যতক্ষণ নাসিকায় নিঃশ্বাস বর্তমান। মজুমদার অতঃপর দেখেছিল, শুধু দুঃসাহস কাউকে গন্তব্যে পৌঁছে তো দেয়ই না, বরং অহমিকা সৃষ্টি করে, যার স্পর্শ মনে হতে পারে কোন সদ্গুণের শাখা, অথচ তা নয়। এমন ক্ষেত্রে শেষে অভীষ্ট লক্ষ্য আর বড়ো হয়ে দেখা দেয় না এবং মিলেও আখেরে তার লুপ্তি ঘটে অহমিকার আচ্ছন্নতায়। রাজা মজুমদারও এগিয়ে গিয়েছিল পতঙ্গাঘাত দংশন-ক্ষত গায়ে গতরে জড়িয়ে যা তার নিজের এলাকার লোকের কাছে কুষ্ঠরূপে পরিগণিত হয়েছিল। তার নির্ঘাৎ পরিণতি মনুষ্যসমাজ থেকে নির্বাসন এবং উক্ত বিজনে কোনরকমে বাঁচার চেষ্টায় হনো যখন কৌতূহল-আদর্শ অনেকখানি ঝাপসা হতে বাধ্য। তখন সাংবাদিক বুঝেছিল, কোনরকম তদারকে ইচ্ছে সর্বেশ্বর তো নয়ই বরং তা কল্পনামাত্র যদি চারিদিকের সঙ্গে ঠিকমত যোগাযোগ না থাকে এবং তা উপলব্ধির মতো চোখ ভূমি তৈরি করে না থাকে। সাধনা মারফত। হতজ্ঞান সাংবাদিক কয়েকদিন পড়েছিল এবং তারপর উঠেছিল অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষের মতো এলাকায় ফিরে যেতে নয়, বরং আত্মগোপন দ্বারা ক্ষতস্থান সারিয়ে তুলতে যেন গ্রামবাসীদের উৎপীড়ন থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এমন দুর্বিপাকের মধ্যে পড়েও রাজা মজুমদার কিন্তু কৌতূহলের তাগিদ এতটুকু কমতে দেয়নি, বরং সব হদিস তলিয়ে চিন্তা করত এবং এই প্রত্যাসন্ন ছবি নিজের সামনে রেখেছিল ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্যে। সাংবাদিক তাই ওই এলাকার দিকে চোখ রেখে-রেখে ঘোরাঘুরি করত এবং ভাবত, নিশ্চয় ওই এলাকা থেকে কোন লোক আসবেই— না এসে পারে না। কারণ, মানুষ আছে

এলাকায় এবং ওই অবস্থান প্রমাণ করে, মানবপ্রকৃতি চিরদিন একই জায়গায় একই খাতে ডুবে-ডুবে খাবি খেতে অনভ্যস্ত, যদিও সাময়িকভাবে অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটতে পারে। রাজা মজুমদারের এমন দুর্মর বিশ্বাস ছিল বলে, পতঙ্গ-বিধৃত এলাকার কিনারা থেকে সে সাময়িক হতাশাকে ছোট করে দেখত না বটে, কিন্তু উড়িয়ে দিত প্রথমে কল্পনায়, পরে বাতাসে'বাতাসে। এইভাবে সে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একটা উপায় করে নিয়েছিল, যখন সাধারণ উপাদান শুধু মৃত্যু-কীর্তনের মহিমাই চড়া গলায় গাইতে থাকত পূর্বপুরুষদের কণ্ঠ জীবন্ত করে বার বার সমাধি-দর্শন মারফত। রাজা মজুমদারের ধারণা আরো বলবৎ হয়েছিল এই যে পশুপাল যেহেতু প্রচরণশীল পতঙ্গ এবং তার স্বভাব হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ-যাত্রা বিনা অগ্রপশ্চাৎ-চিন্তা, বিনা পরিণাম-যাচাই—একদিন না একদিন তাদের ভূমিকা শেষ হতে বাধ্য। কেবল ধৈর্য, সুযোগ এবং সতর্ক পাহারার জন্যে শঙ্কিত উদ্বেগ পোষণ করে যেতেই হবে এবং তা অবধারিত যেহেতু নিয়ামক কেউ ফাঁকি দিতে পারে না, স্বয়ং ঈশ্বরও সেখানে অসহায় তা বেশ জোর দিয়ে বলা চলে। তা না হলে দৈনন্দিনতার করিডরে যে-উৎপাত দেখা দিত, তারপর জীবনের আর কোন অর্থই থাকত না এবং হাজার হাজার বছর মানুষ যে নিজেকে অতিক্রম করেছে, জটিলতা থেকে আরো জটিলতায়, তা কোন কালেই সম্ভব হত না এবং পৃথিবী চিরদিনই আদিমতার গর্ভে নির্বাসিত থাকত।

সৌভাগ্য বলতে হয়, গফুর পড়বি-পড় একদম প্রথমেই পড়েছিল রাজা মজুমদারের সদা-জাগর চোখের সামনে, যখন সে অপর এলাকায় পা দিয়েছিল বুকে নানা দুরু দুরু আশঙ্কা পুষে। আত্মার অমন নির্বাচন-ক্ষমতা আছে কিনা, বলা দুরূহ, যদ্যপি উক্ত ক্ষেত্রে তারা উভয়ে উভয়কে দেখা-মাত্র এক লহমায় চিনে ফেলেছিল। যেহেতু গফুরের গায়ে কোন দাগ ছিল না, সাকিম জানার পর, রাজা মজুমদারের শুধু বিস্ময়ের উদ্রেক হয়নি, তার কৌতূহল তখন কড়ার উপর ফুটন্ত ধান অর্থাৎ খইয়ের মতো দিকভ্রান্তি-বিলাসে এমন মত্ত হয়েছিল যে সে কী জিজ্ঞেস করবে সে হদিস তফাতেই থেকে যায়। প্রাথমিকতা কাটে, কেটে গিয়েছিল ধীরে ধীরে এবং সহসা পুনরায় শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়েছিল এ-ও তার পাশ কাটিয়ে। গফুরের নায়ক হিসেবে যা জানা, রাজা মজুমদারও তো মগজের খাটালে খাটালে ভরতে থাকে এবং আফশোস করে, তার সঙ্গে প্রচুর কাগজ-পেন্সিল থাকা উচিত ছিল। তবে এই উৎসাহ নিভে এসেছিল যখন সাংবাদিক মজুমদার আবার প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাইয়ের কথা ভাবে এবং সেইহেতু প্রস্তাব দিয়েছিল, সেও আবার গৌড়গ্রামে ফিরবে একসঙ্গে যেখানে যাওয়ার জন্যে সে কত দিন প্রতীক্ষা বা বেসবুরে অস্থিরতায় ক্ষয় করেছে। এই স্থলে গফুরের ধন্দে পড়ে যাওয়ার হেতু ছিল। গ্রামে সে বহু ধরনের মানুষ দেখেছে এবং সেইজন্যে নানা দল, উপদল, সংঘর্ষ-বিবাদ যার পরিণতি তাদের অতি গোপনীয়তা রক্ষার শপথ। রাজা মজুমদার কী ধরনের মানুষ? কয়েক লহমার মধ্যে গফুরের একটা ধারণা হলেও বিশ্বাসের রশি কতখানি ঢিলে দেওয়া যায়? শেষে সব ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। সে-আশঙ্কা মাদবর চাচার চোখে বার বার প্রতিভাত, দেখেছিল সে এবং যাত্রার পূর্বে শুনেছিল পুনঃপুন তার সতর্কতামূলক কণ্ঠ-স্বর। কিন্তু একটা আশ্বাস বর্তমান, যদি কোন ফলদায়ক যুক্তি পাওয়া যায়, যার পরিণাম তারা চোখেই দেখতে পাবে। যেহেতু এখানে সমস্যা একটাই এবং তার মধ্যে কোন ঘোর বা প্যাঁচ নেই : আততায়ী-নিধন। রাজা মজুমদার শেষ পর্যন্ত গফুরের কূটনৈতিকতার নিকট হেরে গিয়েছিল না কেবল, সে জানতেও পারেনি কিভাবে লোকটা সেখানে হাজির হয়েছিল অমন অক্ষত শরীরে। তবে রফা হয়েছিল ব্যবসা-সুলভ কায়দায় বিনিময়-মারফত, ভবিষ্যৎ আশা-পূর্তির উপর, যখন গফুর তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এবং অচিরে—জোর একদিন বাদ।

গৌড়গ্রামে তুমুল হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল পরদিন কতগুলো আকস্মিক দৃশ্যে নয়, বরং দৃশ্যের

সংখ্যাগত পরিবর্তনে এবং নানা দুঃসাহসিকতার বহরে। পতঙ্গ মরে পড়ে ছিল শতে শতে সড়কের উপর, যা দেখে মনে হতে পারে, কেউ ঔষধ ছড়িয়েছে কোন একরকম এবং তারই পরিণতি এই মড়ক। বাতাসের গন্ধ বদলে গিয়েছিল। তার প্রমাণ, ফুলের আঘ্রাণ ফিরে এসেছিল, যা এতদিন পাওয়া যেত না দুষ্প্রাপ্য বলে নয়। (কোথাও আড়ালে ফুটলেও গন্ধ আসবে বৈকি) বাতাসের মধ্যে কী যেন প্রবেশ করেছিল। এক জায়গায় পোড়া কিছু লতা এবং জমিন দেখে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল, কোথাও কোথাও অগ্নিসংযোগ হচ্ছিল পতঙ্গ-নিধনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এমন হঠকারী উন্মাদের দল কোথা ওত পেতে ছিল যে তাদের কোন সন্ধান মিলবে না যা অতি অবিশ্যি দরকার শুধু অনাচার নয়, ভবিষ্যতের আরো গজব-রোধকল্পে। মোহাম্মদ আলী আর গৃহাবদ্ধ থাকেনি, বেরিয়ে এসেছিল গ্রামের আরো মাতব্বর এবং শক্ত জোওয়ান সঙ্গে, যেন অমন খামখেয়ালিপনা, অনাচার আর না বাড়ে, যার ফলে গোটা গৌড়গ্রামের ধ্বংস অনিবার্য। কবি জনপরিবেষ্টিত নতুন নতুন কবিতা আবৃত্তি শুরু করে দিয়েছিল যেন মুখস্থ করিয়ে দেওয়ার পর তারাও আবার বাণীর বিস্তার ঘটাতে পারে। শেষে দরুদের মতো মন্ত্রের মতো পাঠ হতে লাগল গ্রামের মরাণবস্থা আবহাওয়ার মধ্যে কবিতার গুচ্ছ, পুঞ্জ, পংক্তি-আবলী এক অপূর্ব স্তিরেন, যা বহু পূর্বে সুরক্ত মণ্ডল দিতে পারতেন। কিন্তু সবই বালুভর্তি বুলেটের মতো ফাঁকা যেতে লাগল, যখন বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল, পতঙ্গ-মড়ক অব্যাহত আছে গ্রামের বিভিন্ন দিকে। হয়রান মোহাম্মদ আলীর সৃষ্টিধারা বেগে প্রবাহিত হতে লাগল সেই অনুপাতে, যে-অনুপাতে পতঙ্গের লাশ স্তূপীকৃত হতে লাগল আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে, বনেবাদাড়ে, আঘাটায়, কুঘাটায় যায় নিষ্ঠীবন ইষ্ঠিবন সামিল। যেন সুরাসুরের যুদ্ধে রক্তমুকুল নিহত হচ্ছে অথচ অদৃশ্য দেবতাদের দর্শন মিলছে না প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে যা বিধৃত।

সেই সময় একদিন মাদবরকে মোহাম্মদ আলীর ডাকার হেতু বোঝা না গেলেও সে বুঝেছিল, কবিতার জোর থাকলেও ঐতিহ্যের খুঁটি-সদৃশ ঐ বর্ষীয়ান ছাড়া তার উদ্দেশ্য এগোবে না।

- মাদবরসাহেব, আপনি থাকতে গাঁয়ে এসব অনাছিষ্টি। এখন হয়তো গ্রামে আট আনার মতো লোক মরছে। কিন্তু যা হচ্ছে তাতে ষোল আনার কিছু থাকবে না।

—কী করব, কবিমহাশয়?

--ধৈর্য ধরেন।

- তা ধরেই আছি।

-কিন্তু গাঁয়ে কিভাবে এসব হচ্ছে?

আল্লা জানেন।

- তা ঠিক। তবে আমাদেরও জানতে হয়।

--সব আল্লার উপর নির্ভর।

তা ঠিক। তবে কিনা ।

--? ? ? ? ?

-- তবে আপনাকে একটু দেখতে হয়।

- আসুন, রাত্রে আমরা পাহারা দিই।

—বেশ, কখন যেতে হবে, খবর দেবেন।

পারস্পরিক সন্দেহে গৌড়গ্রাম নিমজ্জিত। মোহাম্মদ আলী সুরাহা-প্রার্থী, বেশ উল্লসিত হয়ে উঠেছিল যখন মাদবর প্রস্তাব দিলে, আপনি জ্ঞানীগুণী মানুষ। আমার পাড়ার ছেলেরা খুশি হবে আপনে গেলে। তবে কী জানেন, পাড়ায় পাড়ায় বিবাদ। আপনি একা আসুন। আমরা

দু-একদিন পাহারা দিলে হদিস বেরিয়ে যাবে। আমি মুরুব্বু মানুষ অ্যাম্নেই বুঝি।

চাটুকারিতা বা আর কিছু। এই দ্বিধায় মোহাম্মদ আলী সরলভাবেই প্রতিবাদ করেছিল বিনা সন্দেহে, না- না- ।

কবির উদ্দেশ্য এবং কাব্যের উদ্দেশ্য যদি এক খাতে প্রবাহিত না হয়, তখন কারিগর হিসেবে নিষ্ফল বাঞ্ছাজাত এক রকমের তিক্ততা কবিদের মনে দেখা দিতে পারে। কিন্তু মোহাম্মদ আলী স্বতন্ত্র মানুষ বিধায় তার ধারে-কাছে যেতে না-পারার কারণ, মোহের সম্মুখে সে সেবাদাসীর মতো নির্বেদিত হতে পারত। তাই সন্ধ্যার পরই এক দঙ্গল লোকের মধ্যে, প্রায় ক্ষুদ্র জনতা, এসে পড়ে সে ভাবছিল, তার সাধনার একটা স্বচ্ছন্দ যাচাই চলে যাবে, যদি এদের প্রতি সমীহা থাকে।

মাদুর এগিয়ে দিয়েছিল মোহাম্মদ আলী অতিথিকে সম্মান দিতে। গ্রাম্য রেওয়াজে যা কতকাল ধরে চালু। গফুর, রাখাল, বুলন -এমন আরো চেনা মুখ বেরিয়ে পড়ে মোহাম্মদ আলীকে দেখে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল যদিও এদের অনাহারক্লিষ্ট মুখে এমনিতেই কাউকে আনন্দ দেওয়ার কথা নয়। একথা, সেকথা, আসল কথায় যেতে আদৌ বিলম্ব না হওয়ার হেতু, খালি পেটে একমাত্র হারামজাদা ব্যতীত কে-ই বা আর কাব্যমাহাত্ম্য নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে? মোহাম্মদ আলী সোজা অস্থিরতাজাত অধৈর্য এবং তজ্জাত প্রাণিহানির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিল। অকুস্থলে মাদবরের উঠান বটে, কিন্তু সুড়ঙ্গ নিকটেই মেঝের মাঝখানে একটা মাদুরে-ঢাকা।

কবি উচ্চারণ করেছিল,—মাদবরসাহেব, আমি আগেও বলেছি, না ভেবেচিন্তে কাজ ভাল নয়। আর তাছাড়া—।

-কবিসাব, বহুদিন নয়, কয়েক মাস তো গেল। আপনে অহনও কন্- । মোহাম্মদ আলীর বাক্যসমাপ্তির পূর্বে হঠাৎ-উপস্থিত গফুর গলা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

কবি এমন ছেলেদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। যেহেতু সচরাচর মার্জিত-রুচি সভ্য মানুষের সামনে গ্রাম্যজন, এমন ভাব-দর্শনে অনভ্যস্ত।

-গফুর, চুপ করো। মোহাম্মদ আলী তাকে সঙ্গে সঙ্গে কুঁপিয়েছিল,- বোঝা যাচ্ছে, তোমরাই এসব অনাছিষ্টি করছ, আগুন লাগাচ্ছ, পতঙ্গ মারছ।

মারছি। হ মারছি। মারুম না?

তা আমার বুঝতে বাকি নেই।

আমাগোও নাই।

- কী নাই?

মাদবরসাহেব, আপনি এইসব ছোকরাদের আস্কারা দেন, বোঝা গেল।

মোহাম্মদ আলী মাদবরের দিকে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু সে অবনত-মুখ, অপাঙ্গ-দৃষ্টি গফুরের উপর।

-বেশ আজ সব জানা গেল। আমি চললাম। তবে । কথা শেষ না করেই মোহাম্মদ আলী যেই পা তুলেছে, গফুর চটপট এগিয়ে খামচি-যোগে তার পাঞ্জাবির কলা ধরে কটমট তাকাতে শুরু করেছিল।

—কী, মারবে নাকি? অভ্যন্তরে ভীত মোহাম্মদ আলী বাইরে রোয়াব স্থিতাবস্থায় বজায় রাখে।

—মারুম না আপনেরে। তবে আর যাইতে দিমু না। গফুরই একমাত্র জবাব দিয়েছিল। আরো ইতিমধ্যে অনেকে উপস্থিত, মূর্তিবৎ স্তব্ধ।

—যেতে দেবে না?

—না।

—না?

—দ্যাশে পাঠামু আপনেরে।

—আমি এখন দেশে যাব না।

—পোকার ডর?

—না। পরে যাব। আমার ইচ্ছেমত যাব।

গফুর তখন কবিকণ্ঠে ছেড়ে দিয়ে সঙ্গীদের সম্বোধন করেছিল,—ধর হালারে। পঙ্গপাল চেনে না, হালা কবিতা লেখে। সুরুজ দাদু ঠিক কইছিলেন।

মাদবর কী একটা আপত্তি তুলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল এই ভেবে যে ছেলেছোকরাদের তখন রুখতে গেলে কবির নাজেহাল আরো বাড়বে বই কমবে না। হিড়হিড় তারা মোহাম্মদ আলীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ঘরের মেঝের উপর মাদুর সরিয়ে, যেখানে সুড়ঙ্গের মুখ হাঁ-হাঁ করছে, কেমন একটা ত্রাস-ভাব-রঞ্জিত অন্ধকারের সঙ্গে লেপ্টে।

গফুরের বাগাড়ম্বর—হালারে কইয়া দে, সুড়ঙ্গ কাইট্যা মানষের কাছে খবর লইছি, ওগুলো পোক, পোক—লোক না। মারলে গুনা (পাপ) অয় না। তারপরই সে সঙ্গীদের নির্দেশ দিয়েছিল,—সুড়ঙ্গে ঢোকা ব্যাডা রে। (কবিকে) ডর পাইয়েন না কবিসা'ব। হাইট্যা চইলা যান, পোকে খাইব না।

এই সময় বাগ্‌দেবীর বরপুত্রের মুখের আশপাশে বা ভেতরে কোন বাক্য বা শব্দ ছিল কিনা—এমন মনে উদয়ের হেতু এই যে মোহাম্মদ আলী শুধু বার বার মাদবরের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, কিন্তু কিছু কইতে অক্ষম। তবু শেষে সে প্রায়-মরীয়া চিৎকার দিলে, মাদবরসাহেব, আমি যাচ্ছি। একটা অনুরোধ—।

অবনতমুখ খাড়া মাদবর এবার বেশ সলজ্জ কণ্ঠ উচ্চারণ করেছিল,—বলেন—বলেন, কবি-মহাশয়।

—আমার কবিতার খাতাগুলো এক দৌড়ে এনে দিতে বলেন।

—যেহানে আছে সেহানেই থাকতে দিন। চাঁচাছোলা কণ্ঠ গফুরের।

কিন্তু খেদোক্তি কবির গলায়,—না, না, ওখানে থাকলে পোকায় খেয়ে ফেলবে।

—মানুষকে পোকায় খাচ্ছিল, তাতে তোমার—হালা আপ্‌নের কিছু তক্‌লীফ অয় নাই। অহন কডা কবিতার জন্যে শোক—মার হালা।

গফুর সত্যি কবির পাছায় এক লাথি মেরে বসেছিল এবং বড় বাড়াবাড়ি মনে হওয়ার ফলে মাদবর অসোয়াস্তি ভোগ করে। কিন্তু গফুর তখন পঞ্চমে, কবিসা'ব, ওই কবিতা লেখার চাইয়া লোম ছিঁড়বেন, অনেক কামে লাগবে।

বুলোন হাসতে হাসতে সায় দিয়েছিল,—কাকা, হে কাম-ই করে কবি। দ্যাহেন না, হে-কামের পর কয় গাছি ধুতনির উপর লাগাইছে।

মাদবর বাদে আর সকলে যখন তুমুল হাস্যরত, সেই ফাঁকে গফুর মোহাম্মদ আলীকে ঠেলে সুড়ঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অবিশ্যি তৎপূর্বে পাছায় আর-এক লাথি-প্রদান-সহ।

মাটি ফুঁড়ে যেন নির্গত, এতক্ষণ ওত পেতে ছিল রাজা মজুমদার, মন্তব্য পরিবেশনে বিলম্ব করেনি,—আপনারা ঠিক করেছেন। আমার দুঃখ এগুলো লেখাপড়া শিখে এত অন্ধ হয় কী করে? কিন্তু ভাইসব, বড় নাটকে কিছু ভাঁড়ের দৃশ্য থাকে। যাক সেকথা। আমাদের আরো ঢের কাজ বাকি আছে। প্রস্তুত হোন।

১৭

দীপালি উৎসব না মশাল-মিছিল, তা আর বলার যো ছিল না, এমনই দিকে দিকে লকলকে অগ্নি-শিখার জয়-জয়-রব উত্থিত। যখন বেরিয়ে আসছিল গ্রামের নানা প্রান্ত থেকে শত শত বালক-বালিকা কিশোর যুবক, কেবল চলৎশক্তি-বিরহিত-নয় বৃদ্ধ এবং সেই দৃশ্য দেখতে লাগল চটের আড়াল সরিয়ে, উঠানের পার্শ্বস্থ কলাগাছের ওত ফাঁক করে-করে অন্দরমহলের বধূ, তরুণী আরো পুরবাসিনীরা -যারা সহজে পর্দার দেওয়াল টপকায় না। সকলের হাতে আগুনের হল্কা স্থির থাকবে কী, এদিক ওদিক ধাইছিল, এতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে যেখানে পঙ্গপাল বসে থাকবে বা বসে আছে নতুন কোন হামলার জন্যে। সূচীভেদ্য অন্ধকার পটভূমি রচনা করেছিল ওই মনুষ্যযাত্রার— হাজারে হাজারে যাচ্ছিল না শুধু, জয়-জয়কার-ধ্বনি তুলছিল প্রতিধ্বনির মধ্যেও যেন সেই অনুরণন বজায় থাকে, অবিকল যাকে আপন উৎপত্তিস্থলের মতো এবং সহজে তা আর নির্বাপিত না হয় নিস্তব্ধতার জঠর-গর্ভে- যেখানে বোবা এবং কবর একত্রে গলাগলি-রত। কণ্ঠস্বর যে বজ্রস্বর হতে পারে শুধু তোড়ের মাহাত্ম্যে নয়, বরং উদ্বেলিত বক্ষপিণ্ডের উপর কেলি-পরায়ণ রক্তের হিল্লোলে— তার পরিচয় এইখানে পাওয়া যাবে এবং তা পেতে তোমার নিকটে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কেবল কোথাও একটু দাঁড়াও, তোমার কান তোমার জন্যে প্রয়োজন নেই, কোন নিবিষ্ট মনোযোগ পর্যন্ত অনাবশ্যক। কেবল নিজের বক্ষপিণ্ডে হাত দিলে, জানান দিয়ে যাবে : জনারণ্যে খাণ্ডবদাহন শুরু হয়েছে প্রচণ্ড বিক্রমে, তড়িৎ গতির সম্ভ্রমে এবং তুমি -বেশি বিলম্ব হবে না- -তখনই তার মধ্যে নিজের সব কামনার মূর্ত রূপ খুঁজে পাবে বলে আর দুই কদম স্থির থাকতে পারবে না, বরং তখনই ছুটবে কোন রণমুখী অশ্ব -দেহের ছন্দে উন্মাদ অথবা মাতাল। সড়কের ধুলো যা চিরদিন মাটির সঙ্গে মিশে থাকে বা ঈষৎ আলোড়নে সামান্য এদিক ওদিক উচ্চতা-জরীপের পর প্রশান্তি পায়, তা-ও প্রাণবন্ত আর নিজের কেন্দ্রবিন্দুর তোয়াক্কা তো রাখেইনি, বরং উঠছে, ছুটছে এবং সকল স্থানেই 'হেথা নয়' রবে তাদের প্রত্যাখ্যান করছে হেতু নিবেদনের পর . প্রাণ, প্রাণের জোয়ার চতুর্দিকে, হে অন্ধ, কোটালবন্যার উন্মত্ততায় তীরভূমি গ্রাস করছে চোঁ- চোঁ—ঊর্ধ্বশ্বাসে। তাই স্থির হতে যেও না, বেগের সামিল হও যেমন ঘাটের নৌকা মাঝদরিয়ায় তখন ভেসে পড়ে, তীরের সলিল-সমাধি থেকে নিষ্কৃতি পেতে। হল্লা-হুল্লোড় নয়, সংগঠনের আশ্চর্য রূপে নৈরাজ্যের কুজ্ঝটিকা ছড়িয়ে রাখে তাদের জন্যে, যারা আত্মপরায়ণ খোলসে গুটিসুটি, অল্প পরিসরে ঘোরাফেরা করেছে এবং যার পরিণতি ক্রমশ দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা কেন, সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় (কোথাও ব্যাপ্তি থাকলেও তা আদৌ গভীরে নয়)- -যা সন্দেহের বীজ বপন করে কোন-কিছুর স্বরূপ সম্পর্কে আবছা ধারণায় এবং এই সন্দেহ আগে ভীতি- -যেমন স্ত্রীর উপপতিকর্তৃক গোপনে নৃশংস অতর্কিত নিহত হওয়ার সম্ভাবনা। অথচ ভেতর থেকে তার লীলায়িত ছন্দ, সুর শুধু উপভোগের সামগ্রী নয়, উপরন্তু ধীরে ধীরে তার মধ্যে প্রবেশ এবং তার মধ্যে আত্ম-অবলুপ্তির উন্মাদনা জেগে ওঠে, আত্মহত্যাপ্রবণ কোন যান্ত্রিক ইচ্ছায় নয়, বরং আরো-আরো সান্নিধ্যে নিজেকে আলিঙ্গন করার জন্যে, যখন নিজেই সকল সমষ্টির প্রতীক এবং কায়িক অসুবিধা থেকে রেহাই পাওয়ার তাছাড়া আর যে-কোন পথ রুদ্ধ। জীবন-মৃত্যুর ফারাক এইভাবে অন্য কোন ভেদরেখায় সীমাবদ্ধ না-থাকার ফলে, তখন গতি কোথা থেকে এসে জোটে এবং সবকিছু দ্রুতান্বিত করে তোলে যেখানে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, অধীরতা, অস্থিরতা এমন একাকার হয়ে যায় যে মনে হবে, সংগতির একটিমাত্র সুরে সব আবদ্ধ। রাগ-মেলে যে-বিবাদী ধ্বনি আছে নব-অর্কেস্ট্রার আয়োজনে তারও অবস্থিতি অপরিহার্য। নচেৎ কিছুই মিলবে না, যতই মেলাতে চেষ্টা করো। মিছিল-চালক এবং চালিত কোন পৃথক পৃথক খড়ে অগ্রসর

হয় না। দুর্বল-সতেজের পার্থক্য সেখানে এত অবান্তর যে সাধারণ দৈনন্দিন দৃষ্টির বহর যতই স্ববিরোধ দেখুক না কেন, কোন কিছুই ধরতে পারবে না, যদি না মিলিত অখণ্ডতার সব দ্যাখো। চলমানতা যেখানে চাঁদোয়া টানায়, তার নিচের দৃশ্য দেখতে এক জোড়া চোখ, কান বা আর কোন সহায় অসহায়, এইজন্যে যে গতির পরিমাপ সহজ নয়। মিলিত হলে মিলনের মর্যাদা উপলব্ধি করা যায়। এই সূত্রে এখানে যেমন প্রযোজ্য তেমন আর কোথাও না। তাই ওদের বাইরের পদক্ষেপ, উল্লাস, উন্মাদনায়-অনুভূত বসুধার থরথর-কম্পন অথবা প্রথম বিশ্ববিলোকনের বিহ্বল-বিস্ময় সাধারণ দর্শকের চোখে কখনই ধরা পড়বে না, যদি না শরিক-রূপে সে জমিনের উপর দাঁড়ানো থামিয়ে, চলা শুরু করে। মাতাল পেশী মাতালের সঙ্গে যে-সম্পর্কটুকু রাখে তা কেবল বহুদিনের অবস্থান-বাধ্যকতা। নচেৎ একই খাতে বাহিত হলে নেশা তো বেইজ্জত হয়ে দাঁড়ায়। স্ববিরোধের আলেয়া এমনই মশাল-মিছিলের সঙ্গ পেতে আরো দাউদাউ-জ্বলন্ত দিশাহীনতার মাত্রা বাড়িয়ে তুলছিল স্বয়ং বেপথু হতে, নিজের বৈশিষ্ট্য পরাভূত করতে। চিৎকার কিভাবে সুর হয়, এই প্রসব-দৃশ্যের জন্যে ঘরের বাঁধা-ধরা অচল উঠান সড়কের দিকে ইঙ্গিত-মারফত ক্ষান্ত থাকতে অসমর্থ, বরং ভূমিকম্পের স্তব করছিল—যা ওলটপালটের ধুনাইকর না হলেও কিছু স্থানচ্যুতির সান্ত্বনা অন্তত সুনিশ্চিত রাখে। পুরনারীবৃন্দের প্রার্থনা দেখা গেল, চটের পর্দার উন্মোচনে, যদ্দূর সম্ভব বেআবরু বেরিয়ে আসতে পারা যায় এমন দুঃসাহসিকতায়। গোড়গ্রামের রুদ্ধ অগ্নিগিরি লাভার লাভায় এগোচ্ছিল গ্রামের এমন ব্যাদন-মুখ যে জিহ্বার অসহায়তা চাটা হয়ে যাবে প্রত্যয়হীনতা সমাহিত হবে তপ্ত কর্দমের নিচে—যা সৌরভ-রূপে সুড়সুড়ি-দান-রত সড়কে শরিক হতে—যেখানে কুসুম-পল্লব পূর্ণ ভাণ্ডারে প্রতীক্ষমাণ। উপনিষদের চরৈবেতি আহ্বান যা যুগযুগান্তের কালের এ'টেল মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল, পুনর্বার মন্ত্রতরঙ্গে আছাড় খায় কর্ণচত্বরে, মর্মপথে—যার মূর্ছনায় আত্মপর-বিস্মৃত এই জনপদের অধিবাসীরা উধাও-বিবাগী। তার জন্যে আদৌ রুদ্ধ নয়, বরং এগিয়ে যাচ্ছিল হাতের মশাল যথাযথ রেখে, কাতার না ভেঙে, যদিও কেউ পেশাদার সৈনিক নয়।

মাদবরের হাতের মশাল সবচেয়ে উজ্জ্বল, এমনই কায়দায় মশাল-দণ্ড ঘোরাচ্ছিল সে যেন অগ্নিশিখা সমান তালে চতুর্দিকে পৌঁছায়। গফুর, রাখাল, বুলান এবং অন্যান্যদের চিৎকার সর্বকণ্ঠ ছাপিয়ে উঠছিল তারুণ্যের মাহাত্ম্যে নয় শুধু, আবেগের অসহ্য তাগিদে, অঙ্কুশ-আঘাতে। অনেক লোক। সংখ্যার একুন নিষ্প্রয়োজন এইজন্যে, সংখ্যা যখন গুণে পরিণত হয় তখন সাদামাটা হিসেব হিসেবের প্রহসন মাত্র। মসজিদের ইমামের বহু ভক্ত কখন ভিড়ে গিয়েছিল এই হুল্লোড়ে তার খেয়াল তারা করতে পারেনি, এমন কি যখন জয়কার দিচ্ছিল,—'দশ যেথা, খোদা সেথা, দশ যেথা খোদা সেথা' রবে। এইসব হুঙ্কারের পেছন-পেছন ঢাক-ডমরুর বাদ্যধ্বনি প্রচণ্ড আওয়াজে রণক্ষেত্রের সূচনার মতো বেজে চলছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কালো আকাশ জুড়ে উড্ডীন পঙ্গপাল পালাচ্ছিল জমিন থেকে, গাছপালা থেকে। শুঁড়ে সঙ্গীন, চরণে কাঁটা-কাঁটা নখর জীবগুলো আতঙ্কিত দিকজ্ঞানশূন্য যখন এদিক ওদিক পাখনা-বিস্তার মারফত উপরে উঠছিল, অসংখ্য তার পূর্বেই ধরাশায়ী ঠ্যাঙানির চোটে, আগুনের হল্কায় ছাই অথবা পোড়া-ভাজা। বনেবাদাড়ে, আঁদাড়ে, জলাশয়ের ধারে তৃণলতা-সম্ভারী ও মাঠঘাট মরুভূমি করার পর তারই উপর আস্তানা-নির্মাণকারী পতঙ্গগুলোর বহুদিনের মৌরসী স্বত্বে হঠাৎ এমন আঘাত লেগেছিল। তাই জীবসুলভ যেটুকু আক্কেলের অধিকারী, তাও খুইয়ে ফেলতে বিলম্ব ঘটেনি : ঝাঁপ দিচ্ছিল সোজা মশালের মধ্যে। আলোর পরিধি বেশি দূর যায় না বিধায় অনেকের আফশোস—অনেক আফশোস—চোখ তেড়ে-তেড়ে আর কদ্দূর দেখা যায়? অনেকে চলাপথেই অনুমান করছিল, পতঙ্গগুলোর আবির্ভাবকালে যেমন পুরু ছায়া পড়েছিল, কালো ছায়া অথচ আশীর্বাদ-রূপে সংগৃহীত—তেমনই সঞ্চরমাণ ছায়া এখন চতুর্দিকে। কিন্তু

গোটা পৃথিবীর জন্যে আদিখ্যেতা নিরর্থক, যখন নিজের অল্প পরিসরটুকুই পরিষ্কার রাখা প্রায় সাধ্যাতীত। মশালধারীরা আকাশের দিকে চোখ তুলে মাঝে মাঝে দেখলেও আশপাশের ঝোপঝাপ কেউ বিস্মৃত হয়নি, বরং এগিয়ে যাচ্ছিল দ্রুত কোথাও স্রেফ আগুনে ধরিয়ে দিতে, যেখানে পোকা ছাড়া অন্য কিছু নষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা অনুপস্থিত। কেউ কেউ পোড়া-পাখা, ভাঙা-ডানা পতঙ্গপালের উপর লাথি মারছিল; বহুদিনের জমাট জিঘাংসা তখনই অকুস্থলে প্রশমিত করতে বেহুঁশ—নিজের গায়ে চোট লাগতে পারে এমনই অমনোযোগী।—'খেদাও, মারো, আগুন লাগাও' ইত্যাদি আদিম শিকারীদের মুখ-ফুৎকারের সঙ্গে তুলনীয়, যার মধ্যে একাগ্রতা, ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন, ক্ষুধা নিবারণের প্রত্যাশা-আনন্দ এবং পাশব-শক্তির আবাহন (যেহেতু জন্তু-বধে দরকার) সব মিলিয়ে থাকে। স্ত্রীপুত্রপরিজন হারানোর শোক, গৃহপালিত জীব-খোয়ানোর খেদ, প্রতিবেশীর খাঁ-খাঁ ভিটার উন্মাদ-বিষাদ এমন শত বিয়োগ-ব্যথার সমাহার যদি চোখের সামনে পলকে-পলকে ভেসে ওঠে, কার না প্রতিশোধস্পৃহা রণপা-পায়ে তুড়ি দেবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। কিন্তু স্থিতধী এক অন্তর্নিহিত বেগ সকলকে অভীপ্সা যোগাচ্ছিল, অথচ জ্ঞানশূন্যতার বিজনে কাউকে নির্বাসন দেয়নি। এত শব্দ, এত আলো, এত হুংকল্লোল! যাদের কাছে ওই পরিস্থিতি পতঙ্গপাল-আবির্ভাবের মতো অপরিজ্ঞাত ছিল, তাদের স্বতঃই ভয় পাওয়ার কথা, আর চেষ্টাই পায় না জানার—কিসে কী হয়। শুঁড়-সংগীনহারা কতগুলো পতঙ্গপাল পূর্বে থেকে রাস্তার উপর পড়ে ছিল, যাদের কুচকাওয়াজীরা তালভঙ্গের অপরাধ সত্ত্বেও লাথিযোগে আরো রগড়ে দিয়েছিল ঠিক শিলে নোড়া ব্যবহারের কায়দায়। বিরাট ঘূর্ণীস্রোতের চাকায় এমন ছোট ছোট বহু চাকা বা অঙ্কাংশের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত, যদি হাজার হাজার জোড়া চক্ষুধারী কেউ থ কত সেদিন সর্বস্থলে সদা-উপস্থিত।

সুড়ঙ্গ নিচে পড়ে ছিল একান্ত একাকী নিথরতায়—যে-অবস্থান এক বিবৃতির শেষ সিদ্ধান্ত বলা যায়। যেহেতু নিঃশেষ প্রয়োজন। মাটির উপরেই যখন পা ফূর্তি লাভ করে অশেষ-অশেষ আলোর সঙ্গে তাল-রত, তখন অন্ধের মতো অন্ধকারে গুটিগুটি পদে পদে সতর্কতা-সহ কে আর হাঁটার পিয়াসী? একটা মশাল-বহর এই পথে এগিয়ে আসছিল যার পুরোভাগে মাদবর, বুলান এবং তাদের ছায়ানুসারী কয়েকজন উৎসাহ-আতিশয্যের যোগানদাতা-রূপে, যখন যা প্রয়োজন। যথা, কাতার ঠিক সমান রাখা বা কোন ঝোপের অলিগলি যেন ফাঁক না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রভৃতি।

মিছিলের এক ভাগ সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল, পরবর্তী যাত্রাপথ জরীপের জন্যে। অন্ধকারে দূরাগত কোন বিস্ফোরণের শব্দের মতো শত শত পতঙ্গপালের পাখনার আওয়াজই একমাত্র নিরিখ—যার সাহায্যে শত্রুর অবস্থান নির্ণেয়। মাদবরের চোখে পড়েছিল প্রথম এবং তারপর অন্যান্যদের, যখন শত শত মশাল পর্যন্ত স্থিরশিখা, যেমন দাঁড়িয়ে যায় যারা মশালের দণ্ডবাহী। তাদের সম্মুখে একটা লোক খাড়া। সে জটাজুটধারী, শালদীর্ঘ শীর্ণ চেহারা, যদিও গায়ে ছেঁড়া কাঁথা জড়ানো। তার চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছিল বিশাল রুপো দাড়ির মধ্যে, যেন নিশীথের ব্যাঘ্রনয়ন। কিন্তু তাকে ভূত ছাড়া আর অন্য কোন আখ্যায় কে অভিহিত করতে পারে, যখন জায়গাটা জনশূন্য এবং মনুষ্যবসবাসের পক্ষে অসম্ভবরূপে অযোগ্য। মশালের আলোয় তাকে দেখা গেল, দাঁড়িয়ে আছে স্থাণু। কোন শিল্পীর আঁকা চিত্র বা হঠাৎ-স্তব্ধ সমুদ্রপ্রবাহ। দুই পক্ষে বিস্ময়-নিমজ্জিত মনুষ্যবৃন্দ। মাঝখান জিজ্ঞাসামুখর চোখের দৃষ্টিতে-দৃষ্টিতে প্লাবিত—হুলাব।

প্রথম মুখ খুলেছিল মাদবর, কে? শেখপাড়ার মেনা শেখ না? গফুরের কানে শব্দ-পড়ামাত্র সচকিত, অতঃপর স্মৃতির সমতলে পায়চারী-রত: সেদিন সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে একেই দেখেছিলাম।

লোকটা এগিয়ে এসেছিল ধীরে ধীরে এবং অনুভব করছিল, স্তব্ধ এক বাহিনী তার কার্য-

কলাপ নিরীক্ষণ-রত। কিন্তু সেদিকে তার আকর্ষণ নয়। প্রথমে ধীরে, পরে অতিশয় দ্রুত-পদ সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাদবরের বুকে এবং তাকে আলিঙ্গনে বেঁধে চিৎকার দিয়ে উঠেছিল, —এত দেরি করে আইলি, মাদবর? এত দেরি কইর‍্যা?

—মেনা শেখ, ভাই।

—মাদবর, ভাই।

—পণ্ডিতপাড়ার হেরা কোথায়?

—সব খতম।

—তাঁতিপাড়ার মহেশ-রমেশরা?

—সব শেষ, আমিও শেষ।

—ভাই!

—ভাই। আর কাঁদুম না।

স্বয়ং আলিঙ্গনমুক্ত মেনা শেখ মাদবরের দুই কাঁধে রক্ষিত হাত, চোখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি উচ্চারণ করেছিল, —আমার মশাল কোথায়?

—এই নাও। কম্পিত-কর মাদবর।

মশালটা হাতে নিয়েই মেনা শেখ কিন্তু অন্ধকার মাঠের দিকে দৌড় আরম্ভ করেছিল, মুখে চিৎকার, পুত—পুত—কী কইর‍্যা গেলি—পুত—ওরে পুত—।

শূন্যতা দীর্ণ হতে লাগল।

আকাশ-তমসায় তাড়াতাড়ি বৃক্ষ-ডেরায় ফেরার উদ্দেশ্যে আহত বাদুড়ের ভূমিকা।

সব স্তব্ধ।

সকলে স্তব্ধ।

মশালের শিখা এক ঋজুরেখায় অধিষ্ঠিত।

দংগলের মধ্যে কোন এক জায়গায় রাজা মজুমদার ছিল, বোঝা যায়, যখন সে মাদবরের নিকটে এগিয়ে এসে ডাক দিলে, কাকা!

—কী বাবা?

—লাভ-লোকসান, ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নিকেশের সময় আছে। আজ আর তা করতে যাবেন না।

—ঠিক বলেছ। পঙ্গপাল আর নেই মনে হচ্ছে।

—কী করে থাকবে? অনেক দাওয়াই দিয়েছেন। আজ দিলেন মোক্ষম দাওয়াই। পতঙ্গ থাকবে কী করে?

—কোন দাওয়াই?

—দংগলের মিলিত দাওয়াই।

—বুঝেছি, চাচা। লোকের কাছে শেষ পর্যন্ত পোক টেকে না।

মশালবাহী যাত্রিদল আবার এগিয়ে যেতে লাগল, যদিও অনেকের সামনে ভেসে উঠছিল অন্ধকারে সহসা অদৃশ্য আগন্তুকের মুখ। বার বার।

কাল খোঁজ করা যাবে। হাঁটিতে হাঁটিতে মাদবর নিজের মনেই উচ্চারণ করে ফেলেছিল।

সমাপ্ত

পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক : এবং অথবা

সিদ্ধ তান্ত্রিকের শবসাধনা

নবনীতা দেব সেন

Pol : What do you read, my lord?
Ham : Words, words, words.

Claud : My words fly up my thoughts
remain below./Words without
thoughts never to heaven go.

বাগর্থের দাম্পত্যকলহ সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে, এ কথা নতুন নয়। শব্দশক্তির গুণ-কীর্তন সৃষ্টির প্রথম শুভক্ষণ থেকেই হয়ে আসছে জগতে। স্বীকার করেছে সকল ধর্মেই যে শব্দের মধ্যে ব্রহ্মত্ব আছে। মনুষ্যসভ্যতা শব্দের ইন্দ্রজালে কদাচ সংশয় রাখেনি। লেখক দ্বিতীয় ঈশ্বর—শব্দ দিয়েই তিনি ভুবনের ঈশ্বরী শব্দার্থ। বাক্ যখন অর্থ থেকে বিযুক্ত, সে তখন সৃষ্টির কাজে লাগে না। অর্থবিহীন শব্দ শুধুই আওয়াজ—তাকে কথা বলে না। অর্থহীন 'কথা' কি হয়? সাধারণ নিয়মে হয় না; আবার কখনো কখনো হয়ও। ভাষার ক্ষেত্রে অর্থ-বিচ্যুত 'শব্দ' (word) অসম্ভবও বটে—কারণ একা দাঁড়ালে সব শব্দেরই নিজস্ব অর্থের মেরুদণ্ড আছে। কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে অসাধ্য নয় অর্থের মেরুদণ্ডটি মুচড়ে ভেঙে ফেলে শব্দকে ব্যর্থ করে দেওয়া।

মানবসভ্যতায় শব্দের মৌল কর্তব্যই হল ভাবনাকে উন্মোচিত করা। কিন্তু মানুষ আরো একটু এগিয়ে আসার পরে, তার পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে অনিয়ম সৃষ্টি করে শব্দের প্রাথমিক প্রয়োজনটাকে ভেস্তে দেওয়া খুবই সহজ। ব্যাকরণটা ভেঙে দিলেই হল—শব্দরা আর থাকবে না ভাবনার রূপ হয়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে রেললাইন-ছিটকানো কামরার মতন—অকর্মণ্য, আহত, অচল।

আবার, যেমনভাবে ঈডিপাস স্ফীংক্সকে পরাজিত করেছিলেন শব্দের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা ফিরিয়ে দিয়ে, তেমনি, মানুষের পক্ষেই সম্ভব, পুনঃপ্রত্যর্পণ করা শব্দকে তার অর্থ, আবার ফিরিয়ে আনা ব্যাকরণ, যৌক্তিকতা। ফের ছুটবে শব্দ তার গতিময়তা, ছন্দোময়তা, লক্ষ্যময়তার শক্তিতে।

শব্দরা এমনিতে তো ছড়িয়ে-ছিটিয়েই আছে জগতে—লেখকের কাজই হল ঈডিপাসের মতো, তাদের লক্ষ্যময় করে তোলা। 'ভাষা' আসলে যে স্ফীংক্সের মতো রাক্ষসী, তাকে বশ মানানোতেই লেখকের শক্তিপরীক্ষা। শব্দ থেকে অর্থকে বিযুক্ত হতে দেওয়া চলবে না—পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো সম্পৃক্ত রাখতে হবে বাক্ এবং অর্থকে। এবং তারই মাঝখানে শব্দের ধ্বনিতে নতুন নতুন অর্থ সঞ্চারিত করে পুরোনো শব্দের মধ্যে নবযৌবন আনতে পারা, সেটাই হল লেখকের সৃজন-লীলার মূল আনন্দ। শব্দের সঞ্জীবনশক্তির মন্ত্রটা আয়ত্ত করতে পারলেই লেখকের মন্ত্রসিদ্ধি ঘটল। তারপর তাঁর স্বকীয় ভুবন তাঁর মুঠোয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভূমিকাটা বদলে যায়। লেখক ভুলে যান তিনি ভাঙতে বসেছেন, না গড়তে বসেছেন। ঈডিপাস না হয়ে লেখক স্বয়ং যেন স্ফীংক্স হয়ে ওঠেন—আর বোঝার তরোয়ালটা তুলে দেন পাঠকের মুঠোয়। পাঠকের কাজ তো নয় ধাঁধার জবাব বের করা, পাঠকের কাজ ঠিক-ঠিক শব্দের

মুখে আলো ধরে ধরে শব্দের মুখ চিনে নেওয়া। মুখোশ খসানোর কথা তাঁর নয়। চিনে-নেওয়া এক—আর ব্যাখ্যা দেওয়া আরেক। শব্দ-ব্যবহারকারীদের মধ্যে পারস্পরিক যে সৌহার্দটি থাকা একান্ত প্রয়োজন, যে সমবেদনা, যে সহ-অনুভূতি ভাষাব্যবহারের একেবারে গোড়ার কথা, লেখক যখন সেইখানেই একটা পাঁচিল তুলে দেন তখন দান-গ্রহণের মূলে ব্যাপারটাতেই বিঘ্ন ঘটে যায়।

ভাষা-ব্যবহার করা একটি দ্বিপাক্ষিক কাজ। দুদিক থেকে দুজনে হাত বাড়িয়ে দেবেন, তবেই তো ঘটবে পাণিগ্রহণ। লেখক কখনো কখনো এই হাত বাড়ানোর ব্যাপারটাকে খুব ঘোরালো করে তোলেন, হাতটি না বাড়িয়ে, এগিয়ে দেন শংকরমাছের চাবুক কিংবা কাঁটাখেজুরের পাতা। তখন পাঠক বেচারীকে শিউরে উঠে পালিয়ে আসতে হয়, নয়তো দস্তানা পরে নিতে হয় বক্সিংগীরদের মতো—প্রস্তুত হতে হয় পাণিগ্রহণ নয় মল্লযুদ্ধের জন্য।

সাহিত্য যখন যুদ্ধের হাঁক ছাড়ে, রণহুংকার দিয়ে পাঠকের বুকে ত্রাস সঞ্চার করে, তখন আমরা সেই সাহিত্যকে ভদ্রতা করে নাম দিই 'দুর্বোধ্য'। শত্রুভাবে যেখানে পাঠকের ভজনা করেন লেখক, তাঁরই নাম 'জটিল' লেখক। এই জটিলতা বা দুর্বোধ্যতার মধ্যে যে একটা ঘোরতর শত্রুতার মেজাজ আছে, একটা অসামাজিক মন, অথবা সমাজদ্রোহ আছে, এমনকি যাকে মানবদ্রোহিতা পর্যন্ত বলা যেতে পারে- এদিক থেকে আমরা মোটেই ভাবি না।

আজকাল যে অপ-শব্দটি মাঝেমধ্যে ব্যবহৃত হয় সংস্কৃতির গোড়াতে, এখানে সাহিত্যের ডগায় সেই অপ-শব্দের ভর-করা রয়েছে। দুর্বোধ্যতার চর্চা বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসের লক্ষণ। বিচ্ছিন্নতাবোধ নানা কারণেই ঘটতে পারে। আমরা এখানে অস্তিত্ববাদী লেখকদের কথা তুলব না, তুলব না উপ-বাস্তববাদীদের কথাও- কারণ আমাদের আলোচনায় আজ যাঁর রচনাকে উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি, তাঁর বেলায় এ-সকল শব্দ অদরকারি।

শ্রীকমলকুমার মজুমদার আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর তুল্য কবজির জোর নিয়ে খুব বেশি লেখক যে-কোনো যুগেই, যে-কোনো দেশেই জন্মান না। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর সিংহাসন চির-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কমলকুমারের তুল্য ঐশ্বর্যের অপচয় এবং অপব্যবহার আর কোন দেশে কোন লেখক করেছেন, অথবা কোনো দেশেই কেউই করেছেন কিনা, তা আমরা জানি না। এ-হেন শক্তি, এবং এ-হেন বিনাশ—দুটোই অসামান্য, এবং সেই কারণেই লক্ষণীয়।

আজ আমরা আলোচনা করব, কিভাবে কমলবাবু পাঠক আর লেখকের মধ্যে কেবলমাত্র মনস্তাত্ত্বিক বাধাই সৃষ্টি করেন না, খুবই বাস্তব, ভাষাগত বিঘ্ন তৈরি করে চেষ্টা করেন পাঠককে যথাসাধ্য সাহিত্যরসে বঞ্চিত করতে। এবং বলাতে সংকোচের শেষ নেই, কমলবাবু ইদানীং তাতে রীতিমতো সাফল্যও লাভ করেন।

ভাষাগত বিঘ্ন সৃষ্টিতে কমলবাবুর প্রধান অস্ত্র ব্যাকরণ এবং অভিধানকে উলটে ফেলা। তাঁর বাক্যগঠন-রীতি, তাঁর অব্যয়-ব্যবহার, কারক-বিভক্তি-ব্যবহার, পদ-ব্যবহার সবই বাংলা ব্যাকরণ-বহির্ভূত। ব্যাকরণের মেরুদণ্ডটি ভেঙে দিয়ে তিনি প্রথমেই ভাষার গড়ন-পেটনটা পাকটে তাল পাকিয়ে নেন, ভীম যেমন কীচককে। ব্যাকরণ থেকে ভাষাকে বিযুক্ত করে নেওয়ার কাজটি মোটেই সহজ নয়, এজন্য অসামান্য মননশক্তির প্রয়োজন। কিন্তু ঘটনাটি একবার ঘটাতে পারলে, অত্যন্ত সহজেই বাক্ থেকে অর্থকে বিচ্যুত করে নেওয়া সম্ভব। শব্দ এবং অর্থের মধ্যে যে সুনিশ্চিত বন্ধন, মানবসভ্যতার হাতে-খড়িই সেই প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে। শব্দ এবং অর্থের শৃঙ্খলার মধ্যে মানবমনের প্রাথমিক শৃঙ্খলাটি গড়ে উঠেছে। এই শৃঙ্খলা ভেঙে দিলে সৃষ্টির আদিম অনিয়মের কিছুটা স্বাদ মেলে। শব্দ আর অর্থের মধ্যে ব্যবধান রচনা করা মানে শব্দশক্তিকে

ইচ্ছাশক্তির কাছে হার মানানো। শব্দশক্তি সমষ্টিগত শক্তি, সামাজিক শক্তি। তাকে ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির কাছে পরাজিত করা—এর মানে সমাজের বিরুদ্ধে একজন ব্যক্তির বিদ্রোহ। শব্দ থেকে অর্থকে সরিয়ে দেওয়া মানেই একজন মানুষের মনের কাছ থেকে অন্য মানুষের মনকে দূরে হটিয়ে দেওয়া। কমলবাবুর লেখা পড়লে এই অভিজ্ঞতাটি খুব স্পষ্ট হয়। আমরা এই প্রবন্ধে দেখতে চেষ্টা করব কমলবাবু কী কী উপায়ে এই 'কাজ'টি সম্পন্ন করেন, এবং কেন। এই দ্বিতীয় অংশটির—অর্থাৎ কেন এমন করেন—যথার্থ শেষ উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। কেবল দেখা যেতে পারে, যে-যে কারণ প্রদর্শিত হয়েছে, সেগুলি গ্রহণযোগ্য কিনা। প্রাসঙ্গিক হোক, অথবা অপ্রাসঙ্গিক—আবার বলে রাখছি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শ্রীকমলকুমার মজুমদার এক তুলনাহীন নষ্ট-প্রতিভা, একটি কক্ষচ্যুত নক্ষত্রবিশেষ। তাঁর চেয়ে অনেক, অনেক কম ক্ষমতা নিয়ে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের হাটে স্থায়ী দোকান দিয়ে গেছেন। অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মূল ধারায় কমলবাবুর স্থান থাকবে না, তিনি থেকে যাবেন পার্শ্বভূমিকায়—শুধু একটি ব্যতিক্রম হিসেবে উৎসাহের খোরাক যুগিয়ে। এই ট্রাজিডির মূলে খুঁজতেই এই প্রবন্ধের সূচনা।

শ্রীকমলকুমার মজুমদারের নিজের মতে, বাংলা সাহিত্যের সেই আদি-অকৃত্রিম উৎসমূলের কাছে ফিরে যাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। ভারতভূমিতে ইংরেজের পদধূলি না পড়লে বাংলা ভাষার যে সহজাত অভিক্রম ঘটত, তিনি সেইটিই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চান। তিনি মনে করেন, বাংলা ভাষার বর্তমান রূপটি বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে কলুষিত। ভাষার অঙ্গ থেকে এই অবাঞ্ছিত বিকার মুছে ফেলে তিনি সেই অকৃত্রিম সৌন্দর্যটি আবিষ্কার করতে চান, ভৌগোলিক স্বাধীনতা বজায় থাকলে বাংলা ভাষা যেমনটি থাকত। ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা ছাড়া একে আর কিছু বলা যায় না। এবং এই প্রয়াস যে খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়, একথা অনস্বীকার্য। আজকাল নিগ্রো-আমেরিকার সাংস্কৃতিক জাগরণে এই ধরনের প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই অন্য এক স্তরে। শিকড় খুঁজতে গিয়ে কখনো কখনো যেন মধ্যেকার যুগটির অস্তিত্বটাকেই মুছে ফেলা হয়,—যেন দেশ-মাতৃকার স্তনমূল থেকে কখনো বিচ্ছেদ ঘটেনি, যেন যোগাযোগ নিরন্তর ছিল—এই ধরনের একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস তৈরির চেষ্টা দেখা যায়। বিকল্প সত্তার অন্বেষণ করতে গিয়ে এই মনগড়া সত্তা গড়ে নেওয়াটা কতদূর সুফলপ্রসূ তা আমরা এখনও জানি না—এই প্রয়াসের সামগ্রিক জটিলতা এবং ঐতিহাসিক মূল্য যে কতখানি তা আপাত নজরে স্পষ্ট নয়। কিন্তু একটি সামগ্রিক, সামাজিক অন্বেষণ, এ কোনো ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এইখানে ইতিহাস ভাঙবার প্রবৃত্তি একটি বিশেষ সামাজিক ধারা হিসেবে প্রবাহিত হচ্ছে, তার শেষ পরিণতি কিসে, এখনও জানা যায়নি।

কমলবাবুর ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রয়াসটি প্রবহমান সময়ের বিরুদ্ধে একটি ব্যক্তিগত বিদ্রোহ। ইংরেজ না এলে ফরাসিরা আসত (যেমন চন্দননগরে) বা মোগল-পাঠানরা তাদের রাজত্ব বজায় রাখতে পারত। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে যে কখনোই 'সনাতন হিঁদুয়ানি' বলে আলাদা জোরালো কোনো ঐতিহ্য ছিল না, এ ঘটনাটিকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। মুসলমান আমলে দরবারী ভাষা ছিল ফার্সী—বাংলা ভাষাতে তখন ফার্সীর দোর্দণ্ড প্রতাপ। অন্য ধর্মের আওতা এড়িয়ে অস্পর্শ্যপশ্য 'অপ্রভাবিত' হিন্দু সংস্কৃতিকে বাংলা সাহিত্যে কোথাওই খুঁজে পাওয়া যাবে কি? ইংরেজ-বাহিত খৃষ্টান সংস্কৃতির আগে ছিল মুসলমান, তারও আগে বৌদ্ধ—বাংলা সাহিত্যের গোড়া ধরে টানলে উঠে আসে বৌদ্ধ চর্যাপদ। 'হিন্দুয়ানি' বাংলা সাহিত্যে নতুনত্ব, তা কিন্তু পুরাতনের পুনঃস্থাপনা নয়। নতুন করে হিন্দু বাঙালি সংস্কৃতি গড়তে বসলে ইতিহাসনিষ্ঠ হয়ে, ইতিহাস-প্রদত্ত ঘটনাবলির মধ্য দিয়েই তা করা উচিত, মুসলিম বা ইংরেজ সভ্যতাকে উড়িয়ে

দিয়ে নয়। বিদ্রোহ করা মানে বাস্তবকে অস্বীকার করে, কালপ্রবাহের বাইরে চলে যাওয়া নয়। স্বপ্ন-কল্পনার পাল তুলে দিয়ে রূপকথার রাজ্যে ভেসে বেড়ানো নয়। ধরুন, ইংরিজি ভাষার 'পবিত্রতা বজায়' রাখার ছুতোয় কেউ যদি ইংল্যান্ডে রোমক এবং ফরাসি সভ্যতার অনুপ্রবেশের ঘটনাকে অস্বীকার করে ভাষার অঙ্গ থেকে ফরাসি আর রোমক প্রভাব মুছে ফেলার প্রয়াস পেতেন, সেটা যেমন দাঁড়াত, এ ঘটনাটিও দাঁড়াচ্ছে প্রায় তেমনিই। ঐতিহ্য এবং অভিনবত্বের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে পারাই একজন সৃজনশীল শিল্পীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

ভাষা এবং সাহিত্যের শুদ্ধতম উৎসটির সন্ধানে যদি বেরুতেই হয়, তবে আমাদের ইতিহাসের সংকেত মেনেই এগোতে হবে। ভাষার সম্ভাব্য অতীতের যথার্থ পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের হতে হবে ইতিহাসনিষ্ঠ, এবং যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই ভাষাতত্ত্বেও। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের কারোরই জানা নেই, এই কাজ আদৌ সম্ভবপর কিনা। যাই হোক, বাংলা ভাষার চরিত্র আর রূপায়ণ নিয়ে কমলবাবুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আপাতনজরে এই উদ্দেশ্যের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। নানা ব্যক্তিগত আলোচনায় তিনি বহুবার এই অভিমত প্রকাশ করেছেন (যেমন, 'সমতট' পুজো-দেওয়ালি সংখ্যা, ১৯৭৪)। আমরা হয় সেই মত গ্রাহ্য করে আমাদের বিশ্লেষণে হাত দিতে পারি, নয়তো নস্যাৎ করে তার বিশ্লেষণে অযথা কালক্ষয় না করতে পারি। আমরা এক্ষেত্রে লেখকের ব্যাখ্যাকে সম্মানিত করেই আমাদের বিশ্লেষণে অগ্রসর হচ্ছি।

২

শ্রীকমলকুমার মজুমদারের স্বকীয় ব্যাখ্যাকে গুরুত্ব দিলে, আমাদের উচিত বাংলা ভাষার ক্রম-পরিণতির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতি নজর দেওয়া। বিশেষত, ভাষার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করে দেখতে হবে কমলবাবু বাংলা ভাষার যে রূপায়ণটি ঘটিয়েছেন, ভাষার স্বাভাবিক নিয়মে কোনোদিন সেইরকম হবার সম্ভাবনা ছিল কিনা।

যাঁর ভাষা পশ্চিম এবং পূর্ব বাংলায় আজও সাহিত্যের ভাষার আদর্শ, সেই রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দিয়ে, আমরা বরং বঙ্কিমচন্দ্র বা বিদ্যাসাগরকে নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। আদর্শ বাংলা লিখিত ভাষার কারিগর হিসেবে তাঁদের স্বীকৃতি দিলে ভুল হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষা নিশ্চয়ই কমলকুমারের আদর্শ নয়, তবে কি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী? কিন্তু তাই বা হবে কেমন করে, কমলকুমার চান ইংরেজের ছায়া-ছোঁয়া-এড়ানো খাস বাংলা। বঙ্কিমচন্দ্রে তা পাওয়া যাবে না। বঙ্কিম কেন, কৃত্তিবাস ওঝা বা কাশীরাম দাসের পরবর্তী কালের সব বাংলা সাহিত্যিকই কোনো না কোনো উপায়ে পাশ্চাত্যের প্রভাবে পড়েছেন। কমলবাবুর নিজের মতানুযায়ী, তাঁর বাংলা ভাষার শিক্ষাগুরু রাজা রামমোহন রায়, যিনি দেহরক্ষা করেছেন ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতাকে ব্রিটিশ ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা অস্পৃষ্ট, পবিত্র সনাতন হিন্দু বাংলার প্রতিনিধি ঠিক বলা যায় কি? তবু কমলকুমারের কাছে তিনিই ভাষার বিশুদ্ধতার প্রসঙ্গে ভগীরথোপম। যুক্তি দিয়ে বিচার করে এ ব্যাপারটিকে ঠিকমত বোঝা যায় না।

রামমোহনের ভাষা বোধগম্যতার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য দায়ী সে যুগের বাংলা গদ্যের যতিচিহ্নের অব্যবস্থা। রামমোহন বাংলা গদ্যে ইংরিজি যতিচিহ্নের প্রবর্তন করলেন (ফুলস্টপ সমেত), চেষ্টা করলেন বাংলা গদ্যের একটি সুনিয়ন্ত্রিত রূপ গড়ে দেবার, যাতে আছে মাত্রাবোধ। রামমোহনের আগে বাংলায় পদ্যই লেখা হত, তেমন কোনো মননশীল গদ্য লেখা হয়নি। ঠিকমতো দাঁড়ি-কমা বসিয়ে নিতে পারলেই রামমোহনের গদ্য আর দুরূহ থাকে না। প্রাচীন

বাংলায় যে গদ্য লেখা হয়েছিল তারও ভাষা অত্যন্ত সাদাসিধে, কি পূর্ব বাংলায়, কি পশ্চিমে। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতই হোক, হোক মৈমনসিংহগীতিকার প্রণয়কাব্য কিংবা ভারতচন্দ্রের শিল্প-সমৃদ্ধ শৃঙ্গাররস প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কোথাও কোনো দুর্বোধ্যতা নেই। কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাস একটি নির্দিষ্ট মানের সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করেন। বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস সকলেই সহজবোধ্য; এমনকি, জয়দেবের সংস্কৃতও বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। জয়দেবই বা কেন? চর্যাপদের ভাষাও বোধগম্য, কেননা তারও একটা ব্যাকরণগত বিধিনিয়ম আছে, যা শিখে নেওয়া যায়। অপভ্রংশ ভাষার ক্ষেত্রেও তা সম্ভবপর। (দ্রঃ পরিশিষ্ট—এক উদাহরণ ক।) কোনোটাকেই অবোধ্য বলা চলে না। কমলবাবুর ভাষাটি তাহলে কেমন ধরনের? ওঁর সমস্যা কি ভাষাগত দুরূহতার নাকি আঙ্গিকের অপরিচয়জনিত মনস্তাত্ত্বিক বিঘ্নই তার মূলে? কমলবাবু বাংলা ভাষাতে অনন্য এমন একটি দুর্বোধ্য, কৃত্রিম ভাষা গঠন করার কাজে তাঁর তুলনীয় কেউ নেই। অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর মতো অতটা দুর্দান্তপনা করেননি, অতখানি সেয়ানা চমকও লাগাতে পারেননি।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষাকে নতুন প্রাণরসে উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করেছিলেন ইংরিজি ও সংস্কৃত বাক্যবন্ধ এবং বাগ্‌রীতি বাংলায় ব্যবহার করে। কিন্তু কমলবাবুর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের তুলনা চলে না, কারণ সুধীন্দ্রনাথ যা লিখতেন তা সর্বতোভাবে ব্যাকরণসিদ্ধ। অতিরিক্ত সচেতন ভাষা ব্যবহারের ফলে আপাত-জটিলতার সৃষ্টি হলেও, যত্নবান পাঠকের কাছে তা দুর্লঙ্ঘ্য নয়, কেননা সে-ভাষা ব্যাকরণসম্মত। নতুন নতুন আঙ্গিকের ব্যবহার পাঠকদের কাছে অপরিচিত হওয়ার কারণে প্রথমটা যে মানসিক ব্যবধান গড়ে ওঠে, সেটাও ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্য অনেকটা দায়ী। এখানে সমস্যা মূলত ভাষাগত নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক; অভ্যাসগত। এই কারণে এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও দুর্বোধ্যতার অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যখন চলিত বাংলা ব্যবহার করছিলেন, বঙ্কিমী সাধুভাষার বদলে, অথবা যখন তিনি শব্দচিত্রের মাধ্যমে কবিতা সৃষ্টি করছিলেন।

কিন্তু কমলবাবুর লেখায় পাঠক যে সমস্যার সামনে পড়েন, তা শুধুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক নয়। তা বহুলাংশেই ভাষাতাত্ত্বিক বিঘ্ন-বিপত্তি। ফলে আমরা আবার সেই পুরোনো প্রশ্নে ফিরে আসছি : কমলবাবুর ভাষার মূল কোথায়? কার ভাষাদর্শের ছায়ায় তাঁর আঙ্গিকের সৃষ্টি হয়েছে? 'বিশুদ্ধ ভাষার উৎস' সন্ধান করতে করতে আমরা ন্যায্য ঐতিহাসিক সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছি। রামমোহন পর্যন্ত পৌঁছেও আমরা ঠিক কমলকুমারের ভাষা ব্যবহারের তুলনা খুঁজে পাই না। যিনি সবচেয়ে কাছাকাছি আসেন, সেই উইলিয়ম কেরী সাহেবের মাতৃভাষা বাংলা ছিল না। তারপরে সাদৃশ্য দেখি কোর্ট-কাছারির ব্যবহারিক ভাষার সঙ্গে। আইন-আদালতের দরখাস্ত, চুক্তিপত্র ইত্যাদি যে কৃত্রিম সাধু ভাষায় লিখিত হয় (অতিমাত্রায় ফার্সী প্রভাবিত, খটমট, নিষ্প্রাণ, আনুষ্ঠানিক বাক্‌প্রণালী) সেটি কিছুটা কমল মজুমদারীয় শোনালেও, সে ভাষা তো কোনো দেশেকালে কদাচই সাহিত্যসৃষ্টির কাজে লাগেনি। তবে কি কমলবাবুর ভাষা বাংলার কোনো আঞ্চলিক ভাষা? সেও সম্ভব নয়, কেননা সাধু ভাষার কোনো 'আঞ্চলিক' পার্থক্য নেই। এ যে সাধু ভাষা। গ্রীয়ারসনে কিংবা ও ডি বি এল-এও তো কমল মজুমদারীয় ভাষা ব্যবহারের কোনো উল্লেখ নেই। তবে নিশ্চয় এ ভাষা কোনো চেনা আঞ্চলিক ভাষার সাধুকরণ নয়। বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত ওলটপালট করেও আমরা কমলকুমারের ভাষার সাদৃশ্য অতীতে খুঁজে পাই না। অতএব অতীতে প্রচলিত ছিল এমন কোনো 'শুদ্ধ ধারা' কিন্তু কমলবাবুর প্রেরণার উৎস বলে মনে হল না। তবে কি এ ভাষা ভবিষ্যতের ভাষা? এক প্রসিদ্ধ তরুণ সাহিত্যিক একবার বলেছিলেন একশো বছর বাদে কমলবাবুর বাংলাই হবে বাংলা সাহিত্যের

ভাষা। কিন্তু সেই তরুণ লেখক স্বয়ং, সৌভাগ্যক্রমে, তাঁর প্রিয় লেখকের ভাষা নকল করবার কোনো লক্ষণই দেখাননি। এবং তা সত্ত্বেও কবি-ঔপন্যাসিক হিসেবে যশখ্যাতি লাভ করেছেন। আগামী-কালের লেখকরা যদি কমলবাবুর ভাষার অনুকরণ করেন, এই ভাষা যদি ক্রমে আগামী দিনের বাংলা সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠে, (যেহেতু কমলবাবুর একটি অন্ধ ভক্তগোষ্ঠী আছেন যাঁরা কোনো একদিন কাজেও হয়তো তাঁর অনুগামী হতে পারেন) তবে সেটি হবে বাংলা সাহিত্যের বিপুল দুর্দিন। ভাষার গোলকধাঁধা মানুষে-মানুষে বৈষম্য বাড়িয়েই চলে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে, ব্যবধান চওড়া করতে দুরূহ ভাষা একটি অত্যন্ত জবরদস্ত উপায়। ভাষা যেমন মানুষে মানুষে সংযোগ ঘটায়, তেমনি তার বিপরীত ফল ঘটানোর ক্ষমতাও সে রাখে। সযত্নে, সচেতনভাবে প্রচলিত ভাষাকে বিকল করে দিয়ে, গতানুগতিক যোগাযোগের ব্যবস্থাকে আঘাত করা সব সময়েই যে ধ্বংসাত্মক, তা নয়। কবিতার ক্ষেত্রে সাধারণত এই কায়দায় চমৎকার ফল পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যের পক্ষে যে এই বাক্‌ভঙ্গিমা কতদূর সহায়ক, তা কমলবাবুর রচনাশৈলী ভালো করে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। গদ্যের উদ্দেশ্য আর পদ্যের উদ্দেশ্য আলাদা, একজনের ব্যঞ্জনা-সৃষ্টিতেই কাজ শেষ, অন্যের ব্যাখ্যায়। কমলবাবুর গদ্য, এমনকি প্রবন্ধও, ব্যঞ্জনাসৃষ্টির খেলায় থেমে থাকে। সেদিক থেকে গদ্যের মাধ্যম হিসেবে ওঁর বাক্‌শৈলী বিশেষ কার্যকরী নয় বলেই আমাদের ধারণা হয়।

৩

ভাষার কাজ কী? ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা নানা বিভিন্ন সংজ্ঞা তৈরি করেছেন। যেহেতু ভাষাতাত্ত্বিক নই, কেবলমাত্র ভাষাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারকারী এক ব্যক্তি হিসেবেই এই প্রবন্ধে আমার বিশ্লেষণকর্মটি- "আলগা ভাষাভিত্তিক সমাজতত্ত্ব, যার কোনো আনুষ্ঠানিক নৈপুণ্য নেই" (ফার্থ, ১৯৩৫) হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবুও আমি বিশ্বাস করি যে যে-কোনো সাধারণ পাঠকের সাহিত্যে ভাষার ব্যবহার নিয়ে মতামত প্রকাশ করার অধিকার আছে, যেহেতু সে সর্বদাই গ্রহীতার ভূমিকায় থাকে। আমার কাছে 'গজদন্তমিনারনিবাসী সাহিত্যিক' -এই কথাটাকে শব্দের আভ্যন্তরীণ অন্ত-র্বিরোধের জাজ্বল্যমান উদাহরণ বলে বোধ হয়। যেহেতু 'সহিত' থেকে 'সাহিত্য', 'সাহিত্য' থেকেই না 'সাহিত্যিক'? গজদন্তমিনারে 'সহিত' শব্দ কোথায়? সাহিত্যই বা কোথায়? আর তাহলে 'সাহিত্যিক' ওর মধ্যে কোথাও থাকেন কি? সাহিত্য ভাষানির্ভর শিল্প। এবং ভাষা মানেই যোগ-সূত্র। 'বিচ্ছিন্নতাবাদী সাহিত্যিক' কথাটাকে 'সোনার পাথরবাটি'র মতো স্ববিরোধী শোনায়— সংজ্ঞাটির মধ্যেই সাহিত্যের উদ্দেশ্যের পরাজয় ঘোষিত।

ভাষা ব্যবহার একটি দ্বিপাক্ষিক পদ্ধতি। মানুষে মানুষে যোগস্থাপনই তার উদ্দেশ্য। তাই ভাষাকে নির্ভর করতে হয় কিছু নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতীকের ওপরে। তার কাজ কেবল সংকেত সরবরাহ করাই নয়, তার অতিরিক্ত কিছু, এবং এই অতিরিক্ত অংশটুকু থেকেই ঘটে সাহিত্যের উৎসরণ। সাহিত্য মানেই সঙ্গ, সংসর্গ, একক্রিয়ান্বয়িতা, অখণ্ডতা। সাহিত্যে ভাষার দায়িত্ব এই অখণ্ডতা গড়ে তোলা; পাঠক এবং লেখকের মধ্যবর্তী ব্যবধান দূর করে দেওয়া। এর অর্থ ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা। একজন লেখক যখন অক্ষমতাপরবশ হয়ে নয়, সচেতন ইচ্ছাপ্রয়োগে ভাষায় কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়ে পাঠক আর লেখকের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেন, তখন তিনি জেনেশুনেই সাহিত্যের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম করেন। একে আমি তো অন্তত 'সাহিত্যচর্চা' না বলে বলব 'সাহিত্যদ্রোহিতা'।

জার্মানির অধ্যাপক ডাঃ লোথার লুৎসে একটি মজাদার নকশা তৈরি করেছেন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের স্থান বিচারের জন্য। সাহিত্যে ভাষার ভূমিকাও এখানে খানিকটা বুঝতে সুবিধা হয়। আমাদের কাজের জন্য নকশাটি তুলে দিচ্ছি। সাহিত্যে সংযোগ বিষয়ে লুৎসের নকশা :

Author situation লেখকের অবস্থা	>	Text Disturbance Deviation মূল পাঠ রূপান্তর বিচ্যুতি	>	Reader situation পাঠকের অবস্থা
১। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি ২। উদ্দেশ্য, প্রেরণা ৩। নিরূপণ, কেন্দ্রীভূত - কবিতা বিকেন্দ্রিক – নাটক (বিক্ষিপ্ত)				১। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি ২। গ্রহণ ৩। পছন্দ, বাছাই এবং মূল পাঠের ব্যাখ্যাকরণ
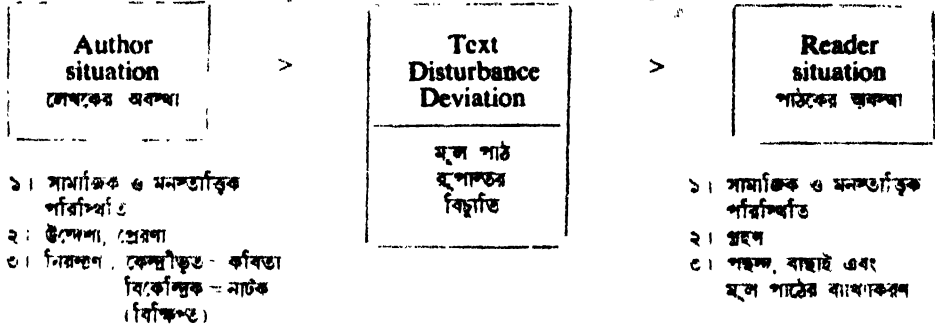
সাহিত্যদ্রোহিতার নানা পন্থা থাকতে পারে। উপায়ের ছলচাতুরীর অভাব নেই। চিত্রকল্পের, প্রতীক এবং রূপকের জটিলতায়, শব্দানুষঙ্গের এলোমেলো ব্যবহারে, যতিচিহ্নের যথেচ্ছাচারে (বা প্রথাবিরোধী অপব্যবহারে) এবং ব্যাকরণের বিকৃতি ঘটিয়ে ভাষাকে যোগসূত্র না করে বিয়োগসূত্র করে তোলা সম্ভব। লোথার লুৎসের একটি চমৎকার কথা এ প্রসঙ্গে ব্যবহার না করে পারছি না একে ভাষার প্রতি 'সংগঠিত বলাৎকার' ('organized violence') বলা উচিত। এই হাতিয়ার ব্যবহার করে পাঠককে বিচ্ছিন্ন এবং 'সাহিত্য'কে বিকল করে দেওয়া খুব সোজা, কেননা তার পরিণতিতে কী ঘটে? চিন্তার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়, পাঠকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় অথবা গতানুগতিক প্রতিক্রিয়ার বিনাশ ঘটিয়ে একটা চমক সৃষ্টি করে, এক অভিনব প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলে। এই অভিনব চমকের সাহায্যে পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে তাকে ক্রমশ এক অতিব্যক্তিক প্রতীকী জগতের অচেনা আবহাওয়াতে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে প্রতীকগুলির মর্মোদ্ধার করতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক মানের শিক্ষা-সংস্কৃতি থাকা দরকার। ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশে, দুর্ভাগ্যবশত, এই মানদণ্ডটি একটি বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী শ্রেণীর কথাই মনে পড়িয়ে দেয়, শিক্ষা আর সংস্কৃতি যাদের হাতের মুঠোয়। অতএব সযত্ন-সৃষ্ট ইচ্ছাকৃত দুর্বোধ্যতা এক ধরনের অসামাজিকতা হয়ে পড়ে, যার ঢংটা শেষ পর্যন্ত নিতান্তই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হয়। আমি একেই সাহিত্যদ্রোহিতা বলতে চাই। এই ভাষাগত বিঘ্ন সৃষ্টি একটি বিশিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণীর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে, এর লক্ষ্য বিকেন্দ্রিক নয়—কেন্দ্রীভূত, গোষ্ঠীগত। ভাষার অর্থ উন্মোচন করা যদি অপ্রয়োজনীয় হয়, ভাষা তখন আর মানুষের ভাষা থাকে না, প্রায় জীবজন্তুর ভাষার মতো হয়ে দাঁড়ায়। তখন তা আর সৃষ্টিকর্মের বাহক থাকে না, হয়ে যায় সৃষ্টিছাড়া, অমানুষিক কোনো সংকেত, অর্থবিহীন কিছু শব্দমাত্র। সে ভাষা সাহিত্যের পক্ষে অনুপযুক্ত। সে ভাষা সাহিত্যদ্রোহীর ভাষা।

ভাষা নিয়ে কমলবাবুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা যদি ভবিষ্যতের বাংলা ভাষার চিহ্নসূচক হয়, তবে তাঁর ভাব নিয়ে কাজ-কারবার কিন্তু বিগত দিনের চিহ্নসূচক। তাঁর অতি-আধুনিক পরীক্ষামূলক বাক্‌শৈলী কিন্তু তাঁর অতি-পুরাতন সনাতন হিন্দু চিন্তাধারার সঙ্গে মেলে না। ভাষা হবে চিন্তার আধার, চিন্তাকে রূপ দেবে সে। চিন্তাকে শুধু শব্দেই তো রূপায়িত করা হয় না, হয় আঙ্গিকেও। এই নব্য বাক্‌ভঙ্গির মাধ্যমে তিনি কি কোনও নবীন ভাবধারা পৌঁছে দিচ্ছেন? কই, তা তো মনে

হয় না। যদি বলি পুরাতনের পথে পথেই তাঁর স্বর্ণসন্ধান, তবে ভাষায় এই অভিনবত্বের সঙ্গে সে-ভাবের কোনো সমতা নেই। বরং তাঁর 'আধুনিক' মাধ্যম এবং 'সনাতন' বাণীর মধ্যে স্পষ্টতই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে যায়।

অন্যভাবে দেখলে, একটি বিচ্ছিন্নকারী মাধ্যম কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নতার বাণীই পৌঁছে দিতে পারে। এই ধরনের ভাষাগত বিঘ্নের দ্বারা লেখক, পাঠকের মধ্যে শ্রেণীগত বিঘ্নই সৃষ্টি করতে চান, যার মূল উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক উন্নাসিকতা। কমলবাবুর লেখায় একটা মজা আছে তাঁর বাকভঙ্গিতে উপ্ত আছে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীবদ্ধতা, উন্নাসিকতা, অথচ বক্তব্যে রয়েছে জনপ্রিয়তার লক্ষ্য-সন্ধান। জনপ্রিয়তার উদ্দেশ্যে তিনি দুটি বিপরীতমুখী পথ অনুসরণ করেন।

(ক) হয় তিনি বঞ্চিত, বেদনাতুর সহস্রের কথা বলেন এই দরিদ্র দেশ যাদের জীবননাট্যের মঞ্চ। (যেমন তাঁর অসামান্য সব ছোটো গল্প, 'মতিলাল পাদ্রী', 'নিমঅন্নপূর্ণা', 'তাহাদের কথা' ইত্যাদি।)

(খ) নয় তিনি জাতি-ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে মাতেন। হিন্দু জাতিবর্ণবিচার বা সাম্প্রদায়িকতা -বর্তমান ভারতের এই দুই পরম সংকীর্ণ অন্ধকার গলিতেই তাঁর পদার্পণ ঘটে। এর ওপরে আছে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের জটিল বাধা। তিনটিই আমাদের আধুনিক পৃথিবীতে পা ফেলার পক্ষে বিপুল বিঘ্ন। তাঁর ভাষার দর্পণে যে মূল্যবোধগুলি প্রতিফলিত হতে দেখি তা হল পশ্চিমী শিক্ষায় প্রভাবিত, সামন্ততান্ত্রিক, গোঁড়া হিন্দু, উন্নাসিক ব্যক্তিত্ব-বিশেষের লক্ষণ। ভাষায় অবশ্যম্ভাবী হল ভাষা-ব্যবহারকারী ব্যক্তির সামাজিক মূল্যবোধগুলির বহিঃপ্রকাশ, এবং ভাষা ব্যবহারের কৌশল সেই ব্যক্তির ভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্যও ফুটিয়ে তোলে। কমলবাবুর ভাষাতে দেখতে পাই পাঠকের কাছে কিছুতেই ধরা না-দেবার জেদ, আত্মোন্মোচনের অনিচ্ছা, সহজ না হবার, স্পষ্ট না হবার চেষ্টা অথচ তাঁর কথা বলার তাগিদ আছে প্রচুর। শব্দশক্তির অপব্যবহার যে কাকে বলে, কমলকুমার মজুমদার তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। (শুধু কি তাই? ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার, শিল্পশক্তির চূড়ান্ত অপব্যবহারেরও কি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ তিনি নন?) কমলবাবুর কব্জিতে যথেষ্ট জোর আছে, ইচ্ছামতো ভাষাকে বিপথে চালিত করবার, এবং সেই কারণেই সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি নিশ্চিত মূল্যবান। একথা অনস্বীকার্য যে তিনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একটি মূর্ত প্রতিবাদ, মধ্যবিত্ত বাঙালির সাহেবিয়ানার বিপক্ষে তাঁর জেহাদ। কিন্তু প্রতিবাদের ঝোঁকে অতিরিক্ত পেছু হেলে পড়া, অর্থাৎ প্রগতিশীল, সামনের দিকে তাকানো প্রতিবাদের বদলে নঙর্থক, প্রতিক্রিয়াশীল, অতীতবাদী প্রতিবাদ করা আজকের ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যহীন বলেই বোধ হয়।

এবারে বরং কমলবাবুর ভাষা ব্যবহারের বিশেষ পদ্ধতিটির রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা যাক। মানুষ যে-ধরনে ভাষাকে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, সেই ধরনটার গোড়ায় ঘা দিয়ে মনের শর্তাধীন পরাবর্ত (কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্সেস)-কে এলোমেলো করে দিলেই সৃষ্টি হয় ভাষাগত এক বিপুল বিঘ্ন। রোলাঁ বার্থ একবার বলেছিলেন যে সুররিয়ালিস্টরা সাহিত্যকে ছত্রভঙ্গ করে দেবার একটা জোরালো প্রয়াস পেয়েছিলেন কিন্তু সফলকাম হননি। কমলবাবুও যেন সেই ধরনেরই একটা চেষ্টা করেছেন, এবং সুখের বিষয় তিনিও বড় একটা সার্থক হতে পারেননি। চিরাচরিত ভাষাকে বিকৃত করা, নতুন ব্যক্তিগত শব্দ-প্রতীকের জগৎ গড়ে তোলা এবং একক উদ্যোগে বাংলা ব্যাকরণের প্রচলিত রূপটিকে নষ্ট করা—এই হল মোটামুটি কমলবাবুর প্রয়াস। এই প্রয়াসে সিদ্ধিলাভের জন্য

কমলবাবু চিত্রকল্প বা শব্দানুষঙ্গের যথেচ্ছ ব্যবহারের উপরে নির্ভর করেন না, ব্যাকরণ ও যতি-চিহ্নকে উলটেপালটে দিয়েই তাঁর বাঞ্ছিত ফলাফল আদায় করেন। তিনি ভাষায় বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য রূপকের উপরেও ভরসা করেন না। তাঁর পুরো বাক্‌ভঙ্গিটাই একটি ঘনসংবদ্ধ রূপক, ইতিহাস এবং যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিবাদের একটি প্রতীক। তিনি এজন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করেন তা এইরকম :

(ক) অপরিচিত ইংরিজি রীতিতে বাক্যবিন্যাস, এমন কি ফরাসি রীতিতেই বাক্য গঠন;

(খ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের অবলুপ্তি ঘটানো এবং কখনো কখনো অপ্রয়োজনে অতিরিক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা;

(গ) সম্পর্কবাচক সর্বনাম (রিলেটিভ প্রোনাউন) দিয়ে বা শব্দসংযোজক অব্যয় (যেহেতু, সুতরাং, এবং, অথবা, অতএব) দিয়ে বাক্য আরম্ভ করা। অথবা মালা গেঁথে। একসঙ্গে পাশাপাশি এই সবগুলি অব্যয় ব্যবহার করা—অর্থাৎ যুক্তিসংবদ্ধ ক্রমান্বয়িতা ধ্বংস করে ফেলা;

(ঘ) বিশেষণকে বিশেষ্যের মতো এবং বিশেষ্যকে বিশেষণের মতো ব্যবহার;

(ঙ) কারক-বিভক্তির অসংগত, ব্যাকরণবিরুদ্ধ ব্যবহার—যা ভাষার যৌক্তিকতা ভেঙে দেয়;

(চ) শর্তাধীন যৌগিক বাক্য লিখতে আরম্ভ করে, তার শর্তের সংগত দাবি পূরণ না করে মধ্যপথে বাক্যটি সহসা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করা—এটিও যুক্তির ভিত্তি ধ্বংস করবার চমৎকার উপায়;

(ছ) যতিচিহ্নের প্রথাবিরুদ্ধ ব্যবহার, অব্যবহার, ও অতি-ব্যবহার (যত্রতত্র বিস্ময়সূচক চিহ্ন যেমন);

(জ) বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার একত্র ব্যবহার- একই বাক্যে বিভিন্ন কালের ভাষার অযৌক্তিক সংমিশ্রণ;

(ঝ) সাধুভাষার ক্রিয়াপদের সঙ্গে চলিত ভাষার বিশেষ্য-বিশেষণ ব্যবহার—(ধাতুরূপের বেলা তিনি এদিক ওদিক করেন না, যদিও শব্দরূপের বেলায় করে থাকেন);

(ঞ) চলিত ভাষায় মাঝে মাঝে ক্রিয়াপদ যেভাবে আগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তিনি সাধু ভাষায় সেই (ব্যুৎক্রম) বাক্‌ভঙ্গিটি (inversion) ব্যবহার করে সাধু ভাষার নির্দিষ্ট নিয়মিত আনুষ্ঠানিক বাগ্‌ধারাটি ব্যাহত করেন, অথচ তাতে চলিত ভাষার উক্ততাও যুক্ত হয় না;

(ট) অতি-আধুনিকের সঙ্গে অতি-পুরাতন বাক্যবন্ধ ব্যবহার, বিশুদ্ধ তৎসমের সঙ্গে নেহাৎ কথ্য, বা গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার, শুদ্ধর সঙ্গে অশুদ্ধ ভাষা, এবং মৌখিক, অভিধান-বহির্ভূত অপশব্দের সঙ্গে অধুনা অপ্রচলিত সেকেলে বাগ্‌ধারার সংমিশ্রণ - উচ্চাঙ্গের ভাষার সঙ্গে মেঠোবুলির, অমৃতের সঙ্গে ইতরের;

(ঠ) বাংলায় বিকল্প আছে, অথবা সহজেই অনুবাদযোগ্য এমন সব বিদেশী শব্দবন্ধ ও বাক্যবন্ধের অযথা ও যথেচ্ছ ব্যবহার—হয় মূল ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী বঙ্গলিপিতে অনুলিখিত, রূপান্তরিত অবস্থায়, নয়তো সরাসরি, অপরিবর্তিত চেহারায়—ফরাসি, জার্মান, গ্রীক, লাতিন, ইংরিজি, সংস্কৃত—কিছুই বাদ নেই;

(ড) বিভিন্ন কালে ব্যবহৃত শব্দকে নতুন অনুষঙ্গ দান করে ব্যক্তিগত ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করা;

(ঢ) কর্মবাচ্যের বদলে ভাববাচ্যের ব্যবহার, ব্যাকরণগত কাল ইত্যাদির অপব্যবহার, মুড-এর অপপ্রয়োগ, যেমন **subjunctive**-এর বদলে **indicative**, **simple indicative**-এর বদলে **imperative**, **auxiliary** ছাড়াই **infinitive**-এর ব্যবহার ইত্যাদি;

(ণ) সমাস, সন্ধি, শতৃ-শানচ্-এর শাস্ত্রবিরোধী ব্যবহার;
(ত) জোড়-কলম শব্দ তৈরির খেলা, (পোর্টম্যান্টো শব্দ);
(থ) গদ্যে কাব্যিক বাগ্‌ধারার অকালপ্রয়োগ;
(দ) নামধাতু ব্যবহার;

বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সীমানা নির্ধারণের চারটি মূল লক্ষণ আছে · (দ্রঃ প্রাইড, পৃঃ ৬৪)

(ক) ঐতিহাসিক অভিক্রম
(খ) সমসাময়িক বিবরণ
(গ) বোধগম্যতা
(ঘ) সামাজিক অনুমোদন

কমলকুমার মজুমদার একই সঙ্গে এই চারটি লক্ষণেরই বিরোধী। তাঁর ভাষা ঐতিহাসিক অভিক্রমের নিয়মসিদ্ধ নয়, সমসাময়িক বর্ণনাভঙ্গির সঙ্গে তাঁর যোগ নেই, বোধগম্যতা তাঁর ইচ্ছা-বিরুদ্ধ, এবং তিনি সামাজিক অনুমোদনের পরোয়া করেন না। তাঁর সব লেখাই এমন একটি বিশিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতি উদ্দিষ্ট, একমাত্র শিক্ষা-সংস্কৃতির জোরেই একজন ভারতবাসীর পক্ষে যে গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব। এই উচ্চাঙ্গের পাঠকগোষ্ঠী ভাল স্কুলকলেজে উচ্চশিক্ষা ছাড়াও আরও নানাভাবেই রুচি ও বুদ্ধির অনুশীলন করে মানসিক উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ পেয়েছেন। এদেশে সাংস্কৃতিক কৌলীন্য এখনও অনেকটাই নির্ভর করে অর্থকৌলীন্যের ওপরে।

কমলকুমার মজুমদারের বাঙালিয়ানার যথার্থ স্বাদ পেতে হলে আমাদের আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকার দরকার। আর তার জন্য উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন। দুঃখ এখানেই। এখানেই কমলবাবুর ট্রাজিক আইরনি, যে তাঁর ঐতিহাসিক অভিক্রম বাঙালি লেখকের মধ্য দিয়ে নয় বরং ইয়োরোপের সাহিত্যিকদের সঙ্গেই তাঁর ভঙ্গির চারিত্র-সাদৃশ্য, শোণিতসংজ্ঞা মিলে যায়। যিনি প্রুস্তের 'পুরনো সেই দিনের কথা' বা জয়েসের 'ফিনিগান্‌স্ ওয়েক্' পড়েছেন তাঁর কাছে বরং কমলকুমার মজুমদারের আঙ্গিক ততটা অপরিচিত নয়। বাংলা ভাষাকে প্রাক্-পাশ্চাত্য দিনের আদিম আকৃতি-প্রকৃতি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে কমলবাবুকে কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের বাক্‌রীতির কাছেই নতজানু হতে হয়েছে। ফলত এভান্‌স্ প্রিচার্ডের বর্ণনায় সুদানের 'জান্দে' উপজাতির সান্ধ্য ভাষা যেমন, প্রায় সেই ধরনেই কমলবাবুর একটি ব্যক্তিগত উপ-ভাষা গড়ে উঠেছে : 'This is the language of dissimilation, hinting, circumlocution, innuendo, sarcasm'। এই লুকোচুরি, ঠাট্টা-তামাশা, আভাস-ইঙ্গিতের ঘোরালো-প্যাঁচালো সাঙ্কেতিক ভাষা প্রায়ই অপ্রত্যাশিত চমক লাগিয়ে অদীক্ষিত পাঠককে ল্যাবিরিনথের মতো এক গোলোক ধাঁধায় ফেলে দেয়। তা থেকে মুক্তি পেতে প্রবল বুদ্ধির পরিশ্রম লাগে। লেখকের এই বিশেষ শৈলীর মধ্যেই এক ধরনের অগণতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশিত হয়ে পড়ে বলে আমার ভয়। এই মনোভঙ্গি স্পষ্টতই মানব-বিমুখ, অতিমাত্রায় আত্মনিমগ্ন, এবং একদিক থেকে অত্যাচারী।

ভাষাকেন্দ্রিক গোষ্ঠীবদ্ধতার চরিত্রই হল সাংস্কৃতিক উন্নাসিকতার ওপরচালাকি দিয়ে ভাষাকে ভিন্ন হাঁড়ি করে নেবার অতিরিক্ত অনুমতিটুকু সমাজের কাছে জোরজবরদস্তি আদায় করে নেওয়া। 'বিশিষ্ট সামাজিক আত্মপরিচয়ের এই নির্দিষ্ট অনুভূতিটিকেই পেশাদার রাজনীতিবিদ ও প্রচার-সংস্থাগুলি কাজে লাগানোর চেষ্টা করে থাকেন' (দ্রঃ প্রাইড, পৃঃ ১৯)। যেমন ধরুন 'KWALITY'

বানানের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বটি যা, কমলকুমার মজুমদারের আঙ্গিকের মূলে দার্শনিক তত্ত্বও এতে তেমনটিই হয়ে দাঁড়ায়। তারপরে একটা মানুষ ক্রমশ একটি কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়ে যান। মানুষ থেকে মিথ-এ পৌঁছনো খুব লম্বা দৌড়ের রাস্তা নয়। ক্যাসিয়াস ক্লে'র স্লোগান 'আয়্যাম দা গ্রেটেস্ট' যেমন মিথ, গ্রেটা গার্বোর ব্যক্তিগত রহস্যময়তা যেমন মিথ, 'নিখাকী মাতা' যেমন মিথ, তেমনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে কমলকুমার মজুমদার।

"তরুণ হের্বর্টরের দুঃখ'তে গ্যয়টে যেমন 'ক্লপস্টক' এই নামটিকে মিথ হিসেবে রোমান্টিক আবেগের প্রতীকস্বরূপ ব্যবহার করেছেন। দুটি প্রেমিক হৃদয়ে মুহূর্তেই সেতু বেঁধে দেয় এই একটি বিশেষ শব্দ। এককথায় 'ক্লপস্টক' এই নামটির সঙ্গে জড়িত সমস্ত কোমল, কাব্যিক, হার্দিক অনুষঙ্গ শব্দটিকে রোমান্টিকতার মূর্ত প্রতীক করে তোলে। সাম্প্রতিককালে ঠিক তেমনই কোনো কোনো গোষ্ঠীর কাছে 'কমলকুমার' এই নামটি এককথায় উন্নাসিক মননশীলতার প্রতীক চিহ্ন। কমলকুমার মজুমদার বলতে এই ভক্তগোষ্ঠীর কাছে বোঝায় :

(ক) রুচির কৌলীন্য, উন্নাসিকতা;

(খ) উচ্চশিক্ষা, ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ও দর্শনে জ্ঞান;

(গ) বুদ্ধির অনুশীলন, চটক এবং চমক;

(ঘ) অভিনবত্বের নেশা;

(ঙ) এক বিশেষ পলায়নী মনোভঙ্গি, যাকে 'অক্ষম ঈর্ষাকাতর আম-জনতার আক্রমণের হাত থেকে বুদ্ধিজীবীর পলায়ন' (দ্রঃ ফিশার, ১৯৫৮, পৃঃ ৪৪৬, প্রাইডে উদ্ধৃত) বলা চলে।

(চ) এবং বামপন্থী সাহিত্যের সঙ্গে কিছুটা আপতিক, আনুষঙ্গিক চটকদারী যোগাযোগ।

বাংলা ভাষার পবিত্র উৎস সন্ধানে কমলবাবুর এই অন্বেষাতে আমরা এক ধরনের শুদ্ধতার আতিশয্য দেখতে পাই। "সংশোধনের আতিশয্য অনেক সময়ে সামাজিক মর্যাদার ঊর্ধ্বগতির লক্ষণ হতে পারে, সুতরাং এটাকে আমরা পদমর্যাদা লাভের প্রয়াস হিসেবে ধরে নিতে পারি।" (ল্যাবর, ১৯৬৬, পৃঃ ২০, প্রাইডে উদ্ধৃত) ওয়াইনরিখও বলেছিলেন : "আহৃত উচ্চম্মন্যতা অনেক সময়ে ভাষার প্রতি অতিরিক্ত তীব্র এক আনুগত্যের জন্ম দেয়" (প্রাইডে উদ্ধৃত)। ভাষাকে সচেতনভাবে দুর্বোধ্য করে তোলায় কমলবাবুর দুর্বার মোহ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের এই কথাগুলি মনে করিয়ে দেয়। ফরাসি সাহিত্যিক গারোদির জটিল ভাষা প্রসঙ্গে পণ্ডিত রোলাঁ বার্তের কথাগুলিও মনে করুন। বার্ত বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই, আমাদের নিতান্ত মাঝারি ক্ষমতাকেও জায়গা করে দেওয়া উচিত বৈকি—এবং শ্রীযুক্ত গারোদির ক্ষেত্রে তা তো রীতিমতো মর্মস্পর্শী!" কমলকুমার মজুমদারের ক্ষেত্রেও যদি কেউ কেউ বার্তের মতো করেই ভেবে ফেলেন? কিন্তু না। আমরা ওভাবে ভাবতে চাই না। কমলবাবুর ক্ষমতার অসামান্যতাকে অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু এও সত্য, যে তাঁর ভাষা ব্যবহারের চমকপ্রদ পদ্ধতিটিকে চট করে অনন্যতা অর্জনের সহজ উপায় বলে মনে হতেই পারে। তাঁর অনুচ্ছেদগুলি অতি-প্রলম্বিত, তাঁর যতি-চিহ্নের ব্যবহার অতি-অভাবনীয়, প্রচলিত ধারাবিরোধী বিচিত্র বাক্যবিন্যাস করেন তিনি। অর্থের দিক থেকে সেই সব বাক্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ এবং দুর্বোধ্য, যেহেতু তারা ব্যাকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই দুরূহ ভাষার নিহিত উদ্দেশ্য যদি হয় হঠাৎ আঘাত সৃষ্টি করে পাঠকমনকে সচেতন করে তোলা, তবে বলব সে উদ্দেশ্যে তিনি সম্পূর্ণ সফল হননি। কেননা বেশির ভাগ সাধারণ পাঠকই তাঁর ভাষার আকস্মিক আঘাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাঠ ছেড়ে পলায়ন করেন। শেষ পর্যন্ত লেগে থাকেন কেবল তাঁরাই যাঁরা সচেতনভাবে, বুদ্ধির ব্যায়ামে উৎসাহী, এবং/অথবা, যাঁদের হাতে এ ধরনের শব্দের ধাঁধার জট খোলবার মতো যথেষ্ট উদ্বৃত্ত সময় আছে। এ ধরনের পাঠকদের একটিই নির্দিষ্ট অর্থ-

নৈতিক শ্রেণীর ফসল বললে খুব ভুল হবে না। কমলবাবু জনগণের জন্য লেখেন না। তিনি লেখকের লেখক। কমলবাবু প্রসঙ্গে পাঠকদের মতামতের পর্যালোচনা করলে আমরা তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই : হয় তদ্গত ভক্তি, নয় বিরূপতা, নতুবা নিছক কৌতুক। কমলবাবুর লেখা পড়ে যাঁদের মনে কৌতুক জাগে, অথবা প্রতিকূল ভাবোন্মেষ হয়, তাঁদের মানসিক প্রক্রিয়ার কারণ বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু তাঁর লেখাকে যাঁরা অকুণ্ঠ সমাদর করেন, নিজেদের অনুভূতিতে তাঁরা যথেষ্ট সৎ কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। সাধারণত এ'রা নিজেরাও সাহিত্যিক। হয় সৃষ্টিমূলক নতুবা সমালোচনা সাহিত্যে অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু নিজস্ব সৃষ্টিকর্মে অমিয়বাবু ভিন্ন তাঁদের কারোকেই কমলবাবুর দ্বারা প্রভাবিত হতে, বা তাঁকে সচেতনভাবে অনুসরণ করতে দেখা যায় না। নিজেদের লেখার সময় এ'রা কিন্তু সহজবোধ্য ভাষাই ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কমলবাবুকে নিয়ে এ'রা যতটা হৈ চৈ করেন, ততটা তাঁকে ইদানিং আর পড়েন কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ হয়। অতীতে কমলবাবুর প্রথম দিকের অসামান্য লেখাগুলি এ'রা পড়েছিলেন, এবং তাদের জেল্লায় এ'দের নয়নমন ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। সেই ধাঁধাই এখনও ঘোরের মতো চোখে লেগে আছে। খোলা চোখে এ'রা কমলবাবুর দিকে নজর দেন না। ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করবার প্রক্রিয়াটিতে সব সময়েই একটা 'supercali-fragilistic-expi-ali-docious'-জাতীয় গালভরা ফাঁকির ফাঁদ থেকেই যায়।

কিন্তু বাংলা ভাষা নিয়ে কমলবাবুর এই ফুটবল খেলাকে পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক না ভাবার স্বপক্ষেও বেশ কিছু যুক্তি আছে। প্রথমত ব্যাকরণগত পরীক্ষানিরীক্ষা তা যেভাবেই হোক না, ভাষাকে সর্বদা পুনরুজ্জীবিত করে। তাতে নতুন আলোকপাত ঘটে এবং মানুষ নতুন করে ভাষা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে। তখন ভাষা সম্পর্কিত নানা প্রশ্ন মানুষের মনে জাগে . যেমন জীবন ও সাহিত্যে ভাষার ভূমিকা, তার স্থিতিস্থাপকতা ও পরিধি; লেখকের সামাজিক ভূমিকা, জীবনে সাহিত্যের ভূমিকা; সাহিত্যে আদর্শ ভাষার অনুসন্ধান, ভাষাতে কোনো ধ্রুব আদর্শ সৃষ্টি সম্ভবপর কিনা ইত্যাদি। অন্ততপক্ষে এতে তো কোনো সন্দেহ নেই যে একজন মাত্র লেখক তাঁর একক ব্যক্তিত্বের যথেচ্ছ আচারে কোনো সুগঠিত, প্রতিষ্ঠিত ভাষার স্থায়ী ক্ষতি করতে পারেন না। আর ভাষা সম্পর্কিত যে-কোনো একক পরীক্ষা যদি সে ভাষার অন্তরে প্রবেশ করে, ভবিষ্যৎ লেখকদের প্রভাবিত করতে পারে, তবে তো সে-প্রচেষ্টা সার্থক। এবং এইসব সার্থক পরীক্ষাই তার সম্পদ বাড়িয়ে তোলে। ভাষার চরিত্র পালটে দেয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা ভাষার গায়ে আলতো ঢিল ছুঁড়ে কমলকুমার কোনোদিন বাংলা ভাষার ক্ষতি করতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর ভাষার অন্তরালে যে ভাবধারাটি প্রবাহিত, যে মূল্যবোধ নিহিত, তা সমাজের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক হতে পারে। কারণ, সেক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রগতিবিদ্বেষী, ইতিহাসবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল। ভাষার চিরাচরিত প্রকরণকে পরিবর্তিত করার যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টাই শেষ পরিণতিতে সে-ভাষাকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দেখাতে বাধ্য। ভাষার ওপর যথেষ্ট শক্তিশালী আক্রমণ বিতর্ক সৃষ্টি করে--এবং নিছক সাহিত্যপ্রেমিকদের ভাবুক নজর ভাষার বৈজ্ঞানিক দিকেও কেড়ে আনে। অতএব শত্রুভাবে ভজনা করেও এ ধরনের প্রচেষ্টা বাগ্‌দেবীর শ্রীবৃদ্ধিই করে। যেহেতু সাহিত্যের মূল্যায়ন কখনোই দেশ-কাল, সমাজ-অর্থনীতির বাইরে নয়, তাই বর্তমান যুগে সাহিত্যের সমালোচনাতে ভাষার চরিত্রের দিকটিকে হিসেবের মধ্যে আনা দরকার। কেননা সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলির সম্যক প্রতিফলন ঘটে ভাষার দর্পণে। কী বলছি তার চেয়ে কীভাবে বলছি সেটা কম জরুরি নয়, কেননা তা থেকেই বোঝা যাবে, কাকে বলছি। কার জন্য লিখছি। কেবলমাত্র নান্দনিক সমালোচনা করার রীতিটি ক্রমশ অস্তমিত হয়ে আসছে—সাহিত্য সমালোচনার প্রসঙ্গে সোশিও-লিঙ্গুইস্টিক দৃষ্টিকোণটি এখন

উদীয়মান। আমরাও সেই চোখেই কমলবাবুর ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নটিকে পরীক্ষা করেছি।

কমলকুমার মজুমদার ভাষাকে সংশ্লেষ প্রক্রিয়া (synthetic process)-তে ব্যবহার করেন। সংশ্লেষ বলতে আমি বুঝি সেই পদ্ধতি যার সাহায্যে কবিতা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ একই শব্দে একাধিক অর্থের অনুপ্রবেশে বাঁধাধরা অভ্যস্ত সংজ্ঞা থেকে শব্দের মুক্তি ঘটে যায়, এবং বিভিন্ন অনুষঙ্গের সমাহারে কবির হাতে প্রাণশূন্য রিক্ত শব্দের নবজন্ম ঘটে। নতুন ভাবৈশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠার ফলে কবিতায় শব্দের বহুমুখী চরিত্র অর্থকে কুয়াশাবৃত না করে বরং শিল্পের অভিজ্ঞতাকেই সর্বজনীন করে তুলতে সক্ষম হয়। এ হল কবির ভাষা--প্রেরণার, মর্মোচ্ছ্বাসের ভাষা, যুক্তির বিশ্লেষে নয়, আবেগের সংশ্লেষে যার জন্ম; সৃজনী প্রতিভা আত্মার প্রয়োজনে এই ভাষাকে আবিষ্কার করে, আর পাঠককেও তার সমান অংশীদার করে তোলে।

কমলকুমার মজুমদারের নিজস্ব ভাষাও এক অর্থে প্রেরণার, ভাবুকতার, মর্মোচ্ছ্বাসের ভাষা, অথচ তিনি এর মধ্যে একটি অদ্ভুত সেকেলে হিতোপদেশের গন্ধ কৌশলে মিশিয়ে দেন—যার ফলে পাঠকের সঙ্গে তাঁর সুদূর বিচ্ছেদ গড়ে ওঠে। তিনি তাঁর নিজস্ব সম্পদ অন্যদের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে তেমন পছন্দ করেন না। যক্ষের ধনের মতো নিজের ভাষাটির চাবি কেবল নিজের কাছেই রেখে দেন।

সমালোচনামূলক নয় এমন সমস্ত সৃষ্টিশীল রচনার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ গল্পে, উপন্যাসে) যতই অস্বস্তি হোক, তবুও তাঁকে সহ্য করা সম্ভব। যেহেতু এক্ষেত্রে তিনি ভাষার যে-প্রকরণটিকে আত্ম-প্রকাশের উপযুক্ততম বলে মনে করেন, ভাষাকে ভেঙে চুরে সেটি তৈরি করে নেবার শিল্পগত অধিকার তাঁর আছে। এটি মৌলিক সাহিত্যের জন্মগত দাবী। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। জর্জ স্টাইনার বলেন--"সমালোচকের সমস্ত রচনাই দোহাতফের্তা, যেহেতু সমালোচক অন্যের লেখার বিষয়ে লেখেন।" অতএব ব্যঞ্জনার চেয়ে ব্যাখ্যাতেই সমালোচকের নজর থাকা প্রয়োজন। সমালোচনার জন্য চাই সর্বজনগ্রাহ্য, বোধগম্য, যুক্তিশুদ্ধ, ঋজু বাক্‌প্রকরণ, যা লতার মতো না লুটিয়ে মহীরুহের মতো সোজা দাঁড়াবে। যার আন্তর সত্য আলো-বাতাসে আন্দোলিত হবে।

কমলবাবুর ভাষা-প্রকরণ প্রসঙ্গে আমার সংশয়গুলি নিচে সবিনয়ে লিপিবদ্ধ করছি।

(১) তাঁর গদ্য প্রবন্ধের যোগ্য নয়, দ্ব্যর্থহীনভাবে তথ্য উপস্থাপনের ক্ষমতা ঐ উপ-ভাষার নেই।

(২) তাঁর ভাবনার, বিষয়বস্তুর জনদরদী উদার সংবেদন এবং তাঁর ভাষার জনবিরোধী সংকীর্ণ আবেদন--এই দুটির মধ্যে নৈতিক বিরোধ আছে। যাদের নিয়ে লেখা, তাদের জন্য লেখা নয়। আর যাদের জন্য ওঁর লেখা, তারা জনদরদী নয়। উন্নাসিকতা, গোষ্ঠী-বদ্ধতার মূল সংজ্ঞাই তো জনদরদের বিপরীত। ওঁর ভাবনায় যে জনদরদ আছে ভাষায় সে জনদরদ নেই, বরং আছে জনমানসকে পূর্ণ উপেক্ষা।

কোনটিকে গুরুত্ব দেব আমরা?

(৩) ওঁর ভাষাকে যদি বিদ্রোহের ভাষা বলে ধরে নিই (ব্যাকরণকে যদি গতানুগতিক নিয়ম-তান্ত্রিক সামাজিক ঐতিহ্যের প্রতীক বলে ধরি) তাহলে তার সঙ্গে ওঁর গতানুগতিক জাতি-বর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা-কুসংস্কারবিলাসী ভাবনাগুলির চারিত্রিক বিরোধ উপস্থিত হয়। আমার আপত্তি এখানেই। ভাবে ও ভাষাতে দুই দিকেই তিনি বিদ্রোহী হতে

পারেননি কেন? অথবা ঐতিহ্যবাদী? তিনি ঠিক কী হয়েছেন? নিজের জন্য একটি সাহিত্যিক তথা সামাজিক বিশিষ্ট ভূমিকা গড়ে নিয়েছেন তিনি, অথচ সেই ভূমিকাটি যে ঠিক কী, সেই বিষয়ে নিজেই নিশ্চিত নন। নিশ্চিত নই আমরাও।

তিনি নিজেকে (ট্রাডিশনাল) ঐতিহ্যবাদী বলে চিনতে এবং চেনাতে চান, অন্তত ছিন্ন স্বস্তিবচন দিয়ে লেখা শুরু করলে সেই ইঙ্গিতই করা হয়। অথচ ব্যাকরণ বিদ্রোহ মোটেই ঐতিহ্যবাদের লক্ষণ নয়। সে তো ঐতিহ্য ভাঙারই জেহাদ। তাঁর বিদ্রোহ ঠিক কিসের বিরুদ্ধে? সমকালের বিরুদ্ধে? তার মানে প্রগতির বিরুদ্ধে? পশ্চাৎ অপসরণের দার্শনিক তত্ত্বে যে কী প্রগতিবাদ নিহিত, তা আমি শ্রীদেবেশ রায়ের 'কথাসাহিত্যের নতুন সংজ্ঞা' যত্ন করে পড়েও ঠিক বুঝতে পারিনি। মাত্রাতিরিক্ত ভাষাসচেতনতা সাহিত্যের পক্ষে সর্বদাই যে ভালো তা নয়। সৎ সাহিত্যের জন্য তা অত্যাবশ্যকও নয়—শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, প্রেমচন্দ, ডিকেন্স, হুইটম্যান বা টলস্টয় এ'রা কেউই তো অতিরিক্ত ভাষা-সচেতন লেখক ছিলেন না। ভাষা যখন নেশা হয়ে দাঁড়ায় তখন শিল্পীর শ্রম ও নিষ্ঠা, অনেক সময়েই অপশিল্পের দিকে ঢলে পড়ে। কমলকুমার এমনিই এক 'অপসংস্কৃতি'র হোতা। অথচ 'পরিচয়'-এ দেবেশবাবু লিখেছেন : "কমলকুমার মজুমদারের ভাষা প্রকরণ এইভাবে আমাদের অনুভূতির সম্প্রসারণ ঘটানোর ফলে বাঙলা গদ্যের বিস্তারক্ষমতা বহুগুণে বেড়েছে ঠিক তখনই, যখন জনমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান চাহিদায় বাঙলা গদ্যের বিস্তারক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। প্রক্রিয়াটি এই মতো : ব্যক্তিমানুষের আশাআকাঙ্খা, হতাশা ও সামাজিক মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়াসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাঙলা গদ্যসাহিত্য সমাজ-পরিবেশহীন, ব্যক্তিত্বহীন চরিত্রের নেহাৎ ক্ষুদ্রতর পরিবেশে সংকীর্ণ হয়েছে। এই ক্ষুদ্রতর পরিবেশ থেকে কমলকুমার মজুমদার নিজস্ব প্রকরণের সাহায্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। এই বিচ্ছিন্নতা তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। এই বিশিষ্টতা তাঁকে জীবনের নানা মূল প্রশ্নের সঙ্গে অন্বিত করেছে। ফলে এই অন্বয় তাঁকে সাম্প্রতিক বাঙলা গদ্যসাহিত্যের সংকীর্ণতা থেকে জীবনের বৃহত্তর পরিধিতে মুক্তি দিয়েছে।

তাই কমলকুমার মজুমদারের ভাষা-প্রকরণের বিশিষ্টতার সাধনা সাহিত্যকে বিশিষ্ট মণ্ডল থেকে বের করে এনে বৃহত্তর বিষয়ের ভেতর মুক্তি দেয়। তাঁর ভাষার বিশিষ্টতা আসলে তাঁর বিষয়ের সর্বজনীনতাকে ধারণ করে।" (বৃহত্তর, ক্ষুদ্রতর, বিচ্ছিন্ন, বিশিষ্ট, অন্বিত, বৃহত্তর শব্দগুলি দেবেশ রায়ের মূল প্রবন্ধে মোটা হরফে ছাপা ছিল। পরিচয়, এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃঃ ৭১১)।

যখন একজন সমাজ-সচেতন বামপন্থী তরুণ বুদ্ধিজীবী এই কুযুক্তি প্রয়োগ করেন তখন মনে হয় 'there is something rotten in the state of Bengali Literature.' দেবেশবাবু নিজেই এই ভাষাকে 'বিচ্ছিন্নবাদিতা' নাম দিয়েছেন এবং বলেছেন, "ভাষায় বিচ্ছিন্নতার সাধনা কখনো কখনো ...নতুন বৈপ্লবিক উপাদানের...জন্ম দিতে পারে।, কমলকুমার মজুমদারের ভাষা বাঙলা গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই নতুন বৈপ্লবিক উপাদানের জন্ম দিয়েছে।" (দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৭০৯), তারপর "কমলকুমার মজুমদার সোয়া শ' বছরের বাঙলা কথাসাহিত্যের প্রধান নির্মাণকর্তাদের একজন।

কিন্তু পাঠক ও সমালোচকের সমর্থন তিনি পান না। সে অসমর্থনের পক্ষেও নাকি যুক্তি আছে। আর প্রধানতম বাধা নাকি তাঁর ভাষা। এই যুক্তির ভেতর ভাষা উদ্ধারের অক্ষমতার যে-পরোক্ষ স্বীকৃতি থেকে যায় তার জন্য আমাদের আত্মসম্মানবোধ পীড়িত হয় না। নিজেদের অশিক্ষার দায় আমরা লেখকের ওপর চাপাই।" (দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৭১৫)। এই দুঃখজনক মন্তব্যের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। দেবেশবাবু একজন মানবমুখী, সংবেদনশীল, জনদরদী লেখক। তিনি নিজে এই 'নির্মিত' ভাষাটি ব্যবহার করেন না বলে বাঙালি পাঠকদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন—"কমলবাবুর জনপ্রিয় না হবার কারণ "কমলকুমারের প্রকরণ নয়, ভাষা নয়, বিষয় নয়।

তার কারণ কমলকুমার মজুমদার সাহিত্যের ক্লাসিকধর্মে বিশ্বাসী আর সম্প্রতিকালে সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা আমরা হারিয়েছি, ক্লাসিকসের পঠনঅভ্যাস থেকে আমরা বঞ্চিত।" (দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৭১৫-১৬)। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ক্লাসিকস বিষয়ে এখানে হয়তো দীর্ঘ আলোচনাই প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু সংক্ষেপে বললে ক্লাসিকস সাহিত্যের প্রথম কথাই হলো ভাষার বোধগম্যতা, স্বচ্ছতা, ঋজুতা, সমস্ত আতিশয্যকে নিষিদ্ধ করে, ব্যাকরণের অনুজ্ঞা মেনে যাবতীয় প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সংজ্ঞার নীতিকে পূর্ণ সম্মান জ্ঞাপন করে, কোথাও কোনো সীমাকেই লঙ্ঘন-অতিক্রমণ না করে—সামাজিক অনুমোদন মেনে, তথাকথিত ক্লাসিক রীতির সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। সেই যে, "ঐতিহাসিক অতিক্রম, সমসাময়িক বিবরণ, বোধগম্যতা, সামাজিক অনুমোদন"- ভাষার সীমানির্ণয়ের প্রসঙ্গে গ্রাইড যা যা বলেছিলেন সেইগুলি সবই ক্লাসিকস সাহিত্যের সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কমলকুমার কোনোটাই মানেন না। তাই তিনি কোনো হিসেবেই ক্লাসিকস প্রথায় বিশ্বাসী লেখক বলে স্বীকৃতি পেতে পারেন না। সবচেয়ে বড় কথা, ক্লাসিক রীতির সাহিত্যে রূপরীতি ও বিষয়বস্তুর সমন্বয় ঘটে। সেইটের অভাবই কমলবাবুর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। ব্যাকরণবিরোধী বিপ্লবী আঙ্গিকের শিল্পগুণের সঙ্গে 'ভাগবত দর্শনের একটি কাহিনী' বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, যৌন উপভোগে পুরুষের অগ্রাধিকার, কুলীনদের বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ইত্যাদির অসম মিলনে যা প্রস্তুত হয়, তা যে কোনোও যুক্তফ্রন্টের মতোই, সাময়িক। অন্তর্বিরোধে ভুগে তা শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়তে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গে আরেকজন প্রগতিবাদী এশীয় লেখকের অভিমত তুলে দিচ্ছি :

"প্রথম কথা হল কাদের জন্য আমাদের শিল্পসাহিত্য রচনা?...তত্ত্বের বেলায় আর মুখের কথায় আমাদের কোনো কমরেডই জনতাকে পেটি বুর্জোয়াদের চেয়ে কম মূল্য দেন না। কিন্তু কাজের বেলায় কিছু কমরেড কি জনতার তুলনায় পেটি বুর্জোয়াদের বেশী গুরুত্ব দেননি? আমার মনে হয় দিয়েছেন। বহু কমরেড বুদ্ধিজীবীদের অনুধাবন করার দিকেই বেশি সময় ও শক্তি নিয়োগ করেন, সেই সঙ্গে তাদের দুর্বলতার সাফাই গান, এমন কি দোষগুলিকে সমর্থন পর্যন্ত করেন। আমাদের শিল্পী সাহিত্যিকদের অবশ্য-কর্তব্য হচ্ছে মূলসমেত উঠে আসা, জনতার পাশে এসে দাঁড়ানো ।...দর্শক-পাঠকের সমস্যা হচ্ছে একটা মৌলিক সমস্যা—নীতির সমস্যা।" (মাও-সে-তুং, শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে, পৃঃ ৮৭-৯৩) এই মৌলিক নীতির সমস্যাটিকেই কমলবাবু প্রশ্রয় দেননি। কমলবাবুর গুণমুগ্ধ সমর্থকবৃন্দের কাছেও পাঠকের সমস্যাটি জরুরি হয়ে ওঠেনি। কমলবাবুর যাবতীয় লেখার মধ্যেই সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ কাঁটার মতো স্পষ্ট বিদ্ধ করতে থাকে পাঠকের চেতনাকে। জানি না তার কতটা অকৃত্রিম, কতটা ভনিতা, কিন্তু ভানই হোক আর সত্যই হোক, তা পাঠকের কাছে অরুচিকর, আপত্তিকর এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। বিশেষত তাঁর ভাষা-প্রকরণ যেহেতু বৈপ্লবিক। এখানে একটা জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বও থেকে যায়—"বুর্জোয়া শিল্পসাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মর্মটাকে বাতিল করতে হবে, এবং অত্যন্ত বিচার বিবেচনা করে তার শিল্পগুণকে গ্রহণ করতে হবে। চরম প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পসাহিত্যে—যেমন ফ্যাসিস্তদের রচনা-বলীতেও কিছু শিল্পগুণ থাকা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু উঁচুদরের শিল্পগুণসম্পন্ন প্রতিক্রিয়াশীল রচনা জনসাধারণের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে, সুতরাং এ ধরনের রচনাকে বাতিল করাটা অত্যন্ত জরুরি। ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় শোষকশ্রেণীগুলোর শিল্পসাহিত্যের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের রূপরীতির উৎকর্ষের স্ববিরোধ।

আমরা দাবি করি শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির ঐক্য; আমরা চাই বিষয়বস্তু ও রূপরীতির সমন্বয়।" (দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১১৫) 'স্লোগান এবং পোস্টার' নীতির সাহিত্যকর্ম নিশ্চয় নিন্দার্হ;

কিন্তু নজর-কাড়ানো শিল্পশৈলীর মাধ্যমে কুসংস্কার আর প্রগতিবিরোধী কথা বলা আরো বেশি নিন্দার্হ।

এ ছাড়া, ঐতিহ্যবাদীর পোশাকে বিপ্লব বা বিপ্লবীর মুখোশে ঐতিহ্যবাদ -দুটোর কোনোটিই বিশ্বাসযোগ্য সমাজবাদের পন্থা নয়। (কায়িক্‌ বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি, যা গণসংস্কৃতি নয়, এ বছরে যার নয়া নাম হয়েছে 'অপসংস্কৃতি', কমলকুমার মজুমদার তারই চূড়ামণি। অথচ কমলকুমারের প্রতিভার বিপথগামিতার জন্য অনেকখানি দায়িত্ব পাঠকের। যে-সৃষ্টির জমিতেই বিপরীত আদর্শের স্ববিরোধ, তার ফসল ফলবে শূন্যতায়। কমলকুমার মজুমদার সেই শান্তিহীন শূন্যে পরিণাম। পাঠকের বিভ্রান্ত অনুরাগ, অযৌক্তিক অন্ধ ভক্তি সৃষ্টির পক্ষে গর্হিত ক্ষতিকর হতে পারে। এখানে লোথার লুৎসের মডেলটির অন্য একটি অংশ মনে করিয়ে দিই, পাঠক ও সমালোচকের প্রতিক্রিয়াও যে উলটে লেখকের রচনার ধারাকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে লুৎসে একটি সুন্দর মডেল করে দেখিয়েছেন :

লেখক | ---------→ পাঠক/সমালোচক

পরবর্তী রচনা ←—— |

কমলকুমার মজুমদারের প্রতিভা-হননের তদন্তে এই মডেলটি খুব সহায়তা করে। সমালোচকের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিনি আমরা। সমালোচক লেখকের চাটুকার নন, নন ভক্ত, বা প্রেমিক। তিনি লেখকের বন্ধু, উপদেষ্টা, এবং বিচারক। যথাকালে লেখকের ত্রুটি নির্ণয় করে দিয়ে তাঁর প্রতিভার সম্যক ঔজ্জ্বল্য বিধান করাই সৎ সমালোচনার উদ্দেশ্য। ব্যক্তিত্ববিলাস (পার্সোনালিটি কাল্‌ট) সবক্ষেত্রেই সর্বনাশ ডেকে আনে, কমলবাবুকে ঘিরে সেই মন্দ বাতাস বইছে আজ প্রায় বিশ বছর হতে চলল। যে মুহূর্তে থেকে কমলবাবু স্বকীয় শিল্পকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়েছেন - শুভানুধ্যায়ী পাঠকদের হেঁকে বলা উচিত ছিল - "মহারাজ, আপনি যে অবসন?" কিন্তু ভক্তিবাদের শিকার হয়েছেন তিনি। এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় তার জন্য দায়ী আমাদের মুখ্য প্রগতিবাদী পত্রিকা-গুলিই- যারা কমলবাবুর প্রধান ভক্তগোষ্ঠী ও পৃষ্ঠপোষক। নিরবধিকাল হালফ্যাশানের চমক নেয় না, তুলে নেয় চিরায়তটুকু। এক টুকরো কমলকুমার হয়তো বেঁচে থাকবেন 'নিম অন্নপূর্ণা'য়, 'মতিলাল পাদরী'তে, 'তাহাদের কথা'য়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায় যুক্ত হলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে যাঁর নাম থাকলেও থাকতে পারত, তিনি পরিণত হলেন এক 'পেয়ালা চমকে', একটি উদ্দাম ব্যতিক্রমে। নিছক একটি শিল্পসামগ্রীতে। এক "খেলার প্রতিভা"য়।)

পরিশিষ্ট—এক ॥ উদাহরণ—ক

রবীন্দ্রনাথ : যদি খোকা না হয়ে আমি হতেম কুকুরছানা!

বঙ্কিমচন্দ্র : পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?

রামেন্দ্রসুন্দর : সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই। কিন্তু ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জাকর।

হুতোম : আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মতো মূর্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে...বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় ক'চ্চেন। যদি এর কেউ ওয়ারিসান থাকত তাহলে হয়ত এতদিন কতো গ্রন্থকার ফাঁসি যেতেন।

মধুসূদন : (ক) হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব/বিবিধ রতন!

(খ) থু! থু! কুঁকড়োর পাখা! প্যাঁজের খোসা!

বাবু ইদিকে আবার পরম বৈষ্ণব!

বিদ্যাসাগর : (ক) এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি, যাহার শিখর-দেশ সতত সঞ্চরমান জলধর পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত।

(খ) গোপাল বড় সুবোধ বালক। সে যাহা পায় তাহাই খায়।

ঈশ্বর গুপ্ত : বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে।

রামমোহন রায় : ভাষা বিবরণের অপরাধ মহৎ ব্যক্তি দিবেন না., যদি বিবরণে অশাস্ত্র কথাও লেখা থাকে তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, এবং অশাস্ত্র প্রমাণ হইলে দোষ দিতে পারেন......

উইলিয়াম কেরী : এক রাজকন্যা অতি বড় সুন্দরী ছিলেন।

*লেবেডফ (১৭৯৬)...ভাল ঈশ্বর অনুগ্রহ করুন, আমি করিয়া এনেছী একটি বিষয় আমার মনস্তের। সসিমুখী সন্দেহ লাস্তী আমার কথায় প্রত্তয় করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর : বড় রসিয়া নাগর হে/গভীর গুণসাগর হে।

রামপ্রসাদ : বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।

কাশীরাম দাস : মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

কৃত্তিবাস : গোলক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।

চণ্ডীদাস : সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

বড়ু চণ্ডীদাস : দেখি লাজে গেলা চাঁদ/দুই লাখ যোজনে।

চর্যাপদ : টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী

হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী।

অপভ্রংশ : ওগ্গর ভত্তা রম্ভ আ পত্তা

গাইক ঘিত্তা দুগ্ধসজুত্তা।

*কমলকুমার (১৯৭৪) : মাধবায় রামকৃষ্ণায় নমঃ। এখন যাহা আমরা লিখিতে ভাবস্থ করি. . এমন হইল মনস্কামনার।

পরিশিষ্ট—দুই ॥ উদাহরণ—খ

১। "মাধবায় রামকৃষ্ণায় নমঃ। এখন যাহা আমরা লিখিতে ভাবস্থ করি তাহাই অব্যাভিচারিণী কৃতজ্ঞতাতে হউক তাহা শুদ্ধতাতে হউক যে এবং সুন্দর ভক্তিতে হউক যে কোনো শেয়ানা চমক না থাকে এমন হইল মনস্কামনার।"

(ক) স্বস্তিবচন। ভান-ভনিতা। ভাষায় কালাতিক্রমণ। অপ্রচলিত বাক্যবন্ধ ব্যবহার।

(খ) সম্পর্কবাচক সর্বনাম ও সংযোগকারী অব্যয়ের—অকারণে দ্বৈত প্রয়োগ (যে, এবং)।

(গ) নির্দেশক ভাব ব্যবহার (Indicative mood), অপেক্ষিত বা সংযোজক ভাবের (Subjunctive mood) পরিবর্তে।

(ঘ) ইংরিজি বাক্যবিন্যাস—বিপরীত পদান্বয়—অতিরিক্ত ক্রিয়া ব্যবহার।

(ঙ) দ্বিতীয়ার বদলে ষষ্ঠী (মনস্কামনার)।

(চ) ভাববাচ্য।

(ছ) মৌখিক ভাষা (শোনানো চমক)।

২। "যে যাহার বিষয়েতে এই পাট, তিনি নিশ্চিত হয়েন পুণ্যশ্লোক।"

(ক) শুরুতেই অকারণ সম্পর্কবাচক সর্বনাম এবং সংযোগবাচক অব্যয় প্রয়োগ।

(খ) 'পাট' শব্দের অপ্রচলিত প্রয়োগ।

(গ) 'হয়েন' অপ্রচলিত ক্রিয়া রূপ—রীতি-বহির্ভূত প্রয়োগ—ইংরিজি বাক্যবন্ধ।

(ঘ) বিপরীত পদান্বয় বিচ্যুতি।

৩। "ইহাটি টানাসুরে বর্জিয়া, ইহা আপনুতস্বরে, ইহা বুদ্ধি সুচিন্তিত কণ্ঠে পাঠক কবিতা পড়িবার যে বিন্যাসেই উচ্চারিব একই নাটকীয়তার বৈপরীত্য (কন্ট্রাস্ট নহে) আমাদিগেতে ছাইবেই!"

(ক) মৌখিক লোকভাষা (ইহাটি)।

(খ) (বর্জিয়া) নামধাতু কাব্যিক প্রয়োগ গদ্যে অপ্রচলিত।

(গ) চ্যুত বিন্যাস (deviant syntax), ("পাঠক কবিতা") অংশ অসংলগ্ন।

(ঘ) (উচ্চারিব) নামধাতু কাব্যিক প্রয়োগ।

(ঙ) দ্বিতীয়ার বদলে সপ্তমী (আমাদিগেতে)।

(চ) (ছাইবেই) কথোপকথনের ক্রিয়াপদ, ক্রিয়াপদের অদ্ভুত ব্যবহার।

(ছ) (কন্ট্রাস্ট নহে) অনাবশ্যক ইংরিজি শব্দ।

(জ) (বুদ্ধিসুচিন্তিত কণ্ঠে) অর্থ কী? স্বাতন্ত্র্যসর্বস্ব শব্দযোজনা।

(ঝ) অকারণ বিস্ময়সূচক চিহ্নের ব্যবহার।

৪। (ক) "এস্থেটিক জনায় নহে।"

(খ) "তবু শব্দ বাছাই ঠিক কিন্তু তাহার জনায় কেমন?"

(গ) বাংলা হরফে ইংরিজি শব্দ (এস্থেটিক)।

(ঘ) অব্যয়ের সঙ্গে ষাং প্রত্যয় যোগ (জনায়) হয় না।

৫। "এখানে মোহহীন শব্দটি হয় ভারী সুক্ষ্মতা।"

(ক) অন্তার্থক ক্রিয়ার অপব্যবহার (হয়)।

(খ) (সুক্ষ্মতা) বিশেষণের পরিবর্তে বিশেষ্য।

৬। "এই মার্কোওবার চাপ আমাদিগে আভ্যন্তরে নির্ক্ষেপিল, আরিঃশ্বাস!"

(ক) মার্কোওবার—ইংরিজি শব্দকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাচীন তৎসম শব্দের মতো চেহারা দেওয়া (পোলবর্জিনীর মতো) ম্যাকাবার না লিখে। শৌখিন বানান।

(খ) ইংরিজি শব্দ কেন?

(গ) (আমাদিগে) দ্বিতীয়ার পরিবর্তে সপ্তমী।

(ঘ) (আভ্যন্তরে) মৌখিক, লৌকিক শব্দ।

(ঙ) (নির্ক্ষেপিল) ওজনদার নামধাতুর কাব্যিক প্রয়োগ—'আভ্যন্তরে নির্ক্ষেপিল' গুরু-চণ্ডালী।

(চ) (আরিঃশ্বাস) ফার্সী মৌখিক বিস্ময়সূচক শব্দের ক্লাসিক প্রয়োগ।

পরিশিষ্ট—তিন ॥ উদাহরণ—গ *

১। পৃঃ ১৭ কমলকুমার মজুমদার, মধুসূদন দত্ত, মাধব, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব বসু (ইংরিজি শব্দ—কন্‌স্ট্রাস্ট, আর্ট)।

২। পৃঃ ১৮ নিপট বাঙালীত্ব, নিছক বাঙালীত্ব, সেন্ট ফ্রান্সিস অব আসিসি, অর্লীন্সের কুমারী জোন, লুা সিয়েকাল দ্য লুই ১৪, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব বসু, ভোলত্যার, জেরাবদ্যা।

৩। পৃঃ ১৯ বু. ব., ত্রৈলোক্যবাবু, 'ম্যাকৌওবার চাপ', 'হিরোইক ব্রাহ্মণ্য', মিরাক্যাল।

৪। পৃঃ ২০ "কোনও পাশ্চাত্ত্য লেখক" (কে? নাম কেন নেই? পাঠকের জানা উচিত? তবে জোন্ অব আর্কের নামের দীর্ঘ টীকা-পরিচিতি আছে কেন? পাঠকের জ্ঞানের বৈদেশিক পরিধি বিষয়ে আশ্বাস, বা আশঙ্কা, কোন্‌টা বেশি?), বু. ব., কালিদাস, বঙ্গীয় সংস্কৃতি।

৫। পৃঃ ২১ ইংরেজ, বু. ব., কল্লোল যুগ, কালিদাস, বৈষ্ণবকবি ভরতচন্দ্র, ১৮ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য লেখকদের মস্তিষ্কসমতা।

৬। পৃঃ ২২ কেরী, সংবাদপ্রভাকর, রেভঃ কৃষ্ণমোহন, ভূদেববাবু, বু. ব., শ্রীঅরবিন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন, ত্রৈলোক্য, ১৯ শতাব্দী, বাঙালীত্ব হইতে হিন্দুত্বে, ইতিহাস, নারীচরিত্র, দেশাচার।

৭। পৃঃ ২৩ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মডেলভগিনী মমতাজ, মানিকবাবু, রাজা রামমোহন, মধুসূদন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎবাবু, নজরুল, শিবনাথ শাস্ত্রী, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, ডিটেকটিভ গল্পে নারী, টেকচাঁদ, কালী সিংহী, ঈশ্বর গুপ্ত, কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা, দেশীয় ধারা, হিন্দু, নব্য, ইংরাজ।

৮। পৃঃ ২৪ ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, অর্ধেন্দুবাবু, বঙ্কিমবাবু, সংবাদপ্রভাকর, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্র সেন, Gaiety Theatre।

৯। পৃঃ ২৫ অমরত বসু, মধুসূদন, দাদাভাই নৌরজী, অর্ধেন্দুবাবু, রাধাকান্ত দেব, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, সতীশ চক্রবর্তী, বিজাতীয় নব্য, ঈশ্বর, হিউম, নিহিলিজম, কমতের পজিটিভিজম, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, গীতার ব্যাখ্যা, অগস্ত কোৎ, মধুসূদন, জড়বাদ, নাস্তিকতা (ইংরিজি উদ্ধৃতি), রিফর্মড হিন্দু, পয়ার হইতে মুক্তির আন্দোলন।

১০। পৃঃ ২৬ মধুসূদন, ইংরিজি ভাষায় উদ্ধৃতি, লাতিন উদ্ধৃতি, ১৮শ জর্ম্মন মতিত্ব, ফরাসীদের মনোভাব, ভূদেব, পৌরাণিক চরিত্র, বঙ্কিমবাবু, ভগবান রামকৃষ্ণে কৃপাবশে, বৈকুণ্ঠ সান্যালের 'কেশবচরিত', হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখা, আধ্যাত্মিক মধুর ভাব, বিধানবিশ্বাসী, ব্রাহ্মসমাজ, বৈদান্তিক জ্ঞান বিচার।

১১। পৃঃ ২৭ ঠাকুরের (রামকৃষ্ণের) ভাষার সারল্য, টেকচাঁদ, কালী সিংহী, বুদ্ধদেব, অবয়বান্তর (metamorphosis), মনুষ্যবৎ এর নামে সমস্ত চিন্তাধারার = হিংসা, আত্মত্যাগ, প্রতিহিংসা, ধর্ম্ম, একান্নবর্তী, বিলাতী শিক্ষা, সভ্যতা, সত্যের জয়, অনুতাপ, বৈরাগ্য, লেখার সমালোচনা, চিত্রাঙ্কন, ঘটনাচক্র,

লিপিচাতুর্য, ভিকতর আলফিয়েরী ইতালীয় ট্র্যাজিক কবি (১৭৪৯-১৮০৩), মারী স্টুয়ার্ট, রেস্তোরাঁ, ভিয়োলিও, কেশব সেনের বাচনিক অভি-ব্যক্তি, শিবনাথ শাস্ত্রী, মাঘোৎসব, শরৎবাবু, কল্লোল, ভারতী, প্রবাসী, প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সন্তোষ ঘোষ মহাশয়, একসিডেন্ট।

১২। পৃঃ ২৮ সন্তোষ ঘোষ, একসিডেন্ট, shock, alarmer, সমন্বয়, হারমোনাইজ, শরৎবাবু, বুদ্ধদেব, পাঠকবর্গদের প্রতি সাবধানবাণী মানবতা মনুষ্যত্বের বাজারচলতি রাজনৈতিক অভিধা বিষয়ে, ছোটজাত একতারা বাদকদের মতামত, মহেন্দ্রনাথ, নানা সম্প্রদায়।

১৩। পৃঃ ২৯ The Anglo-Saxon and the Hindu, টপসি, কবি অজিত দত্তের উক্তিতে যেমন প্রভু গুহঠাকুরতা, ব্রজেন শীল, বঙ্কিমচন্দ্র, মাস্টার, ঠাকুর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেববাবু, গোকুলচন্দ্র নাগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

১৪। পৃঃ ৩০ রামেন্দ্রসুন্দর, দিলীপ রায়, নলিনী গুপ্ত, পাশ্চাত্যতত্ত্ব, অজিত চক্রবর্তী, সুকুমার রায়, পাশ্চাত্যের কাব্য, আর্ট, ডারউইন, গোটে, রামেন্দ্রসুন্দর, বের্গসনএর এলাঁ ভিতাল, ফ্রয়েড, 'অবচেতন', এ্যাট হোম, মাই ডিয়ার, বস্তুবাদ dogmatic, ব্রজেনবাবুর ওবজেকটিভ সমালোচনা, কন্টিনেন্টাল বিশ্লেষণ, পাশ্চাত্য ১৮ শতাব্দী, ১৯ শতাব্দী, অজ্ঞাতনাম্নী 'ভদ্রমহিলা'র উক্তির উদ্ধৃতি, ক্যানডিড (আসল নাম ক্যানদিদ য়্যুঁল ওপ্তিমিজম [Sic]. সবিনয়ে দুঃখ করছি, কেন যে এই শব্দ ফরাসি উচ্চারণিক অহংকার! কারণ সত্যি তো সেটাও ঠিক না। জিন দা আর্ক নয়। প্রকৃত-পক্ষে 'জান দার্ক'; ক্যানদিদ য়ুঁল ওপ্তিমিজম নয়, 'কাঁদীদ উং ল্যোপ্তি-মিজম'. অগাস্ত নয় 'ওগুস্ত' এসব শুধরেই বা কী লাভ? আমরা ইংরিজিটাই বুঝি ক্যানডিড, কিংবা জোন অব আর্ক বললেই ঠিক চিনব। এটা তো আলজিরিয়া নয়!) লেইবনেৎসীয়ান (Sic) আশাবাদ, Humarise, মোপাসাঁ, মাই ফাদার গ্রন্থে জাঁ রেনোয়া।

১৫। পৃঃ ৩১ (জাঁ রেনোয়ার) পিতা বিখ্যাত শিল্পী অগাস্ত পীয়ের রেনোয়া, মোপাসাঁ, পবিত্রবাবুর মেটাবলিজম, সত্যেন দত্তর নগাচীর পাদা, গোকুলবাবুর জাঁ ক্রিস্তফ, মণীন্দ্রলাল বসু, শরৎবাবু, স্বর্ণময়ী দেবীর শিবনাথের anglo vernacular সমাজ, কালো মেয়ে হেরোইন, সাদাত এসথেটিকস, নিটশে'র সুপারম্যান, বাইওলজিকাল নিড, বার্নার্ড শ'র চাকচিকা, লিগাল প্রসটি-টিউশন, বেকনেও, New atlantises, শালজাক, লা ফাম দ্য তারাত জা, ঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গ, অচিন্ত্যবাবু, বুদ্ধদেব, আর্ট।

১৬। পৃঃ ৩২ ইংরাজ সমাজ, লেডি চ্যাটারলীজ লাভ, নিরুপমবাবু ও সন্তোষবাবু, সজনীবাবুর পত্র উদ্ধৃতি (উচ্ছৃঙ্খল যৌনতত্ত্ব বিষয়ক মন্তব্য), নরেশ সেন-গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র উদ্ধৃতি, বুদ্ধদেব বসু, কল্লোল যুগ, আর্টের মূলতত্ত্ব রমণীদেহ, সত্যেনবাবু, সজনীবাবু, সমাজতন্ত্র, অশ্লীলতা বিষয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের, মধুসূদনের, ইংরাজী চিঠি রাজনারায়ণের, উদ্ধৃতি, নীতি-বাগীশ ব্রাহ্ম।

১৭। পৃঃ ৩৩ (মধুসূদন), ইনসেসচুয়াস লাভ অফ রাধা, বিধর্মীদের 'পঞ্চসতী লইয়া

টিটিকার', হিউমানাইজ বা মনুষ্যত্ব, র‍্যাশানালাইজ, 'রঙ্গের বিচিত্র কথা', ভ্রূণহত্যা, 'গোস্বামীর সাগরযাত্রাতে incest, মডেলার্ভাগিনীতে খানসামার বডিস উন্মোচন, হরিদাসের গুপ্তকথা, হিন্দুঘরের মেয়েদের কোর্টশিপ, চুম্বন, গর্ভদান, শিবনাথ শাস্ত্রী, এ্যাংলো-ভার্নাকুলার সমাজের কিস দেওয়া মানে চুম্বন, ইনসেস্ট, মধুসূদন, শরৎবাবুতে immoral বেশ্যাচরিত্র, লীলাপ্রসঙ্গ, বিবেকানন্দ ও তদীয় বন্ধুর আলোচনার উদ্ধৃতি, যুবক নরেন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বুদ্ধদেব, সত্যেনবাবু, জয়দেব, ভারতচন্দ্র, বিপরীত বিহার, বিদ্যাসাগরের গুরুপ্রসাদী।

১৮। পৃঃ ৩৪ মিস মেও, মাদার ইণ্ডিয়া, হিন্দু ছদ্মমার্গ, ব্রাহ্ম নৈতিকতা ও পাপবোধ, হেরম্ব মৈত্র শেলীর 'লাভস ফিলজফি' পড়ানো, বুদ্ধদেব বসু, ফ্লোবেয়ার, লরেন্স, ইউলিসিস, বাঙলার ব্রত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১৯। পৃঃ ৩৫ জাঁ পল সার্ৎ, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্ত, বুদ্ধদেব বসু, ট্রাজিডি, নিয়তি ও নৈতিকতায় চিরাচরিত হেলেনিক মেল, ১৯ শতাব্দী।

২০। পৃঃ ৩৬ বুদ্ধদেব, দোল দুর্গোৎসব, অজ্ঞাতপরিচয়, ১৯ শতাব্দীর খ্যাতনামা কবির বক্তব্য, দিদেরো, স্টার্ন, সুইফ্ট, র‍্যাবেলে, নেরভাঁ কোকেন্ট্ই, পেতরো, লুসিয়া, ভোলতেয়ার, লা সিএকল দ্য লুই কাতজ, সুইফ্ট হয়েন র‍্যাবেলেপার ফেকাসিঅনে, (ফরাশি), গোলাপ, বাঁশী গল্প, ইত্যাদির দেশভ্রমণের ইতিহাস, বিদ্যাসাগর এবং ফিলিপ নাভার, ১৫ শতাব্দী ও ১৯ শতক, জাতক, কথাসরিৎসাগর, হোপম্যানের হানাবাড়ী সাতো, এবং কর্ণিত পাষাণের তুলনা, ওয়াল্টার স্কট।

২১। পৃঃ ৩৭ বিখ্যাত সাহিত্যিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, মোপাসাঁ, চেকভ, জন গলস্‌-ওয়ার্দী, সিলভার স্পুন, ভারতী, বুদ্ধদেববাবু, ইমপরটান্স অফ বিং আর-নেস্ট, স্বর্ণময়ী দেবী, সুবল মিত্তির, মধুসূদনের চিঠির ইংরাজী উদ্ধৃতি গৌরদাস বসাক, রাজনারায়ণ বসু, স্তাঁদাল, ওপেরা গান, স্তাঁদালের ইতালী ভ্রমণ, ন্যাস আরগসী লিসনার (বি বি সি), মাইকেল আরলেন, 'it গার্ল সংজ্ঞা', কাহার লেখা মনে নাই, রুইলা ক্যাথার, গার্ডিনার, ১৮ শতাব্দীতে (২) কি ফরাসীতে ও ইংরাজীতে প্রাচ্য আকর্ষণ দেখা যায়, স্বদেশ সমা-লোচনা, exotic হওয়া, মনস্তাত্ত্বিকও, ইংরাজদের নিকট নবাব আমাদের কাছে ফিরিঙ্গী।

২২। পৃঃ ৩৮ এ্যাংলো স্যাকসন এন্ড দি হিন্দু, বুদ্ধদেব, 'ইংরাজী সাহিত্য ও আমরা', বু ব-র তীব্র অভিমান ওউটলাইন অফ ওয়ার্লড লিটারেচার গোছের গ্রন্থে বাঙালী লেখক নাই, কানাডা, নিউজীল্যান্ড, সুরেশ সমাজপতি, রমাপ্রসাদ চন্দ, 'পরিচয়', হোরাইজন, নিউ স্টেটসম্যান এন্ড দি নেশন, টাইম (sic), লিটেরারী সাপ্লিমেন্ট, লিসনার, মার্কস ইস্টম্যান আদি প্রবন্ধ লেখক, চাইকোভোস্কী (sic), ইম্প্রেশানিস্ট, বুদ্ধদেববাবু, রেনে গ্রুসে, চারুবাবু, বেদান্তের তত্ত্বালোচনা, উদ্বোধন, ভারতের সাধনা, বসুমতী, ইংরেজ সাধনায় যাওয়া (বৈজ্ঞানিকতা, যুক্তি, নির্ণয়ে, ধর্মান্ধতা)।

২৩। পৃঃ ৩৯ 'শ্রীঅরবিন্দের পর আরও মানুষের দরকার ছিল', 'যদিও সুধীনবাবু

আমাদের একমাত্র মহৎ কবি', শরৎবাবু, দিলীপ রায়, মধুসূদন, কেন মহাশয় জর্মান উক্তি দিয়া পদার আরম্ভ', মধ্যযুগ বা হেলেনিক পুরাণের পুনরুল্লেখ, ভগবান শঙ্করাচার্য, মহাপ্রভু রামকৃষ্ণ, তুলসীদাস, রামায়ণ, বুদ্ধদেব, গঙ্গার কথা, রামকৃষ্ণের উল্লেখ, দেবেন সেন, সুধীনবাবু, ১৯ শতকের কবি।

২৪। পৃঃ ৪০ ইংরাজী উদ্ধৃতি (মধুসূদনের), ১৯ শতকে হিন্দুত্বকে সম্মান না করে পুরাণকে মান্য করার ভ্রান্তি, 'পরিচয়', রাজনারায়ণ, মধুসূদন, শিবের গীতে মিসসার্টিফিকেশন, সত্যেন মজুমদার, দুর্বোধ্যতা, সান্ধ্য ভাষার উদাহরণ, বাউলিয়া দুর্বোধ্যতা, অনামা পাশ্চাত্ত্য কবির বালখিল্যতা, বুদ্ধদেব, সুধীনবাবু, সিরিল কনোলী, রজার ফ্রাই।

২৫। পৃঃ ৪১ মালার্মে অনুবাদ, 'মো জুস্ত'! ঠাকুর বলিয়াছেন কথা ইশারা বটে, pour l' effet ! (মানে কি?), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাগলকে অজ লিখেন, সাবলিম্ড বা প্রতীকমনা, disillusion, 'অথচ ইহারা প্রত্যেকে মহা উচ্চবর্ণের কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ এবং নিশ্চয়ই শ্রী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!' (যদি এটা বিদ্রূপই হয়, তবে বুদ্ধদেবের স্মৃতিকে সম্মান করতে এসে তাঁকে বিদ্রূপ করা কি উপাদেয়?), ডিসইলুউসন, সামন্ততন্ত্র, বঙ্কিমবাবু, বুর্জোওয়া, Byronic!, নেপোলিয়ন (ইংরিজি উদ্ধৃতি), বাইবেলী আত্মা।

২৬। পৃঃ ৪২ আপেল ভক্ষণের পূর্বের আহ্লাদ, সাম্যবাদ, জাতীয়করণ, পিপিলস ওয়ার, মাও, সুবোধ ঘোষ, সুভাষবাবু, জাপানি, বুর্জোওয়া, কমুনিজম, মাস বুর্জোওয়াজী, সিনতোসিস, ডাইলেক্ট, দীনেশবাবুর 'আকাশে চাঁদ হ'ল কাস্তে' (sic), সুধীনবাবু, সোসাল কনটেন্ট, বুদ্ধদেববাবু, আ লা ল্যাম্প পোস্ট, পৈশাচিক সেমেটিক আক্রোশ, ১৯ শতক, সমাজতত্ত্ববিদ, লণ্ডনেতে কোন বাঙালী বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টরের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের বিবৃতি (নাম নেই কেন? ফিল্ম আকাশের একচন্দ্র বলেই কি ধরে নিতে হবে? আরও দুতিনজনের কিন্তু লণ্ডন-গতি হয়েছে!), রাজসিক আখের, নামী হোসে কাজ, প্রাইজ, উচ্চপদ ইত্যাদি 'সবই মিলিল', থেরেটিক পারসেন্ট, উপনিষদ ব্যাখ্যা, বুদ্ধদেব, সুবোধ ঘোষ, তিলাঞ্জলি।

২৭। পৃঃ ৪৩ ইতিহাস, পাশ্চাত্ত্য, বুদ্ধদেব (চিঠি উদ্ধৃতি), স্পেনসরীয় প্রতিক্রিয়াশীলতা, সগুণ, নির্গুণ, জীবতত্ত্ব, বঙ্কিমবাবু, ঈশ্বর গুপ্ত, খাঁটি বাঙ্গালী, বাঙলা, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন পাল, রামপ্রসাদে বাঙালীত্ব ছিল কিনা।

২৮। পৃঃ ৪৪ অজিতবাবু, বুদ্ধদেববাবু, ওস্কার ওয়াইল্ড, mon cher পদটি, বাঙালীর আবেগ, বঙ্কিমবাবু, মহান গিরিশবাবু, তদীয় অর্ধেন্দুবাবু, সাইন অফ দি ক্রস, সুবল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুরেশবাবু, দীনেশ সেন, প্রমথ বিশী, ত্রৈলোক্যবাবু, ভোলতেয়র, সুইফট।

২৯। পৃঃ ৪৫ দিদেরো (প্রমথ বিশী), মধুসূদন, একজন ডক্টরেট লিখিলেন (কোনজন? নাম নেই কেন?), 'শেলীর জার্মাণিত্ব', decor, ঈশ্বর গুপ্ত, কালী সিংহী, কলকাতা, বুদ্ধদেববাবু, আমাদের মা কি বলতেন, বাঙ্গলা দেশ (এখনও

পূর্ব পাকিস্তান), গ্রাম, শহর, উচ্চারণ, পূর্ববঙ্গীয়দের কানে লাগা।

৩০। পৃঃ ৪৬ সুকুমারবাবু, পাশ্চাত্ত্যে কোন ঔপন্যাসিক, কোন কবি, খৃষ্টান ভালবাসা (কার্থলিক ও উইক্লিফ হইতে প্রটেস্টান্ট সংজ্ঞা) এক, আর বাঙালীর মন কেমন আর এক! 'এই এক বিপুল শহরে যাহা ধার্ম্মিক...অগণিত ম্লেচ্ছ ইহার হিন্দুত্ব নষ্ট করিতে পারে নাই', ভক্তশ্রেষ্ঠ নাগমহাশয় বলিয়াছেন এখানে গঙ্গা আছে, গঙ্গার কূলে ভক্তি জন্মায়, চতুরঙ্গিনী 'শ্রীশ্রীঅম্বিকার অধিষ্ঠান, বুদ্ধদেববাবু, মহাপ্রভুর পদরেণু, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, এবং অজস্র মহাপুরুষ, আধা বৈদিক কলকাতা, কেশব সেন, 'এখনও আমাদের ধর্মোন্মাদনা রহে, ভাবাবেগ আছেই, তত্ত্বসূত্রে পৌঁছাইবে।' কবি তারাপদ রায়, অচিন্ত্যবাবু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, idiom।

৩১। পৃঃ ৪৭ রামায়ণ, মহাভারত, ম্লেচ্ছ শব্দ, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা তর্কবাগীশ, সংস্কৃত সাহিত্য, মীমাংসাদর্শন, বৈষ্ণবকাব্য, ভারতচন্দ্র, ১৯ শতাব্দীর ভাষা মধুসূদনে, প্রমথবাবু, বুদ্ধদেব বসু, কম্পারেটিভ লিটরেচার, লাঠি বিস্কুট, মাকাসার ওয়েল, হরির লুঠ হরির নুট, সাঙ্গুভেলী, দান্তে, নিরুপমবাবুর লিস্ট, অচিন্ত্যবাবু, ভবনবাবু, পূর্ববঙ্গীয় টান, সংস্কৃত-বিলাস।

৩২। পৃঃ ৪৮ সন্তোষবাবু, নিরুপম চাটুজ্যে, অরুণ সরকার, বুদ্ধদেববাবুর শনিবারের চিঠি, কাজল কমপ্লেক্স, নরেন দে (ইংরিজি উদ্ধৃতি), অরুণবাবু, মহৎ মণীন্দ্রলাল, কেদারবাবু, নিরুপমা দেবী, রাজশেখরবাবু, নরেশচন্দ্র, কেদার-বাবু (আবার), জগদীশ গুপ্ত, সুধীনবাবু, মানিকবাবু, বনফুল, শৈলজা-বাবু, গোকুলবাবু, দিলীপ রায়, অচিন্ত্যবাবু, তারাশংকর, বিভূতিবাবু, বিরাট তত্ত্ব ডিটারমিনিজম, প্রয়োজন ও মুক্তি, রামেন্দ্রবাবু, ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনবাবু, বুদ্ধদেববাবু, ইতিহাস, বীর হিন্দু, কুলতিলক সভারকর, সুভাষবাবু, ফিরিঙ্গিরা শালারা; মেড়ো আধিপত্য, এনার্কিস্ট, রিট্রেঞ্চ-মেন্ট, স্বর্ণমান হস্তান্তর, সেকুরাবিয়ার।

৩৩। পৃঃ ৪৯ এ্যাট হোম, আনা পাবলভা, শিশিরবাবু, আমেরিকানরা, কেশববাবুর সেন্টেনারী, রবিবাবুর জয়ন্তী, ক্রাইসলার, গালি কুর্চি, ফৈয়জ খান, আব্দুল করিম, অর্ধোদয় যোগ, ভগবান রামকৃষ্ণ সেন্টেনারী, উদয়শঙ্কর, হোয়াইট-ওয়েস সুররিয়ালিজম সজ্জা, অবনীবাবুদের হিন্দুস্থান বিল্ডিংএ স্কুল, ফোক আর্ট, মহৎ গায়ক ভীষ্মদেব, সুরকার হিমাংশু দত্ত, শচীন কর্তা, নজরুলের গজল, কমলা ঝরিয়া, হরিমতী, লর্ড ব্রাবোর্নের মৃত্যু, সেভরলে গাড়ী, ডগ রেস, শীরিষবাবুর ভারতীয় architecture, আর্টের প্রবক্তা রামেন্দ্রসুন্দর, রামানন্দবাবু, ১৯ শতাব্দীর ভূয়াশিবাস্ত্র প্রকৃতি, ঈশ্বর গুপ্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেন, রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয়-বাদী ছিলেন, ভগবান রামকৃষ্ণ, বিপ্লব, সমাজভঙ্গ, 'স্বরাজ', চিকাগো লেকচার, বুদ্ধদেববাবু, প্রগতিশীলতা, কল্লোল, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাস বা মঙ্গলকাব্যে গল্প করার রকম, তার বুনট, কবিকঙ্কণ, ধর্মমঙ্গল, সঞ্জীব-বাবুর এসথেটিক বৃত্তি, বুদ্ধদেববাবু, স্যানিটি অফ আর্টস, পন্ডিচেরী,

* কোথা মা দাসেরে মনে প্রবন্ধে ব্যবহৃত নাম ও তত্ত্ব/ভাবের অসম্পূর্ণ উল্লেখপঞ্জি।

উল্লেখপঞ্জি

১। Roland Barthes : Writing Degree Zero, London, 1967.

২। E. E. Evans-Pritchard : 'Sanza, a Characteristic Feature of Zande', Bulletin of the School of Oriental & African Studies, VIII, London, 1956.

৩। J. L. Fischer : 'Social Influence in the Choice of a Linguistic Variant', Word, 1958.

৪। J. R. Firth : 'The Techniques of Semantics', Transactions of the Philological Society, 1935.

৫। A. Kondratov : Sounds and Signs, 1969.

৬। কমলকুমার মজুমদার : 'রেখো মা দাসেরে মনে', কৃত্তিবাস, প্রথম পর্যায়, শেষ সংখ্যা, ১৯৭৪।

৭। J. B. Pride : The Social Meaning of Language, London, 1971.

৮। দেবেশ রায় : 'কথাসাহিত্যের নতুন সংজ্ঞা', পরিচয়, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪।

৯। G. Steiner : Language and Silence, London, 1967.

১০। মাও সে-তুং : 'ইয়েনান ফোরামে আলোচনা' (১৯৪২), শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে, বাংলা অনুবাদ, এন বি এ সংস্করণ, ১৯৬৮।

পরিশিষ্ট দুই এবং তিন-এর সব উদাহরণগুলিই গৃহীত হল 'রেখো মা দাসেরে মনে' (কৃত্তিবাস, প্রথম পর্যায় —শেষ সংখ্যা, বুদ্ধদেব বসুর স্মরণে) প্রবন্ধ থেকে। কেননা এই আলোচনাটি লেখার সময় পর্যন্ত ওটিই ছিল শ্রীকমলকুমার মজুমদারের শেষতম প্রকাশিত রচনা। কমলকুমার মজুমদারের বিষয়ে লেখিকার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এপ্রিল, ১৯৭৪ সালে।

স মা লো চ না

'Eurocommunism' and the State *by* Santiago Carillo. Translated from the Spanish *by* Nan Green and A. M. Elliot. Lawrence & Wishart, London. £ 2.75

১৯৭৭-এর এপ্রিল মাসে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সান্তিআগো কারিওর 'ইওরোকমিউনিজম অ্যান্ড দি স্টেট' বইটি প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের শেষ দিকে বইটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তার আগেই আমরা ঐ বইটি সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। মস্কো থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নিউ টাইমস' (২৩ জুন ১৯৭৭, নং ২৬) পত্রিকায় (পত্রিকাটি ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ এবং রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) ৩,৫০০ শব্দ-সম্বলিত একটি প্রবন্ধে কারিওকে সোভিয়েত-বিরোধী ন্যাটোর স্বার্থবাহী সংশোধনবাদী ইত্যাদি বিশেষণে চিহ্নিত করে তীব্র সমালোচনা করা হয়। এই সমালোচনার সংক্ষিপ্তসার একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সরবরাহ সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই, সরকারী কমিউনিস্ট আন্দোলনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই বইটি মার্কসবাদ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির জিজ্ঞাসু ছাত্রদের কাছে তীব্র ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে।

ছ'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই বইটির ভূমিকায় কারিও বলছেন যে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি (পি সি ই) নেতৃত্বকে দু ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কোন কোন মহল থেকে বলা হচ্ছে, পি সি ই'র পক্ষে গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন হল নেহাতই একটা কৌশলগত আবরণ, অন্যপক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে যে ইওরোকমিউনিজমের তত্ত্ব সাবেকী সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির সর্বাধুনিক সংস্করণ। তাঁর বইয়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে কারিও বলছেন : প্রয়োজন হল আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় আজকের উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজের সামগ্রিক বিশ্লেষণ... বিশেষত প্রয়োজন হল যে-ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এখন প্রচলিত আছে তার মূল্যায়ন করা এবং গণ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাকে রূপান্তরিত করার প্রশ্নটি বিশেষভাবে বিবেচনা করা . পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-যন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ ও সমাজবাদী সমাজ নির্মাণের বাহন হিসাবে সেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনার প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট কোন মত উপস্থাপিত করতে না পারা পর্যন্ত .. আমাদের বিরুদ্ধে এক হয় কৌশলী পন্থা অবলম্বনের অভিযোগ উত্থাপিত হবে আর না হয় সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে আমাদের গুলিয়ে ফেলা হবে। (পৃঃ ১০)

কারিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন যে পুঁজিবাদী শ্রেণীশাসনের যন্ত্র ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে 'মানবপ্রগতির যন্ত্রে' রূপান্তরিত করার ধারণা বনেদী সংশোধনবাদ এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক সংস্কারবাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রলক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত। সেই কারণে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে চিরায়ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নেতার বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে একদিকে তিনি বনেদী সংশোধনবাদীদের মতের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন যে সংস্কৃতি এবং সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রগতি ঘটায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পরিবর্তন হচ্ছে। অন্যদিকে তাঁর বক্তব্য হল, বর্তমানে রাষ্ট্র-

যন্ত্রকে চূর্ণ না করেও তাকে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর। কারণ, রুশ বিপ্লব, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর-কালে শ্রমিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠা, এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসান ঘটার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকের দুনিয়ার বাস্তব অবস্থা হল, সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে সাম্রাজ্যবাদের যত শক্তিই থাক না কেন, তার ভিত্তিমূলে নাড়া পড়েছে, তার সুস্থিতির অবসান ঘটেছে। তার কারণ, মহান অক্টোবর সমাজবাদী বিপ্লব এবং পরবর্তীকালে সমস্ত ধরনের সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা এবং অসম্পূর্ণতা (যা আমরা গোপন করে রাখিনে এবং গোপন করে রাখার ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহও নেই) সত্ত্বেও ইওরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন অ্যামেরিকায় সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসান। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সুস্থিতির অবসান-প্রক্রিয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যেসব দেশ এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল সেইসব দেশেও পরিবর্তনের জোয়ার দেখা দিয়েছে। (পৃঃ ৮২)

কারিও স্বীকার করেছেন যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর এবং পি সি ই নেতৃত্বের পুরনো ধারণার অনেকাংশে পরিবর্তন ঘটেছে। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন, সোভিয়েত নেতৃত্বও অনেক প্রশ্নে তাঁদের মত পরিবর্তন করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল : লেনিনের উত্তরাধিকারিত্বের দাবিদার স্তালিন লেনিনের বক্তব্য সংশোধন করেছিলেন, এবং সি-পি-এস-ইউ'র নেতৃত্বের অনুমোদন নিয়ে লেনিনের অনেক তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছিলেন। ক্রুশ্চেভ সংশোধন করার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি সঙ্গতভাবেই স্তালিনের কার্যাবলী এবং ভাবধারাকে নিন্দা করে-ছিলেন। পার্টির বিংশতি এবং দ্বাবিংশতি কংগ্রেসের অনুমোদন নিয়েই তিনি এ কাজ করেছিলেন। সি-পি-এস-ইউ'র বর্তমান নেতৃত্ব ক্রুশ্চভের বক্তব্যের সংশোধন করেছেন, তার চেয়ে বড় কথা হল তাঁকে রাজনৈতিকভাবে জীবন্ত অবস্থায় কবরস্থ করেছেন.. এবং তাঁদের কেউ কেউ, যাঁরা আজ স্প্যানিশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং পশ্চিম ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের বিরুদ্ধে সংশোধন-বাদের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, নিজেদের এই সংশোধনকার্যের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে পার পেতে চেয়েছেন। (পৃঃ ১৮)

লেনিনের কোন্ কোন্ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে স্তালিন সংশোধন করেছিলেন, কারিও তা আলোচনা করেননি। স্তালিনের 'একদেশে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয়'-এর তত্ত্ব যে লেনিনের আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এবং স্তালিনীয় তত্ত্ব যে লেনিনীয় তত্ত্ব থেকে স্পষ্টতই বিচ্যুত, একথা তিনি উল্লেখ করেননি। স্প্যানিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নেতা ধরে নিয়েছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং মিত্র শ্রমিক রাষ্ট্রসমূহের শক্তিবৃদ্ধি ধন-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্রমান্বয়িক রূপান্তর সম্ভবপর করে তুলবে। সঙ্গতভাবেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে কারিও-র এই ধারণা স্তালিনীয় তত্ত্বের ক্রমপরিণতি কিনা?

কারিও-র যুক্তিসূত্রে অবধান করলে দেখা যাবে যে তিনি বলতে চেয়েছেন যে আন্তর্জাতিক শক্তি সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন অবস্থা দেখা দেওয়ায় চিরায়ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের রাষ্ট্রসম্পর্কিত তত্ত্ব বদলে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। চিরায়ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করে দেওয়ার যে-কথা বলা হয়েছিল আজকের দিনে তার প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ বর্তমান পৃথিবীতে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দুটি 'বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী' দেখা দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য হল, অতীতে যেসব দেশে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে তা লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সে-সব দেশে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু পারমাণবিক যুগে সে ধরনের কোন সম্ভাবনা আর নেই। তিনি বলছেন : ইওরোপে কোন যুদ্ধ লাগলে তা একই সময়ে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে। বিরোধী শ্রেণীসমূহের ধ্বংস ডেকে আনবে। তার কারণ তার ফলে সমগ্র মানবজাতি এবং এতাবৎ যে

বৈষয়িক এবং সামাজিক প্রগতি সাধিত হয়েছে তা বিলয়প্রাপ্ত হবে...তবে তিনি বিপ্লবে বল-প্রয়োগের সম্ভাবনাকে আদৌ খারিজ না করে দিয়ে বলেছেন :...অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশে যে উন্নত দেশে স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই সে দেশে এবং শাসকশ্রেণী যেখানে জনগণের বিরুদ্ধে পাশবিক একনায়কত্ব চালিয়ে যায় সেখানে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটতে পারে, যদি সে দেশের জনগণ সশস্ত্র সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী একটি অংশের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও যদি সেই দেশে দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ হস্তক্ষেপ করে তবে তার পরিণতি হবে মারাত্মক—এই সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করে দিলেও এটা সুস্পষ্ট যে উন্নত দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের রাস্তা...অন্য ধরনের হতে হবে। (পৃঃ ৫১) সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথ চিহ্নিত করতে গিয়ে কারিও বলছেন, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর সঙ্গে জনগণের সংযোগের মধ্য দিয়ে এই রাস্তা গড়ে উঠবে। তাঁর বক্তব্য, যেসব জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আজ পুঁজিবাদের স্বার্থের পরিপোষকতা করছে সেইসব প্রতিষ্ঠানকে সমাজ-তন্ত্রের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত করতে হবে। (পৃঃ ৫১)

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রশ্নে কারিওর এই ধারণার সঙ্গে সোভিয়েত কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কোন বিরোধ নেই।

কারিওর মতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 'রূপান্তর'-প্রক্রিয়া চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। ফলত সমাজ-বাদী বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত তাঁর রচনায় কোন স্থান পায়নি।

সমাজবাদী বিপ্লবের পরিবর্তে কাঠামোগত সংস্কার কারিও-দের বক্তব্যের মূলকথা। মার্কস-বাদ-লেনিনবাদ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিধারার সঙ্গে পরিচিত সকলেরই জানা থাকার কথা যে কাঠামোগত সংস্কার-এর প্রথম প্রবক্তা ছিলেন ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত নেতা পামিরো তোগলিয়াত্তি। 'কাঠামোগত সংস্কার'-এর মূল বক্তব্য হল : বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থিত হবার সম্ভাবনা আছে, সম্ভাবনা আছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ভেতর থেকে তার প্রকৃতিকে বদলে দেওয়ার। আধুনিক সংশোধনবাদী বলে পরিচিত ক্রুশ্চভ সেখানে পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সমাজবাদী সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের কথা বলেছিলেন। (সি পি এস ইউ'র বিংশতি কংগ্রেসের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য) তোগলিয়াত্তি সেখান থেকে অনেকটা দক্ষিণে সরে এসে 'ভেতরে থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তন'-এর কথা বলছেন।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটেছে ওই বক্তব্যের সপক্ষে বলতে গিয়ে কারিও বলছেন : কেবল সেনাবাহিনী, পুলিস, আদালত, কর আদায়কারী এবং আমলাতন্ত্র বর্তমানে রাষ্ট্রের কাজে নিযুক্ত নয়; রাষ্ট্রের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন হাজার হাজার শিক্ষক, প্রশাসক, টেকনিশিয়ান, সাংবাদিক এবং দৈহিক পরিশ্রমে নিযুক্ত নন এমন বহু কর্মী। এটা ঠিক যে বর্তমানের রাষ্ট্র মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন-কথিত শ্রেণীশাসনের যন্ত্রই থেকে গিয়েছে। কিন্তু আজ তার কাঠামো অনেক বেশি জটিল; পরস্পরবিরোধী শক্তির সমাবেশ ঘটেছে সেই কাঠামোয়, সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে যা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন দেখে যাননি। (পৃঃ ২২)

কারিও দেখাতে চেয়েছেন পৃথিবীজোড়া পুঁজিবাদী সংকটের ফলে 'নয়া পুঁজিবাদ'-এর আমলের সম্প্রসারিত রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার স্বরূপ ধরা পড়ে গিয়েছে। (পৃঃ ২০) পুঁজিবাদের সংকট রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলছেন, ইওরোপের বিভিন্ন দেশে নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে বামপন্থী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। 'একজোটিয়া পুঁজিবিরোধী মৈত্রীর' (পৃঃ ৪০) স্তালিনবাদী স্ট্র্যাটেজিকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করে তিনি

বলছেন : সোস্যালিস্ট ও সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিসমূহের মধ্যে এবং খ্রিশ্চিয়ান আন্দোলনের প্রগতিশীল ও সমাজবাদী অংশের মধ্যে অকৃত্রিম সমাজবাদী চিন্তাধারার বিস্তার ঘটেছে ও তার শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে। এইসব শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ একটি নতুন রাজনৈতিক শক্তি-সমবায় গড়ে তুলতে পারে, যার ফলে একচেটিয়া পুঁজিকে গণসমর্থন থেকে বঞ্চিত করা যাবে। সমাজতন্ত্রের পথে গণতান্ত্রিক অগ্রগতির ভিত্তিভূমি হিসাবে গড়ে উঠবে রাজনৈতিক শক্তিসমূহের এই নতুন সমাবেশ। (পৃঃ ৪১)

১৯৬৮-এর মে মাসে ফ্রান্সে যে ছাত্রবিক্ষোভ সংঘটিত হয়, যাকে অনেকে 'প্রায়-বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন, সে সম্পর্কে উল্লেখ করে কারিও বলেছেন, এই বিক্ষোভের ফলে প্রত্যক্ষত কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি, অন্যান্য কারণের মধ্যে তার জন্য দায়ী ছিল আন্দোলনের কর্মধারা। তাঁর মতে, অপরিণত এবং নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহ এই বিক্ষোভের মাধ্যমে রাষ্ট্র এবং মধ্যশ্রেণীর একটা বিরাট অংশকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তৎসত্ত্বেও ১৯৬৮-এর মে বিক্ষোভ ফ্রান্সে বামপন্থীদের ভবিষ্যৎ বিজয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছিল। (পৃঃ ৫২)

পি সি ই নেতার বক্তব্য, ফ্রান্সের ১৯৬৮-র মে বিক্ষোভ কেবল পপুলার ফ্রন্ট মৈত্রীর নির্বাচনী সাফল্যেরই ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই সহায়তা করেনি, এর প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়েছিল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়নমূলক শক্তির মধ্যেও। ফরাসী সেনাবাহিনীর মধ্যে, কেবল সাধারণ সৈনিকদের মধ্যেই নয় এমনকি উচ্চ মহলেও, এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। কারিও বলছেন: পুলিসবাহিনী তাদের দমনমূলক ভূমিকা পালনে পরাঙ্মুখ ছিল। তিনি এ থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন তা প্রচলিত স্তালিনবাদী সংস্কারবাদী রাজনীতির অনুবর্তী। তিনি বলছেন : পুলিসের কাজ হল সমাজবিরোধী শক্তিসমূহের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা, তাদের কাজ যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা, জনসমষ্টিকে রক্ষা করা ইত্যাদি। (পৃঃ ৫৫) তাঁর মতে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে আমাদের লড়াই চালাতে হবে যাতে জনসংযোগ সম্পর্কে আমরা নতুন সত্তা-ধারণা গড়ে তুলতে পারি। সুবিধাভোগী সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষা নয় সামাজিকভাবে জনসমষ্টিকে রক্ষা করার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই আমাদের এ কাজে ব্রতী হতে হবে। (পৃঃ ৫৬)

সেনাবাহিনীর 'আন্তরিক প্রেরণাজাত দেশপ্রেম' (পৃঃ ৫৭) এবং অফিসার বাহিনীর 'ব্যক্তিগত দায়িত্ব'-এর কাছে আবেদন জানানোর মারফত কারিও সেনাবাহিনীকে 'রূপান্তরিত' করার কথা ভেবেছেন। (পৃঃ ৫৭)

লেনিন 'সর্বহারা বিপ্লব এবং নীতিভ্রষ্ট কাউটস্কি' বইয়ে লিখেছিলেন: ...'যে কথার উপর মার্কস এঙ্গেলস বারে বারে জোর দিয়েছেন, পুরনো সেনাবাহিনী ধ্বংস কর, ভেঙে দাও এবং তার বদলে একটা নতুন বাহিনী প্রতিষ্ঠা কর।' মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-নির্দেশিত বুর্জোয়া সেনাবাহিনীকে চূর্ণ করে দেওয়ার প্রস্তাব কারিও অগ্রাহ্য করেছেন। বিপ্লবী সংকটের সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়া সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি বাতিল করে দিয়েছেন। 'নতুন সমতা-ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ'-এর পথে এবং 'গণতান্ত্রিক অগ্রগতি'-র অভিযানে সামরিক বাহিনীকে শরিক হিসাবে পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। সেই কারণে প্রয়োজন হল সামরিক বাহিনী সম্পর্কে 'পুরনো আমলের সম্পূর্ণ নঞর্থক মনোভঙ্গি' পরিবর্তনের। তাঁর বক্তব্য : সামরিক বাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের একটা সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রয়োজন হল, আধুনিক সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে রূপান্তরিত করে নেওয়া। তিনি বলছেন : আধুনিক ধারণায় অফিসার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নন এবং সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত নন। অফিসার হলেন একজন শিক্ষক যাঁর কাজ হল জনগণকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা

যাতে করে তারা জাতীয় ভূখণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারে। (পৃঃ ৭০) তিনি যদিও বলছেন এই ধারণা বর্তমান রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রেও আমরা যদি ভাবাদর্শগত প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকতর এবং অধিকতরভাবে কাজে লাগাতে পারি তবে আমাদের এই ধারণা ক্রমশই অফিসারদের খুব বড় অংশের সমর্থন লাভ করবে। তার কারণ, এই ধারণা...একটি ঐতিহাসিক প্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। (পৃঃ ৭১) তাঁর মতে, সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা ক্রমেই পরিবর্তিত হচ্ছে। (পৃঃ ৭১) স্প্যানিশ সেনা-বাহিনী এবং সাধারণত পশ্চিম ইওরোপের সেনাবাহিনী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল · সমাজের পরি-বর্তনকামী সমস্ত শক্তিকে প্রকাশ্য সংগ্রামে পরিচালনা করতে হবে এমন এক সেনাবাহিনীর জন্য যে সেনাবাহিনী জাতীয় প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতা রাখে...এই ভিত্তিতে পেশাদার সৈনিক-দের সহানুভূতি অর্জন করা সম্ভবপর হবে। (পৃঃ ৭৩-৪) উদাহরণস্বরূপ তিনি ফরাসী দেশের প্রতিরোধ-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি এবং 'দেশপ্রেমিক অফিসারদের' মৈত্রী ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। কারিও সেনাবাহিনী সম্পর্কে যা বলেছেন এবং যে-যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তাতে অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নেই। স্তালিনবাদী রাজনীতিতে অতীতেও এ ধরনের তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। কিন্তু অনিবার্যভাবেই 'জাতীয় স্বাধীনতা' রক্ষার প্রশ্নে ক্রেমলিন এবং পশ্চিম ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের মধ্যে পরিপ্রেক্ষিতের একটা তফাত আছে।

ক্রেমলিনের পক্ষে সপ্তম দশক (১৯৬১-৭০) পর্যন্ত দ্য গোল-এর সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রেমী অথচ প্রতিক্রিয়াশীল ও শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী দ্য গোল শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ক্রেমলিন-এর এই সম্পর্ক ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ক্রমশই অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিকে, ক্রেমলিনের প্রতি আনুগত্য-শীল হওয়া সত্ত্বেও, এই অবস্থার প্রতিবাদ করতে হয়েছিল। বর্তমানে পশ্চিম ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের পক্ষ থেকে 'দেশপ্রেমিক অফিসারদের' প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করার মূল যুক্তি হল প্রগতিশীল সামাজিক পরিবর্তনের কাজে তাঁদের সহায়তা পাওয়া সম্ভবপর হবে। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক ক্যু-র পরেও চিলির কমিউনিস্ট পার্টি সেনাবাহিনীর মধ্যে 'প্রতিক্রিয়াশীল' ও 'গণতান্ত্রিক' অংশকে পৃথক করে দেখিয়ে 'গণতান্ত্রিক' অংশের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে চূর্ণ না করে 'সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির গণতন্ত্রীকরণ'-এর প্রস্তাব যে ইতিহাস-খণ্ডিত, চিলির ঘটনা তা প্রমাণ করে দিয়েছে। কিন্তু কারিও সে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাননি।

কারিও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 'গণতন্ত্রীকরণ' প্রসঙ্গে বুর্জোয়া পার্লামেন্টের পরিপূরক হিসাবে বিকেন্দ্রীকরণ এবং 'জনগণের ক্ষমতা-সংস্থা' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। 'ইওরোকমিউনিস্ট' স্পেন এবং ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকেই কেবল এই ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়নি, পোর্তু-গালের কট্টর স্তালিনবাদী নেতারাও এ ধরনের কথা বলেছেন।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ না করে তাকে রূপান্তরিত করতে হবে—এই মতের সপক্ষে কারিও বলতে চেয়েছেন যে তিনি যে প্রস্তাব করছেন তা 'প্রচলিত সমাজতন্ত্র'-এর ব্যবহারিক কর্মধারা থেকে স্বতন্ত্র নয়। তিনি বলছেন : রাষ্ট্র সম্পর্কে এই ধারণায় এবং রাষ্ট্রের গণতন্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রামে আগে থেকে ধরেই নেওয়া হয় যে শ্রমিক ও কৃষকের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা পরিত্যক্ত হচ্ছে। বনেদী সমাজতন্ত্রের ধারণা ছিল শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্রে নীচ থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা গড়ে উঠবে, শ্রমিক ও কৃষকরা রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হবে। কারিও-র মতে, এ ধরনের রাষ্ট্রের ধারণা তত্ত্বের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, কোথাও কোনদিন এ ধরনের রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি যেখানে বল-

প্রয়োগের মাধ্যমে বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে সেখানে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থিত থেকেছে এবং নতুন পরিচালকেরা দ্রুতগতিতে পুরনো কায়দা রপ্ত করেছে। (পৃঃ ৭৫-৬)

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে গিয়ে কারিও স্বীকার করছেন যে তাঁর পরিকল্পিত রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যক্তি-পুঁজি ও রাষ্ট্রীয় পুঁজির সহ-অস্তিত্ব বজায় থাকবে। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বলছেন : যেসব সমাজতন্ত্রী দেশ বনেদী কায়দায় বিপ্লব করেছে, সেইসব দেশের বাস্তব অবস্থা লক্ষ করলে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে অধিকাংশ দেশ বেশ কয়েক দশক ধরে নতুন ব্যবস্থার অধীনে কাটিয়েছে। এসব দেশে ক্ষমতা অধিকার করা হয়েছে ঐতিহাসিক অর্থে দ্রুতগতিতে, কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের গতি খুবই শ্লথ। অসাম্য এখনও বর্তমান ..। (পৃঃ ৭৭)

কারিও-র মতে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিত সোভিয়েত নেতৃত্বের একটি ঐতিহাসিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউ-নিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে প্রদত্ত ক্রুশ্চভ-এর রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। (পৃঃ ৮৫) পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে ক্রুশ্চভ ঐ রিপোর্টে 'পার্লামেন্টারী পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা'র কথা উল্লেখ করেছিলেন। কারিও ক্রুশ্চভকে উপস্থাপিত করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে অবরুদ্ধ গণতন্ত্রীকরণ-প্রক্রিয়ার প্রতিভূ হিসাবে। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রই ক্রুশ্চভ-উত্তর আমলে ব্রেজনেভও শান্তিপূর্ণ, পার্লামেন্টারী পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের ক্রুশ্চভীয় নীতিই অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য লক্ষ করলেই এটা ধরা পড়বে। এমনকি স্তালিনের লেখা থেকেও পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বক্তব্য খুঁজে বের করা দুষ্কর নয়। [প্রসঙ্গত বলা চলে, স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য ফারনানদো ক্লদিন একটি প্রবন্ধে (নিউ লেফট্ রিভ্যু, লন্ডন, ৭৪, জুলাই-আগস্ট, ১৯৭২, পৃঃ ৩-৩৪) স্পেনের বিপ্লব সম্পর্কে স্তালিন ও কমিনটার্ন-এর স্ট্র্যাটেজি আলোচনা করতে গিয়ে স্তালিনের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। স্তালিন বলেছিলেন : "এটা খুবই সম্ভবপর যে পার্লামেন্টারী পথ স্পেনে বিপ্লব করার পক্ষে প্রশস্ততর পথ...।"] ক্রেমলিনের বর্তমান নেতৃত্বের প্রতিপক্ষরূপে ক্রুশ্চভকে উপস্থাপিত করে কারিও বলেছেন যে বর্তমান নেতৃত্ব এক ধরনের 'প্রাসাদ বিপ্লব' মারফত তাঁকে নেতৃত্বপদ থেকে অপসারিত করেছেন। খুব সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, ক্রুশ্চভই বা কিভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বা স্তালিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি-শাসিত 'সমাজবাদী' রাষ্ট্রসমূহে নেতৃত্বের পরিবর্তন অন্য কোন্ভাবে ঘটে থাকে?

তাঁর নিজের দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও সংগ্রামী-চেতনাসম্পন্ন শক্তিসমূহের কাছে কারিও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বিপ্লবী রূপান্তরের প্রস্তাব অবাস্তব এবং সেই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কমিউ-নিস্ট পার্টি-শাসিত রাষ্ট্রসমূহের বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। স্তালিনবাদী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের ভিন্নতা প্রমাণ করতে গিয়ে একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু-দলীয় গণতন্ত্রের পক্ষে তিনি রায় দিয়েছেন। তাঁর মতে, এমন একটা রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে যা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

কারিও তাঁর বইয়ের অনেকটা জায়গা জুড়ে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন সাধারণভাবে একটি বিপ্লবী পার্টির পক্ষে পার্লামেন্টারী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সম্ভাবনার কথা কল্পনা করতে পারেননি। তাঁর মতে, বর্তমানে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়

ফলে সে সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য : ...আজকের ইওরোপে সমাজবাদী শক্তিসমূহ সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকার গঠন করতে পারে, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং তারা নিজেদের সমাজের শীর্ষকেন্দ্রে অবস্থিত রাখতে পারে যদি তারা পর্যায়কালীন নির্বাচনের মারফত জনগণের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়। (পৃঃ ৯৬)

কারিও-র এই বক্তব্যকে মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়। ব্রিটিশ লেবার পার্টি বা সুইডিশ সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তো বারে বারে সরকার গঠন করছে, কিন্তু তার ফলে পুঁজিতন্ত্রের, এমনকি একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের, রূপান্তর ঘটেছে? জি ডি এইচ কোল তাঁর 'ওয়ার্ল্ড সোস্যালিজম রিস্টেটেড' পুস্তিকায় সুইডেনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন সোস্যালিস্ট পার্টি দীর্ঘকাল মন্ত্রিত্বের গদিতে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও সেদেশে পুঁজিতন্ত্র নির্বাসিত হয়নি। ইংল্যান্ডের লেবার পার্টির আমলের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ।

বিপ্লবী কমিউনিস্টদের ঐতিহাসিক কর্তব্য আলোচনা করতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে বলেছিলেন : 'শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবে প্রথম ধাপ হল প্রলেতারিয়েতকে শাসকশ্রেণীর পদে উন্নীত করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা।

'বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেওয়ার জন্য, রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসক-শ্রেণীরূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং উৎপাদন-শক্তির মোট সমষ্টিটাকে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে।

'শুরুতে অবশ্যই সম্পত্তির অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদন-পরিস্থিতির উপর স্বৈরাচারী আক্রমণ ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না, সুতরাং তা করতে হবে এমন সব ব্যবস্থা মারফত যা অর্থনীতির দিক থেকে অপর্যাপ্ত ও অযৌক্তিক মনে হবে, কিন্তু যাত্রাপথে এরা নিজ সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং পুরানো সমাজব্যবস্থার উপর আরও আক্রমণ প্রয়োজনীয় করে তুলবে; উৎপাদনপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপ্লবীকরণের উপায় হিসাবে যা অপরিহার্য।' (মস্কো, বাংলা সংস্করণ, ১৯৭০, পৃঃ ৫৫-৬)

বলা বাহুল্য, রাষ্ট্র সম্পর্কে কারিও-র ধারণা মার্কস-এঙ্গেলসের ধারণার বিপরীত মেরুপ্রান্তে অবস্থিত। কারিও-র ধারণা উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে মার্কস এঙ্গেলস নির্দেশিত সম্পত্তির অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদন-পরিস্থিতির উপরে 'স্বৈরাচারী আক্রমণ' ছাড়াই রাষ্ট্রের গণতন্ত্রী-করণ সম্ভবপর।

কারিও তাঁর 'গণতান্ত্রিক' পরিপ্রেক্ষিত বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে 'টোটালিটারিয়ান' সমাজবাদী রাষ্ট্রসমূহের সমালোচনা করেছেন। (পৃঃ ৯৭) তিনি এই প্রসঙ্গে বলছেন : প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদী রাষ্ট্রসমূহে, বিশেষত সেইসব দেশে যেখানে অর্থনৈতিক বিকাশ একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে, সমালোচনার স্থান স্বীকৃত হওয়া উচিত এবং দুঃসহ পদ্ধতি মারফত সমালোচনা স্তব্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। (পৃঃ ৯৮)

এই প্রসঙ্গে বইয়ের উপসংহারে (পৃঃ ১৭২) কারিও বলছেন : উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে সমাজবাদী আন্দোলনের অগ্রগতি সোভিয়েত সমাজকে প্রকৃত শ্রমিক গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে, ও কাজের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের আদর্শের পক্ষে এটা আশীর্বাদস্বরূপ। এর ফলে বুর্জোয়া প্রচারের ভিত্তি ধ্বসে পড়বে। এই কারণে এটা আরও বেশী দুঃখদায়ক যে ১৯৬৮ সালে চেক কমরেডদের তাঁদের প্রয়োগ-পরীক্ষা চালিয়ে যেতে দেওয়া হল না। (পৃঃ ১৭২)

কারিও কেবল 'সমাজবাদী' শিবিরের রাষ্ট্রসমূহের 'গণতন্ত্রীকরণ'-এর পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করেই নিবৃত্ত হননি। পার্টিসমূহের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করে তিনি বলেছেন : 'ইওরো-কমিউনিজম'-এর তত্ত্বে কমিউনিস্ট পার্টিই শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি, এ ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। (পৃঃ ১০০) কারিও পার্টি সম্পর্কে স্তালিনবাদী ধারণাকে ধর্মীয় মতান্ধতার পর্যায়ভুক্ত বলে চিহ্নিত করে বলছেন : সামূহিক রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রের বাইরে প্রত্যেক পার্টিসদস্যের ব্যক্তিজীবনে এবং বুদ্ধিচর্চা ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব পছন্দ থাকতে পারে। তত্ত্ব, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মানবিক বিদ্যার অনুশীলন ইত্যাদি ব্যাপারে পার্টির কর্মীমহলে বিভিন্ন ভাবধারার অস্তিত্বকে আমরা স্বীকার করি; এসব বিষয়ে পার্টির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনে ও পার্টি প্রকাশনায় অবাধ বিতর্কের সুযোগ থাকা উচিত। (পৃঃ ১০১)

স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি যে প্রকৃত অর্থেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা বিবৃত করার পর কারিও বলছেন : আমাদের বন্ধুরা ও যাঁরা আমাদের সৎ প্রতিপক্ষ তাঁরা সকলেই একথা সত্য বলে স্বীকার করবেন যে 'ইওরো-কমিউনিজম্' মস্কোর কৌশলী কোন পন্থা' নয়। অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি কেউ আমাদের বিচার করেন তাহলে তিনি স্বীকার করবেন যে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবে'র ক্ষেত্র প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে বা ইওরোপে সামরিক শক্তিসম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে আমাদের এই স্ট্র্যাটেজি রচিত হয়নি। (পৃঃ ১০১) জোট গঠনের রাজনীতির পরিবর্তে শান্তি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অধিকতর সমতাবাদী গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, সামগ্রিকভাবে ইওরোপের গুরুত্ব বাড়া দরকার বলে কারিও মনে করেন। (পৃঃ ১০৩) কারিও এক্ষেত্রে ধনবাদ-শাসিত ইওরোপ এবং ইওরোপের যেসব দেশে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়েছে তার কোন পার্থক্য করেননি।

সামরিক জোট গঠনের প্রশ্নে কারিও-র মত হল আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবমুক্ত ইওরোপ মহাদেশ-ভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা স্প্যানিশ সেনাবাহিনীর জাতীয় চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করছে। (পৃঃ ১০৯)

বইয়ের শেষ অংশে কারিও বলেছেন, (১) 'ইওরো-কমিউনিস্ট' লাইন পশ্চিম ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের ও সোভিয়েত পার্টি নেতৃত্বের মৌলিক নীতির ক্রম-অনুসৃতি; (২) অতীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পশ্চিম ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের অবিচ্ছেদ্যভাবে অঙ্গীভূত হওয়ার ফলে ও অতিরিক্ত সোভিয়েত হস্তক্ষেপের জন্য এই নীতিসমূহের যথার্থ প্রয়োগ ঘটতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে ফ্রান্স ও স্পেনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১১৩-৪, ১২৪)। ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট গঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে কারিও বলেছেন যে পপুলার ফ্রন্ট সরকার গঠনের ব্যাপারে ফরাসী কমিউনিস্টদের সঙ্গে কমিনটার্নের মতপার্থক্য ছিল।

কারিও আরও বলতে চেয়েছেন যে স্পেনের কমিউনিস্টরা যদি প্রথম থেকেই রিপাবলিকান সরকারে যোগ দিতেন তবে স্পেনের রাজনীতি ভিন্ন দিকে মোড় নিত, প্রতিবিপ্লবী ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানকে পরাস্ত করা সম্ভবপর হত। অনুরূপভাবে, ফরাসীদেশে কমিউনিস্ট পার্টি যদি পপুলার ফ্রন্ট সরকারে থাকতেন তবে স্পেন এবং ইওরোপের ভাগ্য ভিন্নতর হত। অন্যদিকে, কারিও একথা অস্বীকার করেছেন যে গৃহযুদ্ধ শুরু হবার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন আমূল রূপান্তর-প্রক্রিয়াকে আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এইসব তাঁর বিবেচনায় একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট। (পৃঃ ১২৩) এই প্রসঙ্গে তিনি রিপাবলিকান সরকারের প্রধানমন্ত্রী লারগো কাবালেরোকে লিখিত

স্তালিন, মলোতভ এবং ভরোশিলভ-এর চিঠি উধৃত করেছেন। ঐ চিঠিতে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ বুর্জোয়া পার্টিসমূহের সঙ্গে 'গণতান্ত্রিক সহযোগিতার' সুপারিশ করেছিলেন। কারিও বলছেন, এটা সোভিয়েত পার্টির পক্ষে একটা কৌশলগত আবরণ হতে পারে এবং পরবর্তী ঘটনায় থেকে এই সমালোচনা সঠিক বলে বিবেচিতও হতে পারে। কিন্তু স্প্যানিশ কমিউনিস্ট পার্টি এই সুপারিশকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। (পৃঃ ১২৫)

কারিও এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলেছেন : গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে বিপ্লবী অনুভূতির উপর ভিত্তি করে পপুলার ফ্রন্ট আমলে আমরা যে-নীতি নির্ধারণ করেছিলাম তাই বর্তমান নীতির (গণতন্ত্রসহ সমাজতন্ত্র) ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। কারিও-বর্ণিত সমাজতন্ত্রের মূল কথা হল : গণতন্ত্র, বহুদলীয় ব্যবস্থা, পার্লামেন্ট এবং বিরোধী মত ও দলের স্বাধীনতা। (পৃঃ ১২৮)

এ বছরের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে (১৯৩৬-এর গৃহ-যুদ্ধের পর প্রথম পার্টি কংগ্রেস) লেনিনবাদী ঐতিহ্য থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও নিজেদের স্বতন্ত্র-রূপে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে পার্টির 'মার্কসবাদী-লেনিনবাদী' বিশেষণ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং পার্টিকে 'মার্কসবাদী, গণতান্ত্রিক এবং বিপ্লবী' দল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। (জাপানের কমিউনিস্ট পার্টিও পার্টির গঠনতন্ত্র থেকে 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' শব্দ দুটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।) এর সূচনা কারিও-র বইয়ে যেখানে তিনি পার্টির কর্মসূচী থেকে 'প্রলেতারিয়েতের একাধিপত্য' বর্জন করার আহ্বান জানান। যেসব দেশে পুঁজিবাদী মালিকানার অবসান ঘটেছে এবং সাধারণভাবে একদলীয় শাসনের ভিত্তিতে প্রলেতারিয়েতের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেইসব দেশে আমলাতান্ত্রিক বিকৃতি দেখা দিয়েছে, এবং এমনকি অধঃপতনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে' বলে কারিও মন্তব্য করেছেন। (পৃঃ ১৫৫) 'সমাজবাদী' দেশসমূহে যে ধরনের প্রলেতারিয়েতের একাধিপত্য প্রচলিত আছে তার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে হয়েছে যদি তাঁরা পি সি ই নেতৃত্ব প্রলেতারিয়েতের একাধিপত্য সম্পর্কে সাবেকী মার্কসবাদী লেনিনবাদী ধারণায় অবিচল থাকেন তবে গণতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছুনোর যে-কথা তাঁরা বলেছেন তা জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে না। তাঁর মতে, বহু বছর যাবৎ আমরা গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ করে চলছি কিন্তু আমরা ঐ মডেলকে (সোভিয়েত একদলীয় শাসনব্যবস্থার মডেল) সমর্থন করে এসেছি। সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন পর্যন্ত একমাত্র সমাজবাদী দেশ ছিল ততদিন পর্যন্ত তার পক্ষে যুক্তি ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন সারা পৃথিবী জুড়ে শক্তিসাম্যের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তখন আর তা করা চলে না। (পৃঃ ১৫৫)

স্তালিন ও স্তালিনবাদীদের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কারিও তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন স্তালিন আমলে লেনিন-কল্পিত আদর্শ শ্রমিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। তার পরিবর্তে গড়ে উঠেছে সমাজের ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটা বিশাল দৈত্যাকার রাষ্ট্রযন্ত্র। তাঁর মতে, অক্টোবর বিপ্লবের ফলে যে-রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে তা স্পষ্টতই বুর্জোয়া রাষ্ট্র নয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে-রাষ্ট্র এখনও শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠেনি। (পৃঃ ১৭৫) তবে বাহ্যিক আকারগত দিক থেকে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের সঙ্গে সোভিয়েত ব্যবস্থার সাদৃশ্য মেনে নিয়েও তিনি সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার মূলগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন। (পৃঃ ১৫৭)

সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর আমলাতান্ত্রিক বিচ্যুতি সম্পর্কে বিপ্লবী মার্কসবাদী মহল থেকে অতীতেও অনেক সমালোচনা হয়েছে। কারিও স্তালিনবাদী আমলাতান্ত্রিকতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে

নতুন কিছু বলেননি। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক আন্দোলনে হাল আমলে এসব প্রশ্ন উঠছে। তাঁর মতে, বাস্তব পরিস্থিতির সাক্ষাৎকে আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই। (পৃঃ ১৫৯)

অতীতে সরকারী কমিউনিস্ট মহলে এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে ক্রেমলিনের ভাবমূর্তির উপরেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে। কারিও বলতে চেয়েছেন, অতীতের সে ধারণা আজকের দিনে অকেজো হয়ে পড়েছে। পশ্চিম ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের ভবিষ্যৎ এখন এখন আর ক্রেমলিনের মর্যাদার উপর নির্ভরশীল নয়। পশ্চিম ইওরোপের কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের শক্তি ক্রমবর্ধমান এবং তা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে বলে তাঁর ধারণা। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কিসিংগার-এর একটি বক্তৃতা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে তাঁর (কিসিংগার-এর) দুর্ভাবনার বিষয় হল যে পশ্চিম ইওরোপে সমাজব্যবস্থা বদলিয়ে যেতে পারে। কারিও বলছেন, এই স্বীকৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যান্ত্রিক চিন্তায় অভ্যস্ত মতান্ধদের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে স্বাধীন বক্তব্য উপস্থাপিত করার অর্থ হল যে যাঁরা এই ধরনের বক্তব্য পেশ করছেন তাঁরা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বক্তব্যের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু বাস্তবে, মতান্ধতা ও সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট পার্টিসমূহের তুলনায় যেসব কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন, গণতান্ত্রিক নীতির প্রবক্তা সেইসব কমিউনিস্ট পার্টি নিয়েই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের দুশ্চিন্তা বেশী। মতান্ধতা ও সংকীর্ণতা রোগদুষ্ট কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের পক্ষে ধনবাদী পশ্চিমী ভূখণ্ডে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ও থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। (পৃঃ ১৭০)

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা কি সত্যি সত্যিই কারিও-দের রাজনীতিতে সন্ত্রস্ত বোধ করছেন? না পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে এস্টাবলিশমেন্ট-বহির্ভূত তরুণ বিপ্লবীদের দৃঢ় ও সাহসিক অভিযান, শ্রমিক এবং গণ-আন্দোলন কিসিংগারদের দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে?

দুটি জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কারিও তাঁর আলোচনাতে ছেদ টেনেছেন। (১) এই বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে হবে যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভিন্ন প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। (২) পশ্চিম ইওরোপে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহ যদি 'গণতান্ত্রিক রূপান্তর' সাধন করতে পারেন তবে তা পূর্বেও (অর্থাৎ সোভিয়েত শিবিরে) গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সূচনা করবে।

কারিও স্তালিনবাদী রাজনীতির সমালোচনা করলেও চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি থেকে স্তালিনবাদী রাজনীতি যে কাঠামোর মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল তার সীমানা অতিক্রম করে আসতে পারেননি। কিন্তু নির্বাচনের মারফত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'রূপান্তর'-এর প্রতি আনুগত্য জানাতে গিয়ে তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর আমলাতান্ত্রিকতার বিরূপ সমালোচনা করতে হয়েছে। সোভিয়েত নেতৃত্বও কারিও-র ইওরোকমিউনিজম-এর তত্ত্বে বিক্ষুব্ধ। সোভিয়েত নেতৃত্ব কারিও-র বিরুদ্ধে এ কারণে বিক্ষুব্ধ নন যে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী তত্ত্বকে বর্জন করেছেন। সোভিয়েত নেতৃত্বের শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী শিক্ষার সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ সে সম্পর্কে সঙ্গত-ভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন আরও উঠতে পারে যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-এর রাজনীতি বা বুর্জোয়া কাঠামোকে বজায় রেখে 'কাঠামোগত সংস্কার' 'প্রাগ্রসর গণতন্ত্র' 'বহু পার্টি ও গণতন্ত্রভিত্তিক সমাজবাদ' সবই সংশোধনবাদ ও সংস্কারপন্থার এপিঠ-ওপিঠ কিনা। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপর সোভিয়েত নেতৃত্বের অখণ্ড কর্তৃত্ব আগের মত

নেই, থাকা সম্ভবপর নয়—এটাও তাঁরা মেনে নিয়েছেন। (১৯৭৬-এর ২৯ ও ৩০ জুন বার্লিনে অনুষ্ঠিত ইওরোপীয় কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের সম্মেলনে গৃহীত দলিলে প্রত্যেকটি দেশের পার্টিকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দেওয়ার নীতি স্বীকৃত হয়)। উদ্বেগের কারণ অজস্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া এবং অন্যান্য জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে 'ভিন্ন মত'-এর অস্তিত্ব এবং ইওরোকমিউনিজম-এর বক্তব্যের মধ্যে একটি পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেই কারণেই ব্রেজনেভ, সুসলভ, পোনোমারেভ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন[২]

ইওরোকমিউনিজম্-এর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কাছে সংশোধনবাদের সর্বাধুনিক সংস্করণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু সংকীর্ণ স্বার্থে অভীষ্ট হলেও কারিও স্তালিনবাদী রাজনীতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে যেসব বিকৃতির প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার গুরুত্ব সমাজরূপান্তরে বিশ্বাসী কর্মী ও মুক্তবুদ্ধি মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের কাছে নেহাত অকিঞ্চিৎকর নয়।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

যামিনী রায় : তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক। বিষ্ণু দে। আশা প্রকাশনী। কলকাতা। মূল্য পনেরো টাকা।

চতুর্থ দশকে শুরু হয়ে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শিল্পী প্রতিভাধর যামিনী রায়ের সঙ্গে নানা জনের নানা পর্যায়ে পরিচয় এবং সান্নিধ্য ঘটেছে। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন স্বীয় ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কর্মক্ষেত্র তাঁদের যাই হোক না কেন, এঁরা তার পরিধি অতিক্রম করেছিলেন। বাংলার সেই সারস্বত চর্চার দিনে যামিনী রায়-আবিষ্কার নানাদিক থেকেই অর্থবহ। যামিনী রায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের দ্বার যাঁদের কাছে অবারিত ছিল তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম মনে আসে বিষ্ণু দে-র। যামিনী রায় : তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক, বাস্তবিক পক্ষে অনুজের কর্তব্য পালনস্বরূপ। এখনকার যুগে অনেকেই হয়ত জানেন না, বিষ্ণু দে ও যামিনী রায়ের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এবং তিনি এই মহান শিল্পীকে যামিনীদাদা বলেই সম্বোধন করতেন। শুধু তাই নয়, পরিবারগতভাবেও ছিলেন তাঁরা অত্যন্ত কাছাকাছি।

গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে যামিনী রায়ের কথা, যামিনী রায় ও শিল্পবিচার, বিদেশীর চোখে যামিনী রায় ও তাঁর ছবি, এবং পটুয়া শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবং এই পরিচ্ছেদগুলি সযত্নে পাঠ করলেই মোটামুটিভাবে বোঝা যাবে যামিনী রায়ের চিত্রচিন্তা।

যামিনীবাবু 'ইউরোপীয় মার্গে অসাধারণ নৈপুণ্যে' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পোর্ট্রেট আঁকেন, এবং তার জন্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করেন। এমনকি আচার্য যদুনাথ সরকার ও যোগেশচন্দ্র রায়মহাশয়ও তখনকার সেই নবীন শিল্পীকে দিয়ে পোর্ট্রেট করিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কালে শিল্পচেতনার দিকপরিবর্তন প্রত্যয়ের ফল। এবং রবীন্দ্রনাথের 'তপোবন' প্রবন্ধ পাঠ করে যামিনী রায় তাঁর আপন এই প্রত্যয়ে স্থিত হলেন। প্রবাসীতে প্রকাশিত 'তপোবন' প্রবন্ধ পাঠের সময় তিনি প্রবন্ধের পাশে ও নিচে নানা মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্যেই তখনকার কালে তাঁর চিত্রসাধনার সংকটের সন্ধান পাওয়া যায়।

তাঁর মন্তব্য : 'আমার মনের কথা আজ লিখায় পড়লাম। ঠিক আট মাস পূর্বে এই কথা

উপলব্ধি হয়েছে।' ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'একথা মনে রাখতে হবে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ-অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ।...ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না; তা হলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মান বোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না.. ।' এই বোধই তাঁকে ইউরোপীয় চিত্ররীতি থেকে ভিন্ন পরীক্ষায় ব্যাপৃত করল। তার প্রথম পরীক্ষান্তরে তাই আরম্ভ হল ভিন্ন রীতির আভাস। রেখার স্পষ্টতা এবং রঙের স্বল্পসমতা।

তারপর অতিবাহিত হল অনেক কাল। যামিনী রায় আঙ্গিক ও অনুকরণে হয়ে উঠলেন সিদ্ধহস্ত। যা তিনি চোখে দেখছেন, তাই তিনি আঁকছেন। সে-ছিল এক অবিকল সততার স্তর। আর বোধ হয় এই শিল্পসততাই তাঁকে নতুন উপলব্ধিতে দীক্ষিত করল। তখন তিনি 'আঁকতে চাইলেন তাঁর রঙের ইতিহাস, চাইলেন তাঁর দেশের লোককে রূপ দিতে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে কোনো আত্মত্যাগই তাঁর কাছে তিক্ত লাগেনি। কোনো বিপদের ভয়ই তাঁকে নিবৃত্ত করেনি। শিল্পের উপায় উপকরণ? ইউরোপীয় দীক্ষায় দীক্ষিত পশ্চিমা উপকরণে অভ্যস্ত যামিনী রায় এইসব সুবিধা বিসর্জন দিলেন। তাঁর বর্ণফলক তিনি পরিমিত করলেন সাতটি রঙে। এবং এই রঙ তিনি প্রস্তুত করেন স্থানীয় মাটি-রঙ চূর্ণ করে তেঁতুল আঠায় বা ডিমের শাদায় মিশিয়ে। ধূসর তিনি আনেন নদীর পলিমাটি থেকে, সিঁদুর রঙ পান মেয়েদের পূণ্যাচারের সিঁদুর থেকে, নীল তো চাষের নীল, আর শাদা হচ্ছে সাধারণ খড়ির রঙ। এবং কালো তিনি মেশান সুলভ ভুষো থেকে। সর্বোপরি, জমি তৈরির জন্য তিনি গোবরের সদ্ব্যবহার করেন, দেশের প্রাচীন পুরুষদের মতোই শুধু কার্যকারণের পূর্ণজ্ঞানে।' ('ল্‌'আর' পত্রিকায় এরডে মাসন্‌-এর লেখা থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৫২)

যামিনী রায়ের বোধ এবার পূর্ণতা পেল। মাধ্যম হল সহজলভ্য। শুরু হল তাঁর পরীক্ষা ও উত্তরণের পালা। কে জানে তাঁর এই অগ্রগমনের কালে পরোক্ষে তাঁর পিতার কথা কাজ করেছিল কিনা। তিনি বলতেন : ভারতের মানুষের 'এক হাতে থাকবে বই, আর অন্য হাতে লাঙল।' যামিনী রায় তাই সহজেই তাঁর চিত্রের বিষয় খুঁজে পেলেন। চিত্রের দুটো দিক, 'বলবার কথা আর বলবার ভাষা প্রসঙ্গ ও আঙ্গিক' এই দুয়েরই প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য তিনি অচিরে অর্জন করলেন।

যামিনী রায়ের চিত্র, তাঁর চিত্ররচনার দর্শন, তাঁর শিল্পীজীবনের অব্যাহত ধারাবাহিকতা - এ সবেরই সন্ধান পাওয়া যায় বিষ্ণু দে-র আলোচ্য গ্রন্থে। তিনি যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করে, বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত নানা মতামতের একত্র সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন এই গ্রন্থে। এমনকি, দুই ভিন্ন প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা দুই শিল্পী যামিনী রায় ও মাতিস-এর চিত্রগুণ নিয়ে কিছু আলোচনা আছে। অনেকেরই মতে মাতিসের সঙ্গে যামিনী রায়ের মিল দৃষ্টিগ্রাহ্য শুধুই নয়। এই মিল গভীরেও। এই গ্রন্থে এই বিষয়েও কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। নানা শিল্পী এবং রবীন্দ্র-নাথের চিত্রকলা নিয়ে যামিনী রায়ের মতামত, পটুয়াশিল্প সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ইত্যাদি এই গ্রন্থের মূল্যবান সংযোজন।

যামিনী রায় ও শিল্পবিচার প্রসঙ্গে অশোক মিত্রের দীর্ঘ আলোচনার উপর বিষ্ণু দে-র বক্তব্য এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধ সকলেরই মনোযোগের বিষয়। কারণ আলোচনা উপলক্ষে শিল্পী ও তাঁর শিল্পচর্চার ক্ষেত্রের নানা দিক এতে উদ্ঘাটিত হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, বিষ্ণুবাবুর বিশ্লেষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক। তাঁর বক্তব্যে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, চিত্র দৃষ্ট বস্তু-নিচয়ের প্রতিভাস নয়। রঙে, রেখায় তার যে 'মূড' তৈরি হয়, যাকে তিনি বলেছেন 'আনন্দ' তা দৃষ্টবস্তুর গভীর উপলব্ধির মধ্যেই সম্ভব। বস্তুতে রঙের হেরফের থাকে, রেখার স্থূলে ও সূক্ষ্মে

টানের ব্যতিক্রম দেখা যায় কিন্তু রচিত চিত্রে যখন দেখা যায় রঙের সমমাত্রিক প্রয়োগ অথবা রেখায় একই টান, তখন তার তাৎপর্য শিল্পীমনেরই অনুভূতির বিষয়।

এই গ্রন্থের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ বিষ্ণু দে-কে লেখা যামিনী রায়ের পত্রাবলী। এগুলি তাঁর ঘরোয়া জীবনের স্বাক্ষর। এই চিঠিগুলির সাল ১৯৪২ থেকে প্রায় ১৯৭০ পর্যন্ত। নানা সময়ে নানা উপলক্ষে লেখা। কখনো বা তা নেহাতই কুশলবিনিময়। শুধু একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি বড়ো বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ১৯৪২ এবং তার পরবর্তী সময়ে তাঁর বেলিয়াঘাটায় অবস্থানকালে ভারতের সেই বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ঘটনার দিনগুলি তাঁর মনকে কতোখানি স্পর্শ করেছিল, অথবা আদৌ করেছিল কিনা, তার কোনো পরিচয় এই পত্রগুচ্ছ থেকে পাওয়া যায় না।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি। সম্পাদনা : নারায়ণ চৌধুরী। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৭০০ ০৭৩। মূল্য দশ টাকা।

অপসংস্কৃতি শব্দটি হালের। অভিধানে শব্দটি এখনো ঠাঁই না পেলেও, বাংলাদেশের রাজনীতিক সাংস্কৃতিক জগতে শব্দটি ইদানীং হামেশাই বহুল ব্যবহৃত ও স্বীকৃত। অপসংস্কৃতি সম্বন্ধে গত দশ বছরে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু আলোচনা, বক্তৃতা হয়েছে, পোস্টারও দেখা গেছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে সমস্যাটি নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়নি। সঙ্গতভাবেই প্রাবন্ধিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত ষোলজন চিন্তাশীল লেখকের ষোলটি প্রবন্ধের এই সংকলনকে এই বিষয়ের উপর প্রথম গ্রন্থের সম্মান দেওয়া যেতে পারে। যদিও, ইতিপূর্বে শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য তাঁর 'পরিপ্রশ্ন' গ্রন্থে ১৬৩ পৃষ্ঠা ধরে 'কালচার ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে অপসংস্কৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। এর আগে সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রীগোপাল হালদার লিখেছেন দুটি বই 'সংস্কৃতির রূপান্তর' ও 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ'। এ-ছাড়াও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার, বিমলচন্দ্র সিংহ, নীহাররঞ্জন রায়, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ চিন্তাশীল লেখকদের রচনাও আছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে সংস্কৃতির বিকৃতি সম্পর্কে পিনবদ্ধ আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি।

ষোলটি প্রবন্ধে, সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও তার তাৎপর্য, অপসংস্কৃতির স্বরূপ এবং অবলম্বন, সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে, যাত্রায়, নাটকে, গানে অপসংস্কৃতি, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রসঙ্গে লেখা ছাড়াও, শিল্পসাহিত্য প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য এবং শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বক্তব্য—এই দুটি প্রবন্ধও আছে। লেখক তালিকায় আছেন সর্বশ্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, নেপাল মজুমদার, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, সরোজমোহন মিত্র ও আরো অনেকে।

পুস্তক-পরিচয়ের সীমাবদ্ধ পরিসরে সমস্ত লেখার বক্তব্যের চুম্বক দেওয়া বা আলোচনা করা অসম্ভব। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুরুত্বের জন্য, এই ধরনের প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়ে, দু-একটি মৌলিক প্রসঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন বোধ করছি।

শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে সঠিকভাবেই বলেছেন 'সংস্কৃতি কাকে বলে? এ প্রশ্ন নিয়ে বহু মানুষ তর্কবিতর্ক করে তখনই যখন সমাজজীবনে দুটো দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনতিক্রম্য পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।...বিতর্কটা শব্দার্থ বা ন্যায় যুক্তি নিয়ে নয়, বিতর্কটা আসলে সমাজজীবন নিয়ে,

জীবনাদর্শ নিয়ে।' (পৃঃ ১০) শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'সংস্কৃতির জগতে আমরা একটি বিতর্কের সম্মুখীন—এই সমাজ যেহেতু শ্রেণীসমাজ এই বিতর্কও অবধারিত।...কোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানসজগতে কোন ফসলই শ্রেণীর ঊর্ধ্বে নয়, সংস্কৃতিতে তো নয়ই। (পৃঃ ৮৭) শ্রীকনক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী শিল্পসংস্কৃতিরও কোন শাশ্বত নন্দনমূল্য নেই।...সমাজের 'প্রভুরা' শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রভুত্ব করতে থাকে।' (পৃঃ ১২৫) আলোচ্য সংকলন গ্রন্থের প্রায় সব প্রবন্ধ থেকেই এজাতীয় বক্তব্য উদ্ধৃত করা সম্ভব। এই বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে কেন? বক্তব্যটা কী ভুল? আমাদের মতে বরং এইটাই সঠিক বিশ্লেষণ। মার্কস যখন বলেন, চেতনা (mind) জীবনের নিয়ন্তা নয়, জীবনই চেতনার নিয়ন্তা, (মনে পড়ে সময় সেনের দুটি পংক্তি : জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে/চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়।) তার অর্থ হচ্ছে, যে কোন সমাজের উৎপাদনের সম্পর্কের সমষ্টিকে বলা হয় ভিত্তি (structure)। আর এই ভিত্তিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে যেসব ধারণা এবং সেইসব ধারণাকে রূপ দিতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, তাকেই বলা হয় উপরি-কাঠামো (super-structure)। ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, দর্শন, আইন, রাজনীতি, শিল্পকলা এ সবই হচ্ছে উপরি-কাঠামোর ফসল। সম্পাদক এবং এই সংকলনের লেখকরা এ-তত্ত্ব জানেন এবং বলেছেনও (দ্রঃ পৃঃ খ, ৭১, ৮৭, ৯৭, ১০৯, ১২৫ ও অন্যত্র।)

এবার আমাদের জিজ্ঞাসা, সংস্কৃতির বিকৃতিই যদি অপসংস্কৃতি হয়, সংস্কৃতির অনাচারই যদি অপসংস্কৃতি হয় বা 'সংকট-জর্জর পচে-যাওয়া মরণোন্মুখ সমাজ ব্যবস্থার বমন, একটা গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ' যদি অপসংস্কৃতি হয় (দ্রঃ পৃঃ গ, ১৫, ৬৭, ৭৮ ও অন্যত্র) তবে কোন্ সংস্কৃতির বিকার, কোন সমাজ-ব্যবস্থার বমন এই অপসংস্কৃতির? সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ছাড়া আর সর্বত্রই মোটামুটি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-ঔপনিবেশিক-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামো বজায় আছে। আর মার্কসীয় সূত্র অনুসারে 'প্রত্যেক যুগের প্রধান ধ্যান-ধারণাই হল সেই যুগের শাসকশ্রেণীর ধ্যান-ধারণা।' সংস্কৃতিও শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতি। ধনতন্ত্রের পতনের যুগে, তার সংস্কৃতিও বিকাশের দিকে এগোতে পারে না, বরং চলে অবক্ষয়ের পথে। কডওয়েলের ভাষায় শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতি হল Dying Culture যেটা উৎপল দত্ত তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছেন (দ্রঃ পৃঃ ৭৮)। বার্নার্ড শকে কেউ-ই অপসংস্কৃতির ধ্বজাধারী বলবেন না। কিন্তু লেনিন শ' সম্বন্ধে বলেছিলেন 'A good man fallen among Fabians.' কডওয়েল বলেছেন, 'Shaw is an ex-anarchist, a vegetarian, a Fabian, and, of late years, a Social Facist. .Shaw is helplessly imprisoned in the categories of bourgeois' thought.' (Studies in a Dying Culture, p.pl, 17)

ধনতন্ত্রের বিকাশের যুগে তার যে সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছিল—সেটাও ছিল ধনতন্ত্রের জন্যই, তা সত্ত্বেও তার মধ্যে যেসব ভাবধারা, শিল্পকৃতি—মানুষের সংগ্রামের পরিপন্থী নয়—সেগুলোও ছিল এবং স্বাভাবিক নিয়মেই থাকতে বাধ্য। কিন্তু অবক্ষয়ের যুগে সংস্কৃতিকেও করা হল পণ্য—তাই দেখা দিল Vulgarisation, Commercialisation। এটাও পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অনিবার্য ফল।

সুতরাং অপসংস্কৃতিকে কেবলমাত্র সংস্কৃতির বিকার বা বিচ্যুতি বলে বোঝাবার চেষ্টা করার ফলে, সম্পাদক ও লেখকেরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সমগ্র বুর্জোয়া সংস্কৃতি সম্পর্কে অস্পষ্টতা তৈরি করেছেন। সৈয়দ শাহেদুল্লাহর উজ্জ্বল প্রবন্ধ 'প্রতিক্রিয়ার অবলম্বন' থেকে ধার করে বলি, তোমার সংস্কৃতি, তোমার শ্রেণীসংস্কৃতি, তার সঙ্গে আমি একমত নই, কিন্তু তোমার সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটাবার চেষ্টা হলে, আমি তোমার জন্য সংগ্রাম করব—এই রকম একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় বক্তব্য, এই সংকলনে রুচি তৈরি করার ক্ষেত্রে, যা আবার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে প্রভাবান্বিত করে, পৃষ্ঠপোষকতা করে—যে যে হাতিয়ার প্রধান, যেমন চলচ্চিত্র, রেডিও, সংবাদপত্র, রেকর্ড-গ্রামোফোন-মাইক, টি ভি—তার মধ্যে সংবাদপত্র ও রেডিও সম্পর্কে কোন আলোচনা আনা হয়নি।

তৃতীয় বক্তব্য, উৎপলবাবু ও জ্যোতিবাবুর প্রবন্ধ ভিন্ন আর অধিকাংশ লেখাতেই যৌনতা, নগ্নতা ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ আসেনি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ডি এচ লরেন্সের উক্তি : 'Anybody who calls my novel (Lady Chatterley's Lover) a dirty sexual novel, is a liar. It's not even a sexual novel : it's phallic. Sex is a thing that exists in the head, its reactions are cerebral, and its processes mental. Whereas the phallic, reality is warm and spontaneous—. এ প্রসঙ্গে উৎপল দত্তর বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত (দ্রঃ পৃঃ ৮০, ৮১) জ্যোতি ভট্টাচার্যের বক্তব্যও সমর্থনযোগ্য। (দ্রঃ পৃঃ ২২)।

চতুর্থ বক্তব্য সম্পাদক লিখেছেন, 'অপসংস্কৃতি আর কিছু নয়, ধনতন্ত্রের ঔরসে স্বৈরিণী বুর্জোয়া বিলাসিনীর গর্ভের এক অপজাত সন্তান। অবৈধ তার জন্মেতিহাস, অবৈধ তার ক্রিয়াকলাপ।' (দ্রঃ পৃঃ ৬) এই গ্রন্থের একটি বিশেষ সুচিন্তিত ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ 'অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাংলা নাটক -যুগে যুগে'র লেখক শ্রীহীরেন ভট্টাচার্য লিখছেন, 'ইতিহাস খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে—অপসংস্কৃতির প্রশ্নটা আজকের নতুন নয়।' (পৃঃ ১৩৯) অন্যত্র শ্রীকুদিরাম দাস লিখছেন 'সামন্ততন্ত্রের যুগে যেমন স্থূল রুচির প্রকাশে কবি-শিল্পীরা উৎসাহিত হয়েছেন...' (পৃঃ ৬০) উদাহরণ বৃদ্ধি করে লাভ নেই। মার্কসীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সমাজের ভিত্তি (structure)-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উপরি-কাঠামোর সম্পর্ক হচ্ছে 'react upon one another'। যখন পুরনো অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙতে থাকে, তখন উপরি-কাঠামোতেও (সঙ্গে সঙ্গেই নয়, কারণ উপরি-কাঠামোর পরিবর্তন মন্থর) পচন ধরে। সুতরাং সর্বকালেই ঐতিহাসিক নিয়মেই বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতির মধ্যে তথাকথিত 'অপসংস্কৃতি'র প্রাদুর্ভাব ঘটে।

এই গ্রন্থে সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, জ্যোতি ভট্টাচার্য, হীরেন ভট্টাচার্য, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত-র প্রবন্ধ খুবই মূল্যবান। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের প্রথম অংশ সুলিখিত, কিন্তু তারপরেই হারিয়ে গেছে বক্তব্যের খেই। মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'অপসংস্কৃতি : অবক্ষয়ের বেনোজল' প্রবন্ধে ১১১ পাতায় সোভিয়েত রাশিয়ার ফিল্ম সম্পর্কে যে-বক্তব্য রেখেছেন, সেক্ষেত্রে ভিত্তি ও উপরি-কাঠামোর ব্যাখ্যা দেননি। সমাজতান্ত্রিক দেশে কেন এসব হচ্ছে? অবশ্য উৎপলবাবুও পাশ কাটিয়ে গেছেন একই প্রশ্নে। (দ্রঃ পৃঃ ৮৫)।

মনোরঞ্জনবাবুর প্রবন্ধে অসতর্ক কিছু তথ্যের উল্লেখ পাঠককে বিভ্রান্ত করবে। ১১২ পাতায় ১৮৪৩ সালের ফ্রান্সের বুর্জোয়া বিপ্লব প্রসঙ্গে বোদলেয়ার, ভের্লেন ও জোলার নাম করেছেন। বোদলেয়ার এই পর্বে তাঁর স্বভাবমাফিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এই একবারই। কিন্তু জোলা বা ভের্লেন তখন কোথায়? জোলার জন্মসাল ১৮৪০, ভের্লেনের জন্মসাল ১৮৪৪! একই পৃষ্ঠায় আবেগের জোয়ারে ভেসে মনোরঞ্জনবাবু লিখেছেন, ১৮৭১ সালের পারি কমিউন পর্বে র‍্যাবো, গদ্যা কমিউনের পরাজয়ে তলিয়ে গিয়েছেন। 'অথচ এই পর্বেই আমরা স্তেফান জাইগ, আঁরি বারবুস, পল রবসন, ওরলাকে পেয়েছি'; ১৮৭১-এর কমিউন পর্বে মনোরঞ্জনবাবু এঁদের পেলেন কী করে? সম্পাদকের কাছে প্রশ্ন, ডস্টয়েভস্কী 'পচা-গলা অপসাহিত্যের ইন্ধন জুগিয়েছেন' (দ্রঃ পৃঃ ১১৩) তিনি কী এই মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন?

এই গ্রন্থের ষোলটি প্রবন্ধ যেভাবে বিন্যাসিত হয়েছে, তা থেকে সম্পাদনাকর্মে যে-গৃহিণী-

পনার প্রয়োজনীয়তা থাকে, তার অভাব লক্ষ করা যায়। শিথিল অর্থে যেভাবে খুশি প্রবন্ধগুলির বিন্যাস দোষণীয় নয়। কিন্তু আমাদের ধারণায়, সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য, অপসংস্কৃতির স্বরূপ, অপসংস্কৃতির উৎস ও অবলম্বনের পর লেনিনের বক্তব্য বিষয়ক প্রবন্ধ। তারপর প্রথমে চলচ্চিত্রে, যাত্রায়, নাটকে, গানে এবং সাহিত্যে অপসংস্কৃতি প্রসঙ্গ থাকা উচিত ছিল। এরপরে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিষয়ক প্রবন্ধগুলির পরে পরিশিষ্টে নেপালবাবুর প্রবন্ধটি দিলে ভালো হত। আগেই উল্লেখ করেছি সংবাদপত্রসহ যাকে আমরা মাসমিডিয়া বলি সেগুলির ভূমিকা সম্পর্কে পৃথক প্রবন্ধ এবং মূল্যবোধের প্রসঙ্গেও একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ থাকলে বইটির মূল্য আরো বৃদ্ধি পেত। শ্লীলতা-অশ্লীলতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ছাড়াও, সমকালীন লেখকদের বক্তব্যের উপস্থাপনার প্রয়োজন ছিল।

সবশেষে নির্দ্বিধায় বলব, অনেকদিন বাদে, এমন একটি বাংলা বই পড়লাম, যা নিছক কেতাবী চর্চার পরিচায়ক নয়, বরং সমাজসচেতন লেখকদের দায়িত্ববোধ থেকে প্ররোচিত এই লেখাগুলি পড়তে পড়তে প্রশ্ন জাগে, তর্ক তৈরি করে। আর প্রকাশক তো তাঁর নিবেদনে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, বইটি নিয়ে 'একটা আলোচনার আলোড়ন উঠুক, পক্ষে বিপক্ষে সকল দিক নিয়ে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-বিচারণা চলুক।' এই ভরসাতেই কিছু প্রশ্ন, কিছু আপত্তি জানালাম, সঙ্গে সঙ্গে আশা করবো, সত্যিই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে প্রবল তর্ক উঠুক, কারণ তর্কের মধ্য দিয়েই সচেতন করা যাবে ব্যাপক জনগণকে।

সুবীর ভট্টাচার্য

নতজানু—চিত্ত সিংহ। সৃজনী, কলকাতা-৪। মূল্য সাত টাকা।

দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি এবং ইতিহাস কোন্ পর্যায়ে পৌঁছলে লেখকরা আরো জোরে ক্রমান্বয়ে আরো জোরে চাবুক চালিয়ে আদিম রিপু খেপিয়ে তোলেন, অন্তত আরো আরো মালমশলার মিশেল দেন, আমরা জানি। পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে দেখছি বলে অনেকেই জেনে গিয়েছি। এই স্রোতে গা ভাসাতে রাজী নন, কেবল রগরগে ব্যাপার-স্যাপারে রুচি নেই এমন লেখক আছেন। এমন দু-চারজন আছেন, চিরকাল থাকেন, একা-একা, নির্জনে। তাঁদের খ্যাতি নেই, এমনকি পরিচিতিও না, কারণ সর্বগ্রাসী প্রচারযন্ত্র স্রেফ বাণিজ্যিক স্বার্থের তাগিদে সতর্ক হাতে তাঁদের দিকে কপাট বন্ধ করে রাখেন। তথাপি তাঁরা আছেন। অবশ্য এই মুহূর্তে কানে-তালা-লাগানো ঢাকের বাদ্যি তাঁদের জন্য নয় বলে তাঁদের সব প্রচেষ্টা সব সৃষ্টি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বড়ই ম্রিয়মাণ। আবহাওয়া বদলালে, এবং যেহেতু বদলাতে বাধ্য, কী হতে পারে সে কথা এখন নিঃসন্দেহে বাতুলতা। ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে রাখাই শোভন। ছুরি বেঁধালে যাদের লাগে তাঁরা জানেন, উঁচু মাচা থেকে করুণার হাসি যখন তখন বেমালুম উৎসারিত হয়।

ইদানীং যে-কজন লেখক একা-একা, চিত্ত সিংহ তাঁদের অন্যতম। তবে তাঁর কিছু সুবিধে আছে। তিনি একাই একটি প্রতিষ্ঠান। একদা তিনি স্রোতে ভেসেছিলেন। চমৎকার সাঁতার কাটছিলেন। থামলেন। সম্ভবত ভাবলেন। বেশ কয়েক বছরের নীরবতার পর আবার সাঁতার শুরু। উজানে। জতুগৃহ লিখেছেন, ঈশ্বর পাটনী, বেহুলা। সম্প্রতি হাতে এসেছে তাঁর নতুন উপন্যাস নতজানু। নির্দ্বিধায় অন্তত একটি কথা বলা যায়—বইটি লেখা একান্ত দরকার ছিল। নিবেদনকে

বাংলা গল্প-উপন্যাসের ইতিহাসের খাতিরে।

নতজানু উপন্যাসটি দুটি ভাগে বিন্যস্ত, আদিপর্ব ও অন্ত্যপর্ব। অনেক বিত্তবানের আকস্মিক মৃত্যুর পর তার একুশ বছরের ছেলেকে নিয়ে কাহিনীবয়ন। এই কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম অমৃত, প্রতীকী, বলা বাহুল্য। নামটি পাওয়া যায় মাত্র একবার, উপন্যাসের শেষ বাক্যটির অন্তিমে। কিন্তু নামটির ব্যঞ্জনা বইটির পাতায় পাতায়। বলা যায়, প্রথম পর্বে আলোকপাত মূলত তার জৈবিক এবং দ্বিতীয় পর্বে তার আত্মিক অস্তিত্বে।

প্রথম আর দ্বিতীয় পর্বের লেখার ভঙ্গিতে চরিত্রগত অমিল, সম্ভবত ইচ্ছাকৃত। শুরুতে আত্মজীবনাশ্রয়ী উপন্যাসের সরল ধাবমানতা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় পর্বে সেই স্বচ্ছন্দবিহার ব্যাহত। যেমন ঈশ্বর পাটনী এবং বেহুলায়, এই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে লেখক তেমন রূপকাশ্রয়ী, কখনো বা প্রতীকী। দ্বিতীয় পর্বের আঙ্গিকগত কূটকৌশলে প্রথম পর্বের স্বচ্ছন্দগতি হারিয়ে যায়। কাহিনী জট পাকায়, জট ছাড়ায়, আবার জট পাকায়। এমনকি অতীত উদ্ঘাটনের নাটুকে চমকের ফাঁদেও লেখক পা বাড়ান। সামলে নিতে অসরল মোচড় দিতে হয়।

একালের খ্যাতিমান লেখকদেরও কোনো কোনো উপন্যাস পড়তে বসে মনে হয়, লেখকের চোখে চালশে, সাংবাদিকের চোখ পরিষ্কার, তাই লেখক কোনো সাংবাদিকের হাত ধরে রাস্তা পার হতে চাইছেন। কড়া রোদ্দুরের দুপুরেও এই ব্যাপার। নতজানু-র লেখক কোনো সাংবাদিকের হাত আঁকড়ে ধরেননি, লেখক হিসেবে একাই রাস্তা পার হতে চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কোনো চারচক্র যানের তলায় পিষে যাবেন, নাকি রাস্তার ওপারে গিয়ে পৌঁছবেন, এদেশের সাহিত্যরুচিই বলতে পারে।

নতজানু-র গদ্য ঋজু, তীক্ষ্ণ। সব থেকে স্মরণীয় লেখকের মিতভাষিতা। প্রচুর বাক্য লেখক ইচ্ছে করে অসম্পূর্ণ রেখেছেন। এই স্বেচ্ছাকৃত অসম্পূর্ণতা নিঃসন্দেহে ইঙ্গিতময়তা বাড়িয়েছে। নানা কাগজের বিশেষ সংখ্যায় উপন্যাসের ঘোড়দৌড়ে মিতভাষিতার অভাব কী মারাত্মক আমরা জেনেছি। অল্প একটু রস ভাতিয়ে ফেনিয়ে গাঁজলা তুলে দেওয়া দেখতে দেখতে আমরা পাঠকরা বারবার বোকা বনেছি।

নতজানু-র লেখককে ধন্যবাদ। আর কিছু না হোক, একটু মুখ বদলাবার সুযোগ তো দিচ্ছেন।

সুধাংশু ঘোষ

এই মৈত্রী! এই মনান্তর! (বিষ্ণু দে-কে লেখা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চিঠি অবলম্বনে দুই কবির বন্ধুত্বের ইতিহাস) অরুণ সেন। আশা প্রকাশনী। কলকাতা-৭০০ ০০৯। মূল্য দশ টাকা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মনস্বী পুরুষ হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল সর্বাধিক; বংশগত কৌলীন্যে এবং অভিজাত ঔদার্যে তাঁর বন্ধুভাগ্যও ছিল ঈর্ষাযোগ্য। 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশনা-সূত্রে তো তিনি হয়েই উঠেছিলেন কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যমণি। কিন্তু তাঁর কাব্যচর্চা বা প্রবন্ধাদি রচনা, যা প্রায়শ তাঁর একক ও নিঃসঙ্গ জীবনচর্যারই প্রতিরূপে বা পরিণাম, বিষয়ে কোন নির্মোহ আলোচনা অদ্যাবধি অলিখিত; বন্ধুজন বা গুণমুগ্ধদের অতিভাষণে তাঁর কৃতিত্ব কীর্তিত হলেও, সত্যাসত্য নির্ধারণ শেষ পর্যন্ত অনাগত ভবিষ্যতের হাতেই থেকে গেল।

এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত অরুণ সেন আহৃত এবং -সম্পাদিত সুধীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ প্রকাশনা সকল অর্থেই মূল্যবান; অধিকতর অর্থবহ এ-কারণে যে বর্তমান পত্রগুলি একালের শ্রেষ্ঠ কবি বিষ্ণু দে-কে লিখিত। পারিবারিক এবং সাহিত্যসূত্রে উভয়ের পরিচয় এবং বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়, চিন্তাচর্চায় বৈপরীত্য এবং মতান্তর সত্ত্বেও। বিষ্ণু দে-র ভাষায়, "বহুদিন উষ্ণ দ্বিপ্রহর, বহু সন্ধ্যা, অনেক সকাল/মনে মনে বেয়ে চলি, আনি চেনা চল্লিশ বছর :/কানে শুনি, অভিন্ন মননে কিংবা উষ্ণ মতান্তরে/সানুকম্প অগ্রজের, সহকর্মী সৌহার্দ্যের স্বর—"। কবিতাই, বিশেষত এলিঅটই, যদিচ উভয়ের বন্ধুত্বের প্রাথমিক সূত্র, তথাপি সে-প্রাথমিক ভিত্তিভূমি থেকে অচিরাৎ দুজনেই সরে যান দুই বিপরীত মেরুতে; কিন্তু বন্ধুত্বের যে সূত্রটা সাময়িক বিচ্ছেদ সত্ত্বেও অম্লান থেকে যায়, তা নেহাতই সাহিত্য-বহির্ভূত। এবং এ-সৌহার্দ্যে পরস্পরের কেউই সাহিত্যিক অর্থে উপকৃত বা প্রভাবিত হননি। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চায় এলিঅট তো একেবারেই অনুপস্থিত এবং লরেন্সও আসেন সুধীন্দ্রনাথেরই নামান্তরে। আধুনিকতার ব্যাখ্যানেও সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় সম্ভবত অন্ত্যজই থেকে যান। অন্যপক্ষে বিষ্ণু দে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিকতার ভিত্তিভূমিই নির্মাণ করেননি, প্রায় একক প্রয়াসেই তার উত্তরণ ঘটিয়েছেন যথার্থ নবজন্মে। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থে, সুধীন্দ্রনাথের পত্রাবলীতে এমত মানসিকতার পরিচয় বিধৃত আছে; উক্ত কবির মানসিকতা অনুশীলনে যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত পত্রাবলী প্রকাশনা রবীন্দ্রনাথ-বিভূতিভূষণের কল্যাণে এখন পরিচিত। কিন্তু সেখানে নিছক শব্দসৌন্দর্য বা পেলব কথা ভাষার মাধুর্য ভিন্ন অন্য অর্থ খোঁজা বাতুলতা, যদিচ তাঁদের অনুরাগীরা সেখানেও মহৎ সাহিত্য খুঁজে পান। সৌভাগ্য, বর্তমান গ্রন্থে অন্তত সাহিত্য অনুসন্ধানের সুযোগ অনুপস্থিত। এ-পত্রগুচ্ছের প্রকাশনা নিতান্তই গবেষণার স্বার্থে এবং সে-সত্য স্মরণ রেখেই সম্পাদকের মূল্যবান ভূমিকা এবং টীকা সংযোজন। 'পরিচয়' পত্রিকার প্রারম্ভ যুগের ইতিহাসের অকথিত অংশ সুধীন্দ্রনাথের চিঠিতে ব্যক্ত হয়। সম্পাদক যথার্থই লিখেছেন, "'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতে এই প্রবন্ধটি (কাব্যের মুক্তি) ছাপা হয় ঘোষণারূপে—কারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের ও শিল্পসাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইওরোপে যে আধুনিকতা বা মুক্তির চর্চা ঘটেছিল, তাকে স্বদেশের আঙিনায় এনে ফেলাটাই ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।" কিন্তু তাঁর 'ঘোষণা' সত্ত্বেও 'পরিচয়' শেষ পর্যন্ত আধুনিকতার বাহন হয়ে উঠতে পেরেছিল কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। মধুসূদন-অমর দত্তের সাহিত্যিক উত্তরপুরুষ সুধীন্দ্রনাথের মানসিকতা কি শেষ পর্যন্ত কোন 'মুক্তির চর্চা'য় উন্মুখ হতে পেরেছিল? 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশে তিনি আদর্শ পরিত্যাগ করে যে কম্প্রোমাইজের নীতি (দ্রঃ চিঠি ২; পৃঃ ৪৭) গ্রহণ করেছিলেন, চারিত্র্য-বিবেচনায় তা কি অনিবার্য ছিল? পরিণামে যে-বয়স্ক-আভিজাত্যের ভিড়ে 'পরিচয়' তার চরিত্র হারায়, তা অনিবার্যভাবে বিষ্ণু দে-কে প্রায়শ অপ্রয়োজনীয় ভাবতে থাকে। এ-আবহাওয়ায় আমন্ত্রিত হয়েও তিনি কোনদিন ওদের একজন হয়ে উঠতে পারেননি। অরুণবাবু লিখেছেন, "প্রথম থেকেই কেন যেন মনে হয় 'পরিচয়'-এর একটু বয়স্ক মণ্ডল থেকে বয়োকনিষ্ঠ বিষ্ণু দে একটু দূরে, 'পরিচয়'-এর একজন হয়েও একটু দূরে, কল্লোলের বোহেমিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য ঈষৎ গঞ্জিত, কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির হাওয়া থেকে ভিন্ন এই জগতে যেন সামান্য আমন্ত্রিত-নিমন্ত্রিত ভাব।" তথাপি বিষ্ণু দে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয্যে এবং বন্ধুত্বের দাবিতে (দ্রঃ ৩, ৭, ১০ ইত্যাদি পত্র)। এবং এই ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সূত্রেই তিনি তাঁর চারপাশে, 'পরিচয়'-এর সূত্রে জড়ো করেছিলেন বহু প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীকে। কিন্তু একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুধীন্দ্রনাথ কদাচ তাঁদের মতামতের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি।

অথচ সত্য যে তিনি প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে যোগ দিয়েছিলেন, সম্মেলনে বক্তৃতা করেছিলেন, অথবা মজাজ এবং আলী সর্দার জাফ্‌রিকে আপন গৃহে স্থান দিয়েছিলেন; কিন্তু এর দ্বারা তাঁর আপন প্রগতি-বিরোধী মানসিকতার কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। প্রথম দিকের কবিতায় তাঁর অনুচ্চার সত্য শেষ পর্যন্ত স্পষ্টত জনতা-বিরোধী বক্তব্যে প্রকটিত হয়।

৩১ জুলাই ১৯৫৬ তারিখের চিঠিতে (দ্রঃ পত্র ৪৭) সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই লেখেন, "...সাহিত্যপত্রের পথ আর আমার মত বিপরীত বলেছি বলে আপনি দুঃখিত হলেন কেন? এ-কথা নিশ্চয় কপোলকল্পিত নয় যে সাহিত্যপত্র শুধু মার্কস নয়, স্তালিনের (স্টালিনের) প্রতিও আস্থাবান। এবং আমার স্টালিনবিদ্বেষ বরাবর উগ্র। অবশ্য আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন একদা আমি মুখে মার্কস-ভক্তি দেখাতুম না কি? নিশ্চয়ই দেখাতুম; এবং অনেকদিন পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে মার্কসের তত্ত্ববিদ্যা তাঁর ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক মতের সংস্পর্শবর্জিত।...এই বিশ্বাসের মূলে আমার শ্রেণীস্বার্থ থাকতে পারে; কিন্তু জ্ঞানত এতে কোন মিথ্যা নেই।" স্বভাবতই মার্কস সম্পর্কে এইপ্রকার জ্ঞানই তাঁকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নৈকট্যে এনে ফেলে, যদিচ নিজের অহংবোধ শেষ পর্যন্ত সে-নৈকট্যকে মতাদর্শে নিকটতর করেনি।

এমত বিশ্বাসী সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সচেতন মার্কসবাদী বিষ্ণু দে-র মতান্তর স্বভাবতই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। শ্রীযুক্ত সেন লিখেছেন, "বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় ও মননে যে দ্রুত পরিবর্তন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে চলেছেন এ-সময়ে, মহাযুদ্ধ-পর্বে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট বরণ করে প্রগতিক জীবনচেতনা, মার্কসবাদী ধ্যানধারণা—তাঁর নিজেরই ভাষায় 'উর্বশী ও আর্টেমিস আর চোরাবালি-র পর পূর্বলেখ-র ডাইরেকশনে' সেই বাঁকবদল কি তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন বন্ধু সুধীন্দ্রনাথেরও চিন্তায় ও কর্মে?" অচিরাৎ 'অভিন্ন মনন' হয়ে ওঠে 'উচ্চ মতান্তর'। বন্ধুত্বের বন্ধনে টান পড়ে। এডওয়ার্ড শীল্‌স্‌-এর ভাষ্যে যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েতের আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন সুধীন্দ্রনাথ এবং কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কিন্তু শ্রীসেনের বক্তব্যে "এই দূরত্বটা শুধু রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক বা এমনকি দার্শনিক মতপার্থক্যের কারণেই মনে করলে ভুল হবে।" এর সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক কারণও সংযুক্ত ছিল। এর অনেক পরে পুনর্বার উভয়ের সুহৃদ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়, কিন্তু ছেঁড়া তার কি জোড়া লেগেছিল?

এই প্রবন্ধের পত্রাবলীতে সুধীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের একটা দিক অনবৃত উন্মোচিত হল, যা তাঁর কাব্যবিবেচকদের পক্ষে মূল্যবান। অভিজাত সং মানসিকতায় তিনি নিজেকে কখনো আড়াল করেননি, স্বধর্মেই আস্থাবান থেকেছেন আমৃত্যু। পত্রাবলীতে তা স্পষ্ট। শ্রীসেনকে পুনর্বার ধন্যবাদ। তাঁর প্রয়াসেই বিষয়টি পুনর্বার বিবেচনার দ্বার উন্মুক্ত করল। 'বন্ধুস্মৃতি : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' কবিতা-সংবলিত গ্রন্থটি তাৎপর্যপূর্ণ।

নির্মল ঘোষ

ঋত্বিক—সুরমা ঘটক। আশা প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য আঠারো টাকা।

সুরমা ঘটকের লেখা ঋত্বিক শুধু তাঁর স্বামীর স্মৃতিতর্পণ নয়,—একেবারে ব্যক্তিগত চিঠি, নৈর্ব্যক্তিক প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার আর অন্যান্য রচনার মারফত উঁচুদরের একজন শিল্পী তথা স্রষ্টার কাহিনী এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিজগতের প্রকাণ্ড অস্বাস্থ্য এবং হৃদয়হীনতার এক

আশ্চর্য সজীব ডকুমেন্ট।

ঋত্বিক ঘটকের জীবনকাহিনী পড়তে পড়তে স্বভাবতই বার্ট্রান্ড রাসেলের সেই বিখ্যাত লাইনগুলি কানে বাজে .

From childhood upward, everything is done to make the minds of men and women conventional. And if, by misadventure, some spark of imagination remains, its unfortunate possessor is considered unsound and dangerous. Yet such men are known to have been in the past the chief benefactors of mankind, and are the very men who receive most honour as soon as they are safely dead.

ঋত্বিকের সবচেয়ে সৃজনশীল পর্বে সে ছিল অনাদৃত। বড় বড় কাগজ প্রতিষ্ঠান যারা কাল-চারের কথায় চুলবুল করে ওঠে তারাও নিরাসক্ত হল, খালি একের পর এক ব্যর্থতা, তার মাঝখানে স্বপ্ন দেখা, পথ কেটে চলা। শেষের দিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কথা ঋত্বিক বলতেন। দুই অপরূপ শিল্পীর শেষজীবনে মদ্যপে পরিণত হওয়ার যে মর্মান্তিক অবস্থা তা কি শুধু ব্যক্তিগত-ভাবে অগোছালো। চরিত্রের ত্রুটি অথবা নিজের মুখাগ্নি করে অন্যের মুখ আলো করার মরিয়া চেষ্টা? ঋত্বিকের জীবনের অনেক কিছু ঘটনা আমাদের অনেকেরই চোখের সামনে ঘটেছে। আজ যখন ঋত্বিকের ফিল্মের কাউন্টারে লম্বা লাইন, কাগজে লম্বা প্রশস্তি বেরোয় তখন একথাই প্রমাণিত হয়, আমরা শুধু চিতায় মঠ বানাতে পারি, বড় জিনিস বড়ভাবে বুঝবার ক্ষমতা আমাদের খুবই সীমিত।

সুরমার লেখার এইটাই গুণ, তা আমাদের চারপাশে এই সবকিছু পরম সত্য আবার স্পষ্ট করে তুলে ধরে এবং আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা প্রবলতর হয়। তাঁর নিজের ভাষায় 'একজন বাংলাদেশের ছেলে একদিন গেরুয়া পাঞ্জাবি গায়ে কাঁধে একটি ঝোলা নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন জীবনের পথে... গৈরিক পদ্মার ধারে রূপকথার দেশের স্বপ্ন নিয়ে যে জীবনের শুরু, যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশভাগ পেরিয়ে দুই বাংলার ক্ষতবিক্ষত রাজপথে সে জীবনের সমাপ্তি।'

প্রথম অংশে ঋত্বিকের শিল্পী-জীবন যখন গড়ে ওঠার সময় তখন স্ত্রীকে লেখা তাঁর কয়েকটি পত্র বাংলা ভাষার পত্রসাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর মন তখনও অগোছালো নয়, সজীব শক্তিমান 'আশ্চর্য জানো, সাংসারিক হিসেবের আর দৈনন্দিন চিন্তার কথা যখন লেখ তুমি, তখন জমে না। জমে যখনই তুমি অবান্তর কথায় চলে যাও। তোমার মনটা তখন বেরিয়ে আসতে থাকে। তোমার এই depthকে আরও বাড়াতে হবে, নইলে মুক্তিকামী মানুষদের পুরো কাজে তুমি আসবে না।'

জীবনের শেষে সম্পূর্ণ ভাঙা স্বাস্থ্য এবং প্রায় চিত্তবিকারের মাঝখানেও যে দুটি অনবদ্য ছবি ('তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'যুক্তি তক্কো গপ্পো') ঋত্বিক রচনা করে গেছেন সেই প্রবল দ্বৈত সত্তার ছবিও স্পষ্ট ফুটে উঠেছে বইয়ের শেষদিকে। মেলোড্রামার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্রেখটের উদ্ধৃতিও স্মরণীয়। ঋত্বিক তো প্রমাণ করে দিয়েছেন এ ভাঙা বাংলাদেশকে ধরতে রূপকথা কিংবা মেলোড্রামা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এবং বোধহয় এই উদ্দাম মাথা ঠুকে-মরা মানুষটি ছাড়া এই মহৎ কাজ সম্ভবও ছিল না। প্রকাশককে ধন্যবাদ, সুরমা ঘটকের লেখা প্রকাশ করে বাংলা সংস্কৃতিজগতের এক উজ্জ্বল পুরুষের ছায়াপথ তাঁরা পাঠকের সামনে রেখেছেন।

অসীম রায়

ঈশ্বর প্রতিমা—অরুণ ভট্টাচার্য। উত্তরসূরি। কলিকাতা-৫০। মূল্য চার টাকা।
সময় অসময়ের কবিতা—অরুণ ভট্টাচার্য। উত্তরসূরি। কলিকাতা ৫০। মূল্য পাঁচ টাকা।

চল্লিশের কবিদের হাতে বাংলা কবিতা তিরিশের বিশাল ব্যাপ্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তা এক সহজতর দিকে মোড় নেয়—যে সহজতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় কবিতার চিরকালের বিষয়বস্তু প্রেম, এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষাদ, বেদনা। যদিও তৎকালীন সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমির তীব্রতা চল্লিশের কবিদের নির্মাণকে অনিবার্যভাবেই কিছুটা প্রভাবিত করেছিল, গড়ে উঠেছিল প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভের কাব্যভাষা তবু, শেষ পর্যন্ত, জীবনানন্দ বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অমিয় চক্রবর্তীর জটিল অথচ বিচিত্র অনুভূতিমালা, সার্থক সচেতনতা আর মনীষাকে যথাযথ বজায় না রাখতে পারলেও চল্লিশের কবিরা কবিতায় এক সহজ আন্তরিকতার নতুন স্বাদ আনেন।

চল্লিশের কবিদের কাব্য-ক্ষমতার গড়, গাণিতিক অভিধায়, তিরিশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ন্যূন হলেও অস্বীকার করা যাবে না যে সে সময়খণ্ড থেকে আমরা পেয়েছি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, (যদি তাঁকে চল্লিশে ধরা হয়) নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-অরুণকুমার সরকারের মতো উজ্জ্বল আন্তরিক কবিদের। পেয়েছি, কিছুটা দেরিতে হলেও, অরুণ ভট্টাচার্যের মতো অলংকার হীন ভাষার কবিকে, যাঁর বিষয়বস্তু মূলত প্রেম—তার বিষাদ আর বেদনা।

সম্প্রতি তাঁর দুখানি গ্রন্থ পর পর প্রকাশিত হওয়ার পর (যাতে সংকলিত হয়েছে গত আট দশ বছরের প্রায় পৌনে দুশো কবিতা) অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতা সম্পর্কে যে কোনো সচেতন পাঠকেরই আলস্য কেঁপে উঠবে; সে লক্ষ করবে, কবিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষী আধুনিকতার চর্চার পাশা-পাশি প্রবাহিত থেকেছে এক অমলিন প্রেম ও বেদনার কবিতার ধারা, যা আনন্দের চমক দিতে চায়নি, যা আবিষ্কারের মতো কোনো বাক্য-বন্ধ উপহার দিতে চায়নি, লুপ্ত কোনো শব্দ উদ্ধার করে আনেনি, কোনো চিৎকৃত যন্ত্রণা আনেনি অথচ যা আন্তরিক বোধে, সহজতায় আমাদের আজও, সমস্ত রকম আধুনিকতার দীর্ঘ পরিচর্যা সত্ত্বেও, আনন্দ দেয়। বোধের যে সব তিক্ততা আমাদের ক্রুদ্ধ হতে শেখায়, ঘৃণা করতে শেখায়, হাঁ-করে আমাদের অস্তিত্বকে আক্রমণ করে, তা অরুণ ভট্টাচার্যকে স্পর্শ করতে পারেনি।

অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতার প্রেম, বলা বাহুল্য, শুধুই নারীর জন্য আকুতি-সর্বস্বতা নয়, তা এক ব্যাপক রূপবোধের সঙ্গে যুক্ত, এবং তা নারী, বন্ধু এবং প্রকৃতির প্রতি এক সম্প্রীতির অনুভূতিতে বিস্তৃত। 'সময় অসময়ের কবিতা' থেকে পাশাপাশি মুদ্রিত দুটি ছোট কবিতা পড়ি

১. তোমার কাছে কিছুটা জায়গা চেয়েছিলাম,
যেন বসতে পাই তোমার ঘরে
যেন বকুল গন্ধে তোমার
শাড়ির আঁচলের প্রাজ্জ্বল মমতা
আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে সারাবেলা। (যেন বকুল গন্ধ)

২. কারা যেন কানে কানে কথা ব'লে যায়
'উপরে তারকা, নীচে অবিরাম জলস্রোত—
কোথায় আশ্রয় চাও?' (উপরে তারকা, নীচে অবিরাম জলস্রোত)

প্রথমটি অত্যন্ত সহজ একটি প্রেমের কবিতা যেখানে একটি নারীর সান্নিধ্য না পাওয়ার বেদনা সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় কবিতাটিতে দেখতে পাই বিশাল প্রকৃতির পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা একজন অসহায় ব্যক্তিমানুষের অসহায়তা, অসহায়তার একটি নাটকীয় পরিপ্রেক্ষিত ('কারা যেন

কানে কানে বলেছিল'), রহস্যময়তা এবং একাকিত্ব। সংক্ষিপ্ততম পরিসরে এটি একটি আশ্চর্য সার্থক কবিতা যার পাশে এই কবির 'ঈশ্বর প্রতিমা'র অন্তর্গত বিখ্যাত 'পরিশুদ্ধতার' কবিতাটি-কেও (বুকের মধ্যে পদ্মগন্ধ/চোখের নীলকান্তমণি/সব মিলিয়ে তুমি আমার/নিবিড় ছায়া, মক্ষিরাণি!) কিছু চেনা এবং স্কিম্যাটিক মনে হয়। উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় কবিতাটিও, আমার কাছে, প্রেমের কবিতাই। 'সময় অসময়' থেকে আরেকটি প্রেমের কবিতার উদাহরণ দেওয়া যাক :

থাকলে মুখ ফেরাই না সহজে
পাছে লোকে কিছু ভাবে।
না থাকলে শূন্য ঘর, জানলা দিয়ে হাওয়া
হু হু করে বাহির ভিতর। (বাহির ভিতর)

এই প্রসঙ্গে স্বীকার করা ভালো, আমাদের অবিশ্বাস-নিয়ন্ত্রিত আধুনিক মূল্যবোধের কাছেও এইজাতীয় অনাড়ম্বর স্পর্শকাতর কবিতা প্রতি দৃঢ় সম্মানিত স্থান পেয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে বাক্য আর ছন্দের মারাত্মক শিথিলতা, আটপৌরে শব্দের ক্ষয়প্রাপ্ততা এবং অতি-সরল কবিতা লেখার ঝোঁক সত্ত্বেও (উদাহরণ ১. আমি আর কোন মন্ত্র জানি নে/ভালোবাসার মন্ত্র জানি। আমি আর কাউকে জানি নে/শুধু তোমাকে জানি। ২ কোথায় যাচ্ছো মাধুকর/আমাকে নিয়ে যাও।/ সারা শরীর অবসন্ন/মনের অসুখ সারে না/ভালোবাসার দুঃখগুলি/আগুনে পোড়ে না।) তাঁর অনুভূতির তীব্রতা এবং আন্তরিকতা যাঁর কবিতাকে যথাযথ বাঁচিয়ে রাখে। আমাদের চারপাশের হা হা সময় তাঁর প্রেম বা সম্প্রীতিকে নষ্ট করতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে 'ঈশ্বর প্রতিমা' থেকে 'অন্ধকার বাড়ি' নামক চমৎকার কবিতাটির শেষ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করছি :

'অরুণ বাড়ি আছো, অরুণ
গলিটায় একরাশ দমকা হাওয়া, একরাশ হাওয়া।
ডাকতে ডাকতে আমার হাত শীতল হয়ে আসে
চটি ভেঙে পড়ে, চোখ ক্রমশ জ্বলতে থাকে।
অরুণ বাড়ি আছো, অরুণ!'

কবিতাটির নিচে লেখকের গদ্য সংযোজন : 'উত্তরা-সম্পাদক স্বর্গত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অযাচিত স্নেহ আমি আজীবন লাভ করেছি। কলকাতায় এলেই তিনি আমার সঙ্গে নিজে দেখা করতে আসতেন। বাড়ির কাছাকাছি এসেই 'অরুণ বাড়ি আছো অরুণ' ডাকতে ডাকতে বাড়ির গেট খুলতেন। তাঁর সেই কণ্ঠস্বরে আমি একদিন হঠাৎ কবিতার ধ্বনি আবিষ্কার করি। প্রায় বারো বছর আগে।'

এই সংযোজন থেকে আমরা যে একটি কবিতার উৎস জানতে পারলুম তাই নয়, একজন বন্ধুর আন্তরিক কণ্ঠস্বর থেকে কবিতার ধ্বনি আবিষ্কার করার মধ্যে যে রহস্য আর তন্ময়তা আছে, সংগীতের সংবেদন আছে তা আমাদের মুগ্ধ এবং বিবর্ণ করে।

একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে 'নিরবচ্ছিন্নকাল ও বিপন্ন শহরে অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতার বিষয়'। এই উক্তি কিছুটা শীর্ণভাবে হলেও সত্য। সাম্প্রতিককাল আর তার সংকট, এবং চারপাশের শহরের আর সমাজের অন্ধ পরিবেশ তাঁর কবিতাকে আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। আমি জানি না, এটা কোনো অভিযোগ না প্রশংসা। সত্যিই জানি না।

আমার কাছে অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতা এক ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধতার দিকে যাত্রা।

কালীকৃষ্ণ গুহ

আ লো চ না

দিনেশচন্দ্র রায়

অনিন্দ্য রূপ, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্ব আর সোনার কলমের মালিক দিনেশচন্দ্র রায় মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে আগুনের ভেলায় চেপে কয়েক মাস আগে সরাসরি ঢুকে গেলেন নিমতলার বৈদ্যুতিক চুল্লিতে। তিনি ছিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের বড় ভাই, আমিও তাঁকে অগ্রজ-তুল্য সম্মান করতাম। তাঁর সম্পর্কে যা জানি সব লিখতে গেলে আমাকে কয়েকবার কালি ভরতে হয় কলমে। এই ছোট মাপের লেখাটিতে বিশদ বলার অবকাশ নেই, তাই দু-চারটে কথার অবতারণা করছি।

১৯৬১ সালে জলপাইগুড়িতে যখন পড়তে যাই, তখন থেকে এই হাসিখুশি, সামাজিক আর তীক্ষ্ণধী মানুষটির সঙ্গে আমার আলাপ এবং প্রণয়। দীর্ঘ চোদ্দ বছর চা-বাগানের নির্জনে, প্রকৃত বনবাসে কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। চা-বাগিচাকে কেন্দ্র করে আদিবাসী মানুষ, তাদের সংস্কার, সামাজিকতা, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকজীবন ইত্যাদি নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে যে-চর্চা তিনি করেছিলেন, তার ফল আমরা পেয়েছি প্রধানত 'নাউ', 'পরিচয়', 'জার্নাল অব সোশ্যাল-অ্যানথ্রোপলজিকাল স্টাডিজ'-এ প্রকাশিত সুচিন্তিত তথ্য ওতপ্রোত প্রবন্ধগুলিতে। আদিবাসী উপজাতিদের সম্পর্কে দিনেশচন্দ্রের ঔৎসুক্য বরাবরের। কাজ নিয়ে যখন তিনি আন্দামানে চলে যান, তখনও সেখানকার জারোয়া আর ওঙ্গিদের সম্পর্কে 'পরিচয়'-এ অসামান্য লেখা পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের নিয়ে যে সমীক্ষা করেছিলেন তিনি, 'বুলেটিন অব ন্যাশনাল লেবর ইনস্টিটিউট'-এ তা প্রকাশিত হয়েছিল।

এ তো গেল গবেষণার ব্যাপার। সবার চোখের আড়ালে কিভাবে তিনি নিজেকে কথাসাহিত্যিক হিসেবে তৈরি করছিলেন, কাঠখড় দিয়ে প্রতিমা বানানোর সেই নেপথ্য প্রস্তুতি সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি আমি।
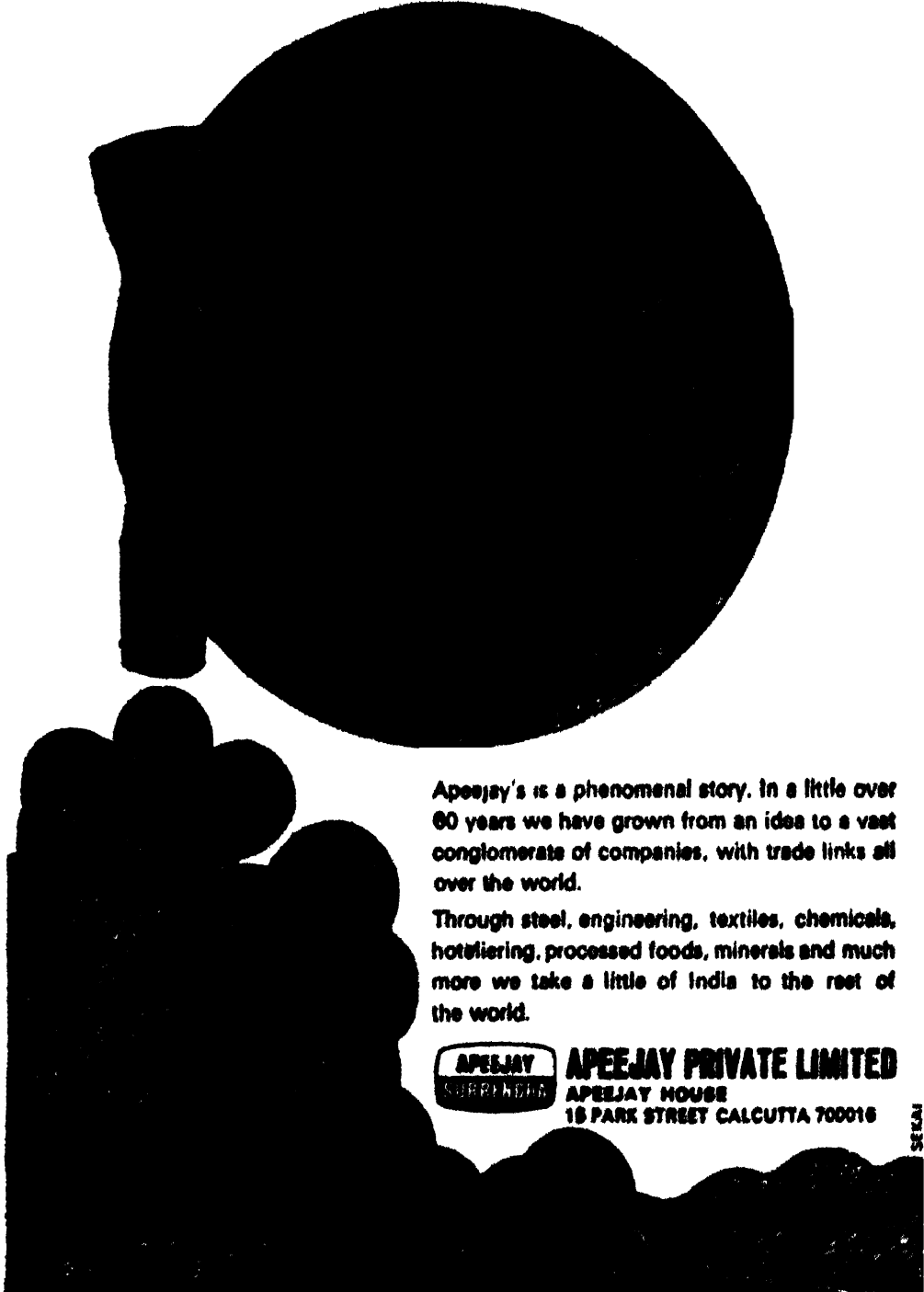
১৯৬৯-এর শেষদিকে জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম। তার কিছুদিন পর থেকে প্রধানত 'চতুরঙ্গ' আর 'অনুষ্টুপ'-এ যখন তাঁর একটির পর একটি গল্প আর উপন্যাস প্রকাশিত হতে লাগল, অসম্ভব নাড়া খেলাম। রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়ে গেছি তাঁর 'কুলপতি', 'আইরাজ মণিরাজ', 'ওড়কা', 'ঐরাবতের মৃত্যু'-র মতো গল্প; 'কুলের পুতুল', 'বিভাবরী', 'লিপুইয়ারের মৃত্যু', 'সোনা-পম্মা'-র মতো উপন্যাস। ইদানীং খুব কম লেখকই লেখার জন্য নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করেছেন বলে আমার ধারণা। ব্যাপক অভিজ্ঞতা, বিষয়-বৈচিত্র্য, অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি, নিবিড় বাস্তবতাবোধ আর রচনার প্রসাদগুণে হাত ধরাধরি করে এসেছিল তাঁর লেখায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর শঙ্খ ঘোষের মতো আমরা অনেকেই আশা করেছিলাম, গর্বিত মাথা উঁচু করে অনেকখানি পথ হেঁটে যাবেন তিনি।

শেষের বেশ কিছুদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হয়। হঠাৎ হঠাৎ গেছি, দেখেছি কিভাবে

তাঁর অপূর্ব স্বাস্থ্য আর রূপ দাঁতে কেটে তছনছ করছে অসুখ। একদিন গিয়ে দেখি, তাঁর বিছানার পাশে রয়েছে ভারতের বৈদেশিক মন্ত্রক কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত 'ঐরাবতের মৃত্যু' গল্পটির অফ-প্রিন্ট। 'সোনাপদ্মা' উপন্যাসটির গ্রন্থাকারে ছাপার কাজ যখন প্রায় শেষ, তখনই হঠাৎ তাড়া-হুড়ো করে চলে গেলেন সেই সদাহাস্যময় পুরুষ—দিনেশচন্দ্র রায়। তাঁর স্ত্রী ও শিশুকন্যা দুটির দিকে তাকানোর অবকাশও পেলেন না—এ কেমন ধারার মানুষ!

অমিতাভ দাশগুপ্ত

Tapping the Export market.

Registered with the Registrar of Newspaper for India under R. N. No. 5400/57

আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়ে, আর আমার ব্যাঙ্ক—এই তিন নিয়ে আমার সুখের সংসার

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক